সেইসব অন্ধকার

তসলিমা নাসরিন

কণ্ঠরোধ

মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে লাগতে পারে এই কারণ দেখিয়ে তসলিমা নাসরিনের আমার মেয়েবেলা আর উতল হাওয়া, আত্মজীবনীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে। একই কারণ দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিষিদ্ধ করেছে দ্বিখণ্ডিত। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এই বইয়ের বিরুদ্ধে মোট একুশ কোটি টাকার মামলা রুজু করা হয়েছে, দুবঙ্গের আদালতই বইটির বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও লেখকের কলম কেড়ে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সমাজের নানান শ্রেণীর লোক, মৌলবাদী গোষ্ঠী, অমৌলবাদী গোষ্ঠী, লেখক শিল্পী রাজনীতিবিদ এমনকী তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার।

তথ্য

সেইসব অন্ধকার তসলিমার সেই দিনগুলোর কাহিনী, যখন তাঁকে দীর্ঘ দুমাস অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল নিজের দেশে। বইটি মূলত তথ্যভিত্তিক। বাংলাদেশে প্রকাশিত আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, ইত্তেফাক, সংবাদ, বাংলাবাজার, ইনকিলাব, দিনকাল, সংগ্রাম, মিল্লাত ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকা থেকে তখনকার খবরগুলো নেওয়া হয়েছে।

যাঁদের কাছে আমার সারাজীবনের ঋণ

আহমদ শরীফ
কলিম শরাফী
খান সারওয়ার মুরশিদ
কবীর চৌধুরী
শামসুর রাহমান
কে এম সোবহান
ডঃ কামাল হোসেন
হামিদা হোসেন
রোকেয়া কবীর
সুলতানা জামান
রুবী রহমান
শামীম সিকদার
সারা হোসেন
শহিদুল আলম
ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

সাত খণ্ডে আত্মজীবনী

প্রকাশিত

১. আমার মেয়েবেলা (১৯৬২-১৯৭৫)
২. উতল হাওয়া (১৯৭৬-১৯৮৭)
৩. দ্বিখণ্ডিত (১৯৮৮-১৯৯৩)
৪. সেইসব অন্ধকার (১৯৯৪)

অপ্রকাশিত

৫. আমি ভাল নেই, তুমি ভাল থেকো প্রিয় দেশ (১৯৯৪-১৯৯৭)
৬. নেই, কিছু নেই (১৯৯৮-২০০২)
৭. বাকি জীবন (২০০৩ -)

সূচি

প্যারিসের ডায়রি
তাণ্ডব
অতলে অন্তরীণ
দেশান্তর

b

জিল গনজালেজ ফরস্টার যেদিন এল আমার বাড়িতে, সেদিন অস্ট্রেলেশিয়া কাপের খেলা হচ্ছে, খেলছে ভারত আর পাকিস্তান। জিলকে ইশারায় বসতে বললাম সোফায়, আমার মতই সে মন দিয়ে খেলা দেখতে লাগল। এক ঘন্টা কেটে গেল খেলা দেখেই। এই একটি ঘন্টা আমি জিলের সঙ্গে কোনওরকম কথা বলিনি, বলিনি কারণ আমি নিশ্চিত যে খেলার মাঝখানে কথা বললে ছেলে বিরক্ত হবে। আমাদের বাড়িতে এরকমই নিয়ম, আর যেসময় বিরক্ত কর কর, খেলা দেখার সময় নয়, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার সময় নয়, আরও বিশেষ করে সে খেলা যদি ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে হয়। জাদেজা শূন্য করে বিদেয় হল। শচিনও বাইশ না তেইশ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল। আজহার তিন করে শেষ। এরপর ধুত্তুরি বলে খেলা থেকে চোখ সরিয়ে জিল কোন দলের সমর্থক তা জানতে চাই। প্রশ্ন শুনে বোকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে--*এই খেলার নাম কি?*

খেলার নাম কি মানে? তুমি জানো না কী খেলা এটি! আকাশ থেকে আমার সত্যিকার পড়া যাকে বলে।

জিল মাথা নাড়ে। সে জানে না। খেলার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বোঝেনি।

বলে কি! ইউরোপের ছেলে, ইংলেন্ডের পাশের দেশে তার দেশ, আর সে কি না ক্রিকেট কি, কাকে বলে তার কিছুই জানে না! না, জানে না! ক্রিকেট খেলা জিল তার বাপের জন্মে দেখেনি, শোনেওনি ক্রিকেট বলে একটি খেলা আছে এই জগতে। একবার কবে কোথাও শুনেছিল ইংরেজরা একটি খেলা খেলে, যে খেলায় বেশির ভাগই খেলোয়াড়ই মাঠের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে, একজন বা দুজন কেবল দৌড়োয়; সেই উদ্ভট খেলাটির নামই যে ক্রিকেট, তা আজ সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

তাহলে এক ঘন্টা যে মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখলে!

দেখলাম! কী আর করতে পারি! তুমি তো কথা বলছিলে না। তুমি ব্যস্ত।

হায় কান্ড।

আমি ভেবেছিলাম আমার চেয়ে জিলই বুঝি বেশি উপভোগ করছে খেলা। যাই হোক, যখন কথা বলার সময় হল, তখন বেচারার যাওয়ার সময়ও হল। হাতে মাত্র একঘন্টা সময় নিয়ে সে এসেছিল আমার বাড়িতে। বলল কাল সে আমাকে নিয়ে যাবে ফরাসি দূতাবাসে। এই দূতাবাসেই আমি আগে গিয়েছিলাম ভিসার জন্য। আমাকে পাঠানো রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্স আর আর্তে টেলিভিশনের আমন্ত্রণ দেখেও দূতাবাসের লোকেরা কঠিন কণ্ঠে বলে দিয়েছে যে এসব আমন্ত্রণে কাজ হবে না, ভিসা হবে না। কেন হবে না, কী কারণ, তার কিছুই বলেনি। ভিসা হবেনার খবর শুনে

রিপোর্টাস সাঁ ফ্রন্টিয়ার্সের লোকেরা জিলকে পাঠিয়ে দিয়েছে প্যারিস থেকে ঢাকায়, যেন ভিসার ব্যবস্থা করে আমাকে নিরাপদে নির্বিঘ্নে প্যারিস নিয়ে পৌঁছোয়।

জিল আমাকে পরদিন দূতাবাসে নিয়ে গিয়ে ভিসা পাইয়ে দিল। যে ভিসা দিতে চায়নি দূতাবাস, সেই ভিসাই কী চমৎকার দিয়ে দিল। যে জিনিসটি হবে না বলে জানি, সেটি কী যে কী অজ্ঞাত কারণে মাঝে মাঝে হয়ে বসে থাকে! জিল টিকিট নিয়ে এসেছে। ঢাকা থেকে থাই এয়ারলাইন্সে ব্যাংকক হয়ে এয়ার ফ্রান্সে প্যারিস। যে আমার পাসপোর্টই ছিল না, সে আমার পাসপোর্ট হয়েছে, দুর্লভ পাসপোর্টে দুর্লভ ভিসাও জুটে গেছে। পাসপোর্টটি কখনই হয়ত পেতাম না যদি না বিদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো তাদের সরকারকে চাপ দিত আমার পাসপোর্ট ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। পাসপোর্ট ফেরত পাওয়ার আশা আমি আসলে একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু আমেরিকা নাক গলালে হুকুম নড়ে তো হাকিম নড়ে না প্রবাদটি বোধহয় অচল হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস, এই অসম্ভবটি সম্ভব করার পেছনে লেখক সংগঠন পেন এর ভূমিকা আছে, পেন যদি প্যানপ্যান না করত, তবে আমেরিকার সরকার মোটে সজাগ হত না। ফতোয়ার খবর, মোল্লাদের আন্দোলনের খবর তো আছেই, নিউ ইয়র্ক টাইমসে লেখা আমার উপসম্পাদকীয়টিও সম্ভবত অনেকটা কাজ করেছে আমার ব্যাপারে আমেরিকার সরকারের উদ্যোগী হওয়ার। তা না হলে তাদের কি দায় পড়েছিল বাড়ি বয়ে এসে আমার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে যাওয়ার! কত মানুষের ওপর এ দেশে অন্যায় হচ্ছে, কত নিরপরাধ মিছিমিছি জেলে পচে মরছে, কত মানুষকে উদ্বাস্তু বানানো হচ্ছে, দেশছাড়া করা হচ্ছে, কই তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের আমেরিকান অ্যাড্রু সাহেব কি দৌড়োদৌড়ি করছেন কিছু!

সুটকেসে কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিলাম। এপ্রিলে এখানে গরমে সেদ্ধ হলেও ওখানে তো অন্তত শীত শীত আবহাওয়ার মধ্যে পড়তে হবে। তবু শাড়ি নিলাম কিছু। প্যান্ট সার্ট ভাল তেমন নেই আমার। লালমাটিয়ায় গিয়ে ছোটদার কাছ থেকে তাঁর একটি কোট নিয়ে এলাম। দু তিনটি সার্ট প্যান্টও নিলাম। গায়ে আমার ঢ্যালঢ্যাল করে ওসব, কিন্তু চলে। বাড়ি কেনার পর টাকা পয়সার অত ছড়াছড়ি নেই যে নতুন কাপড় কিনব।

জিল মোটা একটি বই নিয়ে এসেছে আমার জন্য। রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্স বের করেছে। পৃথিবীর কোথায় কোথায় লেখক সাংবাদিকদের কলম কেড়ে নেওয়া আছে, কাকে জেলে ঢোকানো হচ্ছে, কাকে পেটানো হচ্ছে, কাকে মেরে ফেলা হচ্ছে, তার খবর। বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখা, দেশটি অতি দরিদ্র। বন্যা ঘূর্ণিঝড় দারিদ্র পীড়িত এই দেশে একজন লেখক আছে, তাকে মৌলবাদীরা আক্রমণ করছে। সরকার তার বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তার পাসপোর্ট আটক করেছে। জিল বলল,'বাংলাদেশে এই আমি প্রথম এলাম। এ দেশ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না আমরা। কেবল তোমার কথা জানি। প্যারিসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে অনেকেই আসবে, সবাই ওরা তোমার সম্পর্কে জানে। আমরা তোমাকে জানতে চাই। তোমার বই পড়তে চাই।' জিল এখানকার কিছু সাংবাদিকদের সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে কথা

বলেছে। জিলকে নিয়ে শামসুর রাহমানের বাড়ি ঘুরে এসে শেরাটন হোটেলের ক্যাফেতে বসে চা খেতে খেতে জানতে চাইলাম এখানকার সাংবাদিকদের তার কেমন লেগেছে? জিল পকেট থেকে কিছু নামের কার্ড বের করে বলল এঁদের সঙ্গে সে কথা বলেছে। নামগুলোর মধ্যে একটি নামই আমি পেলাম চেনা। মুহম্মদ জাহাঙ্গীর।

ডডএ লোকটি নিশ্চয়ই আর সবার চেয়ে ভাল?

জিল কাঁধ নাড়িয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মাত্র কয়েকমিনিট কথা হয়েছে, বললেন, তোমরা ধনী দেশ, তোমরা এই গরীব দেশের সাংবাদিকদের জন্য টাকা পাঠাচ্ছো না কেন! টাকা পেলে এখানকার সাংবাদিকদের অনেক সুবিধে হবে। টাকা পাঠাও যদি সত্যিই সাংবাদিকদের জন্য কিছু করতেই চাও।'

জিলের সংগঠনটি, আমি যদ্দুর বুঝি যে কাউকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার জন্য নয়। সাংবাদিকদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করার জন্য সংগঠনটি। সাংবাদিকরা যেন স্বাধীনভাবে যে কোনও খবরই পরিবেশন করতে পারেন, তাঁদের যেন এ কারণে কেউ হেনস্থা করতে না পারে, তাঁদের যেন কেউ ঝামেলায় ফেলতে, জেলে ভরতে না পারে। তাঁদের যেন কণ্ঠরোধ করা না হয়, তাঁদের কলাম যেন কেড়ে নেওয়া না হয়। সংগঠনটির কাজ বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। এ দেশের সাংবাদিক সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার আগেই জিলের ধারণা জন্মে গেছে।

জিল যে বাড়িতে উঠেছে, বাড়িটি এক বাঙালি ভদ্রলোকের, বউ ফরাসি। এর আগে প্যারিসের গামা ফটো এজেন্সি থেকে জিল সসেয়ার এসেছিল, সেও গুলশানের এ বাড়িটিতে ছিল। সেই জিলের সূত্র ধরেই এই জিল এ বাড়িতে উঠেছে। সেই জিল কয়েক হাজার ছবি তুলে নিয়ে গেছে আমার, এমনকী আমাকে নিয়ে ময়মনসিংহে গেছে, অবকাশে পরিবারের সবার সঙ্গে ছবি তুলেছে, বিশেষ করে মার সঙ্গে। ছাদে। মার সঙ্গে ছবি? মা অপ্রস্তুত ছিলেন। মার তো কখনও এভাবে কখনও ছবি তোলা হয় না। মাকে গুরুত্ব দেওয়াটা বাড়ির সবাইকে তো বটেই, মাকেও অবাক করেছে। এখন এই জিল, জিল গনজালেজ গুলশানে। এ বাড়িতে সেদিন অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, নিমন্ত্রিত বাঙালি অতিথিদের জিল বড় গর্ব করে বলেছে, তোমাদের তসলিমাকে আমি প্যারিসে নিয়ে যেতে এসেছি। ওখানে ওর অনুষ্ঠান আছে। আর্তে টেলিভিশনে ও প্রেস ফ্রিডম সম্পর্কে বলবে। শুনে, জিল বলল, ওরা মোটেও খুশি হয়নি, বরং বলেছে, ওর লেখা তো আমরা পছন্দ করি না।

জিল সাত ফুট লম্বা। মেদহীন ছিমছিমে শরীর। নীল চোখের সোনালি চুলের আশ্চর্য সুন্দর যুবক। ছবির দেশের কবিতার দেশের যুবক। জিল বলে, *ফরাসিরা খুব সরল। জটিলতা কম বোঝে।* এটি আমার খুব যে বিশ্বাস হয়েছে, তা নয়। এলিজাবেথকেই তো দেখেছি। ফ্রান্স থেকে এসেছিল আমার ওপর একটি তথ্যচিত্র করতে। বড় রহস্যময়ী। বিশাল বিশাল ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে এলিজাবেথের পেছন পেছন এসেছিল ফিলিপ। আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাঝখানে মাঝখানে ফিলিপ আর

এলিজাবেথ আড়ালে গিয়ে ফরাসি ভাষায় কথা বলে। আমি সামনে গেলেই কথা বন্ধ করে ফেলে। আরে বাবা, বলে যাও, আমি কি আর ফরাসি ভাষা বুঝি! এলিজাবেথ আমাকে সিলেটের সাহাবা সৈনিক পরিষদের হাবীবুর রহমানের কথা জিজ্ঞেস করল, যা জানি তা জানালে বলেছিল যাবে সে সিলেটে। সিলেটে যাবে? কি করে ওখানে হাবীবুর রহমানকে খুঁজে পাবে? আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে এলিজাবেথ আবার ফিলিপের সঙ্গে ফিসফিস করল। এরপর আমাকে একেবারে সাফ সাফ জানিয়ে দিল, আসলে তাদের সময় নেই সিলেটে যাবার, তারা যাচ্ছে না। আসলে কিন্তু সিলেটে তারা গিয়েছিল। পত্রিকায় দেখেছি খবর। আমার কাছে লুকোনোর কী কারণ থাকতে পারে আমার বোঝা হয়নি। জটিলতা হয়ত জিল কম বোঝে।

শেষ রাত্তিরে বিমান উড়বে আকাশে। আমাকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবার জন্য সাহাবুদ্দিন আমার বাড়িতে রাত কাটালেন। জিলকে গুলশান থেকে তুলে নিয়ে বিমান বন্দরে গেলাম, রাত তখন তিনটে কি চারটে। গিয়ে শুনি সময় মত আমরা বিমানে চড়তে পারছি না, দেরি হবে তিন ঘন্টা। রাতে আমার ঘুম হয়নি, জিলেরও হয়নি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিমানে ঘুমোবো। ক্লান্তিতে নুয়ে আসছিল শরীর, রেস্তোরাঁর এক কোণায় তিনটে করে চেয়ার সাজিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। এমন জায়গায় শুলেই তো ঘুম আসে না। দুজন গল্প করতে শুরু করলাম। জিল এই প্রথম এশিয়ার কোনও দেশে এসেছে। বিমান বন্দরটি সম্পর্কে বলল, ইস কী ছোট বন্দর, মাত্র কটা মাত্র বিমান! কেমন লেগেছে ঢাকা শহরটি দেখতে! বলল, খুব ভিড়, রিক্সার, মানুষের। বলল, প্যারিসে কেবল গাড়ি। গাড়ি আর গাড়ি। গাড়ির কথায় এও বলল যে ওখানে সবাই নিজে গাড়ি চালায়। ড্রাইভার রাখে না। খুব ভিআইপি হলে রাখে। যেমন? যেমন প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার। আমার গাড়ির ড্রাইভার দেখে জিল বলেছিল, তুমি খুব ধনী। শুনে হেসে বাঁচি না। না, ধনী হতে হয় না। এখানে সবাই ড্রাইভার রাখে। ড্রাইভারের বেতন এখানে তো খুব বেশি নয়, তাই রাখতে পারে। আমার বাড়িতে, প্রথমদিনই জিল বলেছিল, জ্যোৎস্না নামের ন বছর বয়সী মেয়েটিকে দেখে, যে চা দিয়েছিল আমাদের, *ও কি তোমার ভাই?*

না, ও এখানে কাজ করে।

কাজ করে? জিল অবাক হয়। কাজ করার মানুষ যারা রাখে, তারা তো খুব ধনী হয়, জিলের ধারণা।

জ্যোৎস্নার ন্যাড়া মাথা দেখে জিল বলে, *ওর মাথায় চুল নেই কেন?*

চুল ফেলে দেওয়া হয়েছে, আবার ভাল চুল গজাবে বলে।

ভাল চুল গজাবে! জিলের নীল চোখদুটো অনেকক্ষণ বড় হয়ে ছিল বিস্ময়ে। কানাডার মেয়ে লীনাও অবাক হয়েছিল ভালবাসার ন্যাড়া মাথা দেখে। ওকে পরে আমি বুঝিয়ে বলেছি, এখানে এরকম একটি বিশ্বাস চালু আছে যে যত বেশি চুল কাটা হয় বাচ্চাদের, তত ঘন ও কালো চুল গজায়। এটির পেছনে কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে বলে আমার জানা নেই। জিলের আরও একটি ধারণা দেখে আমি হেসেছিলাম। মৌলবাদীদের একটি মিছিল দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, ওরা কি মুসলিম?

জিল মুসলিম বলতে মৌলবাদী বোঝে। ক্রিশ্চান মৌলবাদীদের ও ক্রিশ্চান বলে। ক্রিশ্চান শব্দটি উচ্চারণের সময় ওর নাক কুঁচকে ওঠে। মুসলিম শব্দটি ভয়ংকর একটি শব্দ, ওর উচ্চারণে আমি তা অনুমান করি।

রেস্তোরাঁয় চেয়ার পেতে শুয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়! উঠে হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটাতে থাকি। বিমান বন্দরের জানালায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন দেখছিলাম বিমান উড়ছে, নামছে, সৌদিয়া, পিআইএ, বাংলাদেশ বিমান, জিল মন্তব্য করল, *দেখেছো সব বিমানগুলোয় সবুজ রং!*

তাতে কি?

সবুজ হচ্ছে ইসলামের প্রতীক। সব মুসলিম দেশের পতাকাতেই সবুজ রং থাকে।

আমি তো জানি সবুজ হচ্ছে তারুণ্যের রং। সবুজ হচ্ছে প্রকৃতির রং।

তুমি দেখো, সব মুসলিম দেশেরই পতাকায় সবুজ আছে। কিছু না কিছু সবুজ আছেই।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, *না। ঠিক বলনি। তুরস্কের পতাকায় নেই।*

জিল মাথা চুলকোয়। এটি তার মাথায় ছিল না।

তুরস্ক ছাড়া সব মুসলিম দেশের পতাকায় সবুজ আছে।

খানিকক্ষণ ভেবে বলি, *মালোয়েশিয়ায় নেই, তিউনেশিয়ায় নেই। কাতারের পতাকায় নেই।*

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে জিল বলে, *গুনে দেখবে বেশির ভাগ দেশগুলোতেই আছে।*

অনেক অমুসলিম দেশের পতাকায় সবুজে ভর্তি। ব্রাজিল। ভারত। বুলগেরিয়া। আয়ারল্যান্ড। ইতালি। মেক্সিকো। দক্ষিণ আফ্রিকা। আমি নিশ্চিত, আরও অনেক দেশে আছে।

হ্যাঁ থাকতে পারে। কিন্তু মুসলিম দেশের পতাকায় বেশি।

বাংলাদেশের পতাকার সবুজের ব্যাখ্যাটি করে দিলাম, বাংলাদেশ ইসলামিক দেশ নয়। এখনও দেশটির নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। পতাকার সবুজ হচ্ছে আমাদের সবুজ প্রকৃতি।

বাংলাদেশ ছাড়ার আগে জিল সাংবাদিকদের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। বলে যে অনেক সাংবাদিকের সঙ্গেই তার কথা হয়েছে। আমার সম্পর্কে ওদের সে জিজ্ঞেস করেছে। ওরা অদ্ভুত করে নাকি হেসেছে। বলেছে, ও তো পুরুষ বিদ্বেষী। ও যে রকম নারী স্বাধীনতার কথা বলে, সেটি এ দেশের জন্য খাটে না। জিল আমাকে জিজ্ঞেস করে, সরল জিজ্ঞাসা, সাংবাদিকদের ভ্রূ কুঞ্চন হয় কেন আমার নাম শুনলে? জিল ওদের ভ্রূ কুঞ্চন দেখে বেশ আহত হয়েছে। কী জানি, মনে মনে ভাবছে বোধহয় যে আমাকে এতটা সম্মান জানাতে প্যারিস অবদি নিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। আমি সংকোচে চোখ ফিরিয়ে নিই। জিলের মুখখানার দিকে তাকিয়ে আমার বোঝা হয় না কোনও অনুশোচনা হচ্ছে কি না তার। বোধহয় হচ্ছে, বোধহয় হচ্ছে না। আমি এই হচ্ছে আর হচ্ছে নার মাঝখানে দুলতে থাকি একা একা। এখানকার সাংবাদিকদের চরিত্র আমি বেশ জানি, তারা কি বলল না বলল তা নিয়ে আমি

মোটেও মাথা ঘামাই না। জিলের জন্য আমার মায়া হতে থাকে। সে কষ্ট পাক, চাই না।

ব্যাংককে পৌঁছে দেখি আমাদের ন কি দশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে প্যারিসের বিমান ধরার জন্য। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বিমান বন্দরে দুটো ঘর নেয় জিল। জিল দুটো ঘর নেয় কেন? ছ ঘন্টায় একটি ঘর চল্লিশ ডলার করে। এত টাকা খরচা করার কোনও মানে নেই। একটি ঘরেই আছে দুটো বিছানা। এতেই তো দুজনের চলত। কি জানি এ বোধহয় সভ্য দেশের বিশেষত্ব। ঢাকা বিমান বন্দরে এক শাদা লোককে দেখিয়ে জিলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লোকটি কি ফরাসি? জিল এক পলক দেখেই সোজা বলে দিল, না।

ডডনা বললে কেন? কি করে বুঝলে যে লোকটি ফরাসি নয়? ফরাসিদের চেহারায় কি বিশেষ কোনও কিছু আছে?

নিশ্চয়ই, বলে রেস্তোরাঁয় কয়েকটি শাদা লোকের দিকে তাকিয়ে ফট করে একটিকে দেখিয়ে বলে দিল, *ওই লোকটি ফরাসি।*

তাই বুঝি!

ফিরে ফিরে তাকিয়ে কিছু একটা বিশেষত্ব খুঁজছিলাম চেহারায়, আচার, আচরণে। আছে কি? হুঁ, তা আছে বটে কিছু।

যদিও বিশ্রামের জন্য আমরা ঘর নিয়েছিলাম, ঘুম আমারও হয়নি, জিলেরও হয়নি। আমরা আবার সিদ্ধান্ত নিই, বিমানে ঘুমোবো। বন্দর ঘুরে জিলের জন্য চকলেট কিনেছি। দেখে খুশিতে ফেটে পড়ে। আমি যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ঘরে, তখনই জিল দুজনের পাসপোর্ট আর টিকিট দেখিয়ে দুটো বোর্ডিং কার্ড নিয়ে নিয়েছে। পরে আমাকে মন খারাপ করে বলল, বোর্ডিং কার্ড দিচ্ছে যে মেয়েটি, জিজ্ঞেস করেছে জিলকে, আপনার হাতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট কেন? কে এই বাংলাদেশি মেয়ে?

একে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্যারিসে। উত্তর শুনে মেয়েটি জিলের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়েছে। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছে, একে ওকে ডেকে এনে পাসপোর্ট দেখিয়েছে। এসব শুনে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীদের কী ভীষণ ঘৃণা করে মানুষ! তারা যে কোনও দেশেই অবৈধ ভাবে ঢুকে যেতে পারে, এই আশঙ্কা সবার। আমি সেই দেশেরই মানুষ বেরিয়েছি পৃথিবীর পথে, যার দিকে দেশে দেশে লোকেরা সন্দেহের চোখে তাকাবে। জিল অনেকবার গৌরব করে বলেছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ ফ্রান্স, সবচেয়ে সুন্দর শহর প্যারিস। সে জার্মানি পছন্দ করে না, কারণ বড় শক্ত শক্ত নিয়ম কানুন ও দেশে, আমেরিকাও তার পছন্দ নয়, কোনও সংস্কৃতি নেই বলে। তবে, জিল, না বললেও বুঝি, যে, বাংলাদেশকে পছন্দ করে না। আর তার অপছন্দের দেশের, প্রচণ্ড গরীব আর সভ্য না হওয়া দেশের মানুষ আমি ডড আমাকেও নিশ্চয়ই সে পছন্দ করছে না। যদি করে কিছু, সে করুণা।

যখনই বিমানের ভেতর ঢোকার জন্য লোকদের ঠেলাঠেলি ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল, জিল জোরে হেসে উঠে বলে, ‘এরা এমন পাগল হয়ে যাচ্ছে কেন আগে যাওয়ার জন্য, আগে গেলে কি ভাল জায়গায় বসতে পারবে নাকি?’ আমাদের

মধ্যেই আগে যাওয়ার কোনও তাড়া ছিল না। আগে গেলেও পরে গেলেও ওই বাহান্নো নম্বর আসনেই বসতে হবে। বিমানের ভেতরে দুজন পাশাপাশি বসে এয়ার হোস্টেসদের দিয়ে যাওয়া কমলার রস পান করছি যখন, জিল বলল, 'খেয়াল করেছো, এয়ার হোস্টেসদের হাসিগুলো? কি রকম কৃত্রিম হাসি, দেখেছো! যেন রোবটের মুখে হাসি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' রসের গেলাস যখন নিতে এল আরেক এয়ার হোস্টেস, মোটেও না হেসে, জিল আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে বলে, 'এ এখনও ট্রেইনি, নকল হাসি রপ্ত করতে শেখেনি।' ঘুম আমাদের, যা ভেবেছিলাম, হবে, হয়নি। ওরকম বসে বসে কি ঘুমোনো যায়! ঘুমোতে চেষ্টা করে আমারও ঘুম হয়নি, জিলেরও হয়নি। বিমান চলছে কাঠমুণ্ড দিল্লি হয়ে পাকিস্তান আফগানিস্তান পার হয়ে প্যারিসের দিকে। জানালা খুলে দিলে ঝাঁক ঝাঁক আলো এসে সম্ভাষণ জানায়। প্যারিসে যখন নামলো বিমান, চলমান সিঁড়িতে নয়, তুমি হাঁটছো চলন্ত কার্পেটের ওপর দিয়ে, ওতে আর সবার মত হাঁটতে গিয়ে যেহেতু অভ্যস্ত নও, হুমড়ি খেয়ে পড়তে নিয়েছো বেশ কবার। খুব দ্রুত এক দালান থেকে আরেক দালানে পারাপারের জন্য এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি করেছে ফরাসিরা। কিন্তু বন্যা ঘূর্ণিঝড় আর দারিদ্রপীড়িত দেশের মানুষ এসব যান্ত্রিক জিনিসে কি করে স্বচ্ছন্দ হবে! কোনও কারণ নেই। হাঁ হয়ে দেখি বন্দরটি। কি বিশাল! কি বিশাল! বন্দরের নাম শার্ল দ্য গোল। বন্দরটিতে হাজার হাজার মানুষ ছুটছে, মিনিটে মিনিটে বন্দরের উঠোনে বিমান নামছে, উঠোনে বসে থাকা বিমান উড়ে যাচ্ছে। এই আছে, এই নেই। চোখের পলকে দৃশ্যগুলো বদলে যাচ্ছে। ছোটোবেলায় দেখা বায়স্কোপের ছবির মত। এমন দৃশ্য সত্যিকার এই প্রথম দেখছি জীবনে। আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্সের প্রধান রবার্ট মিনার্ড। জিল যাকে হোবিয়া মিনা বলে, অন্তত আমার কানে এরকমই শোনা যায়। রবার্ট মিনার্ড আর হোবিয়া মিনা যে এক ব্যক্তি তা আমার পক্ষে প্রথম বোঝা সম্ভব হয়নি। আমি জানি যে ফরাসি উচ্চারণ ঠিক বানানের মত হয় না। বানানে রিমবাউড হলেও ফরাসি কবির নাম র‍্যাঁবো, তারপরও শুনি র‍্যাঁবোও ওরা আমাদের মত উচ্চারণ করে না, কান পাতলে শোনা যাবে খ্যাঁবো। ওদের সম্পর্কে পড়ে আর শুনে জানা এক জিনিস, আর ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের সম্পর্কে জানা আরেক জিনিস। হোবিয়া মিনা আমাকে জড়িয়ে ধরে দু গালে চুমু খেলেন। আমি ভীষণ অপ্রস্তুত। অনভ্যাসে কাঠ হয়ে ছিলাম। চকিতে সরিয়েও নিয়েছিলাম মুখ যখন তাঁর মুখ আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছিল। জানতাম ফরাসিরা গালে চুমু খায়, কিন্তু চুমুর সামনে পড়লে মাথার এই জানা বিদ্যেটা চড়ুই পাখির মত উড়ে যায়। হোবিয়া মিনা একটি অক্ষর ইংরেজি জানেন না। আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছে জিল।

বন্দর থেকে বাইরে বেরোলেই তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস। একটি শীত শীত সুই আমার গায়ে বিঁধল এসে। জিল তার গায়ের কোটটি খুলে আমার পিঠে ছড়িয়ে দিল। আমরা গাড়ি করে প্যারিসের দিকে যাচ্ছি। গাড়ি খুব দ্রুত চলছে, সব গাড়িগুলোই খুব দ্রুত চলে এখানে। হোবিয়া মিনা আর জিল দুজন অনর্গল কথা বলছে, জিল দেখছি নোট করে নিচ্ছে যা যা কথা হচ্ছে, লম্বা একটি কাগজ ভরে গেল লিখতে

লিখতে। মাঝে মাঝে জিল আবার অনুবাদ করে দিচ্ছে আমাকে, 'তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছে, এডিশন দ্য ফাম থেকে, উনি আবার মন্ত্রীও।' ফ্রান্সের মন্ত্রী দেখা করতে চাইছে! অবাক হই। আমি কি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার যোগ্য! এরা হাজার বছরের শিক্ষিত। আর আমার বংশে আমার নানা দাদা দুজনই টিপসই এর চেয়ে বেশি যা পারতেন, তা নিজের নামখানা লিখতে কেবল। আমার বিশ্বাস হতে চায় না আমি এই জায়গায় এসে পৌঁচেছি। বিশ্বাস হতে চায় না পৃথিবীতে এমন সুন্দর কোনও শহর থাকতে পারে। নিজেকে ভুলতে থাকি আমি। আমার ভেতরে আর আমি নেই। যেন অন্য কেউ, অন্য কেউ অন্য কোনও গ্রহে। অথবা যেন ছবি সব। যেন এসব সত্য নয় প্যারিসের ভেতর যখন আমাদের গাড়ি চলছিল, ছবির মত লাগছিল। ছবিতে দেখেছি এমন সব দৃশ্য। প্যারিসে ঢোকা না তো আশ্চর্য সুন্দর একটি ছবির মধ্যে ঢুকে পড়া। এমন সুন্দর চারদিক, যে দেখতে দেখতে শ্বাস নিতে ভুলে যাচ্ছি। প্যারিসে শুনেছি বিখ্যাত অনেক যাদুঘর আছে, কিন্তু পুরো প্যারিসই যে আস্ত একটি যাদুঘর, তা আমার জানা ছিল না আগে।

আমার ঘোর কাটে না। আমার বিস্ময় কাটে না। যত দেখি প্যারিস, তত আরও দেখতে ইচ্ছে করে। শহরটিকে কুড়ি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিছু এলাকাকে বলা হয় ধনী এলাকা, কিছু এলাকাকে গরিব এলাকা। বেলভিল নামের এক গরিব এলাকা যখন আমাকে দেখানো হল, আমি আতি পাতি করে দারিদ্র খুঁজছিলাম। বিশাল বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি, বাড়িতে যারা থাকছে প্রায় সকলেরই গাড়ি আছে, সকলের পরনে সার্ট প্যান্ট, সকলের পায়ে জুতো, এরা আবার গরিব হবে কেন!

ডডগরিব এলাকা দেখাবে বলেছিলে? জিলকে জিজ্ঞেস করি।

ডডওই তো দেখালাম। এতক্ষণ কি দেখলে!

ডডএকে তোমরা গরিব এলাকা বল! আমি হেসে উঠি। আমার চোখে দেখা আর ফরাসিদের চোখে দেখা দারিদ্রে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

জিল আমাকে নিয়ে গেল একটি ব্রাসারিতে দুপুরে খাওয়াতে। ব্রাসারির ভেতর একটি বার। তাকে সারি সারি মদের বোতল সাজানো। জিল জানি না কি খাবার দিতে বলেছে দুজনের জন্য। অদ্ভুত খাবার, কখনও খাইনি আগে। আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হয় না। ক্ষিধে ছিল পেটে, কিন্তু মন এমন ভরে আছে প্যারিসের সৌন্দর্যে! পেটের ক্ষিধে যে কোথায় উবে গেছে কে জানে।

জিল আমাকে নিয়ে গেল শাঁ জার্মা দি প্রের একটি ক্যাফেতে। বিখ্যাত ক্যাফে। ক্যাফে দ্য ফ্লোর। জিলের বোন দোমিনিক অপেক্ষা করছিল ওখানে আমাদের জন্য। ক্যাফেটিতে একসময় জ্যাঁ পল সার্ত্র আর সিমোন দ্য বোভোয়া বসতেন, আড্ডা দিতেন, লিখতেন, সাহিত্য আর দর্শন নিয়ে বক্তৃতা করতেন। ওঁদের নাম লেখা আছে চেয়ারের পিঠে, যে চেয়ারে দিনের পর দিন বসে কাটিয়েছেন। দোমিনিক আর জিলের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। একজন আরেকজনের প্রশংসা করছে, আড়ালে। আর সামনে খুনসুঁটিতে ব্যস্ত। দুজন বড় হয়েছে হিপি পরিবারে। মা স্প্যানিশ গনজালেজ আর বাবা জার্মান ফরস্টার পরিবারের। হিপিরা সমাজের কোনও নিয়ম মেনে চলত না। জিল আর দোমিনিক ছোটোবেলায় বাবা মার কোনও রকম শাসন পায়নি।

কোনো নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে ওরা জীবন যাপন করত না। কেউ বলেনি ওদের নাও খাও, পড়তে বসো, ঘুমোতে যাও বা কিছু। যখন যা ইচ্ছে করে জিলরা তাই করেছে। বাবা মাও তেমন। যেমন ইচ্ছে তেমন জীবন যাপন করেছে। কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না কিছুতে। জিলের বাবা মা কখনও বিয়েই করেনি। ছেলেমেয়েরা বাবা মাকে নাম ধরে ডাকত। জিলও তার মাকে ক্লদিয়া বলে ডাকে। আশ্চর্য, ওই পরিবেশে বড় হয়েও জিল তার বাবা মা আর বোনের জন্য কি গভীর ভালবাসা পুষে রাখে। ওরাও জিলের জন্য।

যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, কী দেখতে চাই প্যারিসে। প্রথমেই আমি বললাম, র‍্যোঁদা মিউজিয়াম। র‍্যোঁদার ওপর একটি বই পড়া আছে আমার। র‍্যোঁদার ভাস্কর্যগুলো এখনও মনের ভেতর। জিল আর দোমিনিক আমাকে নিয়ে গেল র‍্যোঁদা মিউজিয়ামে। খুব সুন্দর এই মিউজিয়াম। র‍্যোঁদার ভাস্কর্যগুলো সামনে থেকে দেখি আর ভেবে কূল পাই না কি করে পাথর কেটে কেটে এমন সব আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি গড়তে পারে কেউ। র‍্যোঁদার পুরো জীবনটি আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কি করে তিনি তার মডেল কন্যাদের ব্যবহার করেছেন কাজে। কামি কদেলকে খুঁজি তাঁর কাজে। ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দেখি। না, এখানে কিছুই স্পর্শ করা যাবে না। ক্যামেরায় ছবি তুললে ফ্লাশ বন্ধ করে তুলতে হয়, কারণ ওই আলোয় শিল্পকর্ম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোথাও কোথাও এমন আছে যে হাজার বছর আগের গুহার ছবিগুলো দেখাও এখন সাধারণ মানুষের জন্য নিষিদ্ধ, কারণ মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে ছবি মলিন হয়ে যায়। মিউজিয়ামের বাইরে রাখা আছে র‍্যোঁদার ভাবুক মূর্তিটি। হাঁটুর ওপর কনুই রেখে চিবুকের নিচে হাত রেখে ভাবছে মানুষটি। রাখা নরকের দ্বারও। র‍্যোঁদার ভাস্কর্য দেখা শেষ হলে জিল নিয়ে গেল ভিক্টর উগোর বাড়িতে। প্লাস দ্য বোজ এ। মাঝখানে একটি মাঠ, আর চার কিনারে একরকম সব বাড়ি। এলাকাটি ধনী এলাকা। ধনীরা থাকতেন একসময়, এখনও ধনীরাই থাকেন। বাড়িগুলো মোটেও আমাদের বাড়ির মত নয়। এসব বাড়িতে কোনও ছাদ নেই। কেউ বিকেলবেলা ছাদে ওঠে না। ছাদগুলো কালো ইস্পাত বা সবুজ কপারে মাথা মুড়ে আছে, মাথার তলে ছোট ছোট ঘুলঘুলিগুলো পাখির নীড়ের মত। একসময় ওপরতলার ছোট ছোট ঘরে কাজের মেয়েরা থাকত। ফরাসি রেভুলেশনের পর শ্রেণীর তফাৎটি দূর হয়েছে। তুমি প্রভু, আমি ভৃত্যডডএই ব্যাপার আর নেই। আহা এরকম একটি সমাজ যদি আমাদের দেশেও হত। ভিক্টর উগোর বাড়িটিতে তাঁর আঁকা ছবি, তাঁর লেখা পান্ডুলিপি দেখলাম। একটি জিনিস আমার খুব অবাক লেগেছে, তাঁর মেয়ে সেইন নদীতে পড়ে মারা যাওয়ার পর উগো এমনই ভেঙে পড়েছিলেন যে মেয়ের আত্মার সঙ্গে তিনি কথা বলতেন বলে ভাবতেন। টেবিলে টোকা পড়ত আর তিনি টোকাগুলো অনুবাদ করতেন। মাসের পর মাস বসে বসে অপ্রকৃতিস্থের মত কেবল অনুবাদ করতেন। মোটা মোটা খাতা ভরে ফেলেছেন লিখে মেয়ের আত্মার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন। রবীন্দ্রনাথও প্ল্যানচ্যাট করতেন। জানি না বড় বড় মানুষগুলো বেশি বয়সে এসে এমন নির্বোধ হয়ে যান কেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিক্টর উগোর মিল অনেক। দুজনের মধ্যে বয়সে একশ বছরের তফাৎ। দুজনে সঙ্গীত ভালবাসতেন।

দুজনে ছবি আঁকতেন। উগো প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর দাদার প্রেমিকার, আর রবীন্দ্রনাথ প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর দাদার স্ত্রীর। উগো কন্যার মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও। দুজনই মানবতার কথা বলতেন।

লুভর মিউজিয়ামটি সেইন নদীর পাড়ে। আশ্চর্য এই মিউজিয়ামটি বাইরে থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা দেখলেও দেখা ফুরোবে না। এমনই নিখুঁত স্থাপত্য এর। বিশাল এই বাড়িটির গায়ে গায়ে মূর্তি বসানো। হোটেল দ্য ভিলের গায়েও মূর্তি বসানো। প্রথম যখন চমৎকার বাড়িটির নাম জিল বলল হোটেল দ্য ভিল, আমি তো ভেবেইছিলাম এটি সত্যিই কোনও হোটেল, যেখানে লোকে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। আরে তা হবে কেন! ওটি টাউন হল। প্যারিস শহরের মেয়রের আপিস। সরকারি এরকম বাড়িগুলোকে ফরাসিরা হোটেল বলে। বেসরকারি কিন্তু বড় কোনও বাড়ি হলেও বলে, যেমন হোটেল পারতিকুলিয়ে।

জ্যাঁ শার্ল বারথেয়ার আর দোমিনিক আমাকে নিয়ে গেল ল্যুভর মিউজিয়াম দেখাতে। জ্যাঁ শার্ল এসেছিল হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। বারথেয়ার আমার অনুবাদক। লজ্জা বইটি অনুবাদের কাজ নিয়েছে সে। বারথেয়ার আর দোমিনিক আমার দুপাশে, আমি জগতের সকল বিস্ময় নিয়ে দেখছি ল্যুভর মিউজিয়াম। অর্ধেক দিন মিউজিয়ামে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়, তবু মিউজিয়ামের হাজার ভাগের এক ভাগও দেখা হয় না। পুরোনো তেলচিত্রগুলো সেই সতেরো আঠারো শতাব্দির, প্রধানত যীশুর ছবি। যীশুর মুখমাথা থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। আধন্যাংটো যীশুই দখল করে আছেন তখনকার শিল্পকলা। আজদাহা সব ক্যানভাস। আর কি যে নিখুঁত সব কাজ! একটি ছবিতে যীশু আর তাঁর পাশে অনেকগুলো লোক, কেউ খাচ্ছে, কেউ গান গাইছে, কারও কারও আবার ভীষণ রকম উদ্বিগ্ন মুখ। দোমিনিককে জিজ্ঞেস করি, এই দৃশ্যের গল্পটি বলতে। দোমিনিক বলল যে ধর্ম সম্পর্কে খুবই কম জানে সে। আমি যখন প্রশ্ন করে উত্তর পাচ্ছি না, তখন ভিড় থেকে এক লোক এসে বলল, মানুষগুলো সবসময় যে বাইবেলের চরিত্র তা নয়, শিল্পী যীশুর আশেপাশের লোকজনের মুখে তখনকার নামকরা সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মুখ বসিয়ে দিতেন। কখনও কখনও আবার দেখা যায় ভিড়ের মধ্যে ধর্মের লোকজনের মধ্যে আকারে ছোট একটি মানুষ, সে মানুষটি হয়ত তিনি, যিনি শিল্পীকে দিয়ে এই ছবি আঁকিয়েছিলেন। পয়সার বিনিময়ে ছবি আঁকতে গেলে অনেক অনুরোধ মেনে চলতে হয়। রাজা বাদশারা বা ধনী লোকেরা শিল্পীদের দিয়ে ছবি আঁকাতেন, শর্ত থাকত যীশুর পায়ের কাছে কোনও কিনারে যেন তাঁরা খানিকটা শোভা পান। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে সেই সব মুখ এখনও শোভা পাচ্ছে ক্যানভাসে, ধর্মের গল্পের অংশীদার হয়ে।

দোমিনিকের সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে কথা হয়, বারথেয়ারের সঙ্গে তেমন হয় না। বারথেয়ার না জানে ইংরেজি, না জানে বাংলা, যদিও সে দাবি করে যে সে বাংলা জানে। এ পর্যন্ত একটি বাংলা শব্দও আমি তার মুখে উচ্চারিত হতে শুনিনি। আমি বেশ কয়েকবার বাংলায় কথা বলতে চেয়েছি, জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি অনুবাদ

শুরু করে দিয়েছেন? বাংলা ভাষা শিখেছেন কোথায়? এসবের উত্তরে আচমকা ঠা ঠা করে হেসে উঠেছে সে। এখন তার যা বলার ইচ্ছে তা সে ফরাসি ভাষায় দোমিনিককে বলছে, দোমিনিক তা অনুবাদ করে আমাকে শোনাচ্ছে। আমার ভয় লাগে ভেবে যে এই বাংলা না জানা লোকটি লজ্জা বইটি বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করবে, কেবল করবে না, অনুবাদ নাকি শুরুও করে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, লোকটির দ্বারা আর যাই হোক, অনুবাদ হবে না। যাই হোক, ওতে আমি আপাতত মন দিচ্ছি না, মন দিচ্ছি শিল্পে। চারদিকে যীশুর এত ন্যাংটো ন্যাংটো ছবি দেখে তাকে কিন্তু ধর্মের লোক বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে পর্নোগ্রাফির চরিত্র। শেষে একটি মন্তব্য করলাম, ধর্মের প্রয়োজন শিল্পের জন্য, জীবনের জন্য নয়। দোমিনিক সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল আমার কথা। বলল, ধর্ম মানুষকে নানারকম কল্পনা দিয়েছে। কল্পনাকে ভিত্তি করেই এইসব আঁকাআঁকি।
ডডদোমিনিক, তুমি কি বাহবাটা শেষ পর্যন্ত ধর্মকে দিতে চাইছো? আমি কিন্তু মানুষকে দিতে চাইছি সবটুকু কৃতিত্ব। মানুষই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। মানুষই ধর্ম নিয়ে ছবি এঁকেছে, বই লিখেছে। মানুষের ভেতর প্রতিভা ছিল বলেই না এসব করতে পেয়েছে।

রাতে জঁ শার্ল বারথেয়ার খাওয়াবে আমাকে। জিল চলে গেছে জিলের বান্ধবীর বাড়ি। সে ক্লান্ত। বারথেয়ার, দোমিনিক আর আমি মোঁপারনাসে ক্লজারি দ্যা লিলা নামের একটি বিখ্যাত রেস্তোঁরায় খেতে গেলাম। এটি বিখ্যাত এই জন্য যে, এখানে একসময় কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা আড্ডা দিতেন। উনিশ শতকের শুরুর দিকে আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ করার ফলে অনেক আমেরিকান লেখক প্যারিসে চলে এসেছিলেন। তাঁরা এই বাধানিষেধহীন স্বপ্নপুরীতে বসে মহানন্দে মদ খেতেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তো এই রেস্তোরাঁয় বসে পুরো একটি বই লিখেছেন। প্যারিসে এরকম বহু ক্যাফে আছে, যেখানে শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিকরা ক্যাফে সংস্কৃতির শুরু করেছিল।

রেস্তোরাঁটিতে দেখছি ছেলেমেয়েরা মদ খাচ্ছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে, চুমু খাচ্ছে। কেউ ওদের দিকে তাকাচ্ছে না। আমি তাকাই। চোখ মেলে দেখি সব। কি চমৎকার পরিবেশ। ইচ্ছেগুলোকে কেউ দমন করছে না। চুমু খেতে ইচ্ছে করছে, খাচ্ছে। চোখ কপাল কুঁচকে মুখে রাগ ঘৃণা হিংসা নিয়ে বসে থাকা ঝগড়া করা মানুষ দেখার চাইতে তো হাসি মুখের খুশি মুখের প্রেম দেখা চুমু দেখা অনেক ভাল। মন ভাল হয়ে যায়। পৃথিবীকে বড় সুন্দর মনে হয়। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়।
বরফের থালায় আমাদের জন্য ঝিনুক এল। দেখে আঁতকে উঠি। কি রে বাবা ঝিনুক খাবে কে! বারথেয়ার আর দোমিনিক ওয়াও ওয়াও বলে একের পর এক ওগুলো খেতে শুরু করল। ভেবেছিলাম ওয়াও শব্দটির পর বলবে *কি বাজে!* কিন্তু বলল *ওয়ান্ডারফুল!* কি করে এই বিদঘুটে জিনিসটি *ওয়ান্ডারফুল* হয় জানি না। বহু কষ্টে গলায় উঠে আসা বমি আটকে রাখি। দুজনই আমাকে সাধাসাধি করে খেতে। আমি

সোজা না বলে দিই। আমার না এ কাজ হয় না। দোমিনিক আমাকে যে করেই হোক ঝিনুকের স্বাদ নেওয়াবেই। আমার চোখ বন্ধ করল ওরা, নাক বন্ধ করল, এরপর মুখটি হাঁ করিয়ে ঢুকিয়ে দিল একটি আস্ত ঝিনুক। গলা বেয়ে সুরসুর করে চলে গেল জিনিসটি, যেন কারও একদলা থিকথিকে সর্দি গিলে ফেললাম। বারথেয়ারের অনেক খরচ হয়ে গেল এই রেস্তোরাঁয়। আমি টাকা দিতে চাইলে, বারথেয়ার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমার বই অনুবাদ করার জন্য ম্যালা টাকা পেয়েছি আমি।

রাত দেড়টায় আমরা বেরোলাম রেস্তোরাঁ থেকে। রেস্তোরাঁ তখনও জমজমাট। প্যারিস কি ঘুমোয় রাতে! আমার মনে হয় না। বিদায় নেওয়ার সময় দোমিনিক আর বারথেয়ার জড়িয়ে ধরে চুমু খেল গালে। একদিনের পরিচয়ে গালে চুমু খাওয়া এ দেশে কোনও ব্যাপারই নয়। দোমিনিক আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যায়। রাতে ভাল ঘুম হয় আমার। আন্তয়ান দ্য গুডমারকে ফোন করেছিলাম। আমি প্যারিসে শুনে খুশিতে চেঁচিয়ে বলল, *ইনক্রিডবল!* ইনক্রিডবল শব্দটি এরা খুব ব্যবহার করে। ক্রিশ্চান বেসকে ফোন করলেও ও বলেছে, *ইনক্রিডবল, তুমি প্যারিসে!* সকালে আন্তোয়ান এল হোটেলে। আমাকে নিয়ে কাছেই একটি ক্যাফেতে গেল নাস্তা খেতে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আন্তোয়ান রোদ দেখে বারবারই বলছে, আহ, কি চমৎকার দিন আজ। কি সুন্দর রোদ!

উফ, রোদ আমার ভাল লাগে না। আমি রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে ছায়া ধরে হাঁটি।

কি বল! রোদ ভালবাসো না তুমি!

ড্ডনাহ।

ড্ডআমাদের এখানে উৎসব শুরু হয়ে যায় রোদ উঠলে। বসন্তের প্রথম রোদ। তুমি যেন তোমার দেশের চমৎকার রোদ এই ঠাণ্ডা মেঘলা স্যাঁতসেঁতে প্যারিসে নিয়ে এলে! তোমাকে ধন্যবাদ।

ড্ড রোদ নিয়ে কী ভীষণ উচ্ছ্বাস তোমাদের। আমি রোদের দেশের মানুষ। রোদ আমাদের গা পুড়িয়ে দেয়।

ড্ডআমাদের সূর্য ভাল লাগে।

ড্ডআমাদের চাঁদ ভাল।

ড্ডএখানে রোদ মানে আনন্দ। রোদ মানে সুখ।

ড্ডওখানে রোদ মানে জ্বালা পোড়া, রোদ মানে অশান্তি। ছায়া আমাদের প্রাণ জুড়োয়।

কি পার্থক্য তাই না! আবহাওয়া নিয়েই গুডমার কথা বলল আধঘন্টা। বৃষ্টি ভাল লাগে আমার। বৃষ্টি অসহ্য গুডমারের। মেঘলা দিনকে গুডমার,কেবল গুডমার নয়, এখানকার সবাই, বলে খারাপ দিন। আমি বলি চমৎকার দিন। গুডমার আমাকে তার পত্রিকা দিল, লিবারেশন। এটি ফ্রান্সের বামপন্থী পত্রিকা। লিবারেশনে আমার প্যারিসে আসার খবর ছাপা হয়েছে। গুডমার ঢাকায় গিয়ে আমার যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, সেটি যে দু পাতা জুড়ে বিশাল করে ছাপা হয়েছিল এ পত্রিকায়, সে লেখাটিও দিল। পত্রিকা খুলে নিজের ছবি আর নাম ছাড়া কোনও কিছু আমার পক্ষে চেনা সম্ভব হয় না। ভাষা রোমান হরফে, কিন্তু ভাষার খুব বেশি কিছু উদ্ধার করতে

আমি পারি না। ক্যাফে থেকে হোটেলে ফিরে দেখি ক্রিশ্চান বেস আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ক্রিশ্চানের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে, অত্যাধুনিক পোশাক পরা সোনালী চুলের মাদাম, ফরাসি অ্যারিস্টোক্রেট। কিন্তু গাম্ভীর্যের বিন্দু মাত্র কিছু নেই। হই হই করা মানুষ তিনি। চকাশ চকাশ করে দু গালে চুমু খেয়ে তিনি আমাকে কাছের আরেকটি ক্যাফেতে নিয়ে গেলেন নাস্তা খেতে। ক্যাফের ভেতরে যেতে চাইলে না না করে উঠলেন ক্রিশ্চান। বাইরের রোদে বসবেন তিনি। ক্যাফের সামনে রাস্তার ওপরের ফুটপাতে চেয়ার পাতা, ওখানে রোদ পড়েছে, রোদে বসে গুডমারও খেয়েছে, ক্রিশ্চানও খেলেন। প্যারিসের এই হল সৌন্দর্য। গরম শুরু হতে না হতেই ক্যাফে রেস্তোরাঁগুলোর বাইরে পাতা চেয়ার টেবিলে খেতে বা পান করতে কিলবিল ভিড় লেগে যাবে।

লম্বা একধরনের রুটি আছে, ফরাসিরা এই রুটিকে বাগেত বলে। এটি তাদের খুব প্রিয় রুটি। বগলে করে একটি বাগেত নিয়ে লোকেরা রাতে বাড়ি ফেরে। অথবা সকালে ঘুম ঘুম চোখে বেরিয়ে মোড়ের *বুলোনজরি* থেকে একটি সবে বানানো গরম বাগেত কিনে বগলে করে বাড়ি যায়। বাগেত খেতে আর যে কোনও রুটির মতই স্বাদ। আমি জানি না, কেন ছোট রুটি না বানিয়ে দু হাত লম্বা রুটি বানাতে হয় এদের। ট্রাডিশন বলে একটি ব্যাপার আছে, ফরাসিরা তা সহজে হারাতে চায় না। কত রকম যে রুটি আছে এই দেশে! ক্রিশ্চান সকালে ক্রোসোঁ বলে একটি শঙ্খের মত দেখতে রুটি খাচ্ছেন, সঙ্গে কালো কফি। এই হল তাঁর সকালের নাস্তা। অনর্গল বকতে পারেন তিনি। ইংরেজি বলেন কড়া ফরাসি উচ্চারণে। বার বার করে জানতে চাইছেন আমার ফ্রান্সের *প্রোগ্রাম।* কবে হবে, কখন হবে, কোথায় হবে, কী হবে ডড সব তিনি জানতে চান। আমি, সত্যি কথা বলতে কি জানিও না আমার কখন কোথায় কি অনুষ্ঠান আছে। ক্রিশ্চানকে বড় আন্তরিক মনে হয়। দুজন খেয়ে দেয়ে হোটেলে ফিরে দেখি বারথেয়ার অপেক্ষা করছে। মোটা একটি বই এনেছে রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি দেখালো, এটি নাকি লজ্জার প্রচ্ছদ হবে। এরপরই জিল এল আমাকে নিতে। বারথেয়ারকে বিদায় দিয়ে জিল ট্যাক্সি ডাকল, সোজা আমাকে নিয়ে গেল রেডিও ফ্রান্সে। রেডিওতে সাক্ষাৎকার দিতে হল। জিল বলল যে তিন তারিখে রেডিওতে নাকি আমার আরেকটি সাক্ষাৎকার আছে। জিল জানে সব।ও জানে কখন কোথায় আমাকে যেতে হবে। রেডিও থেকে নিয়ে গেল একটি পত্রিকা আপিসে। সুন্দর গোছানো ছিমছাম আপিস। বড়। গাদাগাদি করে বাংলাদেশের পত্রিকা আপিসে যেমন সাংবাদিকরা বসে, সেরকম নয়। ওখানেও সাক্ষাৎকার। এরপর দুজন বেরিয়ে ক্যাফের বাইরে বসে দুপুরের খাবার খেলাম। খেয়ে হোটেলে ফেরার পর দেখি সিগমা নামের ফটো এজেন্সি থেকে ফটোগ্রাফার এসে বসে আছে, ফটো তুলবে আমার। হোটেলে তুলবে না, বাইরে তুলবে। বাইরের রোদে। ফটোগ্রাফার তার গাড়ি করে আমাদের নিয়ে গেল ল্যুভর মিউজিয়ামের সামনের বাগানে। কচি কলাপাতা রঙের সবুজ ঘাসে ফুটে আছে শাদা শাদা ফুল। গায়ে অনেক পাপড়ি। প্রেমিক প্রেমিকারা এই ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি খেলা খেলে। পাপড়ি ছেঁড়ে আর বলে, তোমায় আমি ভালবাসি, খুব ভালবাসি, পাগলের মত

ভালবাসি, ভালবাসি না। ছিঁড়তে ছিঁড়তে যে পাপড়িটি একদম শেষে গিয়ে ছিঁড়বে সেটিই হবে মনের কথা। ছবির জন্য বিভিন্ন মূর্তির সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে, আর আমার থেকে থেকে চোখ চলে যাচ্ছে ফুলের দিকে। বাগানের ভেতর যুবক যুবতী চুমু খাচ্ছে। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। গভীর চুমু। এই চুমুর নামই বোধহয় ফরাসি চুমু। দীর্ঘক্ষণ এত ঘন হয়ে বসে এইযে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে গভীর করে চুমু খাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে, তড়িঘড়ি কোনও কর্ম সারার কথা, দেখে মনে হয়, মোটেও ভাবছে না। পাশ দিয়ে এত লোক হেঁটে যাচ্ছে, কেউ একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না চুমু খাওয়া জোড়ার দিকে। বাংলাদেশে হলে ভিড় লেগে যেত। জোড়া তো ছাড়াতোই লোকে, দুজনের হাত পায়ের জোড়াও ভেঙে দিত মেরে।

আমরা জোন অব আর্কের ঘোড়ায় বসা সোনালী মূর্তির কাছেই একটি ক্যাফেতে বসি। এও বাইরে। ফটোগ্রাফার ভাল ইংরেজি জানে না। আধো আধো করে বলার চেষ্টা করল কিছু। এখানে, ফ্রান্সে, বেশির ভাগ মানুষই ইংরেজি ভাষাটি জানে না। সভ্য হতে গেলে যে ইংরেজি জানতে হয় না, তা ফ্রান্সে এসে আমার বেশ ভাল করেই বোধ হয়। উপমহাদেশেই এই ধারণাটি বদ্ধমূল, দুশ বছর ইংরেজ শাসনে থেকে এই হয়েছে মানসিকতা। প্রভুর ভাষা শিখে জাতে ওঠার তপস্যা।

সন্ধেটা হোটেলে বিশ্রাম নিতে গিয়ে দেখি ঘুমে ঢলে পড়ছি। কিন্তু অসময়ে ঘুমোলে চলবে কেন! এখানকার সময়ের সঙ্গে আমার শরীরকে মানিয়ে নিতে হবে। রাত নটায় জিল এসে ডেকে নিয়ে গেল। হোটেল থেকেই ট্যাক্সি ডাকে জিল। দু মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। আমরা চলে যাই দূরে কোথাও। ঝলমলে রেস্তোরাঁ এলাকায়। খেতে খেতে দুজন রাজ্যির গল্প করি। বিকেলে ক্রিশ্চান এসেছিল হোটেলে, আমাকে পায়নি। চিঠি লিখে গেছে, যে ভিলেজ ভয়েজ এর এক সময়ের *মোস্ট ইম্পর্টেন্ট* নারীবাদী লেখক মারিন ওয়ারনার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। শুনে জিল বলে, কিছু হলেই বলে ফেলে *মোস্ট মোস্ট মোস্ট।* ওই লেখকের নাম আমি কখনও শুনিনি। ক্রিশ্চানের সব উচ্ছ্বাসকে জিল বলে, সব টাকার জন্য, সব ব্যবসার কারণে। যারা আন্দোলন করছে, নারীর জন্য লড়াই করছে, বই তাদের দেওয়া উচিত, আদর্শ বলে কথা। ব্যবসায়ী প্রকাশককে তোমার বই দিও না। জিল যখন ক্রিশ্চানের সামনে বলেছিল যে আমাকে স্ট্রাসবুর্গ যেতে হবে, ক্রিশ্চান লাফিয়ে উঠেছিল আনন্দে, জিল ওই আনন্দকেও বলেছে, ছো! সব টাকার জন্য। তোমাকে খুশি করে তোমার কাছ থেকে বই বাগাতে চাইছে। এই উদ্দেশ্য। টাকা টাকা টাকা। জিল হেসে, হঠাৎ বলল, আমি এই নতুন চাকরিতে ভাল করতে পারছি না।
ডডনতুন চাকরি?
ডডহ্যাঁ তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি।
জিলের মপোলিয়েঁ ফিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু আমার জন্য চার তারিখ পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে ও প্যারিসে। রাত তখন সাড়ে বারো। ভিড় উপচে পড়ছে রেস্তোরাঁগুলোয়। ছেলে মেয়েরা হাতে হাত ধরে রাস্তায় হাঁটছে। ঝলমলে আনন্দ চারদিকে। হঠাৎ দেখি নাকের সামনে একটি তাজা লাল গোলাপ। গোলাপটি বাড়িয়ে ধরে থাকা লোকটিকে

দেখি। চোখে চোখ পড়ে। লোকটিকে বাঙালি মনে হচ্ছে। ফুল কিনব কি কিনব না তা না জেনেই লোকটি দ্রুত সরে গেল সামনে থেকে। লক্ষ করি, দূর থেকে আবার পেছন দিকে তাকাল আমার দিকে। লোকটি কি চিনতে পারল আমাকে! সম্ভবত! অথবা আমি যে তার দেশ অথবা তার পাশের দেশ থেকে এসেছি, সে সম্পর্কে সে নিশ্চিত।

ড্ডলোকটি কি বাংলাদেশি! জিল জিজ্ঞেস করে।

ড্ডআমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

চারদিকে কলকলে আনন্দের মধ্যে, শাদা শাদা হাস্যোজ্জ্বল ফরাসিদের মধ্যে একটি বিষণ্ন বাদামী মুখ, ফুলঅলাটির মুখটি মনে পড়তে থাকে।

ড্ডআমার খুব খারাপ লাগে, খুব কষ্ট হয় যখন দেখি আমাদের দেশের ছেলেরা ইওরোপ আমেরিকায় এসে রেস্তোরাঁয় বাসন মাজে, রাস্তায় ফুল বিক্রি করে। শিক্ষিত লোকেরাও সোনার হরিণের সন্ধানে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জিল চোখ বড় বড় করে বলে, বাহ! খারাপ লাগবে কেন! তুমি তো পছন্দ কর দেশের বাইরে যাওয়া।

বললাম, সে তো বেড়াতে। এরকমভাবে, বাসন মাজতে, ঝাড়ু দিতে, ময়লা পরিষ্কার করতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা ধনী দেশগুলোয় দৌড়োচ্ছে।

জিল বলল, বোধহয় কাজ নেই দেশে, তাই।

একটু জোরেই বলি, দেশে থেকে কাজ করার জন্য চেষ্টা তো করতে হবে। কাজ যেন পাওয়া যায় দেশে, সেরকম অবস্থা করার জন্য সংগ্রাম তো করতে হবে। যে লোকটিকে দেখলাম, সম্ভবত সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রি করে এ দেশে এসেছে, এখন ফুল বিক্রি করছে। ফুল বিক্রি করার জন্য কি পদার্থবিজ্ঞান জানার দরকার হয়! মেধাগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে গরিব দেশ থেকে ধনী দেশে। দেশে থেকে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কে তবে চেষ্টা করবে যদি যুব সমাজ কি করে খানিকটা বেশি টাকা কামাবে, সেই কারণে যদি বিসর্জন দেয় সব আদর্শ!

জিল মাথা নাড়ল। সায় দিল আমার কথায়।

কথা ছিল আমি আর জিল নৌকো নিয়ে সেইন নদীতে ঘুরে বেড়াবো। কিন্তু আর ইচ্ছে করেনি সেইনে ভাসতে।

পরদিন উনত্রিশ তারিখ। উনত্রিশে এপ্রিলের ডায়রি আমাকে লিখতে হবে প্যারিসের বিখ্যাত পত্রিকা *লা নভল অবজারভেতর* এর জন্য। পত্রিকাটির সম্পাদক জঁ দানিয়েল ঢাকায় আমাকে অনেকগুলো ফ্যাক্স পাঠিয়েছেন ডায়রি লেখার জন্য অনুরোধ করে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব লেখক ওতে লিখবেন। উনত্রিশ তারিখটি তাঁরা কেমন কাটিয়েছেন, তার বর্ণনা করে। এই দিনটিতেই আমাকে স্ট্রাসবুর্গে যেতে হবে। ক্রিশ্চান সকালেই ফোন করেছিল। শুভসকাল জানিয়ে বললেন কাল আসবেন তিনি আমাকে নিতে আরেকটি টিভি প্রোগ্রামের জন্য। সিগমার আরেকজন ফটোগ্রাফার আবার আসবে। সকালে গরম জলে গোসল করে গোলাপি একটি শাড়ি পরে নিই। প্যারিসে এই প্রথম আমার শাড়ি পরা। শাড়ি পরে শেষ করিনি, নিচ থেকে ফিলিপ ডেমেনএর আসার খবর দেওয়া হল। লা ভি নামে এক পত্রিকার সাংবাদিক এই

ফিলিপ। হোটেলের নিচতলায় একটি ক্যাফে আছে, ক্যাফেতে বসি দুজন। নাস্তা খেতে খেতে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিই। একই রকম প্রশ্ন, একই রকম উত্তর। এর মধ্যে জিল আসে বড় একটি লিস ফুলের তোড়া নিয়ে। কি যে ভাল লাগল চমৎকার ফুলগুলো দেখে। ফুল দেখলেই আমার নাক কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নেওয়ার অভ্যেস। লক্ষ করেছি, ফরাসিরা ফুলের সৌন্দর্য দেখে, ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য নাক বাড়ায় না তেমন। এখানকার ফুলে ঘ্রাণও খুব কম থাকে। বাণিজ্যিক কারণে ফুল ফোটানো হলে তাতে ঘ্রাণ কোথায় থাকবে! ফিলিপ তখনও যায়নি, এল লা ফিগারো পত্রিকার সাংবাদিক সঙ্গে ফটোগ্রাফার নিয়ে। হোটেলের কাছের রাস্তায় ছবি তুলল ফটোগ্রাফার। আমার হোটেলের নাম মারসেলিয়র অপেরা, অবশ্য যদি আমি উচ্চারণ করি। আমার উচ্চারণ শুনে একটি ফরাসিও বোঝে না কি বলছি আমি। আমাকে বানান করে দিতে হয় হোটেলের নাম। ওরা *মাসেই অপেয়া* জাতীয় কিছু একটা বলে। ফিগারোর সাংবাদিক মারি এমিলি লোমবার্ড সঙ্গে কথা বলার আমার সময় নেই, কারণ আমাকে যেতে হবে স্ট্রাসবুর্গ। জিল যাচ্ছে না স্ট্রাসবুর্গে, যেহেতু অন্য সাংবাদিকরাও যাচ্ছেন টিভি প্রোগ্রামের জন্য। তাছাড়া মারি এমিলি যাচ্ছে আমার সঙ্গে। জিল বলে দিল, অবশ্যই যেন স্ট্রাসবুর্গের ক্যাথিড্রালটি দেখি। মারি এমিলি আর আমি প্যারিসের অরলি বিমানবন্দর চলে গেলাম। মারিকে পথে জিজ্ঞেস করলাম, তোমারও কি কোনও প্রোগ্রাম আছে টিভিতে?

মারি হেসে বলল, না, আমি কেবলই তোমার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য যাচ্ছি। তুমি এত ব্যস্ত যে যদি অন্য সময় সময় না পাও, তাই বিমানে বসে সাক্ষাৎকার নেব। বিমান বন্দরেই পরিচয় হয় আলজেরিয়ার আর ক্যামেরুনের সাংবাদিকের সঙ্গে। ক্যামেরুনের বিশাল দেহী সাংবাদিকটি কিছু ইংরেজি জানলেও আলজেরিয়ার সাংবাদিক একটি ইংরেজি শব্দও বলতে পারেন না। ভেবেছিলাম বিমানের জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে যাবো পাখির চোখে ফ্রান্স। কিন্তু মারির প্রশ্নের জ্বালায় তা সম্ভব হয় না। ভেবেছিলাম প্যারিসের বাইরে কোনও এক ছোট মফঃস্বল শহর স্ট্রাসবুর্গ, তেমন আহামরি কিছু দেখতে হবে না। কিন্তু পৌঁছে চারদিক দেখে আবারও বিস্ময় জাগে। নিখুঁত শহর। রূপের কোনও কমতি নেই। দুটো গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল বিমান বন্দরে। একটিতে আমি, মারি, আর ক্যামেরুনের সাংবাদিকটি। আরেকটিতে বাকিরা। ক্যামেরুনের লোকটি লম্বা একটি রঙিন আলখাল্লা পরেছে, মাথায় একটি রঙিন টুপিও লাগিয়েছে। বলল, পোশাকটি ক্যামেরুনের মুসলমানদের পোশাক, যদিও সে খ্রিস্টান, এ পোশাক তার ভাল লাগে বলে পরেছে। বিমানে বসে জ্যঁ শার্ল বারথেয়ারের দেওয়া প্যাকেটটি খুলি, সকালেই জ্যঁ শার্ল হন্তদন্ত হয়ে প্যাকেটটি হাতে দিয়ে বলে গেছেন, এটি বিমানে উঠে খুলবে, তার আগে নয়। প্যাকেটের ভেতরে একটি নিনা রিচি নামের সুগন্ধী, আরেকটি চকোলেটের বাক্স। চকোলেটের বাক্সটি কাউকে দিয়ে দেব, চকোলেট আমার পছন্দ নয়। ফরাসিদের তিনটে জিনিস খুব প্রিয়, এবং এই তিনটে জিনিসই আমার একদম সয় না, কফি, চকোলেট, চিজ। ওদের আমি বলেছিও তোমাদের তিনটে জিনিস

আমার কাছে অখাদ্য, তিনটিই শুরু সি দিয়ে। নামগুলো বললে ওরা ভিমড়ি খায়। আমাকে আদৌ মানুষ বলে ভাবে কি না কে জানে।

টেলিভিশনের বাড়িটি চমৎকার। আমাদের জন্য ওখানেও অপেক্ষা করছিল অনেকে। একজন হাত বাড়িয়ে বলল, আমি ফ্রেড্রিক গারডেল। ফ্রেড্রিকই তো আমাকে আর্তে টেলিভিশন থেকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন। দুজন বাঙালি মেয়ে দেখি গুটি গুটি হেঁটে আসছে আমার দিকে। কাছে এসে বলল, আমরা আপনার অনুবাদক। এতদিন পর কারো মুখে স্পষ্ট বাংলা শুনলাম, মন নেচে ওঠে, কলকল করে আমি বাংলায় কথা বলে উঠি, পাখি যেমন মনের আনন্দে বসন্ত এলে গান গাইতে থাকে, তেমন। প্যারিসে কার মুখে শুনব বাংলা! বারথেয়ার দাবি করছে সে বাংলা জানে। এখনও শোনা হয়নি একটি শব্দও। মেয়ে দুজনকে প্যারিস থেকে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আনিয়েছেন। ফ্রেড্রিক ফরাসিতে বলে যাচ্ছেন পুরো অনুষ্ঠানটি কি হবে, কি জিজ্ঞেস করা হবে, কোন কোন তথ্যচিত্র দেখানো হবে মাঝখানে, কে আমাদের প্রশ্ন করবে, সব। দোভাষীদুজন ফ্রেড্রিকের কথাগুলো অনুবাদ করে দিল। দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হল ওখানে। খাবার বলতে এক হাত লম্বা একটি স্যান্ডুউইচ। ওটি আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হয়নি। মেকআপ রুমে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। ওখানে এসে অনুষ্ঠানের প্রযোজক দেখা করে গেলেন। ফ্রেড্রিক আমার জন্য, যেহেতু কফি খাই না, চা নিয়ে এলেন, আর দেখে শুনে ছোট আর নরম রুটির স্যান্ডুউইচ। মেকআপ শেষ হতেই স্টুডিও। আলোয় ফেটে পড়ছিল ঘরটি। এই প্রথম ইউরোপের কোনও স্টুডিওতে বসে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। দানিয়েল লাকন্ত বসলেন মাঝখানে। দানিয়েল অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। তাঁর বাঁ পাশে আমি। ডানে আলজেরিয়ার সাংবাদিক। আমার বাঁ পাশে ক্যামেরুনের সাংবাদিক। ক্যামেরুন সরকার যাঁকে সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে জেলে পাঠিয়েছিল। আলজেরিয়ার সাংবাদিককে মুসলিম মৌলবাদীরা দিয়েছিল হত্যার হুমকি, গুলিও করেছিল। অবশ্য প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি। একজন কার্টুনিস্ট বসেছেন সামনে। কার্টুন এঁকে যাচ্ছেন আপন মনে। তাঁর আঁকা কার্টুনগুলো আমরা আবার সামনে রাখা মনিটরে দেখতে পাচ্ছি। সবার কানে কানফোন লাগানো আছে। আমার কানফোনে বাংলায় শুনতে পাচ্ছি যারা যে কথাই বলছে। হোবিয়া মিনা বসেছে আমাদের থেকে দূরে, এক কোণে। জার্মানি থেকে এসেছে এক সাংবাদিক, নাম ক্রিশ্চিনা। অনুষ্ঠানের সকলে ফরাসি বলছে। ক্রিশ্চিনা জার্মান বলছে, আমি বাংলা। কিন্তু সবার কথাই আমরা নিজের ভাষায় শুনতে পাচ্ছি। তড়িৎ গতিতে অনুবাদের আয়োজন। ক্রিশ্চিনার আর আমার কথাগুলো ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে প্রশ্ন শুরু হল। মাঝে মাঝে তথ্যচিত্র দেখানো হচ্ছে। মেক্সিকোতে এক সাংবাদিক ড্রাগ মাফিয়ার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে ভয়ংকর অসুবিধেয় পড়েছে, কারণ মেক্সিকোর সরকার ড্রাগ ব্যবসায় জড়িত। মোট তেষট্টি জন সাংবাদিককে সারা বিশ্বে মেরে ফেলা হয়েছে। ১২৪ জন সাংবাদিক হুমকির সম্মুখিন। আলজেরিয়ার সাংবাদিক বলল, ওখানে সাংবাদিকরা মৌলবাদিদের অত্যাচারে

অতিষ্ঠ। মৌলবাদিরা যখন তখন যাকে তাকে মেরে ফেলছে। বিশেষ করে সেইসব সাংবাদিকদের যারা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লিখছে।

এরপর প্রশ্ন হল, যেহেতু এটি বাক্ স্বাধীনতার প্রশ্ন, মৌলবাদীদের স্বাধীনতা থাকা উচিত কি না যা কিছু বলার।

আমি আপত্তি করলাম। বললাম ‘না, মৌলবাদীদের বেলায় আমি এই ছাড় দিতে রাজি নই। আমাদের দেশের মৌলবাদীরা ধনী আরব দেশগুলোর টাকা পেয়ে এখন অস্ত্রবান হয়েছে। সমাজটাকে নষ্ট করে ফেলছে। দেশজুড়ে এক ভয়াবহ অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষকে বিনা দ্বিধায় মেরে ফেলছে, হাত পায়ের রগ কেটে দিচ্ছে। অবাধে ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। নিরীহ মানুষগুলোকে ধর্মের বাণী শুনিয়ে বোকা বানিয়ে দলে ভেড়াচ্ছে। একসময় আমাদের দেশে এদের কোনও অধিকার ছিল না রাজনীতি করার। এখন তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার অধিকার পেয়ে দেশজুড়ে তান্ডব চালাচ্ছে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে এখন ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উন্মাদ হয়ে গেছে। ধর্মীয় শিক্ষা ছড়িয়ে ধর্মীয় আইন জারি করে দেশটিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। সময় থাকতে এই সর্বনাশকে রুখে দাঁড়াতে হবে।’ এরপর আলজেরিয়ার সাংবাদিকের কাছে একই প্রশ্ন রাখা হল। তিনি বললেন, ‘আগে তসলিমার মত এরকম আমাদের দেশেও ভাবা হত। কিন্তু এখন এই ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, তারাই বলছি, মৌলবাদীদেরও স্বাধীনতা থাকা উচিত মত প্রকাশের জন্য। গণতন্ত্রের নিয়মই তো এই।’ আরও অনেকক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলল। শেষ প্রশ্নটি আমাকে করা হয়, ফ্রান্স আর জার্মানির বাকস্বাধীনতা নিয়ে এই যে তথ্যচিত্র দেখলে, যেখানে বলা হচ্ছে এখানেও সাংবাদিকরা অনেক কিছু বলছে না বা বলতে পারছে না, কারণ সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনদাতাদের অনুমতি না পেলে সমাজের অনেক অন্যায় সম্পর্কে মুখ খোলা যায় না। এটি আমাদের দেশের তুলনায় কেমন? আমি বললাম, ‘এখানেও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হচ্ছে, অবশ্যই। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা আরও বেশি কম। রেডিও টেলিভিশন সরকারি মালিকানায় থাকায় এগুলো সরকারি প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংবাদপত্র বেশির ভাগ যদিও ব্যক্তি মালিকানাধীন, তারওপরও কোনও সংবাদপত্রে যদি সরকার বিরোধী কিছু প্রকাশ পায়, সরকার সময় সময় তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে,তাদের গ্রেফতার করতে, এমন কী পত্রিকা বন্ধ করে দিতে দ্বিধা করে না। বেসরকারি পত্রিকাগুলোকেও বাঁচতে হয় সরকারি বিজ্ঞাপনে, সুতরাং বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক সংবাদপত্রই সরকারি আদেশ মান্য করতে বাধ্য হয়।’

অনুষ্ঠান শেষে জার্মানির ক্রিস্টিনা আমাকে একটি সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। সময় নেই। অল্প কিছুক্ষণ কথা বলে দৌড়ে অপেক্ষমান গাড়িতে চড়ে বসতে হল। সোজা বিমানবন্দর। ম্যারিও ফিরল প্যারিসে আমার সঙ্গে। আঠার মত লেগে থেকে আমার কিছু কবিতা ফটোকপি করে নিল। ঘুমে আমার শরীর ভেঙে আসছিল। এই হচ্ছে প্রতি বিকেলে। প্যারিসের সময়ের সঙ্গে শরীর খাপ খাইতে

চাইছে না। এখনও দেশের সময়ে শরীর নেতিয়ে পড়ছে, শরীর আড়মোড়া ভাঙছে। জিল ফোন করলে বলে দিই, না বাবা, এখন কোথাও যাবো না, ঘুমোবো।

জিলের দশটায় আসার কথা থাকলেও সে তার বান্ধবী নাতালিকে নিয়ে আগেই চলে আসে হোটেলে। আইফেল টাওয়ার দেখতে যেতে হবে। নাতালি মেয়েটির ডাগর ডাগর চোখ, মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি। মেয়েটিকে আমার বেশ ভাল লাগে। জিল বলেছিল যদিও তারা একসঙ্গে থাকে, এখনও নাকি তার সঙ্গে নাতালির গভীর কোনও ভালবাসা হয়নি। এ খুবই সত্য কথা যে একসঙ্গে থাকলেই এক বিছানায় ঘুমোলেই ভালবাসা গড়ে ওঠে না। আমরা কিছুদূর হেঁটে একটি ট্যাক্সি নিয়ে আইফেল টাওয়ারের কাছে গেলাম। তিনতলা বন্ধ হয়ে গেছে টাওয়ারের, উঠলে তিনতলায় ওঠাই ভাল। আমার কিন্তু অত চুড়োয় ওঠার কোনও তীব্র ইচ্ছে নেই। দূর থেকেই দেখি না কেন! আলো ঝলমল পরিবেশটি আমার ভাল লাগে। আজদাহা টাওয়ারটি লোহা লককরের একটি স্তম্ভ। জানি না কেন লোকে এটি পছন্দ করে। প্যারিসের লোকেরা অবশ্য এটিকে জঘন্য একটি জিনিস বলে ছো! ছো! করে। ১৮৮৯ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য গুস্তাব আইফেল নামের এক লোক এটি বানিয়েছিলেন, তিনশ মিটার লম্বা টাওয়ারটি, সাত হাজার টন ওজন। কথা ছিল প্রদর্শনীর পর এটি তুলে ফেলা হবে। কিন্তু শেষ অবদি তোলা হয়নি, রয়ে গেছে। এলাকাটি, জিল বলে, ধনী। ধনীর ছেলেরা একটুকরো চাকাঅলা কাঠের ওপর চড়ে ভয়ংকর ভাবে দৌড়োচ্ছে। গরম পড়তেই নাকি এখানে এমন শুরু হয়ে যায়। আমরা নৌকো চড়ব বলে নদীর কাছে গিয়ে দেখি নৌকো নেই। এ কারণে যে মন খারাপ হবে তা নয়। আমার ওরকম হাঁটতেই ভাল লাগছিল। পাশাপাশি তিনজন। ভাল লাগছিল রকমারি মানুষের ভিড়। আনন্দিত মুখ। হাঁটতে হাঁটতে আমরা আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফএর কাছে পৌঁছে যাই। জিল আর নাতালি দুজন বাড়িতে খেয়ে এসেছে। আমার রাতের খাওয়া তখনও হয়নি বলে শাঁর্লস এ লিজের এক রেস্তোরাঁয় বসি। ভেতরে নয়, বাইরে, তেরাসে। অনেক রাত অবদি। রাত গভীর হলেও বোঝার উপায় নেই। হৈ হুল্লোড়, মানুষের ভিড়, যানবাহনের ভিড়। কি অদ্ভুত এক অন্যরকম জগতের মধ্যে আমি!

পরদিন। সকালে ক্যামেরুনের সাংবাদিকের সঙ্গে নাস্তা খাওয়ার কথা। ধুৎ কি নাস্তা খাব। সকালে বিছানায় বসে চা খাচ্ছি আরাম করে। ক্যামেরুনের কথা আপাতত ভুলে যাই। ক্রিশ্চান বেস অপেক্ষা করছেন নিচে। আবার জিলের ফোন। ক্রিশ্চান এসেছে খবরটি দিলে জিল বলল, 'তাহলে তুমি ক্রিশ্চানকে নিয়েই রেডিওতে চলে যাও। আমি তোমাকে নিয়ে আসতে গেলে দেরি হয়ে যেতে পারে। আমি আমার এখান থেকেই তাহলে সোজা রেডিওতে চলে যাচ্ছি।' খানিক পর আবার জিলের ফোন। 'প্রযোজক নেই এখন রেডিওতে, তোমার ওখানে গেছে কী না, খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর।' ক্রিশ্চানের সঙ্গে চা কফি নিয়ে বসলাম আধঘন্টা মত। ক্রিশ্চান বার বারই একটি কথা বলল, 'আমি তোমার নামের জন্য তোমার বই ছাপতে চাইছি না। ছাপতে চাইছি তোমার সাহিত্যের জন্য। লেখক হিসেবে তোমাকে চাইছি। তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে, তোমার এখন চারদিকে নাম, সেজন্য তাড়াহুড়ো করে তোমার একটি বই

ছেপে হটকেকের মত বিক্রি করে তোমায় ভুলে যেতে চাইছি না। সত্যি কথা বলতে কী, তুমি যে লেখক, তুমি যে ভাল একজন লেখক, তা মানুষকে জানাতে চাইছি।'

রেডিওর লোকের জন্য বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। আমরা উঠে পড়ি। ক্রিশ্চান আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছেন। ছোট্ট একটি লাল গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রেসিডেন্ট উইলসন রোডের বাড়িতে। অসম্ভব রকম কর্মঠ তিনি, অবসর বলতে কিছু তাঁর জীবনে নেই। ক্রিশ্চান অনর্গল কথা বলেন। কোনও একটিও কিন্তু বাজে কথা নয়। ফরাসিরা কথা বলতে গেলে হাত পা মুখ মাথা ঠোঁট চোখ খুব নাড়ে। এটা ওদের সম্ভবত জাতীয় অভ্যেস। এডিশন দ্য ফামের মহিলা মিশেল ইডেল ফোন করছে, দেখা করতে চাইছে শুনে ক্রিশ্চান নাক সিঁটকে বলল, 'নারীবাদ নারীবাদ নারীবাদ। উফ! অসহ্য। নারীবাদ নিয়ে যারা লাফায়, আমি তাদের সহ্য করতে পারি না। এ হচ্ছে একধরনের সীমাবদ্ধতা। এও আরেক ধরনের মৌলবাদ। যে কোনও কিছুতেই আমরা নারী আমরা নারী। নারীর এই হয়নি সেই হয়নি। এই চাই সেই চাই। এই হতে হবে সেই হতে হবে। এ আবার কী! মানুষের কথা ভাব, মানুষের জন্য বল, মানুষের জন্য কর, নারী পুরুষ শিশু সবার কথা ভাব! কেবল নারীরই কি সব সমস্যা? শিশুদের নেই? পুরুষের নেই? হু!নারীবাদীদের উদ্দেশ্য নারী নিয়ে ব্যবসা করা, আর কিছু নয়।'

ক্রিশ্চান রাস্তার কিনারে গাড়ি রেখে তাঁর বাড়ির সামনের সড়কদ্বীপে বাজার বসেছে, সেখানে যায়। বাজারটি এই দ্বীপে বুধবার আর শনিবারে বসে। দুপুরের মধ্যেই বাজারটি উঠে যাবে। আবার সব ঝকঝকে তকতকে আগের মত। বিকেলে দেখলে কারও বোঝার উপায় থাকবে না এখানে একটি জমজমাট বাজার ছিল সকালবেলা। আমাদের কাঁচা বাজারের মত নয় এটি। সবকিছুর এখানে নির্ধারিত দাম। আমাদের দেশের মত চিৎকার করে দরদাম করতে হয় না। ক্রিশ্চান ফুল কেনে। লিলি অব দ্য ভ্যালি। চমৎকার ঘ্রাণ ফুলের, ছোট শাদা ফুল। ক্রিশ্চানের বাড়িটি তিনতলায়। এমন সুন্দর বাড়ি আমি জীবনে কমই দেখেছি। যেন বাড়ি নয়, আস্ত একটি মিউজিয়াম। সাতশ সিসি মেফেয়ার গাড়িটি দেখে মনেই হয়নি তাঁর বাড়িতে আছে খৃষ্টপূর্ব চারশ শতাব্দির প্রাচীন মূর্তি, ব্যাবিলিয়ন, সুমেরিয়ান সভ্যতার অমূল্য সব সম্পদ। প্রাচীন সব রঙিন পাথরের অলংকার। মিশরের গুহা থেকে তুলে আনা সেই আমলের জিনিসপত্র। আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি মূর্তিগুলোর সামনে, যেমন থ হয়ে ছিলাম ল্যুভরে। বাড়িটির দেয়ালে দেয়ালে যত তেলচিত্র আছে, সবই বড় বড় শিল্পীর। সবই আসল, নকল বলতে কিছু নেই। বাড়ির আসবাবপত্রগুলোও শিল্পীর তৈরি। যে কাপে চা খেতে দিল, সেটিও কয়েকশ বছর আগের। অ্যান্টিকে বাড়িটি ভর্তি। একটি অ্যান্টিক ল্যাণ্ডও আছে। অমিতাভ ঘোষের অ্যান্টিক ল্যান্ড বইটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন ক্রিশ্চান নিজে। বইটির নামে ইজিপ্ট দেখে আমি ধন্দে পড়ি। ক্রিশ্চান বললেন বাণিজ্যিক কারণে তিনি নামটি পাল্টে দিয়েছেন। *বাণিজ্যিক* শব্দটি উচ্চারণ করতে এখানে কারও কোনও গ্লানি নেই। আমার চা খাওয়া শেষ হয়নি। টেলিভিশনের লোকেরা এল। জ্যঁ শার্ল বারথেয়ারও এল। একবার বাংলায় একবার ইংরেজিতে সাক্ষাৎকার নিল ওরা। এরপর নিচে, খানিকটা হেঁটে গিয়ে মডার্ন

মিউজিয়ামের বারান্দায় আরেক দফা সাক্ষাৎকার। হাঁটছি, কথা বলছি, ক্যামেরা আমার প্রতি অঙ্গভঙ্গি তুলে রাখছে।

প্যারিস কেমন লাগছে?

এত সৌন্দর্য প্যারিসের, তা আমি আগে কল্পনাও করিনি।

জ্যঁ শার্ল বারথেয়ারকে অনুবাদক হিসেবে নিয়েছে টিভির লোকেরা। একসময় আমি মনিক আতলাঁকে, সাংবাদিক পরিচালক দুটোই তিনি, বলি যে বাংলা থেকে ফরাসিতে অনুবাদ হলে, আমি ইংরেজিতে একই প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছি, সেটির সঙ্গে যেন মিলিয়ে দেখে নেন বক্তব্য ঠিক আছে কি না। লক্ষ করিনি জ্যঁ শার্ল আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, আপনি বিসওয়াস খরেন না? চমকে উঠি। তাকিয়ে বারথেয়ারের মুখ দেখি বিষণ্ন মুখ। বড় অপ্রস্তুত হই! বলি, 'না না আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। তবু এই আর কী! আপনার তো কিছু ভুল হতে পারে। যেমন ধরুন অনেক কঠিন কঠিন বাংলা শব্দ যদি না বুঝতে পারেন, তাই।' আমার এই সান্ত্বনায় বারথেয়ারের বিষণ্নতা দূর হয় না। মায়া হয় মানুষটির জন্য। এমন ভাবে বলাটা বোধহয় উচিত হয়নি। ক্রিশ্চান বেস আর মনিক আতলাঁ হাঁটছি কথা বলতে বলতে, ফাঁকে ফাঁকে আমার ব্যাগ আর চশমা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বারথেয়ারের বিষণ্ন মলিন মুখটি দেখছি। নীল চোখ তার, ঘাড় অবদি সোনালী চুল, পরনে জিনসের জ্যাকেট ডড খানিকটা গবেট গবেট মনে হয় তাকে, বারথেয়ারকে, এত স্পর্শকাতর হবে ভাবিনি। কোনও ফরাসি পুরুষ এমন অভিমান করে মলিনতার চাদরে নিজেকে ঢেকে ফেলতে পারে, এই প্রথম দেখলাম। ক্রিশ্চানের গাড়ির কাছে যেতে যেতে সবার থেকে নিজেকে আলগোছে সরিয়ে দু কদম পিছিয়ে নিয়ে বারথেয়ারের সঙ্গে কথা বলতে থাকি আমি। এমনি কথা। ছোটোখাটো কথা। এতদিন আসলে বারথেয়ারকে বিষম এড়িয়ে চলেছি। ক্রিশ্চান যখন আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠবে, বারথেয়ারকে বললাম, আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, আমরা দুপুরের খাবার খেতে যাচ্ছি, চলুন। বারথেয়ারের মুখটি মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু ক্রিশ্চান তাকে ফরাসিতে কিছু বলল, কি বলল জানি না। সঙ্গে সঙ্গে বারথেয়ার আমাকে থতমত ঠাণ্ডা গলায় বলে দিল যে সে যেতে পারছে না, জরুরি কিছু কাজ আছে তার। তবে তিনি বারথেয়ার অপেরায় নিয়ে যাবেন আমাকে, অপেরার টিকিট কেটে এনেছিলেন। তিনি বললেন, সাতটায় হোটেলে যাবেন আমাকে অপেরায় নিয়ে যেতে। ক্রিশ্চান আমাকে লেবানিজ একটি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন। মুরগির কাবাবমত, আর কাঁচা বাধাকপি, নানা রকম কাঁচা পাতা, যা কখনও কাঁচা খাওয়া যায় বলে আমার ধারণা ছিল না। খেতে খেতে ক্রিশ্চানের সঙ্গে কথা বলি ফরাসি সাহিত্য নিয়ে। ফরাসি সাহিত্যিকরা কেমন লিখছেন, কী লিখছেন! ক্রিশ্চান সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট উল্টে বললেন, বাজে বাজে বাজে। নতুন প্রজন্মের সবাই আমবিলিকাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে সবই তো আছে তাদের। তারাই তো জনক শিল্পের সাহিত্যের। সুতরাং নতুন কিছুর আর কী দরকার! ক্রিশ্চান খুবই হতাশ ফরাসি লেখকদের নিয়ে। বললেন, 'আমি অনেক পাণ্ডুলিপি পাই ফরাসি লেখকদের। সবই অখাদ্য। কেবল বর্ণনা। কিছুই নতুন নয়। নতুন ভাষা নেই। নতুন বক্তব্য নেই।'

ক্রিশ্চান জ্যঁ শার্লকে দিয়ে লজ্জা অনুবাদ করাচ্ছেন। এখন লজ্জা নিয়ে তিনি আর ভাবছেন না। ভাবছেন আমার অন্য বই নিয়ে। জ্যঁ শার্ল লন্ডন থেকে আমার বাংলা বই কিনে এনেছে। শোধ, নিমন্ত্রণ, ভ্রমর কইও গিয়া সবই তাঁর পড়া হয়ে গেছে। শোধের গল্পটি সে ক্রিশ্চানকে শুনিয়েছেন। খাতা কলম বের করে ক্রিশ্চান লিখে নিলেন কি কি বই এ পর্যন্ত লিখেছি আমি। কি কি তাঁকে আমি এখন দিতে পারব ছাপতে। এ পর্যন্ত আমি যা লিখেছি সবই তিনি চান এবং এখন যেটি লিখছি, কোরানের নারী, সেটিও তাঁর চাই। সব তাঁর চাই, যা আছে। কবে পাঠাতে পারব সব। কখন। সব তাঁর জানা চাই। বাংলায় পাঠাই, ইংরেজিতে পাঠাই তাঁর কোনও অসুবিধে নেই। ইংরেজিতে পাঠালে তিনি নিজে অনুবাদ করে নেবেন। বাংলায় হলে বাংলা জানে এমন কাউকে দিয়ে প্রাথমিক অনুবাদ করিয়ে নিয়ে নিজে তিনি সংশোধন করবেন। আমি প্যারিসে থাকাকালীনই তিনি আমাকে দিয়ে কন্ট্রাক্ট ফর্ম সই করাতে চান। বারবারই বললেন, 'তসলিমা, তোমার নামকে নয়, আমরা তোমার লেখাকে ছাপতে চাই।'

টেলিভিশনের জন্য ক্রিশ্চানের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞেস করিনি, নিজেই বললেন যে আমার সম্পর্কে জরুরি যে কথাটি বলেছেন তা হল, 'তসলিমার হাতে একটি অস্ত্র আছে, অস্ত্রটির নাম কলম।'

আমার ঘড়িটি প্যারিসে আসার পথেই বন্ধ হয়ে আছে। ক্রিশ্চানও ঘড়ি পরতে পছন্দ করেন না। এদিকে দিন দেখে বোঝার উপায় নেই কটা বাজে। যে দেশে রাত দশটা অবদি আলো থাকে, কি করে অনুমান করব কখন সে দেশে দুপুর হয়, কখন বিকেল আর কখন সন্ধে। হোটেলে ফিরতে হবে, এডিশন স্টক থেকে ফটোগ্রাফার আসবে ছবি তোলার জন্য। দ্য ফাম প্রকাশনীর মিশেল ইডেল আসবেন। মিশেলএর সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছে কারণ মিশেলই প্রথম ফরাসি প্রকাশক আমার সঙ্গে ঢাকায় যোগাযোগ করেছিলেন। দ্য ফাম থেকেই আমার বই চাওয়া হয়েছিল সবার আগে। ওদেরই প্রথম আমি কথা দিয়েছিলাম লজ্জা বইটি ওদেরই দেব। শেষ পর্যন্ত লজ্জা আমি এডিশন স্টককে, ক্রিশ্চানের প্রকাশনীকেই দিই। মিশেল ওদিকে বইয়ের জন্য ফোন করছেন রাত দিন। 'দেখ তসলিমা আমরাই প্রথম তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, আর তুমি কেন চুপ করে আছ, কেন বার বার ফোন করেও তোমাকে পেতে পারি না। কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছ না। টাকার প্রয়োজন তোমার? কত টাকা চাও? এডিশন স্টক কত টাকা দিতে চাইছে তোমায়, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা আমরা দেব। তবু লজ্জা ছাপার অনুমতি আমাদের দাও।' লজ্জা ছাপবেন বলে কন্ট্রাক্ট ফর্ম পাঠিয়েছেন, নিজেদের ছাপানো বই পত্র পাঠিয়েছেন যেন দেখে সিদ্ধান্ত নিই। বলেছেন, 'দেখ তসলিমা দয়া করে আমাদের অনুমতি দাও লজ্জা ছাপার। আমরা আং সাং সুচির বই ছেপেছি, সুচি ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছে। আন্তোনেত ফুক তোমার জন্যও ইউনেস্কো পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।' শুনে ভীষণ বিব্রত আমি। আমাকে কি লোভ দেখানো হচ্ছে! আমি তো লোভে পড়ছি না, টোপমাখা বাক্য শুনে বরং লজ্জায় পড়ছি। লজ্জার জন্য দুটো প্রকাশনী এমনই উন্মাদ হয়ে উঠেছে যে মাঝখানে পড়ে আমি লজ্জায় মুখ লুকোই।

দুজনকেই আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, দেখ লজ্জা এমন একটা বই নয় যেটা তোমাদের পাঠকের আদৌ ভাল লাগবে,বইটি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে লেখা, তার ওপর বইটি তথ্যভিত্তিক বই। ফরাসি পাঠকের এই বই মোটেও ভাল লাগবে না, ওরা বুঝবেও না। না, আমার কথা কেউ মানবেন না। তাঁদের বই চাই, চাইই, যে করেই হোক চাই। ক্রিশ্চানের চাপে আর তাপে বইটি তাঁকে ছাপার অনুমতি দেওয়ার পর মিশেলের জন্য সত্যিই আমার কষ্ট হতে থাকে। লজ্জার মত অসাধারণ একটি বই তিনি পেলেন না বলে নয়, তাঁর ইচ্ছের আমি মূল্য দিইনি বলে তিনি যে কষ্ট পেয়েছেন, সে কারণে। হোটেলে সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে দেখি চারটা থেকে অপেক্ষা করছে এডেন, ছবি তোলার মেয়ে। অপেক্ষা করছে মিশেল ইডেল। মিশেলের বয়স চল্লিশের ওপর। আমাকে আমার দেশে লম্বা মেয়ে বলা হয়, আমার চেয়েও দেড় হাত লম্বা মিশেল, নিখুঁত সুন্দরী। মুখে হাসি লেগেই আছে। ডানে ক্রিশ্চান বামে মিশেলকে নিয়ে আমি তখন কী করি, কোথায় যাই বুঝতে পারছি না। সত্যি, এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় আমি আর পড়িনি। সারাপথ ক্রিশ্চান বলে বলে এসেছেন, ‘প্রকাশক একজন থাকা উচিত তোমার এ দেশে। দুজন প্রকাশক থাকবে কেন! কারণ কি বল! এখানে কোনও লেখকই একাধিক প্রকাশককে বই দেন না। তুমি দেখ আমাদের প্রকাশনীটিকে! দেখ আমরা কী ধরনের বই প্রকাশ করছি। কী মানের বই তুমি নিজে এসে দেখে যাও। আজে বাজে ছোট প্রকাশকের সঙ্গে তোমার দেখা করাই উচিত নয়। আমি অবাক হয়ে যাই তোমার রুচি দেখে। দ্য ফাম!! তারা? তাদের তুমি পছন্দ করলে কি করে? তারা সব বাজে। জঘন্য। নারী নারী নারী বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলল! যত্তসব। এইসব বাজে জিনিস দেখেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রকাশনায় যাওয়ার। তসলিমা, কোনও কিছুর জন্য আমি তোমাকে চাপ দিতে চাই না। দেব না। তোমার অধিকার আছে যা কিছু করার, যাকে খুশি বই দেবার। কিন্তু তোমার তো রুচি থাকা উচিত। অন্তত সামান্য রুচি তো তোমার কাছে আশা করি। তুমি কি করে ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলে? উফ, ভাবতেই পারি না। ভাল যে আমি এসে বাঁচিয়েছিলাম তোমাকে ওদের হাত থেকে। এখন আবার বলছ যে তুমি ওদের সেমিনারে যাবে? তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়েছে? থার্ড ক্লাস। থার্ড ক্লাস। গেলেই বুঝবে। শোনো, মাথায় যদি তোমার সামান্য ঘিলু থেকে থাকে, তবে আমার কথা তুমি রাখবে, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, যেও না। যেও না ওদের সেমিনারে। নিজের মানটা নষ্ট কেরো না। হাস্যকর পরিবেশে গিয়ে নিজেকে হাস্যকর কোরো না।’ একটি প্রার্থনাই আমি মনে মনে করেছি হোটেলে ফেরার পথে, মিশেল ইডেল আমার জন্য হোটেলে অপেক্ষা করতে করতে আমি ফিরছি না বলে যেন তিনি বিরক্ত হয়ে ফিরে যান। আমার প্রার্থনা কোনও খোদা বা ভগবানের কাছে নয়, এই জগতের রহস্যময় জটিল প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতি আমার ডাকে সাড়া দেয় না। মিশেল ইডেল তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা নিয়ে হোটেলের দরজায় দণ্ডায়মান। আমি আর ক্রিশ্চান মুখোমুখি মিশেলের। আমি এখন কাকে সামলাবো। ক্রিশ্চান মোটেও মিশেলের দিকে ফিরে না তাকিয়ে একদমে বলে যান, ‘তসলিমা, তোমাকে এখন ছবি তুলতে হবে, এডেন বসে আছে অনেকক্ষণ। তাড়াতাড়ি চল। ছবি তুলে তারপর

তো তোমাকে অপেরায় যেতে হবে, জানো তো! জ্যঁ শার্ল আসবে ঠিক সাতটায়। মনে আছে তো! তাড়াতাড়ি কর।'

আমি মরা কণ্ঠে এডেনকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি ঘরে ছবি তুলবে, না কি বাইরে?

সুন্দরী এডেন মধুর হেসে বলল, বাইরে।

বাইরে?

ইতস্তত করি।

এডেন আবারও হেসে বলল, দূরে নয়। কাছেই। কাছেই পেলে দ্য রয়াল। ওখানকার বাগানে।

খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে কিন্তু। বেশি সময় নেই আমার। কারণ..

ক্রিশ্চানের দিকে যতটা সম্ভব না তাকিয়ে বলি, কারণ মিশেল এসেছে আমাকে নিতে, সেমিনারে যেতে হবে।

ক্রিশ্চান হা হা করে উঠল, কিসের সেমিনার? কোন সেমিনার? তুমি না অপেরায় যাচ্ছ! জ্যঁ শার্ল তোমাকে নিতে আসবে। ও টিকিট করে রেখেছে।

এবার আমাকে একটি পক্ষ নিতে হবে। ক্রিশ্চান বিদেয় হলে এখন আমি বাঁচি। এ সময় মিশেলকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার উচিত নয়। এত বড় অমানবিক কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমি সেমিনারে যাবো, কথা যখন দিয়েছি, যাবই।

ক্রিশ্চানকে এড়িয়ে আমি বলি, চল একটা ট্যাক্সি ডাকি, এডেন মিশেল আর আমি একসঙ্গেই চল বাগানটিতে যাই। ওখান থেকে মিশেল আর আমি চলে যাব।

ক্রিশ্চান গাড়ির দিকে যাচ্ছে, যেন আমার কথা শোনেনি, বলল, চল চল বাগানে চল, আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে যেতে পারব। এডেন এসো, তসলিমা এসো।

আরে বাবা মিশেল কোথায় যাবে! মিশেলের কি হবে? মিশেল হতভম্ব দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর হাত ধরে বললাম, আপনিও চলুন।

মিশেল গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, ক্রিশ্চান বলেন, আমার গাড়িতে তো দুজনের বেশি জায়গা হবে না।

হবে হবে। আমি বলি, সামনে আমি বসছি। পেছনে ওরা দুজন বসবে, জায়গা হবে না কেন! ঠিকই হবে।

ক্রিশ্চান ভেতরে গজগজ করছেন তা ঠিকই বুঝি। বাগানে ফটাফট কটি ছবি তুলে আর সময় দিতে পারব না বলে কেটে পড়ি। মিশেল একটি ট্যাক্সি ডেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, ওতে উঠে পড়ি। দুজনে কথা বলতে থাকি বিরতিহীন, যেন অনেককালের সম্পর্ক আমাদের। আমাকে মিশেল নিয়ে গেলেন অনুষ্ঠানে, বিশাল সেমিনার কক্ষটির মঞ্চের দিকে, যে মঞ্চে বসে আছেন কয়েকজনের সঙ্গে হুইল চেয়ারে একজন, সেই একজনের দিকে, আন্তোয়ানেত ফুকের দিকে। ষাট দশকের নারী আন্দোলনের নেত্রী এই ফুক। এখন ইউরোপীয় পার্লামেন্টে সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য। এডিশন দ্য ফাম নামের প্রকাশনীর মালিক প্রকাশক তিনিই। তাঁকেই মিশেল ইডেল গুরু মানেন। ফুকের সঙ্গে করমর্দন হল। হাসি বিনিময় হল। চুমোচুমি হল। মঞ্চ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হল আমার আগমন বার্তা,

তসলিমা শব্দটি শুধু চিনতে পারলাম একগাদা ফরাসি শব্দের ভিড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ঘর ভর্তি নারী পুরুষ প্রচণ্ড হাততালি দিতে শুরু করলেন, হাততালি দিতে দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন সকলে। এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। এত মানুষ আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। আমি অভিভূত। বিস্মিত। শিহরিত। কিছুটা বিব্রতও। চোখে আমার জল চলে এল। আজ কি সত্যিই এখানে এসে পৌঁছেছি আমি! এ কি আমার জন্য অতিরিক্ত নয়! এত আমার প্রাপ্য ছিল না। আমাকে কিছু বলতে বলা হল মঞ্চে দাঁড়িয়ে। কী বলব! কী কথা বলা যায় এখানে। সকলের চেয়ারের সামনে লেখার জন্য টেবিল। নারীবাদের ওপর দামি দামি কথাবার্তা হচ্ছিল এখানে, সকলে লিখে নিচ্ছিলেন আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো। সব থামিয়ে দেওয়া হল আমি বক্তৃতা দেব বলে! কোনও কিছু কি আমি বলতে পারবো যা এঁদের কাছে নতুন! মিশেল আর আন্তোয়ানেতকে মিনমিন করে বললাম, দেখ আমাকে তো আগে বলা হয়নি যে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে! আমার তো কোনও প্রস্তুতি নেই, তাছাড়া আমি ক্লান্ত, আমাকে যেতেও হবে এক্ষুনি। এত অপ্রতিভ বোধ করছিলাম যে বেরিয়েই এলাম। বেরিয়ে এসে মনে হল আহা ওই অভিবাদনের উত্তরে অন্তত ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল।

আমার আর মিশেলের পেছন পেছন কয়েকজন তরুণী বেরিয়ে এল। মিশেলকে বললাম, আমার কিছু বলা উচিত ছিল ওখানে। সবাই নিশ্চয়ই মন্দ বলবে।মিশেল হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘কী যে বলছ তসলিমা। সবাই ভীষণ খুশি তোমাকে দেখে। তোমার উপস্থিতিটাই বড়। বলতেই যে হবে এমন কোনও কথা নেই।’ সবাই আমরা কাছের একটি ক্যাফেতে গিয়ে বসলাম। এক ফরাসি তরুণী কাঁপা কাঁপা হাতে আমার হাত ছুঁয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য হলাম। ক্যাফেতে আমাকে ঘিরে বসে সবাই আমি কেমন আছি, কি করছি, কি ভাবছি, সবই জানতে চাইছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা, জানে কেবল আমাকে। আমার জন্য সবাই দুশ্চিন্তা করছে। ফতোয়ার খবর পাওয়ার পর প্যারিসের রাস্তায় নেমেছিল নারীবাদীরা, বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে আমরা তসলিমার সমর্থক লেখা বড় বড় প্ল্যাকার্ড নিয়ে। তারা আমার লেখা পড়তে চায়। কবে বেরোবে বই জানতে অস্থির হয়ে ওঠে। হবেই তো। পৃথিবীর অপর প্রান্তে কোনও এক বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ের দেশের এক মেয়ে নারী স্বাধীনতার কথা লিখতে গিয়ে ফতোয়ার শিকার হয়েছে, কী লিখেছে সে যে এত লোক ক্ষেপে গেল, তা জানার আগ্রহ তো এদের থাকবেই। মনে মনে ভাবি, এই যে লজ্জা বইটির জন্য এমন অপেক্ষা করে বসে আছে পড়বে বলে, লজ্জায় তো নারীবাদের কথা নেই। কেউ যদি ভেবে থাকে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলেছি বলে লজ্জা বাজেয়াপ্ত করেছে বাংলাদেশ সরকার অথবা ইসলামি মৌলবাদীরা আমার মাথার মূল্য ধার্য করেছে তবে তা যে সম্পূর্ণ ভুল তা আমি কী করে কাকে বোঝাবো! ক্যারোল টাং ও অপেক্ষা করছেন আমার বই পড়ার জন্য। ক্যারোল টাং ইওরোপীয় পার্লামেন্টের মন্ত্রী। তিনিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন কুড়ি দফা দাবি পেশ করার, আমার পাসপোর্ট যদি ফেরত না দেওয়া হয়, নিরাপত্তা যদি না দেওয়া হয় আমাকে তবে ইউরোপ

থেকে বাংলাদেশের কোনও অর্থ-সাহায্য পাওয়ার বারোটা বাজবে ইত্যাদি। রেসোলুশনটি পাশ হয়েছে এপ্রিলের একুশ তারিখে।

ফ্রান্স থেকে কদিন পরই দেশে ফিরে যাচ্ছি শুনে সকলে অবাক হয়। বিস্ফারিত চোখ একেকজনের।

ডডওখানে তো আপনাকে মেরে ফেলবে। দেশে ফেরা আপনার উচিত হবে না।

ডডদেশে কি আর আমি একা লড়াই করছি। আমার পাশে অনেকে আছেন।

ডডআপনার জীবন মূল্যবান। আপনাকে লিখতে হবে। দেশে যদি আপনাকে মেরে ফেলে তাহলে লিখবেন কি করে? আপনি ফ্রান্সে থাকুন। লিখতে হলে বেঁচে থাকতে হবে তসলিমা।

ডডলেখালেখি দেশে বসেই করব। দেশ ছাড়ব না।

ডডএ কোনও কথা হল? আপনার ভয় করে না?

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকদিন থেকে আছি, এভাবে থাকাটাই এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। লড়াই করে বাঁচতে চাই। পালিয়ে নয়। যদি মরতে হয়, মরে যাবো। এ আর এমন কী! কত লোকে মরছে।

সকলের বিস্মিত চোখের সামনে সাতটা বেজে গেলে আমি উঠে পড়ি। মিশেল আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় বার বার করে বললেন যেন আন্তোয়ানেতের জন্য কোনও একদিন সময় রাখি। আমাকে নিয়ে তাঁরা প্যারিসের বাইরে কোথাও যেতে চান। আরও অনেক কিছুর ইচ্ছে আছে। সেজেগুজে পাটবাবুটি হয়ে যথারীতি হোটেলে অপেক্ষা করছিলেন জ্যঁ শার্ল। আমার যে অপেরায় যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল তা নয়, অনেকটা জ্যঁ শার্লকে আহত না করার জন্য, যেহেতু যথেষ্টই করা হয়েছে ইতিমধ্যে, আর কিছুটা জিলকে এড়াবার জন্য আমার এই অপেরায় যাওয়া। জিল বারবারই বলেছে, আমি যেন একটু ফাঁক পেলেই তাকে ফোন করি, ফোন করলেই চলে আসবে সে। আমি চাইছিলাম না জিলকে ফোন করতে। থাকে সে মপঁলিওতে। ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্তের এক শহরে। আর তার প্রেমিকা বাস করে প্যারিসে। নাতালির সঙ্গে তার সময় কাটানো নিশ্চয়ই আনন্দের, অন্তত আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে। তাছাড়া জিলকে আমার এত ভাল লাগে যে, তার জন্য মন কেমন করা থেকে নিজেকেও একরকম বাঁচাতে চাই। নাহ, জিল নাতালির সঙ্গে সময় কাটাক, আমার জন্য তার সারাদিনটি নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। জিল নাতালিকে ভালবাসে, বাসুক। আমার মন যেন এত জিলে পড়ে না থাকে। আসলে, এত চমৎকার না হলেও সে পারত। আমার চেয়ে বয়সে সে চার বছরের ছোট। আশ্চর্য, কখনও কোনওদিন আমার চেয়ে অল্প বয়সের কারও জন্য আমার মন কেমন করেনি। জিলের জন্য কেন করে বুঝিনা।

প্যারিসের নতুন অপেরাটি আধুনিক স্থাপত্যের একটি উদাহরণ বটে। ফরাসি লেখক জর্জ পেরেক এটিকে অবশ্য বড় মাপের পাবলিক টয়লেটের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ফরাসিরা শহর ভর্তি চমৎকার পুরোনো স্থাপত্যের মধ্যে হুট করে একটি বেঢপ দালান তুলতে মোটেও রাজি ছিল না। রাস্তায় নেমে রীতিমত আন্দোলন করেছে নতুন অপেরাটির নির্মাণের বিপক্ষে। আন্দোলনে কাজ হয়নি, শেষ অবদি ফরাসি

নন্দনতাত্ত্বিকদের বিচারে যে বস্তুটি একটি কুৎসিত স্থাপত্য, সেটিই আধুনিক অপেরা হিসেবে ঠিক ঠিক দাঁড়িয়ে গেল। অপেরায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল জ্যঁ শার্লের স্ত্রী নাতাশা। আমাকে মাঝখানে বসিয়ে দু পাশে বসে গেল দুজন। নাতাশা নাদুস নাদুস মেয়ে। তার হাঙ্গেরিয়ান মা ওয়ার এণ্ড পিস পড়ে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে কন্যা জন্মালে নাম রাখলেন নাতাশা। নাতাশা আর জ্যঁ শার্ল তাদের ছেলের নাম রেখেছে সত্যজিৎ। শুনে এত ভাল লাগে। প্যারিসের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সেদিন দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের ছবি চলছে, সাতদিনের সত্যজিৎ উৎসব। আনন্দে এমনই ভেসেছিলাম যে চোখে জল চলে এসেছিল। হয় এমন।

এখানকার নাটক থিয়েটারের শেষে যে জিনিসটি হয়, তা আমাদের দেশের নাট্যমঞ্চে দেখিনি। নাটকের শেষে শিল্পীরা যখন সবাই মঞ্চে এসে দাঁড়ায় বিদায় জানাতে, দর্শকরা তাদের করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু দর্শকের যদি কোনও নাটক খুব ভাল লাগে, সেই করতালি আর সহজে থামে না। যতক্ষণ না থামে ততক্ষণ বার বারই শিল্পীদের মঞ্চে এসে এসে অভিনন্দন গ্রহণ করতে হয়। অপেরা থেকে রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে গিয়ে রেস্তোরাঁয় একটি টেবিল পেতেই আমাদের অপেক্ষা করতে হয় এক ঘন্টা। অনেক রাত অবদি রেস্তোরাঁয় বসে তরুণ তরুণীর পরস্পরকে যথারীতি জড়িয়ে ধরা, একশ লোকের সামনে চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে গল্প করতে থাকি। গল্পে গল্পে এইডসের প্রসঙ্গ ওঠে। নাতাশা আর জ্যঁ শার্ল দুজনেই বলল, প্রায় প্রতিদিনই এই রোগে কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে ফ্রান্সে। তিরিশ হাজার ফরাসি এইডস রোগে ভুগছে। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সেই সবচেয়ে বেশি এইডস রোগী। ফরাসিদের মধ্যে এখন সচেতনতা বেড়েছে। এইডসের ভয়ে অনেকে আগ্রহ হারাচ্ছে যৌনসম্পর্কে, এমনকী প্রেমেও। এইডসের রোগীরা ক্রমে ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, কেউ মিশতে চাইছে না, কাজ করতে চাইছে না তাদের সঙ্গে। এসব মন খারাপ করা ঘটনা শুনে হোটেলে যখন ফিরে আসি আমি, বড় ক্লান্ত। শরীরটিকে বিছানায় এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আসার আগে চোখ পড়ে জিলের দেওয়া লিস ফুলে। কি সুন্দর ফুটে আছে ফুলগুলো। জিল কেমন আছে। কী করছে! নিশ্চয়ই ঘরে নেই। শনিবার রাতে কেন সে ঘরে থাকবে! নাতালিকে নিয়ে নিশ্চয়ই রাতের প্যারিস জুড়ে আনন্দ করছে। যারা যারা ফোন করেছিল, হোটেলের লোক কাগজে লিখে রাখে। নামগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে জিলের নাম খুঁজি। নেই।

পরদিন পয়লা মে। ঘুম ভাঙে ফোনের কর্কশ শব্দে। জিল হলে শব্দটি হয়ত এত কর্কশ মনে হত না, ক্যামেরুনের সাংবাদিক পিয়েস বলেই হয়। আজও তার একসঙ্গে নাস্তা খাওয়ার আবদার। এক হোটেলে পাশের ঘরে থাকছে, অথচ দেখা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে না। কাল চারটের সময় চা খাওয়ার কথা ছিল, ফিরতে পারিনি চারটেয়। নটায় নিচতলায় নেমে পিয়েসএর সঙ্গে নাস্তা করলাম। আমার পরনে ছিল সার্ট প্যান্ট, খাচ্ছিলাম শখের সিগারেট। পিয়েস বলল, তুমি কি মুসলিম দেশে এরকম পোশাক পরতে পারো, সিগারেট খেতে পারো? আমি বললাম, সার্ট প্যান্ট পরা যায়, তবে

রাস্তাঘাটে খুব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা যায় না। আর মেয়ে হয়ে সিগারেট খেলে লোকে ছি ছি করে। পিয়েস হেসে বলল, ক্যামেরুনে এসবে কোনও অসুবিধে নেই। পিয়েসের আরেকটি আবদার, আমার একটি সাক্ষাৎকার তার চাইই চাই। 'চলুন আমার ঘরে যাই, ওখানে আমার রেকর্ডার আছে। বাড়তি শব্দ কম হবে ঘরে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে পিয়েসের আবদার নাকচ করে দিই। যদিও তাকে রজার মিল্লারের মত দেখতে লাগে, তবু দানবের মত বিশাল দেখতে লোকটির ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে আমার মোটেও ইচ্ছে হয় না। কী জানি, ভয় ভয়ও হয়ত করে। এটি কি, আমি জানি না, মস্তিষ্কের গোপন কোনও কোষে, বিশ্বাসের মত আছে, কালো কুচকুচে কিছু মানেই ভূত বা ওই জাতীয় ভয়ংকর কিছু। জ্যঁ শার্ল আসার আগে, জিলকে করব না করব না করেও ফোন করি।

ফোন পেয়ে জিল বলল, কি খবর তোমার! তোমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি এখন ক্লান্ত হয়ে গেছি।

ডডআমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলে! কেন তুমি নিজে একবার ফোন করোনি।

ডডতুমি কখন হোটেলে থাকো না থাকো তার ঠিক নেই। তার চেয়ে, আগেই তো বলেছি, তুমি যখন ব্যস্ত থাকবে না, আমাকে ফোন করো। আমি চলে যাবো তোমার কাছে। এখন বল, কি প্রোগ্রাম তোমার আজকে? আমি চাইছি তুমি আমার সঙ্গে প্যারিসটা ঘুরে দেখ!

ডডনা হবে না। জ্যঁ শার্ল আসবে এখন। বেরোবো। তারপর বিকেলে মিশেল আসবে নিতে।

ডডএত ব্যস্ততা!

আমি হেসে ফোন রেখে জ্যঁ শার্ল এলে বেরিয়ে পড়ি। জ্যঁ শার্ল গাড়ি আনেনি আজ। রাস্তায় মিছিল মিটিং হচ্ছে, পুলিশ সব জায়গায় গাড়ি চলতে দিচ্ছে না, তাই। মে দিবস আজ। দোকান পাট বন্ধ। অন্যরকম প্যারিসের চেহারা। আমরা হেঁটে হেঁটে জোন অব আর্কের মূর্তির পাশে গেলাম। মূর্তির সামনে প্রচুর ফুল পড়ে আছে। খুব অবাক হলাম শুনে যে চরম ডানপন্থী দল মে দিবসে জোন অব আর্কের পাদদেশে ফুল দেয়, এবং জোন অব আর্ককে ডানপন্থীরাই নিজেদের প্রতীক হিসেবে নিয়ে নিয়েছে। জোন অব আর্কের মূর্তিতে ফুল দিতে চাইলে জ্যঁ শার্ল না না করে উঠল, বলল এতে ফুল দেওয়া মানে তুমিও ফ্যাসিস্ট দলের মত আচরণ করলে।

ডডবল কি!

ডডফ্যাসিস্ট ছাড়া আর কেউ ফুল দেয় না জোন অব আর্কের মূর্তিতে?

ডডনা।

ডডজোন অব আর্ক তো ফ্রান্সের গৌরব। কেন নয়?

ডডকারণ চরম ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী লিপেনের দলের রানী সে।

ডডকেন এরকম হল?

ডডহল কারণ জোন অব আর্ক ফ্রান্সের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। লিপেনও ভাবছে, তারাও তাই করছে। এই চরমপন্থীরা সব বিদেশি ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এ হচ্ছে জঘন্য জাতীয়তাবাদ।

ডডজাতীয়তাবাদ তো আমাদের উপমহাদেশে পজেটিভ একটি শব্দ।

ডডহিটলার জাতীয়তাবাদী ছিল। ইউরোপে জাতীয়তাবাদ শব্দটি খুব নিগেটিভ। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য শোষিতদের জাতীয়তাবাদী হওয়া আর স্বদেশে বসে ইউরোপীয় ঔপনিবেশবাদী শাসককুলের ভিন্ন জাতের প্রতি ঘৃণা পোষা, তাদের দূর দূর করে তাড়ানো আর নিজের জাতের অহংকারে জাতীয়বাদী হওয়া দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

জ্যঁ শার্ল পেশায় সায়কোএনালিস্ট। তাকে বাইরে থেকে দেখলে মানসিক রোগী মনে হলেও ভেতরে মানুষটি বুদ্ধিমান। আমি ফরাসি ভাষা জানলে অথবা জ্যঁ শার্ল ভাল বাংলা জানলে আমাদের আড্ডা চমৎকার জমতে পারতো, পরস্পরকে আমরা আরও বুঝতে পারতাম নিশ্চয়ই। হাঁটতে হাঁটতে অচিরে আমরা দেখতে পেলাম ল্যুভর মিউজিয়ামের পেছনে একটি খোলা জায়গায় লিপেনের দলের বিশাল সভা। লাল নীল সবুজ হলুদ বেলুন উড়ছে, মঞ্চে বসে আছে কিছু লোক, মঞ্চের সামনে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে শুনছে বক্তৃতা। বক্তা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সোশ্যালিস্ট দলের নেতা ফ্রাঁসোয়া মিতেরোঁর কথা কিছু বলছে, আর শুনে খুশিতে লাফাচ্ছে শ্রোতা। জ্যঁ শার্লকে জিজ্ঞেস করি, মিতেরোঁকে কি বলছে?

ডডগালি দিচ্ছে।

ডডকী বলে গালি দিচ্ছে?

জ্যঁ বলল, শুয়োর।

মঞ্চে কেবল পুরুষ নেতাই নন, নারী নেত্রীও বসে আছেন। আশ্চর্য, তাঁরা কি গণতন্ত্রের চর্চা করছে মঞ্চের ওপর! এই ডানপন্থী দলটিই তো মেয়েদের চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা বলছে, বলছে ঘরে ফিরে যেন মেয়েরা শাদা শাদা সন্তানের জন্ম দেয়, কারণ কালো আর বাদামীরা জন্মে জন্মে পৃথিবী দখল করে নিচ্ছে। সুতরাং এই চরম ডানপন্থী বর্ণবাদী ফ্যাসিস্ট দলের উপদেশ হল, মেয়েরা এতকাল ধরে সংগ্রাম করে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তা যেন দেশের স্বার্থে শাদা বর্ণের স্বার্থে বিসর্জন দেয়! মিশেল ইডেল বলেছেন সেদিন, লিপেনের দল এরকম একটি আইন তৈরি করতে চাইছে, যে বাচ্চা বিয়োলে মেয়েরা কাজ করে যে টাকা উপার্জন করত, সেই পরিমাণ অথবা তারও চেয়ে বেশি টাকা কাজ না করেই ঘরে বসে পেয়ে যাবে। চাকরি বাকরি করার জন্য মেয়েরা সন্তান জন্ম দিতে আগ্রহী হচ্ছে না, এটি নিয়ে লিপেনের খুব মাথা ব্যথা। তাহলে তো সর্বনাশ গো। মিশেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেয়েরা কি এখন সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হওয়ার আদিম ব্যবস্থায় ফিরে যাবে বসে বসে টাকা পাওয়ার লোভে? মিশেল বলেছেন, ‘নাহ! ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন এমন কিছু ভাল নয়। এটি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। মেয়েরা বেকার হওয়ার ঝুঁকি নেবে না। ভাল যে লিপেন ক্ষমতায় নেই।’ আমার আশঙ্কা কবে না জানি আবার লিপেনের দল ভোটে জিতে যায়! ফ্রান্সে ভোট দিতে যাওয়ার লোক খুব কম। ভোটের দিন তারা হয় দূরে কোথাও বেড়াতে চলে যায়, নয়ত ঘরে বসে আরাম করে। ভোটের প্রতি সাধারণ মানুষের

এই অনীহার এই সুযোগে আবার লিপেনের দল কোনও দিন না জিতে যায়! তখন কালো বাদামী মানুষের জন্য তো সমস্যাই, শাদা মেয়েদের জন্যও সমস্যা।

বয়স্ক কিছু লোক তাদের এককালের বুকে ব্যাজ লাগানো মেডেল লাগানো সেনা-পোশাক পরে এসেছে লিপেনের সভায়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, তার বাঁ পাশেই এক ইয়া মোচঅলা লোক সেনা পোশাকে দাঁড়িয়ে ছিল, জ্যঁ বলল, লোকটি আলজেরিয়ায় যুদ্ধ করেছে। লোকের সঙ্গে একটি বুড়ো কুকুর। দেখে জ্যঁ চোখ বড় বড় করে বলে, কুকুরটিরও ট্রেনিং আছে আলজেরিয়ানদের কামড়ানো। বলে কি! তাই নাকি? জ্যঁ নিশ্চিত স্বরে বলল, নিশ্চয়ই। লোকটির হাতে একটি বড় পোস্টার, ফরাসি ভাষায় কি লেখা আছে জানতে চাইলে জ্যঁ বলল, ইওরোপ এক হওয়ার বিরোধী। জাতীয়তাবাদ যাকে বলে। আমরা ফরাসি, আমাদের জাত অন্য জাতের চেয়ে ভাল। আমরা অন্য কোনও জাতের সঙ্গে এক হব না।

সামনে নির্বাচন ফ্রান্সে। আমি জ্যঁ শার্লকে জিজ্ঞেস করি, এরা যদি জিতে যায়!

জ্যঁ ঠোঁট উল্টে বলল, আরে না! এরা খুবই ছোট দল।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে সরে ল্যুভরের বারান্দায় ধরে হাঁটতে গিয়ে লক্ষ করি, কিছু লোক তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখছে। হঠাৎ জ্যঁ আমাকে টেনে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ওদিকে যেও না।

ডডকেন যাবো না?

ডডবিদেশিদের ওপর ওদের খুব রাগ। গালাগাল করতে পারে।

ডডগালাগাল করবে? আমি তো বুঝবও না গালি।

ডডতুমি না বুঝলেও আমি তো বুঝব।

ডডকী বলে গালি দেবে?

ডডবলবে নিজের দেশে ফিরে যা। এখানে এসেছিস আমাদের দেশের সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে। আমাদের চাকরি খেতে!

ডডআমি তো সে কারণে আসিনি। আমাকে তো আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হয়েছে, আমি তো অতিথি।

ডডতোমার গায়ে তো লেখা নেই যে তুমি অতিথি।

ডডগালাগাল করলে আমার কী! চল হাঁটি ওদিকে, লোকেরা জট পাকিয়ে কি করছে, দেখে আসি।

ডডদরকার নেই বাবা। চল এ জায়গা থেকে সরে যাই।

জ্যঁ বড় বড় পা ফেলে উল্টোদিকে হাঁটতে থাকে। জ্যঁকে থামিয়ে বলি, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে কি হচ্ছে এখানে। জ্যঁ আমার হাত ধরে টেনে বলছে, চল সরে যাই! হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ধমকে উঠি, ডড গালাগালকে তোমার এত ভয়!

ডডগালাগাল তো তেমন কিছু না। এরা মেরেও ফেলতে পারে তোমাকে।

ডডবল কি!

ডডঠিকই বলছি। এদের সম্পর্কে তোমার স্পষ্ট ধারণা নেই। এরা খুব ভয়ংকর।

জ্যঁ জোরে হেঁটে হেঁটে বামপন্থীদের মিছিলে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু মিছিল ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। মিছিল আর সভা ছাড়া রাস্তায় খুব লোক নেই।

এসময় নাকি প্রতিবছরই ডামে আর বামে কিছু মারপিট হয় রাস্তায়। মারপিট হয়? মারপিট দেখব। গোঁ ধরলে জ্যঁ বলল, 'ও আশা ছেড়ে দাও। বামের সভা শেষ হয়ে গেছে।' অগত্যা কাছেই এক ক্যাফেতে দুজন বসে চা কফি খেতে খেতে দেখতে থাকি রাস্তার কিনারের দৃশ্যগুলো। এক লোক মূর্তি সেজে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ন চড়ন নেই, সামনে মাথার টুপি উল্টো করে রাখা, কেউ যদি পয়সা দেয়। তিনটে ছেলে মূকাভিনয় করছে। তাদেরও সামনে টুপি। জ্যঁ বলল, 'এরা সম্ভবত পোলান্ডের ছেলে। ছাত্র। ফ্রান্সে বেড়াতে এসেছে। এভাবেই পয়সা তুলে চলছে।' বাহ। বেশ তো। বসন্তের প্রথম থেকে একবারে গ্রীষ্মের শেষ অবদি ছাত্র ছাত্রীরা বেড়াতে যায় বিভিন্ন দেশে। যাদের টাকা পয়সা নেই ঘুরে বেড়াবার, তারা রাস্তায় গান গেয়ে, অভিনয় দেখিয়ে, মূর্তি সেজে টাকা উপার্জন করে সেই টাকায় রেলের টিকিট কাটে, থাকা খাওয়ার খরচা মেটায়। আমি ওদের দেখতে দেখতে ভাবি আমাদের দেশের তরুণ তরুণীরা এভাবে বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর জন্য মোটেও আগ্রহী নয় কেন! পকেটে টাকা পয়সা না নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না কেন! অনেকে এখানে স্কুল কলেজ ছুটি হলেও রেস্তোরাঁয় বাসন মাজার কাজ নিয়ে নেয়, তা থেকে যা উপার্জন করে, তা দিয়ে অন্য দেশে বেড়াতে যায়। মধ্যবিত্ত কোনও ছেলে কি আমাদের দেশে বাসন মাজার কাজ করবে? আমি নিশ্চিত তা করবে না। এতে তাদের মান যাবে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় এসে আমাদের শিক্ষিত আদরের দুলালেরা কিন্তু তাই করছে, এতে মান যায় বলে মনে করছে না। আবার এও ঠিক, দেশের রেস্তোরাঁয় বাসন মাজলে কত টাকা আর পাবে! রাস্তায় সং সেজে দাঁড়ালেই বা তাদের কে দেবে টাকা! এখানে ছোট ছোট কাজেও ম্যালা টাকা মেলে। ছোট কাজ বলে ঠকানোর তেমন কোনও রাস্তা নেই। খুব কম করে হলেও ঘন্টায় পঞ্চাশ ফ্রাঁ। বাংলাদেশি টাকায় চারশ টাকা। ঘন্টায় কোন বাসনমাজনেওয়ালাকে চারশ টাকা দেবে আমাদের লোকেরা! তা ই বা দেবে কোত্থেকে! কজনের হাতে টাকা আছে দেশে! চাকরি করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররাই যে টাকা রোজগার করে, তা দিয়ে বাড়িভাড়া তো দূরের কথা, প্রতিদিন দুবেলা খাবারও জুটবে না। তাইতো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয় সবাইকে। পুলিশের দুর্নীতির কথা লোকে হামেশাই বলে! ঘুষ কেন খাবে না একজন পুলিশ! মাসে বেতন কত পায় সে! যে টাকা বেতন পায়, সেই টাকায় তার বউ বাচ্চা নিয়ে তার কি বেঁচে থাকা সম্ভব! দুর্নীতি দমন নিয়ে কত বড় বড় কথা লোকে বলে, কিন্তু দুর্নীতি কোনওদিন ঘুচবে না যতদিন না সকলের উপার্জন এমন হয়, যে উপার্জন দিয়ে থাকা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা যায়। আবার এও ভাবি, বড় দুর্নীতিগুলো বড় বড় লোকেরাই করে। যাদের অনেক আছে। গুটিকয়েকের হাতে অঢেল টাকা। বেশির ভাগ কায়ক্লেশে জীবন চালায়। কোনওমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই আর দিনে দুবেলা ভাতের জোগান হলেই আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ খুশি। ধনী দেশেই অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের পর আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করে সবাই, তা হল আনন্দ, স্ফূর্তি। আনন্দ স্ফূর্তিকে আমাদের দেশে মোটেও প্রয়োজনীয় বলে ভাবা হয় না, ভাবা হয় বিলাসিতা। এটি কেন! দর্শনের এই তফাৎ কি দারিদ্র্যের কারণে! নাকি অন্য কোনও কারণ আছে। একবার

ভাবি জ্যঁ র সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করি। পরেই আবার উৎসাহ দেখাই না। ভাবনাগুলো আমার মাথায় যায় আসে। আসে যায়। ভাবনাগুলো কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। বাতাসে ধুলোর মত ওড়ে, তুলোর মত ওড়ে। খেই হারিয়ে যায়, আবার ফিরে ফিরে আসে। মানুষ নামের জাতি একটিই। অথচ কী বিভেদ এই মানুষের মধ্যে। কেউ পাবে, কেউ পাবে না। কেউ খাবে, কেউ খাবে না। কেউ সুখে থাকবে, কেউ থাকবে না। কারও সব হবে, কারও কিছুই হবে না। কারও কাছে জীবন মানে আনন্দ, কারও কাছে জীবন দুর্বিসহ। যে শিশুটি জন্মাচ্ছে আজ ফ্রান্সে, আর যে শিশুটি জন্মাচ্ছে বাংলাদেশে, কী তাদের মধ্যে পার্থক্য! মানুষ হিসেবে কোনও পার্থক্য নেই, অথচ কী ভীষণ রকম ভিন্ন অবস্থায় পরিবেশে দুটো শিশু দু দেশে বড় হচ্ছে। আবারও ভাবি খুব কি পার্থক্য? আমি যে প্যারিসের ধনী ক্রিশ্চান বেসের বাড়ি গেলাম, আর ঢাকার গুলশানে এনায়েতুল্লাহ খানের বাড়ি গিয়েছিলাম, কী এমন পার্থক্য দুবাড়ির মধ্যে? কি এমন তফাৎ দু জনের জীবন যাপনে? না, খুব একটা নেই। ধনীরা, সে যে দেশেই হোক, একই রকম আরামে থাকে। তবে গরিবের অবস্থা হয়ত ভিন্ন। বাংলাদেশের গরিব আর ফ্রান্সের গরিব তো একরকম অবস্থায় থাকে না! গরিবের যে চেহারা দেখেছি বেলভিলে, এই যদি গরিব হয়, তবে তেজগাঁর বস্তিকে কি বলা যাবে! দুর্গন্ধ পাগারের ওপর বাঁশ পুঁতে ওর ওপর একখানা তক্তা বিছিয়ে ঘর বানিয়ে গু মুতের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তেজগাঁ বস্তির দুর্গন্ধটি প্যারিসের ক্যাফেতে বসেও হঠাৎ আমার নাকে এসে লাগে। চারদিকে বিশ্বায়ন নিয়ে কথা হচ্ছে। কার জন্য বিশ্বায়ন! পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে বলা হয়। কিন্তু কাদের কাছে ছোট? বাংলাদেশের একজন সাধারণ লোকের কাছে বিশ্বায়নের অর্থ কি! তাকে তো কেবল শ্রম দিতে হবে ধনীর ধন বাড়াতে। বিশ্বায়নে কেবল তো পণ্যদ্রব্যই এক দেশ থেকে আরেক দেশে অবাধে যাবে। গরিব দেশ থেকে কটা জিনিস বিদেশের বাজারে পৌঁছবে! গরিব দেশের কটা লোক ইচ্ছে করলেই দেশের সীমানা পেরোতে পারবে! গরিব হলে হাত পা কেমন বাঁধা পড়ে যায়। সীমানা কত মাপা হয়ে যায়! স্বাধীনতা কত সীমিত হয়ে যায়! সবাই পৃথিবীরই সন্তান, কিন্তু কারও কারও জন্য এক নিয়ম, কারও কারও জন্য অন্য। কারও জন্য বেঁচে থাকা, কারও জন্য মৃত্যু। কারও জন্য সুখ, কারও জন্য দুঃখ। হঠাৎ সুখ শব্দটি আমাকে দোলাতে থাকে। সুখ কি ধন দৌলত হলেই হয়! তেজগাঁর বস্তির এক মেয়েকে দেখেছি গায়ে ছেড়াঁ কাপড় পায়ে জুতো নেই, মায়ের চুলে বিলি কেটে কেটে উকুন আনছে আর খিলখিল করে হাসছে, রেললাইনের ধারে একটি মাটির চুলোয় শুকনো ডাল পাতা জ্বালিয়ে মেয়ের মা'টি ভাত ফুটোচ্ছে, মাও হাসছে। ওই সময়টিতে মা আর মেয়ে দুজনেই খুব সুখী ছিল। আর এখানে এই প্যারিসে ক্রিশ্চানের বাড়িতে তার অঢেল সম্পদের মালিক স্বামী টনিকে দেখেছি একটি একলা ঘরে বিষণ্ন বসে থাকতে, মোটেও মনে হয়নি তিনি খুব সুখে আছেন।

জ্যঁ শার্ল আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে যায় টেলিভিশনে। ওখানে আমার দেওয়া বাংলা সাক্ষাৎকারের ফরাসি অনুবাদ করার দায়িত্ব পেয়েছে সে। জিল হোটেলে খবর দিয়ে রেখেছে আমি যেন ফিরেই একবার তাকে ফোন করি। ফোন

হাতে নিয়ে বসে থাকি। ইচ্ছে করেই জিলের ফোন নম্বরটি আমি ভুলে যাই। ক্রিশ্চান ফোন করে, ‘উফ তোমাকে তো পাওয়াই যায় না সুন্দরী, করছ কি সারাদিন! বল, সেদিনের সেমিনার কেমন হল? নিশ্চয়ই খুব হাস্যকর! নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগেনি।’

আমি শান্ত গলায় বলেছি, আমার ভাল লেগেছে।

ডডবল কি?

ডডহ্যাঁ ভাল লেগেছে। আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না ওখানে। তবে যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, খুব ভাল মানুষ তারা।

ক্রিশ্চান হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ‘তুমি এখনও ভাল করে চেনোনি ওদের।’

আমি আর কথা বাড়াইনি। ক্রিশ্চানের আন্তরিক কণ্ঠ বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, বল, তোমার ডডকিছু লাগবে কি না বল।

ডডনা, আমার কিছু লাগবে না।

ডডকেন লাগবে না! যা কিছুই লাগে, আমাকে বলবে। আমি তোমার সেবায় নিয়োজিত। ভুলো না কিন্তু।

মিশেল ইডেল এলে মিশেলকে আমার হোটেলের ঘরে চলে আসতে বলি। ঘরে বসে দুজন খানিকক্ষণ গল্প করে ক্যাফে দ্য ফ্লোরএ যাই, ওখানে বসে দুদেশের মেয়েদের অবস্থা নিয়ে কথা বলি। কথা হয় ভোট নিয়ে। পঞ্চাশ বছর আগে ফ্রান্সের মেয়েরা ভোটের অধিকার পেয়েছে। মিশেল জানতে চান কবে আমাদের ওদিককার মেয়েরা পেয়েছে এই অধিকার। খুব সোজা, সাতচল্লিশ সালে ব্রিটিশ দূর হল ভারতবর্ষ থেকে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল, পুরুষ এবং নারী উভয়েই ভোটের অধিকার পেল। মিশেলের একটি কথায় আমি বিস্ময়ে দুমিনিট কথা বলতে পারি না। সুইৎজারল্যান্ডের মেয়েরা নাকি ভোটের অধিকার পেয়েছে উনিশশ একাত্তর সালে।

সে রাত আমার কাটে আন্তোয়ানেত ফুকের বাড়িতে। বিশাল বাড়ি। আন্তোয়ানেতের এক অনুসারী, তাঁরও মিশেল বলে নাম, আমার সাক্ষাৎকার নিলেন ভিডিওতে। আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। এত প্রশ্ন এত উত্তর আমার আর সইছিল না। বার বারই শেষ করতে চাইছিলাম, কিন্তু আন্তোয়ানেত ফুকের ইচ্ছে আমার যাবতীয় কথাবার্তা তিনি রেকর্ড করে রাখবেন। কিন্তু কেন? কাজে লাগবে। কি কাজে? তোমার ওপরই একটি তথ্যচিত্র করছি আমরা! আমার অস্বস্তি উত্তরোত্তর বাড়ে।

পরদিন। সকাল নটায় জিল এল হোটেলে। খবর পেয়ে গোসল করে শাদা একটি সার্ট আর বাদামী রঙের একটি প্যান্ট পরে ফুরফুরে মেজাজে নিচে যাই। চা নাস্তা নিয়ে দুজন বসি মুখোমুখি। জিল দাড়ি কামায়নি। আগের সেই কালো জিনস পরনে তার। অমল হাসি ঝলমল করে জিলের মুখে।

ডডকেমন আছ তসলিমা।

ডডভাল। তুমি?

ডডভাল। জিল হেসে ওঠে বলে।

কাল রাতে জিল বলেছিল আজ সে কাঁটায় কাঁটায় নটায় আসবে। নটার এক মিনিট দেরি হলে আমি নাকি বেরিয়ে যেতে পারি। মনে মনে বলেছিলাম, যাবোই তো। তোমার জন্য আমি কেন অপেক্ষা করব জিল?

ডডতোমাকে দুদিন সময় দিলাম জিল। যেন নাতালির সঙ্গে সময় কাটাতে পারো। যেন আমার চাকরি করতে না হয়।

ডডওহ না। তসলিমা কি বলছ তুমি! আমি সবসময় অপেক্ষা করেছিলাম তোমার ফোনের।

তুমি তো ফোন করনি!

ডডহ্যাঁ করেছি। তুমি নেই।

ডডসে তো আমি ইচ্ছে করেই নেই। যেন তুমি নাতালির সঙ্গে..

ডডকি বলছ তুমি!

ডডহ্যাঁ, সত্যি।

ডডনাতালির সঙ্গে, তুমি জানো, আমার কোনও গভীর সম্পর্ক নেই। ওর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতে, বিশ্বাস কর, আমার ভাল লাগে না। সময়ই কাটতে চায় না।

তবে কি আমার সঙ্গে ভাল লাগে? মনে মনে বলি তাহলে চলে এলে না কেন!

জিলের নীল দুটি চোখে চোখ রেখে বলি, তিনবার ফোন করেছো। এ কোনও ফোন করা হল? জিল হেসে বলে, 'ঠিক আছে যাও, প্রতি দশ মিনিট পর পর এখন থেকে ফোন করব। ঠিক আছে?'

আমি বুঝিনা জিলকে দেখলে কেন মনে হয় আমি খুব ভাল আছি। যেন সব ক্লান্তি কেটে গেছে, সব দুর্ভাবনা দূর হয়েছে। আমরা বসে থাকতে থাকতেই নাতালি এল। কাল সে ফোন করেছিল, আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলেছে। এই নাতালি জিলের প্রেমিকা নাতালি নয়। নাতালি বনফুরা প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শেখে। আমার খবর পেয়েছে শিশির ভট্টাচার্যের কাছে। শিশির বাংলাদেশের ছেলে, প্যারিসে কয়েক বছরের জন্য বাংলা পড়াতে এসেছেন। নাতালির কাছে খবর পেয়ে তার প্রায় লেজে লেজেই এসেছে নীলরতন, ভোলার ছেলে, প্যারিসে লেখাপড়া করছে। নাতালি মেয়েটি চমৎকার। আমার খুব ভাল লাগে ওকে। যেন ওর অনেকদিনের বন্ধু আমি। নাতালি সুন্দর বাংলা বলে, সুন্দর বাংলা লেখেও। জিল আমার বাংলা লেখা দেখে বলে, এ তো কোনও ভাষা নয়, এ হচ্ছে আর্ট। নাতালি হঠাৎ বলে আমাকে সে ফরাসি ভাষা শেখাবে।

ডডবাহ বেশ তো শেখাও।

ডডকি শিখতে চাও প্রথম?

ডডআমি তোমাকে ভালবাসি।

ডডজ তেম।

এক এক করে সে লিখল, কেমন আছ, ভাল আছি। কামা সাবা? সাবা। ধন্যবাদ। ম্যারসি। জিলকে বললাম, জিল, জ তেম।

জিলের চোখ মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উত্তরে সে ফরাসি ভাষায় কি বলল বুঝিনি। নাতালি লিখে যাচ্ছে আরও কিছু ফরাসি শব্দ। জিল বলল, 'আজ সারাদিন

কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব। আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া আজ তোমার চলবে না। চলবে না।' এর মধ্যেই জ্যঁ শার্ল এসে উপস্থিত। গতকাল তিনি ন ঘন্টা টেলিভিশনে কাটিয়েছেন আমার বাংলা অনুবাদ করতে। জিলকে বিগলিত হেসে কেলিয়ে বলে দি আমাকে নিয়ে তিনি অপেরায় গিয়েছিলেন।

জিল বলল, কি ব্যাপার তুমি তো বলনি তুমি যে অপেরায় গিয়েছিলে!

হেসে বলি, মনে ছিল না।

মনে ছিল না?

জিল হেসে ওঠে। শিশুর হাসির মত হাসি।

বারোটা বেজে গেল। সকালেই ক্রিশ্চান হোটেলে ফ্যাক্স পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে আমাকে তিনি সাড়ে বারোটায় এসে নিয়ে যাবেন, ফেরত দিয়ে যাবেন তিনটেয়। অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিশন থেকে পিটার নামের এক লোক চার পৃষ্ঠা লম্বা ফ্যাক্স পাঠিয়েছেন, কোত্থেকে যে এই লোক খবর পেলেন আমি কোথায় আছি, জানি না। জিলকে বলি ফ্যাক্সটি পড়ে শোনাতে, আমার পক্ষে অত লম্বা জিনিস পড়া সম্ভব নয়। জিল বাধ্য ছেলের মত শোনায়। ক্রিশ্চান এলে জিলকে সঙ্গে নিই। সোজা এডিশন স্টক, ক্রিশ্চানের প্রকাশনীতে। কি বিশাল প্রকাশনীর বাড়িটি। সকলে আমাকে দেখে বিষম উচ্ছ্বসিত। দু গাল যে কত বার কতজনের কাছে পেতে দিতে হল চুমু খেতে। অভ্যস্ত নই এসবে। কিন্তু ওদের অভ্যেসের কাছে আমার গালদুখানি বিসর্জন দিতে হয়।

রাতে এলিজাবেথ আসে। তার তথ্যচিত্রের ভিডিও ক্যাসেট দিল আমাকে, যা ও তৈরি করেছিল ঢাকায় গিয়ে। বলল, বাইশটি দেশ এই তথ্যচিত্রটি কিনে নিয়েছে। সুইৎজারল্যাণ্ড, ইতালি, স্পেন, ইংলেণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, আমেরিকা..। এলিজাবেথ ঢাকায় যেমন রহস্যে মোড়া ছিল, এবার আর তা নয়। বলল, ঢাকায় তার ঝামেলা হয়েছিল। তিরিশ জন পুলিশ তার পেছনে যখন সে শাখারিপট্টিতে পৌঁচেছে। কি করে তার যাবার খবর পুলিশ জানে, তা এখনও তার কাছে রহস্য। ফৈয়াজ নামে যে ছেলেটি তাকে বাংলা থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করে দিয়েছিল, এলিজাবেথ চলে আসার পরই তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, থানায় নিয়ে কয়েক হাজার প্রশ্ন করেছে। পুলিশের কারণে এলিজাবেথের আর শাখারিপট্টিতে ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। জিজ্ঞেস করলাম, বাইশটি দেশ তোমার এই ছবি কিনে নিল? আশ্চর্য!

ডডহ্যাঁ। ভীষণ পছন্দ করেছে ওরা। প্রচুর চিঠি আসছে আমার কাছে। ওরা তোমাকে সহমর্মিতা জানাতে চায়। তোমার ঠিকানা চাইছে ।

ডডআর যাবে না ঢাকায়?

এলিজাবেথ হেসে বলল, আমার জন্য ঢাকা যাওয়ার পথ বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে আর ঢুকতে দেবে বলে মনে হয় না।

এলিজাবেথ চলে যাবার সঙ্গে নাতালি এল, সঙ্গে নীলরতন আর শ্যামল চক্রবর্তী নামে একটি ছেলে। শ্যামল নীলরতনের বন্ধু। নীলরতন রান্না করে নিয়ে এসেছে। মুরগি, ফুলকপি আর বাসমতি চালের ভাত। নীল চামচ দিয়েছিল থালায়। সরিয়ে দিয়ে হাত ডুবিয়ে দিই ভাতে। কতদিন পর ভাতের স্বাদ পাওয়া! আহা। শ্যামল বার

বারই বলছে, দিদি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে সেই কতদিনের। কি যে ভাল লাগছে দিদি!

নাতালি এসে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে বাংলা গান শুনতে বসে গেছে। নাতালি, আপাদমস্তক ফরাসি মেয়ে, কি চমৎকার বাংলা বলে, বাংলা লেখে। বাংলা গানের পাগল। জিজ্ঞেস করি, এই তুমি শাড়ি পরতে পারো?

মাথা নেড়ে বলল, না।

ওকে একটা লাল শাড়ি দিলাম। নীলরতনকে শার্ট।

‘নিয়ে নাও। আমার লাগবে না।’ সে যে খুশি দুজন।

শ্যামল মেট্রোতে বাদাম বিক্রি করে। সে এখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে। জানেনা, ফরাসি সরকার তাকে আশ্রয় দেবে কি না। না দিলে তাকে দেশে চলে যেতে হবে। বাদাম বিক্রি করে দিনে একশ ফ্রাঁ জোটে তার।

ডডএখানে জিনিসের সে যে কি আগুনে দাম, এই টাকায় কি চলতে পারো!

ডডকষ্ট করে চলি দিদি।

শ্যামল বড় করুণ স্বরে বলতে থাকে, ডডএক ঘরে সাত আটজন গাদাগাদি করে থাকি। বাঙালিরা মেট্রো স্টেশনে বাদাম বিক্রি করে, কাপড় বিক্রি করে, ফুল ফল বিক্রি করে। এসব বিক্রি করা মেট্রোতে নিষিদ্ধ। পুলিশ প্রায়ই ধরে নিয়ে যায়। মারধোর করে।

খেতে খেতে শ্যামলের গল্প শুনি।

ডডপনেরো তারিখে আপনার ওপর একটা অনুষ্ঠান হয়েছে টেলিভিশনে। দু ঘন্টা আগে থেকেই বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল। বসে ছিলাম আপনাকে দেখব বলে। কী যে ভাল লেগেছে দিদি।

নীলরতন বলল, এখানকার কাগজে সেদিন পড়লাম ফ্রান্সের ইস্কুল কলেজগুলো আপনার ওপর একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান হচ্ছে। গর্বে বুক ভরে গেছে।

খাওয়া শেষ হলে আমরা সবাই মিলে বাইরে যাই। অনেকটা পথ রাতের প্যারিস জুড়ে হাঁটি। বাংলায় কথা বলতে বলতে হাঁটি। রাতে অস্ট্রেলিয়া টেলিভিশন থেকে ফোন, আমার ওপর একটি তথ্যচিত্র বানাতে ওরা বাংলাদেশে যেতে চায়। আমি রাজি কি না জানতে চাইছে। এসব কাণ্ড যত দেখছি, তত অবাক হই। আমি তো সেই আমিই! সেই অবকাশের আমি।

নাতালি রাতে থেকে যায় আমার ঘরে। অনেকটা রাত গল্প করে কাটায়। সকালে ঘুম ভেঙে যায় টেলিফোনের শব্দে। নিচে ফটোগ্রাফার অপেক্ষা করছে। গামা নয়ত সিগমা ফটোএজেন্সি থেকে এসেছে। বলে দিই যে নিচে যেতে পারব না, চাইলে ওপরে যেন চলে আসে। মেয়েটি আমার ঘরে চলে এসে পাগলের মত ছবি তুলতে থাকে। ছবি তোলা তখনও শেষ হয়নি, তুলুজ থেকে এলেন ক্যারোলিন ম্যাকোনজি। তখন চা খাচ্ছি। ফটোগ্রাফার অপেক্ষা করছে। ক্যারোলিন খুব কাছে মুখোমুখি বসে বললেন, ‘একটা উপন্যাস আমাকে ছাপতে দিন।’

‘উপন্যাস তো কিছু নেই বাকি। এডিশন স্টককে দিয়ে দিয়েছি।’

‘উপন্যাস যদি না দিতে পারেন, অন্তত একটা গল্পের বই দিন।’

‘কিছু তো নেই। গল্প যা আছে, তা স্টককে দেব বলে কথা তো দিয়ে ফেলেছি।’
‘কিন্তু আমরা যে চাইছি। সেই কতদিন থেকে আমরা ঢাকায় আপনার কাছে ফোন করছি, ফ্যাক্স করছি। কিছু একটা আমাদের দিতেই হবে তসলিমা। দয়া করুন আমাদের। আপনার লজ্জা বেরোবে সেপ্টেম্বরে। এই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আমাকে ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপি দিন। দিতেই হবে।’
না বলতে আমি পারি না। জানি না, না বলতে আমার কষ্ট হয় কেন। বড় করে একটি না বলে দেব, পারি না। কণ্ঠে স্বর ওঠে না। লজ্জা হয় না বলতে। কেমন যেন মায়া হয় মানুষটির জন্য। আমি খুব ভাল করেই জানি যে আমি এমন কিছু লিখিনি যা কি না ফরাসি ভাষায় প্রকাশ পেতে পারে। লজ্জা তো নয়ই। ক্রিশ্চান যখন আমার কাছে যা কিছুই এ পর্যন্ত লিখেছি সবই চেয়েছে, আমি সত্যিই লজ্জায় পড়েছি। আন্তোয়ানেত ফুক আর মিশেল ইডেল যখন চেয়ে মরেছে, লজ্জা আমার কম হয়নি। তবু বড় দ্বিধায় নির্বাচিত কলামটি দিয়েছি। যে স্বাধীনতার কথা বলেছি নির্বাচিত কলামে, সে স্বাধীনতা এখানকার মেয়েরা বহু আগেই পেয়ে গেছে। আমার নারীবাদ এদের কাছে নিতান্তই পুরোনো জিনিস। আর যে কটি লেখাই লিখেছি, সবই তো আমাদের দেশ আর সমাজ সম্পর্কিত, কতটুকুই বা ফরাসিরা অত দূর দেশের নিত্যদিনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত!   ক্যারোলিন কনট্রাক্ট ফরম নিয়ে এসেছেন। বলেছি, এখন সই করব না, আগে দেশে ফিরে দেখি আদৌ কোনও গল্প আমার কাছে আছে কি না। থাকলে কোন কোনটি আপনাকে পাঠানো যায়। ক্যারোলিন একটি প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমার জন্য। খুলে দেখি একটি ঘড়ি। বললেন, জ্যঁ শার্ল বলেছে, তোমার একটি ঘড়ি দরকার।
জ্যঁ শার্লকে আমি বলিনি, আমার ঘড়ি দরকার। নিশ্চয়ই সে লক্ষ করেছে যে আমার হাতে ঘড়ি নেই। প্যারিসের অনেক মেয়েই দেখেছি রঙিন ঘড়ি পরে। রঙিন ঘড়ি আমার পক্ষে পরা সম্ভব নয়, মনে মনে বলি, কেমন যেন বাচ্চা বাচ্চা লাগে। তখনও আমি জানি না সোয়াচ ঘড়ি, সে রঙিন হলেই কি, না হলেই কি, এর মূল্য অনেক। এদিকে ফটোগ্রাফারের মেশিনগান চলছে। ক্যাটক্যাটক্যাটক্যাটক্যাট। থামাথামি নেই। এত ছবি তুলে কি হবে গো? কি করবে এত ছবি!
নাতালি পরে বলেছে, বোঝো না কি করবে এসব ছবি? বিক্রি করবে।
বিক্রি? কোথায়?
ফ্রান্সের কাগজে। কেবল কি ফ্রান্সের! বিভিন্ন দেশের পত্রিকায়। কেবল কি পত্রিকায়! বইয়ের প্রকাশনী আছে, পোস্টার কোম্পানী আছে. টেলিভিশন আছে..।
এই ক্যাটক্যাট যেতে না যেতেই লা হিউমানিতের সাংবাদিক এলেন। লা হিউমানিতে বামপন্থীদের পত্রিকা। সাংবাদিকের সঙ্গে সমাজতন্ত্র বিষয়ে বিস্তর কথা হল। সমাজতন্ত্রে কেন আমি বিশ্বাস করি। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর আমি কি আশাবাদী, যদি আশাবাদী, কেন আশাবাদী। সাক্ষাৎকার যখন চলছিল, তখনই জিল এল। যেতে হবে রেডিওতে। নাতালিকেও সঙ্গে নিলাম। জ্যঁ শার্ল আগেই গিয়ে বসে আছে ওখানে। আমি আর সাংবাদিক মেয়েটি, যে আমার সাক্ষাৎকার নেবে, গিয়ে বসলাম একটি গোল টেবিলের ঘরে, টেবিল ঘিরে মাইক্রোফোন, কাচের দেয়ালের

ওপাশে একটি ঘর। ইংরেজিতে প্রশ্ন করা হবে, আমি বাংলায় উত্তর দেব, জ্যঁ শার্ল সঙ্গে সঙ্গে আমার বাংলা ফরাসিতে অনুবাদ করে দেবে। নাতালিও বসেছে একটি চেয়ারে। কাচের দেয়ালের ওপাশে ঘরটিতে রেকর্ডিং কন্ট্রোল হচ্ছে, ও ঘরটিতেই দাঁড়িয়ে আছে জিল। এক একটি প্রশ্নের উত্তর দিই আর জিলের দিকে তাকাই। জিল মিষ্টি করে হাসে। চোখ টিপে বাহবা জানায়। জিলকে আমার এত আপন মনে হয় যে ভুল করে তার সঙ্গে আমি প্রায়ই বাংলায় কথা বলে ফেলি। রেডিও থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে পিকাসো মিউজিয়ামে যাই। পিকাসো মিউজিয়াম দেখব এরকম একটি ইচ্ছে প্যারিসে নামার পর থেকেই ছিল। জিল বলল, বোধহয় বন্ধ, তবু চল। গিয়ে ঠিক ঠিকই দেখা গেল বন্ধ। প্যারিসের মিউজিয়ামগুলো কোনওটি সোমবার, কোনওটি মঙ্গলবার বন্ধ থাকে, এরকম নয় যে সপ্তাহের দুটোদিন শনি রবিবার মিউজিয়ামগুলোও বন্ধ থাকবে। হাঁটতে হাঁটতে কোথাও খাবো বলে একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকি। জিল বলল, এটা ইহুদিদের রেস্তোরাঁ, এদের খাবার খুব ভাল হয়। রেস্তোরাঁর চেহারাটি অন্যরকম। যেন ধ্বংসস্তূপ। অথবা কোনও গুহা। এরকম করেই বানানো হয়েছে। আমাদের দেশে যেমন বাড়িঘর রং করলে ভাবা হয় সুন্দর, এখানে কিন্তু সব সময় তা নয়। যত পুরোনো বাড়ি, যত প্রাচীন, মলিন, তত তার মর্যাদা বেশি। প্যারিসের বড় বাড়িগুলো সব পাথরে বানানো, কোনও রঙের প্রয়োজন হয় না, সেগুলোই প্যারিসের সৌন্দর্য। ইট সিমেন্টের বাড়িগুলোকে, উঁচু হোক, ঝকঝকে হোক, মোটেও সুন্দর বলে মনে করা হয় না। আমি আমাদের কথাই ভাবি, পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি বানানোর ধুম চলে। আমাদের অবকাশ খুব পুরোনো বাড়ি। বিশাল বিশাল দরজা জানালা, উঁচু সিলিং, দেয়ালের কারুকাজকে মোটেও ভাবা হয় না সুন্দর কিছু। অবকাশ ভেঙে নতুন ডিজাইনের বাড়ি করার ইচ্ছে বাড়ির প্রায় সবারই। তার ওপর সেই পুরোনো কাঠের কারুকাজ করা আসবাবপত্রগুলোকে পারলে ভেঙে খড়ি বানানোর ইচ্ছে সবার। সিংহের মুখ অলা খাটের পায়াগুলোকে পুরোনো পচা ভাবা হয়, তার চেয়ে কোনও পায়াহীন বাক্সের মত খাটগুলোকে মনে করা হয় সুন্দর, আধুনিক। আধুনিক আসবাবপত্র, বাড়িঘরের প্রতি ওখানে আকর্ষণ প্রচণ্ড। প্যারিসে ঠিক তার উল্টো। বিশাল ঝকঝকে তকতকে অত্যাধুনিক দোকানের জানালায় দেখেছি সাজানো আছে চটের বস্তা, পোড়া খড়ি, ভাঙা ইট, মরা ডাল। ওগুলোই এখানে সৌন্দর্য। এসব দেখে আমার একটি জিনিস মনে হয়, আধুনিকতার শীর্ষে উঠে এদের আর আধুনিকে আকর্ষণ নেই, আর প্রাচীনতম দেশগুলোয় পা পা করে যেখানে আধুনিকতা উঁকি দিচ্ছে, সেখানে মানুষ হুড়মুড় করে গিয়ে আঁকড়ে ধরছে সেটি। আধুনিকতা মানে কি? নিজের কাছেই প্রশ্ন করি। স্থাপত্যে, আসবাবে, পোশাকে নতুন ঢংএর নামই কি আধুনিকতা! মনের আধুনিকতাকে যদি সত্যিকার আধুনিকতা বলি, তবে ধনী দরিদ্র নতুন প্রাচীন সব দেশেই আছে সেই আধুনিকতা। দেশ বা সমাজ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা যারা পুরোনো মূল্যবোধ পেছনে ফেলে নতুন দিকে নতুন করে নতুন ভাবে নতুন সময়ের কথা ভাবছি, তাদের ভাবনাগুলো এক। আর যারা ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা, হিংস্রতা ইত্যাদি নিয়ে আছে, তাদের আচরণগুলোও এক।

ইহুদিদের খাবার খুব আলাদা স্বাদের। জিল বলে।
আমি বলি, তা কেন হবে? কোনও খাবারই ধর্মভিত্তিক নয়। এগুলো দেশভিত্তিক, এলাকা ভিত্তিক।
জিল সবেগে মাথা নেড়ে আমাকে অস্বীকার করে বলে, না, ইহুদিদের খাবার অন্যরকম।
ডকী বলছো আবোলতাবোল! কোনও খাবারকে তুমি বলতে পারো না এই খাবার ইহুদিদের, এই খাবার মুসলমানদের বা খ্রিস্টানদের। ফ্রান্সে যে ইহুদিরা হাজার বছর থেকে বাস করছে, তাদের খাবার ইহুদি-খাবার হবে কেন, হবে ফরাসি খাবার! বাংলাদেশের মুসলমানের খাবার আর ইরাকের মুসলমানের খাবার এক নয়। ভারতের খ্রিস্টানদের খাবার আর ইতালির খ্রিস্টানদের খাবার এক নয়। আরবের ইহুদি আর জার্মানির ইহুদির খাবারও এক নয়।
জিল বলে, এক।
এক হওয়ার তো কারণ নেই।
জিল আবারও বলে, এক। এক, কারণ সব দেশেই তাদের বিশেষ খাবারগুলো তারা এক রকম করে তৈরি করে।
না, আমি তোমার কথা মানতে পারলাম না।
না মানতে পারলে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু আমি যা বলছি, তা ঠিক। ইহুদিরা প্রতিটি দেশেই একরকম করে খাবার তৈরি করে।
আমি সজোরে মাথা নেড়ে বললাম, ধর্মের সঙ্গে খাবারের কোনও সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমি নিশ্চিত ভারতের ইহুদি আর ফ্রান্সের ইহুদি একরকম খাবার তৈরি করে না। ভারতের উত্তরাঞ্চলের হিন্দু আর দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দুদের খাবারই ভিন্ন। এসব নির্ভর করে এলাকার ওপর। নির্ভর করে সেই এলাকার সংস্কৃতির ওপর।
জিল তার মত ফেরায় না। আমিও না।
যে কটি খাবারের কথা বলা হয়েছে, এক এক করে সব আসে। সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু বেগুন আছে, তাও আবার বিস্বাদ। ঝাল। জিলের থালায় বড় একটি মরিচ সেদ্ধ। শাকপাতার ভেতর ভাত ভরে মুড়ে দিয়েছে। কি অদ্ভুত খাবার বাবা! আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হয় না। আমার থাল থেকে জিল খেল, আমি জিলের থেকে খানিকটা। ব্যাস।রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যখন হাঁটছি, হঠাৎ দেখি একটি রেস্তোরাঁর নাম ভলতেয়ার রেস্তোরাঁ, ভলতেয়ারের নামে রাস্তা।
এখানে কি ভলতেয়ার থাকতেন?
জিল বলে, না, সম্মান জানানো হচ্ছে।
জ্যঁ শার্ল বলে, তসলিমার নামেও একদিন প্যারিসে রাস্তা হবে।
হো হো করে হেসে উঠি।
মডার্ন আর্ট মিউজিয়ামটি বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে আস্ত একটি তেলের কারখানা। নানারকম নল দিয়ে বানানো মিউজিয়ামের দেয়ালটি। এলাকাটিতে লোকের ভিড়, কিছু না কিছু লেগেই আছে। নাতালি বলল এখানে নাকি বেশ কিছু

বাঙালি কাজ করে। পথে কোনও বাঙালি দেখলেই সে হেসে আমার দিকে তাকায়, কানে কানে বলে, দেখলে বাঙালি। কিছু বাঙালি দেখলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে চালের মধ্যে নাম লিখে লকেট বিক্রি করছে। অত ছোট চালের মধ্যে কি করে নাম লেখা যায়, তা আমার মাথায় ঢোকে না। মেট্রোয় রেল চড়া হল, কোনও বাদামঅলা বাঙালি চোখে পড়ল না। নাতালি বলল, গরম পড়ে গেছে, ওরা বাইরে চলে এসেছে।

একটি পার্কার কলম কেনার শখ হল হঠাৎ। ভীষণ দাম।

ডডজিল, আমাদের দেশেও পার্কার কলম পাওয়া যায়। কিন্তু এত দাম নয় তো ওগুলো!

ডডওগুলো নিশ্চয়ই আসল নয়, নকল। তাই দাম কম। তুমি প্যারিস থেকেই পার্কার কেনো। এগুলো আসল।

ডডপার্কারের গায়ে ঠিক এরকমই তো লেখা থাকে, কেন আসল হবে না আমাদের দেশেরগুলো?

জিল বলে, হয়ত নিবটা এত ভাল না, এগুলোর যেমন ভাল।

জিল তার মত পাল্টাবে না কিছুতেই। শেষ অবদি দাম দিয়েই একটি পার্কার কলম কেনা হয়। যে কোনও দাম দেখলেই আমি আট দিয়ে গুণ করে ফেলি। বইয়ের দোকানে ঢুকেও কিছু আর কেনা সম্ভব নয়। বিশাল একখানা বই ল্যুভরের ওপর। দামেও কুলোতে পারব না, ওজনেও না। তাই বাদ। আরও কিছুক্ষণ বইয়ের দোকানগুলোয় সময় কাটাবো, তার সময় নেই। টেলিভিশনে যেতে হবে, জিল তাড়া দিল।

ডডধ্যুৎ এত টেলিভিশন আমার ভাল লাগে না। হলই তো কত।

ডডএটিই শেষ। জিল মিনতি করে।

একপ্রশ্ন, এক উত্তর। আর ভাল লাগে না। লজ্জা কেন সরকার বাজেয়াপ্ত করল, ফতোয়া দিল কেন, আমার কেমন লেগেছে ফতোয়ার পর, কোনও সমর্থন আছে কি না দেশে, এসবই তো। ফরাসিরা তো শুনেছেই এসব, আর কত শুনবে! আমার ভাল লাগে না।

জিল বলে, বুঝি আমি। আমি যদি তুমি হতাম, আমারও এমন লাগত, যেমন লাগছে তোমার। কিন্তু ওরা এমন করে ধরেছে, এবারটিই শেষ, তোমাকে আর কষ্ট দেব না।

আমি শান্ত গলায় বলি, জিল, আমি সাধারণ একজন মানুষ। খুব সরল ভাষায় খুব সাধারণ জিনিস লিখি। আমাকে নিয়ে এত হৈ চৈ কেন! আমি তো ভেবেছিলাম স্ট্রাসবুর্গে অনুষ্ঠানটি করে ফিরে যাবো দেশে। মাঝখান থেকে প্যারিসটা দেখব। প্যারিস দেখারইচ্ছে আমার বহুদিনের। এইসব রেডিও টেলিভিশন এত না করে প্যারিসটা ঘুরে বেড়ালে ভাল লাগত। অথবা তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে।

জিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জিলও সম্ভবত বাঁধা তার এই সংগঠনের চাকরিতে। তারও কিছু করার নেই। আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্স আর আর্তে টেলিভিশন, এত খরচ করছে এরা আমার পেছনে, না হয়, যা অনুরোধ করছে,

মেনেই নিলাম কিছু। কালই তো চলে যাবো। হোটেলে পৌঁছে জিল বলল, তোমাকে তিন মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নাও।

জিলের কাছে আবদার করে দশ মিনিট সময় নিয়ে স্নান করে একটি বালুচরি শাড়ি পরলাম। গাঢ় খয়েরি রঙের। জিলের এই রংটি খুব পছন্দ। আগেই এই শাড়িটি দেখে বলেছিল, এটি তোমাকে একদিন পরতে হবে,অন্তত আমার জন্য। শাড়িটির আঁচলে একটি মেয়ে কলসি হাতে, একটি ছেলে ঘোড়া চালাচ্ছে এসব দেখে বলেছিল, প্রেমের গল্প বুঝি!

আমি নিচে নেমে এলে জিল শাড়ির আঁচলটি হাতে নিয়ে মিষ্টি করে হাসে। চোখদুটোও হাসে তার। টেলিভিশনে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড সব ব্যক্তিত্বের মহিলা। আমার খুব ভাল লাগে মেয়ে-সাংবাদিক আর মেয়ে-ফটোগ্রাফারদের দেখতে। আমাদের দেশে হাতে গোনা মেয়ে সাংবাদিকতার কাজ করে। করবেই বা কি! লেখাপড়া শেষ করতে না করতেই তো তাদের বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়, আর প্রভু স্বামীরা যা আদেশ করে মেয়েরা তো তাই মাথা নত করে পালন করে। পুরুষের পাশাপাশি বসে লেখালেখি করা, খবর যোগাড় করতে ছুটোছুটি করার কাজ মেয়েদের মানাবে না সিদ্ধান্তই নিয়ে নেওয়া হয়। যে মহিলাটি আমার সাক্ষাৎকার নেবেন, তিনি আমাকে বাংলায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ফরাসিরা ইংরেজি পছন্দ করে না। ইংরেজি জানলেও পারতপক্ষে বলতে চায় না। মাতৃভাষাটিই এদের কাছে পছন্দ। কথা বললে আমি আমার মাতৃভাষায় কথা বলব, অনুবাদক তারা যত খরচা হোক আনিয়ে নেবে, তবু আমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে দেবে না। ইংরেজি ভাষাটি ফরাসিরা মোটেও পছন্দ করে না। ইংরেজের সঙ্গে এদের দীর্ঘ দীর্ঘ কালের বিরোধ এর পেছনে কাজ করে সম্ভবত।

কাকে ডাকবে বাংলা থেকে ফরাসি অনুবাদের জন্য? জ্যঁ শার্ল দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছে, আসতে পারেনি। সাড়ে ছটায় এটি প্রচার হবে, সুতরাং এক্ষুনি লাগবে। অতএব নাতালি, তুমি পারবে? নাতালি ভয়ে নীল হয়ে, তার ওইটুকু বাংলা বিদ্যে নিয়ে মোটে ভরসা পায় না। অতএব আমাকেই বাংলায় বলে বাংলাটুকুর ইংরেজি অনুবাদ লিখে দিয়ে আসতে হয়, নাতালি ও থেকে ফরাসি করে নেবে। সে রয়ে যায় টিভিতে। হোবিয়া মিনা বলবেন আমাকে নিয়ে, আমার পরই।

জিল এবার আমাকে নিয়ে গেল, প্রায় দৌড়ে, শার্লস এ লিজের ফন্যাকে। ফন্যাককে সাহিত্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলা যায়। বই পত্র, গানের যন্ত্র, ক্যাসেট সিডি সব বিক্রি হয়, পাশাপাশি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হয়। প্রায়ই লেখকরা তাঁদের বই থেকে পড়েন। আন্তর্জাতিক প্রেস ফ্রিডম দিবস পালন হচ্ছে ফন্যাকে। বড় একটি প্রদর্শনী হচ্ছে। রিপোটার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্স এখানে আয়োজন করেছে আলোচনা সভার। জিল বলল, তোমার এখানে ইংরেজিতেই বলতে হবে মনে হচ্ছে। জ্যঁ শার্ল তো আসতে পারছে না। বাংলা থেকে ফরাসি করার কেউ নেই। আমার ইংরেজির যে হাল, পছন্দ মত কোনও শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না। রেডিও টিভিতে যা হোক ফরাসিতে তক্ষুনি তক্ষুনি অনুবাদ হয়ে যায় যা বলি। কিন্তু একেবারে দর্শক শ্রোতার সামনে! একটি চেয়ারও খালি নেই। ঘরটি পুরো ভরে গেছে। ফরাসিরা ভাল ইংরেজি জানে

না, এটিই আমার ভরসা। এরকম যখন ভাবছি, তখনই দেখি এক ঝাঁক বাঙালি। ঝাঁকের মধ্যে নীলরতন, পার্থপ্রতিম মজুমদার। পার্থ বাংলাদেশের ছেলে, মূকাভিনয়ে পাকা। ঢাকায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখনই আলাপ। পার্থর সঙ্গে প্যারিসের অভ্যেসে হাত মেলালাম।

ডডএকজন বাঙালি খুঁজছিলাম, আপনাকে পাওয়া গেল।

বাঙালিরা ততক্ষণে আমাকে ঘিরে ধরেছে, কবে এসেছি, কোথায় উঠেছি, কতদিন থাকব, ইত্যাদি হাজার রকম প্রশ্ন। উচ্ছ্বসিত সব।

পার্থপ্রতিম, যেন আমার হাজার বছরের বন্ধু, বারবারই বলতে লাগলেন, 'কেন আমাদের খবর দাওনি যেদিন এলে? সেদিনই ফোন করে দেওয়া যেত না! আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে পারতাম!' পার্থর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক বললেন, 'চলুন আমাদের বাড়িতে যাবেন আজকে, একবেলা অন্তত খাবেন।' কালই চলে যাবো শুনে ইস ইস আহা আহা করে ওঠে সবাই। কেন আগে থেকে ওরা জানল না, কোথায় আছি আমি। তাহলে তো আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারতেন। আগে জানলে আমরা তো একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারতাম। এখানে বাঙালিদের ছোটখাটো সংগঠন আছে, সব সংগঠনের পরিচালকরাই চুক চুক করে দুঃখ করছেন। সকলকেই আমার বিনীত স্বরে জানাতে হল, এখন তো আর সময় নেই ভাই। কালই চলে যাবো। কেন আর কটা দিন থাকছি না। এভাবে প্যারিসে এসে তাদের বাড়িতে না গিয়ে দুটো বাঙালি খাবার না খেয়ে বিদায় নেব, এ কেমন কথা হল!

গল্প করলে চলবে না, মঞ্চে বক্তারা বসে গেছেন। আমাকে ডাকা হচ্ছে। মঞ্চে আমাকে নিয়ে বসালেন রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্সের সভানেত্রী, অনুষ্ঠানের উপস্থাপক-পরিচালক। সভানেত্রীর বাঁ পাশে বসনিয়ার সাংবাদিক, ডান পাশে আমি, আমার পাশে ক্যামেরুন, ক্যামেরুনের ডানে আলজেরিয়া। ফ্রান্সের লোকেরা আফ্রিকার খবর খুব ভাল রাখে। আলজেরিয়া তো বলতে গেলে ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বসনিয়ার খবরও বেশ রাখে। কেবল ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহ খুব নেই। জানেও না খুব বেশি কিছু।

এক এক করে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সাংবাদিকরা। সকলেই ফরাসি ভাষায় বলছেন। আমাকেই কেবল ইংরেজিতে বলতে হবে। ইংরেজি থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করে দেবে কেন। যেহেতু এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদ করতেই হবে, তখন বাংলা থেকেই নয় কেন। বাঙালির দলটির দিকে যেই না প্রস্তাবটি দেওয়া হল, প্রীতি সান্ন্যাল নামের এক বাঙালি মহিলা মঞ্চে এলেন আমার অনুবাদ করতে। একটি উত্তরের অনুবাদ করে তিনি দর্শকের আসনে বসা কাউকে দেখে আমার চেয়ে ভাল অনুবাদক একজনকে দিচ্ছি বলে নিজে কেটে পড়ে যাঁকে পাঠালেন, তিনি অমিতাভ চক্রবর্তী। প্রীতি সান্ন্যালের নিজের ওপর আস্থা কিছুটা কম। জিল দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ার একটিও খালি নেই যে বসবে। বার বার তার দিকে আমার চোখ চলে যায়। জিলের চেয়ে সুদর্শন আর কোনও ফরাসিকে কি আমি এ অবদি দেখেছি! নাহ! দেখিনি। জিল গলগল করে ফরাসিতে কথা বলে, শুনতে বেশ লাগে। তার ইংরেজি

বলাও বেশ মজার, বেশির ভাগ বাক্যই সে শুরু করে আই অ্যাম গোয়িং দিয়ে। আই অ্যাম গোয়িং টু কাম টু ইয়োর হোটেল, আই অ্যাম গোয়িং টু গো টু নাতালিস হাউস, আই অ্যাম গোয়িং টু বাই এ টিকেট এরকম। হঠাৎ নাতালিকে দেখি, নীলরতনকেও। নীলরতন আমার দেওয়া শার্টটি পরে এসেছে। অমিতাভ চক্রবর্তী অনর্গল আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে যাচ্ছেন মঞ্চের বক্তারা কে কি বলছেন। বক্তাদের বক্তব্য শেষ হলে দর্শকদের মধ্য থেকে প্রশ্ন শুরু হল। মূলত ফরাসি-ভিড় থেকে প্রশ্ন। একজন জার্মান ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, ইউরোপ থেকে তাঁরা কি করে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আমি বললাম, দেশ ও বিদেশের যুক্তিবাদী বিবেকবান সচেতন মানুষের সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে পাসপোর্ট পাওয়া সম্ভব হত না। পশ্চিমের দেশগুলো যে দেশগুলো বাক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারে বিশ্বাস করে, অনেকে আমার পাসপোর্ট ফেরত দেবার জন্য, আমার নিরাপত্তার জন্য, লজ্জা বইটির ওপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার জন্য প্রচুর চিঠি লিখেছেন। তাদের আন্দোলনের ফলেই আমি আমার পাসপোর্ট ফেরত পেয়েছি। আপনাদের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। হয়ত একদিন আমি নিরাপত্তা পাবো দেশে। হয়ত লজ্জা বইটির ওপরও আর নিষেধাজ্ঞা থাকবে না।

একসময় দেখি লাল একটি জামা পরে নাতালি ঢুকছে, জিলের নাতালি। নাতালি ঢুকেই জিলকে নিয়ে দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। জিল কি এখন নাতালির সঙ্গে চলে যাচ্ছে কোথাও! আমার মন খারাপ হয়ে যায়। জিল, তুমি তো বলেছো নাতালির সঙ্গে তোমার গভীর কোনও প্রেম নেই! তবে যাচ্ছো কোথায়!

মিশেল ইডেলের সংগঠনের মেয়ে তেরেসকে দেখি । মিশেল ফোন করেছিলেন হোটেলে, আমাকে নিতে আসবেন সন্ধ্যা সাতটায়। আন্তোয়ানেত ফুকের বাড়িতে নেমন্তন্ন। জিল উদয় হয়। মন ভাল হয়ে যায়। হোবিয়া মিনার হাসি-মুখটিও পলকের জন্য চোখে পড়ে। লোকটি আমার ছায়া মাড়ান না। ভাষার অসুবিধের জন্য এই দূরত্ব তিনি নিজেই তৈরি করেছেন। ইচ্ছে করে ফরাসি ভাষাটি শিখে নিতে, কিন্তু কি করে সম্ভব! নাতালির সঙ্গে চেষ্টা করে দেখেছি, হয় না। জিভকে গোল করে পেঁচিয়ে গলার তল থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ওরা বের করে, ওরকম শব্দ শত চেষ্টা করলেও আমার গলা থেকে বেরোবে বলে মনে হয় না। অনুষ্ঠান শেষ হতেই আমাকে ঘিরে ধরলো অনেকে। জার্মানি থেকে এসেছেন এক নারী সংগঠনের নেত্রী। তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জার্মানির অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার।

আমি বলে দিই, দেশে গিয়ে জানাবো আপনাকে। এখনই কথা দিতে পারছি না।

অনুষ্ঠানের ফরাসি দর্শকরা আমার কাছে ভিড় করেন অটোগ্রাফ পেতে।

আপনার বই কবে বেরোবে?

সম্ভবত সেপ্টেম্বরে।

আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি আপনার বই পড়ব বলে।

আমি বিষণ্ন হাসি। আমার দিকে বড় মায়ায় তাকিয়ে একটি মেয়ে বলল, আপনি কি ফ্রান্সেই থাকবেন এখন থেকে?

না, আমি কাল দেশে ফিরে যাচ্ছি।

দেশে কেন ফিরবেন? ওখানে যদি আপনাকে মেরে ফেলে!

আমি দেশে ফিরছি শুনে আরও পাঁচ ছজন ফরাসি মেয়ে বিস্ময়ের ঘোরে বলতে থাকে, না না না দেশে ফিরবেন না। দেশে আপনি কি করে বেঁচে থাকবেন ফতোয়া নিয়ে! এমন একটা ফতোয়া দিয়ে দিল, আর আপনি ফেরার কথা ভাবছেন, কি করে ভাবছেন!

তাই বলে নিজের দেশ ছাড়ব! অসম্ভব।

আপনার বুঝি প্রাণের মায়া নেই? যে করেই হোক বেঁচে থাকতে হবে তো। বেঁচে না থাকলে লিখবেন কি করে!

মানুষগুলোর চোখের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মায়া মমতাগুলো আমি অনুবাদ করে নিই।

এরপর যে কজন বাঙালি এসেছিলেন অনুষ্ঠানে, আবার ঘিরে ধরলেন আমাকে। চলুন আমাদের বাড়ি চলুন।

আজ তো পারছি না ভাই। রাতে নেমন্তন্ন আছে।

তবে কাল!

কাল চলে যাবো।

আমরা কি কিছুই করতে পারবো না আপনার জন্য?

এবার তো হল না। পরের বার এলে নিশ্চয়ই যাবো আপনাদের বাড়িতে।

পার্থ প্রতিম পরিচয় করিয়ে দিলেন শিশির ভট্টাচার্যের সঙ্গে। শিশির কালো মত খাটো মত বাচ্চা বাচ্চা চেহারার এক লোক। শিশিরকে বললাম, শুনেছি ভাল অনুবাদ করেন, আপনার কথা আমি আমার প্রকাশককে বলব, এখানকার ফরাসিদের বাংলায় আমার খুব একটা আস্থা নেই।

সকলেই খুশি হল যে বাঙালিদের কাউকে দিয়েই অনুবাদের কাজ হবে বলে। খানিক পর পার্থ আমাকে খানিকটা দূরে সরিয়ে প্রলয় রায় নামের এক লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, প্রলয় রায় চট্টগ্রামের ছেলে। বহুদিন থেকে আছেন এদেশে। প্রলয় বেশ ভাল অনুবাদ করতে পারবে। কিছু অনুবাদও করেছে। তুলনা হয় না। কোনও বাঙালিই ওর মত ভাল ফরাসি লিখতে পারে না।

প্রলয় আর শিশির দুজনের নম্বরই পার্থর কাছ থেকে নিলাম। জ্যঁ শার্ল এর বাংলায় আমি মোটেও সন্তুষ্ট নই। প্রলয়ের নামই না হয় ক্রিশ্চান বেসের কাছে প্রস্তাব করব, ভাবি মনে মনে। এক জাপানি দাঁড়িয়ে ছিল হাঁ করে। কাছে এসে বললেন, জাপান থেকে তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। আমি যেন কী একটা বিশাল কিছু হয়ে গেছি। কিন্তু আমি কি হয়েছি কিছু? খুব ভাল জানি যে আমি কিছুই হইনি। যে আমি, সে আমিই আছি, অবকাশের আমি, গোবেচারা আমি, খানিকটা বোকা বুদ্ধু, খানিকটা আদর্শ মানা, খানিকটা স্রোতে গা ভাসানো, কিছু বোঝা, কিছু না বোঝা মেয়ে।

জিলের সঙ্গে বাকিটা সময় কাটানো সম্ভব হয়নি। মিশেল ইডেল আর আন্তোয়ানেত ফুকের সঙ্গে মধ্যরাত অবদি কাটাতে হয়।

এপ্রিলের চার তারিখ। আমার চলে যাবার দিন। এয়ারফ্রান্সে প্যারিস থেকে ব্যাংকক, থাই এয়ারলাইন্সে ব্যাংকক থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানে কলকাতা, কলকাতায় কদিন কাটিয়ে আবার ঢাকা। যারা আমাকে প্যারিসে এনেছেন, তাদের আজ প্যারিসের দিকে হাত নেড়ে আমার বলতে হবে, প্রিয় প্যারিস, তোমাকে বিদায়, প্রিয় প্যারিস, জ তেম। ক্রিশ্চান বেস আমার যাবার খবর শুনে হোটেলে চলে এলেন। সই করার জন্য কন্ট্রাক্ট ফরম এনেছেন ক্রিশ্চান। সই করার পর বললেন, পৌঁছেই যেন তাঁকে কোরানের নারী যে বইটি মাত্র লিখে শেষ করেছি, পাঠিয়ে দিই। নাতালি আমার কাপড় চোপড় সুটকেসে ভরে দিচ্ছে। অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল, হল না। সময়ের অভাবে হল না। ক্রিশ্চান বেস কে পই পই করে বলে দিয়েছি, আমার লেখা কোনও ফরাসি জানে এমন বাঙালিকে দিয়ে অনুবাদ করাবেন। ক্রিশ্চান কথা দিয়েছেন যে তিনি তাই করবেন, তবে লজ্জার অনুবাদ জ্যঁ শার্ল প্রায় শেষ করে এনেছেন, এটি নতুন করে অনুবাদ করার সম্ভবত প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই, এ কথা আমি ঠিক মেনে নিই না।

প্যারিস ছেড়ে চলে যাবো, ভাবতেই বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। জানি না আর কখনও আসা হবে কী না প্যারিসে, হয়ত কোনওদিনই আর হবে না। অথবা হলেও এত ভালবাসা এত আদর হয়ত পাবো না।

ক্রিশ্চান বললেন, কাল তোমার আর্তে অনুষ্ঠান দেখলাম। কে ছিল তোমার অনুবাদক?

ডড না। ওরাই যোগাড় করে নিয়েছিল। তবে শুনেছি যে মেয়েটি অনুবাদ করেছে, ওর বাবা ফরাসি, আর মা বাঙালি। খুব ভাল বাংলা যে বলতে পারে তা নয়। শক্ত শক্ত শব্দ বুঝতে পারে বলে মনে হয়নি।

ক্রিশ্চান বলল, তোমার আসলে ইংরেজিতে বলা উচিত।

আমার ইংরেজির যে হাল! কোনওরকম কাজ চালাই। এ দিয়ে কোনও সাক্ষাৎকার চলে না। ওরাই বলে আমাকে বাংলায় বলতে।

ডডকী বল তোমার ইংরেজির হাল খারাপ। সেদিন দুপুরে নোভেল অবজারভেটরের জ্যঁ দানিয়েলের সঙ্গে বেশ গুছিয়ে তো বললে। তোমার লেখালেখি, তোমার সংগ্রাম। সময় পেলে তুমি বেশ সুন্দর বলতে পারো। এখন থেকে সিদ্ধান্ত নাও তুমি ইংরেজিতে দেবে যে কোনও সাক্ষাৎকার।

ডডদেখ, আমাদের দেশে ইংরেজি চর্চা একেবারেই নেই। মুখে বলতে গেলে দেখি অভ্যেস না থাকায় শব্দ খুঁজতে হয়।

ডডতোমার বক্তব্য যেন সব জায়গায়, যেখানেই কথা বলছ, স্পষ্ট হয়, সে কারণেই বলছি। কারণ অনুবাদক, ধরো হঠাৎ করে একজন অনুবাদক পেলে, তোমার চিন্তাচেতনাবিশ্বাস সম্পর্কে যার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই, সে তোমাকে, তুমি যাই বল, ভাল বুঝতে পারবে না। অনুবাদও করতে পারবে না।

ক্রিশ্চান গম্ভীর হয়ে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন আমাকে। তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি যেমন ভাল, তাঁর সহমর্মিতাও দেখার মত। সুটকেস গোছাতে গোছাতেই কথা বলছিলাম ক্রিশ্চানের সঙ্গে।

হঠাৎ পার্কার কলমটি খুঁজে পাচ্ছি না। ক্রিশ্চান ঢুকে গেল তাঁর ওই মিনিস্কার্ট পরা শরীর নিয়ে খাটের তলে, নাতালি আতি পাতি করে খুঁজছে, আর চুক চুক করে দুঃখ করছে, ক্রিশ্চান খুঁজছে আর বলছে, কি রকম রং বল, আমি দৌড়ে দোকানে গিয়ে এক্ষুনি কিনে নিয়ে আসছি। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। শেষ অবদি পাওয়া গেল কলম যে শার্টটি পরা ছিলাম, তার পকেটে।

আবারও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের কথা ওঠালেন ক্রিশ্চান। বললেন, তোমার বিশ্বাস আর আদর্শ সম্পর্কে আমি জানি। কিন্তু আর্তের অনুষ্ঠানে তোমার বক্তব্য খুব বলিষ্ঠ মনে হয়নি। আরেকটি কথা, তুমি যখন মৌলবাদিদের বাকস্বাধীনতা বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব কর, এর পেছনে তুমি কোনও ভাল যুক্তি দেখাতে পারো না।

আমি বললাম, কেন, আমি তো বলেইছি যে মৌলবাদীরা সমাজকে পেছন দিকে টানছে। নারী পুরুষের সমান অধিকার মানে না তারা। মেয়েদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছে, ওদের পুড়িয়ে মারছে, পাথর ছুঁড়ে মারছে। মুক্ত বুদ্ধির যে কোনও মানুষের ওপর হুমকি আসছে। ধনী আরব দেশগুলো থেকে টাকা আসে তাদের কাছে, হাতে তাদের অস্ত্র। মাদ্রাসা গড়ে উঠছে প্রচুর, আর মাদ্রাসা থেকে প্রতিবছর বেরোচ্ছে অগুনতি মৌলবাদী। এরা দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই করছে না। একসময় আমাদের দেশে তো ছিলই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ। সেরকম তো আবার হতে পারে!

ক্রিশ্চান, মনে হয়নি, আমার যুক্তিতে তুষ্ট। কাটিয়ে নিয়ে বললেন, অনুবাদক যেভাবে বলেছে, তাতে যুক্তিটি বলিষ্ঠ হয়নি।

আমি বুঝি যে ক্রিশ্চান গণতন্ত্রের কথা ভাবছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সকলের অধিকার থাকা উচিত রাজনীতি করার। এটা নিষিদ্ধ ওটা নিষিদ্ধ এসব শুনলে ইউরোপের মানুষ পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়নের চিত্র কল্পনা করে শিউরে ওঠে। সোভিয়েতের ভয় সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পরও যায়নি। কিন্তু মৌলবাদীরা যদি গণতন্ত্র ব্যবহার করে ক্ষমতায় এসে যায় কোনও দিন, তবে তো প্রথম যে কাজটি করবে তা হল কবর দেবে গণতন্ত্রের, কবর হয়ে যাবে মুক্তচিন্তার, বাক্ স্বাধীনতার। নির্বাচনে জেতা খুব কি কঠিন হবে ওদের জন্য! ধর্মকে ব্যবহার করছে যাচ্ছেতাই ভাবে। অশিক্ষিত অজ্ঞ মূর্খ মানুষগুলো আল্লাহ খোদার মান রক্ষা করতে গিয়ে এদের দলে যোগ দিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ক্ষমতায় না এসেই সরকারের আশকারা পেয়ে মৌলবাদ বিরোধী নেতাদের গলা কাটতে দ্বিধা করছে না। এরকম তো নয় যে তারা কোনও আলোচনায় যেতে চায়। আমি কলম ব্যবহার করেছি আমার মৌলবাদ বিরোধী লড়াইয়ে, মৌলবাদীরা কি আমার যুক্তি কলম ব্যবহার করে খণ্ডাতে চায়? না, তা চায় না। তারা তলোয়ার নিয়ে পথে নামে। কোমরে তাদের রাম দা। ক্রিশ্চান যদি মনে করেন গণতন্ত্র মানেই হল যে কোনও আদর্শ নিয়েই রাজনীতি করার অবাধ অধিকার, তবে ইউরোপের অনেক দেশেই তো নাৎসি রাজনীতি নিষিদ্ধ। এমনকী

রাস্তায় সোয়াস্তিকার চিহ্ন নিয়ে দাঁড়ালে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তবে? এখানে গণতন্ত্র কোথায় গেল। আর গণতন্ত্রই যদি এত সবকিছুর উর্ধ্বে, তবে হিটলারের নাৎসি দল তো বিপুল ভোটেই জিতেছিল জার্মানির নির্বাচনে!হিটলার তো ক্যু করে ক্ষমতায় আসেনি।

ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরাই। নাতালি ধমকে বলল, সিগারেট রাখো, খেতে হবে না।

ডডএই শেষ।

ডডনা, ফেলে দাও। খেও না।

নাতালির চোখে আদর, শাসন।

নীলাঞ্জনা সুন্দরীটি এত আপন হয়ে উঠছে কেন আমার! তাঁর নীল চোখে আমার জন্য ভালবাসা স্থির হয়ে আছে। কেন নাতালি আমাকে ভালবাসে! আমি বাঙালি বলে, যেহেতু সে বাংলা শিখেছে? নাকি আমার কথা পত্রিকায় ছাপা হয় বলে, আমাকে রেডিও টেলিভিশনে ডাকে বলে সে ভেবেছে আমি বিখ্যাত মানুষ, তাই? নাকি আমার ওপর ফতোয়া জারি হয়েছে বলে করুণায়? নাকি আমার কিছু পদ্যের ফরাসি অনুবাদ পড়ে তার ভাল লেগেছে বলে? কোনটি? আমি অনুমান করার চেষ্টা করি। স্থির হতে পারি না কোনও একটি কারণে। এর মধ্যে জিল চলে এসেছে, সেও গুছিয়ে নিয়ে এসেছে তার ব্যাগ। আজ সে চলে যাচ্ছে মপোঁলিও।

নাতালিকে বলি, প্যারিসের শেষ সিগারেট আমাকে খেতে দাও।

নাতালি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, না।

নাতালিকে যত দেখি, অবাক হই। বাংলায় কবিতা লেখার ইচ্ছে তার। জিলকে বলেছিলাম নাতালি বেশ ভাল বাংলা বলে। জিল বলেছিল, তবে নিশ্চয়ই ওই নীলরতনের প্রেমে পড়েছে সে, প্রেমে পড়লেই ভাষা শেখার আগ্রহ হয়, প্রেমিকের সঙ্গে বাংলা চর্চা করছে বলেই ভাল বাংলা বলছে। অবশ্য নাতালির বেলায় তা হয়নি। ও বলেছে সেদিনই নীলরতনকে প্রথম দেখেছে। নাতালি বাংলাকে ভালবেসেই বাংলা শিখেছে, বাঙালি ছেলের প্রেমে পড়ে নয়। নীলরতনের জন্য মায়া হয়, আমাকে বড় কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, ‘দিদি আমাকে তো তাড়িয়ে দেবে এ দেশ থেকে, লেখাপড়া শেষ, পাশ করে বেরোচ্ছি আর দু মাস পর, এখন তো আর থাকার উপায় নেই। আপনি যদি চেষ্টা করেন, তাহলে আমার হয়ত থাকা হবে এখানে। কারণ দেশে যে ফিরে যাবো, দেশে গিয়ে কি করব? ওখানে তো চাকরি নেই, কিছু নেই।’ নীলকে বলেছি, কিন্তু আমি কি করে চেষ্টা করব, কোথায় কার কাছে কি বলব? নীলরতন চুপ করে ছিল। কতটা অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনা থেকে আমাকে অনুরোধ করেছে সে, বুঝি! জিলকে বলেছি যদি সম্ভব হয় নীলরতনকে যেন সাহায্য করে। জানিনা জিলের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে কি না। হবে না হয়ত। নীলরতন কেন প্যারিসেই থেকে যেতে চায়! আমি নীলরতন হলে দেশে ফিরে যেতে চাইতাম। নিজের দেশের জন্য যা হোক কিছু ভাল করতে চাইতাম। কিন্তু আবারও ভাবি, দেশের জন্য চাইলেই কি কিছু করা সম্ভব! নীলরতন যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার জন্য আবেদন করে, তবে কি খুব সহজে সে শিক্ষকের চাকরিটি

পাবে? হিন্দু হওয়ার অপরাধে তাকে কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে না! হবে! মুসলমান নামের মানুষেরা যে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে না, তা নয়। আসলে ক্ষমতাসীনদের পেয়ারের লোক না হলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়ই কোনও না কোনওভাবে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ, এই যে বলি এত, বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলি, আসলেই কি এটি কোনও গণতন্ত্র। ভোটের বাজারে কিছু টাকা খাটিয়েই গরিবের ভোট যদি কেনা যায়, তবে তাকে গণতন্ত্র বলি কি করে! সত্যিকার গণতন্ত্র কোনওদিন আমরা পাবো না যতদিন না দারিদ্র্য মোচন হচ্ছে, যতদিন না শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, যতদিন না সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সচেতনতা আসছে। ততদিন পর্যন্ত কি? গণতন্ত্রের চর্চা তো চলতেই হবে নাকি কোনও একনায়ক বা একনায়িকার শাসন চাও? প্রশ্নটি ক্রিশ্চান হয়ে আমি আমাকে করি। আপাতত নিশ্চুপ থাকি আমি। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ মৌলবাদ এসবের মধ্যে মানবাধিকার বাক্ স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা এক চিমটি করে করে দিতে থাকি আর ভাবতে থাকি। আমার ভাবনার সুতো হারিয়ে যায় নাতালির সুরে।

--*আমি ঢাকায় যাবো আগস্টে।*

--*হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবে। আমার বাড়িতে থাকবে।*

--*আমার জন্য কিছু কবিতা পড়ে দেবে? আমি ক্যাসেটে তুলে রাখব।*

নাতালি মহাখুশিতে আমার পড়া বাংলা কবিতাগুলো তুলে নেয়। নারীদ্রব্য কবিতাটি তার খুব ভাল লাগে বার বার বলল। এরপর আমার হাতদুটো ধরে সে বলল, *আমার জন্য তো অনেক করলে, এবার একটি জিনিস করতে পারো আমার জন্য?*

--*নিশ্চয়ই করব। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। বল কি চাই?*

--*আমার জন্য তুমি সিগারেট ছাড়ো।*

আমি হেসে উঠি। বলি, *আমি তো ভাই ধরিনি সিগারেট যে সিগারেট ছাড়ব! এ আমার শখের খাওয়া।*

জিল আমার ভারি সুটকেসটি নিয়ে নিচে নেমে যায়। আমিও নিচে নেমে আনমনে একটি সিগারেট ধরাই। নাতালি আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, *সিগারেট খেলে কি হয় জানো?*

শান্ত কণ্ঠে বলি, *জানি। ক্যান্সার।*

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে শুদ্ধ বাংলায় বলল, *আমার বাবা আকাশে থাকে। কেন জানো?*

সিগারেটের কারণে?

হ্যাঁ। কি হয়েছিল বল তো!

ব্রংকোজেনিক কারসিনোমা। সে জানি।

জানো?

হেসে বলি, *হ্যাঁ।*

তারপরও খাও?

আমি ম্লান হাসি।

নাতালি তার *জ সুই লিব্রে* লেখা ব্রোজটি তার জামা থেকে খুলে আমার শার্টে লাগিয়ে দেয়।

চিঠি লিখবে তো!

হ্যাঁ লিখব।

নাতালির চোখ ছলছল করে।

জিল বলে, নাতালি তো আছেই তোমার সঙ্গে। তুমি না হয় এয়ারপোর্টে ওর সঙ্গে চলে যাও। আমি যাবো অন্য এয়ারপোর্টে, অরলিতে।

হেই জিল, আজ শেষ দিন, আজও পালাতে চাও!

নাতালি বলল, ও আসলে নাতালির সঙ্গে সময় কাটাতে চায়।

ঠিক বলেছো।

জিল ধমকে ওঠে, *পাগল হয়েছো। আমি ওর বাড়িতে যাবো না। আমি তো অরলিতে যাবো।*

তিনজন আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসি। জিল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, *কাল রাতে খুব ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে কাটাই। কিন্তু তুমি তো চলে গেলে ওদের সঙ্গে।*

--*তুমিও যেতে পারতে।*

--*আমাকে নেমন্তন্ন করেনি, আমি যাবো কেন!*

--*তাতে কি!*

--*নাহ, তোমাদের ব্যবসায়িক কথাবার্তায় আমাকে মানাতো না।*

-- *মোটেও ব্যবসায়িক কথাবার্তা ছিল না। ছিল নারীবাদী আলোচনা।*

অনেকটা পথ গিয়ে নাতালি বলল, *বিমান বন্দরে গিয়ে কী লাভ। আমার খুব খারাপ লাগে প্রিয়জনদের চলে যাওয়া দেখতে। আমাকে বরং এখানে নামিয়ে দাও। আমি সরবনে যাবো, দুদিন ক্লাস করি না।*

নাতালি নেমে গেলে আমরা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বিমানবন্দরে যাওয়ার বাসে উঠে পড়ি। প্যারিসে মেট্রো চড়া হল, বাস চড়া হবে না কেন! তাই বাস চড়ার আবদার আমার। বাসটি সোজা বিমানবন্দর যাবে। বাসে দুজন পাশাপাশি বসি। জিল বলে, *তুমি যখন বন্ধুবেষ্টিত থাকো, আমার তখন তোমার সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে না। তুমি যখন একা থাকো, তখন আমার ভাল লাগে, দুজন বসে গল্প করতেই তো ভাল।*

--*কবে তুমি প্যারিসে আসবে জিল?*

-- *জুলাইয়ের শেষ দিকে। তখন একটি বাড়ি ভাড়া নেব প্যারিসে।*

-- *বাড়ি ভাড়া কেন? নাতালির বাড়িতেই তো থাকতে পারবে।*

--*আরে না। তোমাকে তো বলেছি যে নাতালির সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে।*

--*যাহ আমার বিশ্বাস হয় না। কেন শেষ হবে সম্পর্ক! খুব চমৎকার মেয়ে নাতালি।*

--*কেন তোমার বিশ্বাস হয় না? আমি কি মিথ্যে বলছি? নাতালিকে আমি ভালবাসি না।*

জিল আজ আমার ঘরে ঢুকতেই বলেছিলাম, জিল কাল নাতালিকে আমি বলেছি জিলের সঙ্গে আমার একটি ব্যাপারে মিল আছে। জিল এক নাতালির সঙ্গে থাকছে, আমি থাকছি আরেক নাতালির সঙ্গে। জিল লাজুক হেসেছে। উদাস তাকিয়ে থাকি

জানালায়। জিল বলে, *তুমি যদি জুলাইয়ের আগে জার্মানিতে আসো, তবে জার্মানি থেকে সোজা চলে যাবে মঁপেলিয়েতে। ওখানে আমার বাড়িতে থাকবে। সামনে* সমুদ্র। তোমার খুব ভাল লাগবে। দুজন আমরা স্পেনে বেড়াতে যাবো। স্পেন খুব সুন্দর দেশ।

মঁপেলিয়ে। মঁপেলিয়ে। জিল মঁপেলিয়ের স্বপ্নে বিভোর।

আর তা যদি না হয়!

আর যদি না হয়, তবে কী?

তুমি তো সেপ্টেম্বরে আসছোই। ক্রিশ্চান বেস তোমাকে তো নিয়ে আসছেন তোমার বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে। তখন তো আমাকে চিনবেই না। বলবে জিল, কোন জিল? জিল নামে কাউকে তো চিনি না।

জিলের পেটে কনুইয়ের গুঁতো পড়ে, *বাজে বোকো না তো!*

---বাজে বকছি না। যা সত্যি তাই বলছি। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে ঘিরে থাকবে সাংবাদিকরা, প্রকাশকরা। এডিশন স্টক ফ্রান্সের খুব বড় প্রকাশনী। তাছাড়া ক্রিশ্চান বেসের তো টাকার অভাব নেই। ওকে বোলো তোমাকে যেন ক্রিঁয়োতে রাখে। বলবে ক্রিঁয়ো ছাড়া আমি থাকব না। তখন ক্রিশ্চান কিছুতেই না বলতে পারবে না। তাছাড়া তার লোক দেখানোও হবে, বলবে দেখ দেখ আমার লেখককে আমি ফ্রান্সের সবচেয়ে দামি হোটেলে রেখেছি। এটা তার প্রচারের কাজেও দেবে। ক্রিঁয়োতে যদি থাকো, আর জিল নামের এই বেচারাকে যদি চিনতেই পারো, তবে এরকম টি শার্ট পরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সোজা বলে দেবে, সুট টাই পরে এসো, তাছাড়া দেখা হবে না।

---না জিল। বড় বড় হোটেলে আমার থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে খুব সাধারণ ভাবে থাকি আর ঘুরে ঘুরে জীবন দেখি মানুষের। পুরো জগতটা দেখি। মানুষের চেয়ে আকর্ষণীয় আর কী আছে। বিশাল দামি হোটেলে থেকে কি আমি মানুষের সত্যিকার জীবন দেখতে পারি!

জিল মাথা নাড়ে। *ঠিক বলেছো।*

বিমান বন্দরে নেমে আমার সুটকেসখানি ট্রলিতে উঠিয়ে ঠেলছিল যখন, জিলকে অপলক দেখছিলাম। জিলের জন্য আমার হৃদয়ে রিন রিন করে একটি বীণা বাজে, বেজেই চলে।

যখন বিমানের পথে যাবো, জিল দাঁড়ায় আমার মুখোমুখি। বলে, *আমি তোমাকে চিঠি লিখব। তুমি অবশ্যই অবশ্যই লিখবে। মনে থাকবে তো!*

বিষণ্নতার ওপাশ থেকে আমি মাথা নাড়ি। *লিখব।*

বিদায় বলেছি। চলে যাচ্ছি। জিল বলে, আর পাঁচমিনিট থাকো। মনে মনে বলি, *কী হবে আর এই পাঁচ মিনিটে?*

জিল হঠাৎ আমাকে আলতো করে জড়িয়ে দু গালে গাল ছুঁইয়ে চুমু খেলো। এ ফরাসিদের অভ্যেস। সবার সঙ্গে ফরাসিরা এই করে। এমনকী একদিনের পরিচয়েও করে। তবুও জিলের এই স্পর্শ, এই চুম্বন আমাকে অদ্ভুত এক ভাল লাগা দেয়।

জিলের হাত ছুঁয়ে বলি, কষ্ট ছুঁয়ে কণ্ঠ খানিক কাঁপে, বলি, যাই।

চলমান সিঁড়ি যখন আমাকে ক্রমশ এক একাকীত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, পেছনে ফিরে আর দেখিনি জিল দাঁড়িয়ে আছে কি নেই।

ডায়রি লেখার অভ্যেস আমার মোটেও নেই। নতুন বছরের আগে আগে বেশ অনেক ডায়রি মেলে। প্রতিটি নতুন বছর আসার আগে ভাবি নিয়মিত রোজনামচা লিখব। এমন নয় যে শুরু করি না। প্রথম দিন লিখতে গিয়ে পুরো পাতা ভরে গেল, এমনকী মার্জিনেও লিখতে হল, এত কথা মনে। দ্বিতীয় দিনেও তাই। তৃতীয় দিনে মার্জিনে লেখার প্রয়োজন হল না। চতুর্থ দিনে পাতা অর্ধেক ভরল। পঞ্চম দিনে ভুলে গেছি লিখতে। ষষ্ঠ দিনের দিন বসে পঞ্চম আর ষষ্ঠ দুদিনের কথা লিখতে গিয়ে দেখা যায় কিছু খুঁজে পাচ্ছি না লেখার। অর্ধেকের চেয়ে কম ভরল পাতা। এরপর পুরো তিন দিন রোজনামচা লেখার কথা বেমালুম ভুলে বসে থাকি। হঠাৎ তিন দিন পর দুটো বাক্য লেখার পর তৃতীয় বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে তখনকার জন্য ডায়রির চেয়ে অধিক জরুরি কোনও একটি বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ক্রমে ক্রমে ডায়রির খাতাটির ওপর আরও বই খাতা জমে খাতাটি অদৃশ্য হয়ে থাকে কয়েক সপ্তাহ। তার পর একদিন টেবিল ঝেড়ে মুছে গোছাতে গিয়ে ধুলোর আস্তর জমে ওঠা ডায়রিটি হাতে পড়তে এক ঝলক আলো নাচে চোখে, মনে মনে বলি ‘ওহ তাই তো, আমার তো কথা ছিল প্রতিদিন এতে লিখব।’ কথা তো কত কিছুই থাকে। কটি কথা আর মানা হয়! টেবিল শেষ পর্যন্ত গোছানো হয় না, ডায়রির পাতা উল্টে উল্টে লেখাগুলো পড়ি। পড়তে পড়তে ভাবি, এখন থেকে বাকি দিনগুলোর কথা লিখে রাখব, জীবনের কত কথা ভুলে যাচ্ছি দিন দিন । যেদিন মনে হল, সেদিনের কথা দু ছত্রে লিখে রেখে দিই, এর পর দিন লেখা আর হয় না। ভাবি এক সময় লেখা যাবে, এ আর এমন কী! মনে তো আছেই সব কিছু। মনে থাকবে। যে সব কাণ্ড ঘটে গেল, তা কি আর ভোলার মত। কিন্তু, আমার মস্তিষ্কটি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে খুব। যে ঘটনাটি কখনও ভোলার নয় বলে বিশ্বাস করি, সেটিই কদিন পর মনেই পড়ে না কখনও ঘটেছিল। মন এক আশ্চর্য জিনিস। কোনও এক দুপুরে একটি লাল জামা পরে জামগাছের তলে দাঁড়িয়ে জাম খাচ্ছিলাম, সেটি স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু কোন বছর আমি ডাক্তারি পাশ করেছি, সেটি দিব্যি ভুলে বসে আছি, এর ওর কাছে জিজ্ঞেস করতে হয়। প্রয়োজনের কথাটি মনে থাকে না, অপ্রয়োজনীয় কথায় মন বোঝাই হয়ে থাকে। মন জিনিসটি অদ্ভুত। কী জিনিস মন নেবে, কী নেবে না, তা আমার সাধ্য নেই অনুমান করি।

প্যারিসের দিনগুলির কিছু কিছু কথা জানি না কি কারণে লিখে রেখেছিলাম। কলকাতার দিনগুলির গল্প লিখে রাখলে সে গল্প শেষ হত না সহজে। কলকাতা প্যারিস নয়, কলকাতা আমাকে চেনে বেশি, প্যারিসের চেয়ে অনেক আপন এই কলকাতা, কলকাতা আমাকে নির্ভুল অনুবাদ করে। সবচেয়ে বড় কথা কলকাতাকে কখনও আমার বিদেশ বলে মনে হয় না। কলকাতায় পৌঁছে দেশে ফেরার মত আনন্দ হয় আমার। হোটেলে পৌঁছে সুটকেসটা রেখে বেরিয়ে যাবো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা

করতে এরকম ইচ্ছে নিয়ে হোটেলের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি ঘরের দরজায় লোহা লককর লাগানো, দরজার কাছে পুলিশ বসা।

ডডএ কী রে বাবা, এসব কেন?

ডডমেটাল ডিটেকটর লাগানো হয়েছে। এ তোমার নিরাপত্তার জন্য।

ডডকলকাতায় আমাকে কে কি করবে? কলকাতার মত নিরাপদ জায়গা পৃথিবীর আর কোথায় আছে?

ডডকলকাতায় মুসলমান মৌলবাদীর সংখ্যা কম নয়, তাদের মনে কী আছে কে জানে, সাবধানে থাকা ভাল।

মেটাল ডিটেকটর, পুলিশ পাহারা এসব আমাকে এমন লজ্জায় ফেলে যে মুখ গুঁজে বসে থাকি ঘরে। যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে যাবার, টই টই করে বাইরে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেটির পায়ে একটি রূপোর শেকল পরানো হয়েছে। কিন্তু শেকল আমার ভাল লাগবে কেন! পুলিশের দরকার নেই আমার, এ কথাটি জোর গলায় বলার পরও কেউ আমার কথা মানলেন না। দরজার পুলিশদের আমি চাইলেও বিদেয় করতে পারি না।

আমার কলকাতায় থাকার আয়োজনটি আনন্দবাজার থেকে করা হয়েছে। যেদিন পত্রিকা আপিসে যাই চেনা পরিচিতদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য, অভীক সরকারের সঙ্গে দেখা হয়। খুব ব্যস্ত মানুষ তিনি। গণ্ডা গণ্ডা পত্রিকার মালিক হলে ব্যস্ততা থাকেই। অভীক সরকারের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কখনও হয় না, সম্ভব নয়। তাঁর সময় নেই। দুমিনিট কী তিনমিনিটের জন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় পাওয়াটাই সৌভাগ্য, সেটিরই ব্যবস্থা করতে অনেকদিন লেগে যায়। অভীক সরকার আমাকে একটি পরামর্শ দেন, কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে যেন কথা না বলি। এদিকে কিন্তু সাংবাদিকরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, যেন আর কোনও কাজ নেই জগত সংসারে, এক আমার সঙ্গে কথা বলাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি। আমার ওপর এমন আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণটি হল *ফতোয়া।* পবিত্র কোরান ও মহানবী হযরত মুহম্মদ সম্পর্কে আমার বইগুলোতে যেসব কথা আছে, সেসব পছন্দ হয়নি বলে সিলেটের হাবীবুর রহমান আমার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছেন। এছাড়া কলকাতায় আমি এখন জনপ্রিয় এক লেখক, আমার লজ্জা বইটি নিয়ে বিতর্ক চলেছে বছর ভর। এত সব কারণের পর সাংবাদিকরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না এ ভাবাই যায় না। বেশি কিছু নয়, একটি সাক্ষাৎকার চায় তারা, আধ ঘন্টা না হলে কুড়ি মিনিট, তা না হলেও অন্তত পাঁচ মিনিট। কিন্তু গণহারে সকলকে বিদেয় করা হল। কী বলতে আবার কী বলে ফেলি, কী লিখতে তারা আবার কী লিখে ফেলে, ওদিকে বাংলাদেশের হাওয়া তেতে আছে আগে থেকেই, সুতরাং মৌলবাদী থেকে তো সাবধান থাকতেই হবে, সাংবাদিক থেকেও সাবধান।

একদিন টেলিভিশনের লোক এল, সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার সাক্ষাৎকার নেবেন। তাঁকে না বলে দিই কী করে! আনন্দবাজারের কর্তারাও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শুনলে না বলতে পারেন না। আমি শরমে মরে যাই, আমি তো এত বড় হইনি যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার সাক্ষাৎকার নেবেন! কিন্তু তিনি

যখন নেবেনই, এবং আমার সাধ্য নেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া, অতএব প্রশ্নোত্তর (আমি কি জানি নাকি সব প্রশ্নের উত্তর!) বা সাক্ষাৎকারের মত না হয়ে আমিই প্রস্তাব করলাম এটি একটি আড্ডা হতে পারে। হল। দুই লেখকের আলাপচারিতা, এভাবেই ব্যাপারটিকে ধরে নেওয়া হল। কেবল তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই বন্ধু নন, সাংবাদিকদের মধ্যেও তো বন্ধু আছেন, তাঁদের যখন একের পর এক তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, বড় অপ্রতিভ বোধ করছিলাম। কতদিন পর দেখা, সাক্ষাৎকার না হোক, দুটো কথা হোক না! কবি গৌতম ঘোষ দস্তিদার প্রতিদিন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করছেন, চোখের সামনে তাঁকেও তাড়ানো হল। বাহারউদ্দিনকে তো নিচ তলা থেকে ওপরে উঠতেই দেওয়া হয় নি। এ কি কাণ্ড। বন্ধুরাই তো তবে শত্রু হয়ে যাবে! এভাবে গণহারে তাড়ানো হচ্ছে সাংবাদিকদের! গৌতম ঘোষ দস্তিদার, যে আমার বিষম প্রশংসা করে লজ্জা বইটির সমালোচনা লিখেছিলেন, তিনিই কিন্তু এরপর চোখ উল্টে দিলেন। এ নিতান্তই ভুল বোঝাবুঝি। সাক্ষাৎকার না দিলে পত্রিকায় আমার সম্পর্কে লেখালেখি বন্ধ থাকবে, তা তো নয়, বরং বানিয়ে লেখা হবে। কথা বললে বরং বানানো গল্প থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। নিখিল সরকারকে জানাই ঘটনা। তিনি বললেন, দুএকটি ভাল পত্রিকায় তাহলে দাও সাক্ষাৎকার। টাইমস অব ইন্ডিয়া, টেলিগ্রাফ। স্টেটসম্যানও যোগ হল। ফোন আসছে মিনিট পর পর, অন্যান্য সাংবাদিকরা পাগল হয়ে যাচ্ছেন। দিল্লি বোম্বে থেকে এসে বসে আছেন। মায়া তাঁদের জন্যও হয়। হাতে গোনা জিনিস আর হাতে গোনার মধ্যে থাকে না। সাংবাদিকদের সঙ্গে একই রকম আলোচনা আর তাঁদের প্রায় একই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ক্লান্তি কাটে বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্যিক আলোচনা আর আড্ডায়। হোসেনুর রহমান কলকাতা ক্লাবে নিয়ে গেলেন একদিন, ওখানে তাঁর লেখক বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হল। হোসেনুর রহমান ঢাকায় আমার বাড়ি গিয়েছিলেন একবার, তখনই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। ঢাকা শহরে দিব্যি তিনি ধুতি পরে ঘুরে বেরিয়েছেন। কলকাতার যে কজন মুসলমান নামের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, সকলকেই দেখেছি জাত ধর্ম না মানা মানুষ, বড় গৌরব বোধ করি তাঁদের নিয়ে। যে ইলা মিত্রকে কোনওদিন দূর থেকে দেখারও আমার সৌভাগ্য হবে বলে ভাবিনি, সেই ইলা মিত্র হঠাৎ একদিন হোটেলে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, অনেকক্ষণ ছিলেন, মন খুলে কথা বলতে পারিনি, একের পর এক সাক্ষাৎপ্রার্থী এসে ভিড় করলে কথা কারও সঙ্গে ঠিক হয় না। দশ রকম মানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে কথা বলা যায় কি! রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, নারীবাদী, শিল্পী, অনুরাগী পাঠক, এই পাঠকদের মধ্যে ব্যবসায়ী থেকে বিজ্ঞানী সকলেই আছেনডড একজনের সঙ্গে কিছু কথা হল তো আরেকজনের সঙ্গে হল না। আমার ইচ্ছে করে সবার সঙ্গে কথা বলতে। কাউকে আমার ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। কত কিছু জানার আছে শেখার আছে ওঁদের থেকে। ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলো, জীবনদর্শনগুলো শুনতে ইচ্ছে করে। নারীবাদী লেখিকা মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় আমাকে অবাক করলেন আমাকে জড়িয়ে ধরে, ভেবেছিলাম তিনি বুঝি আমার মুখদর্শন কোনওদিন করবেন না। বললেন তিনিও পথে নেমেছেন আমার সমর্থনে।

অন্নদাশংকর রায়ের বাড়িতে গেলাম এক সন্ধেয়, ওখানে অপেক্ষা করছিলেন অপরাজিতা গোপ্পীসহ তাঁর দল। সকলেই দেখা করতে চান, সকলেই কথা বলতে চান। কিন্তু সময়ের অভাবে কারও সঙ্গে খুব বেশি কথা বলা হয় না। এক রাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন, সৌমিত্র মিত্র, মুনমুন মিত্র, বাদল বসু, কুমকুম বসু সহ খানা পানা গানা ভানায় রাত গভীর হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মদ খেতে খেতে হাত মাথা নেড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে থাকেন একের পর এক। গলাটা যেমন তেমন, সুর ভাল। স্বাতী, সুনীলের স্ত্রী বলেন, সুনীল তো রবীন্দ্রসঙ্গীত বানায়, কেউ ধরতেও পারে না। তা ঠিক, কত আর মুখস্ত থাকে সব গানের সব কলি, কোথাও ভুলে গেলে গান থামিয়ে না দিয়ে তিনি বানিয়ে গেয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেন, তা তো খুব অজানা নয়! ঘটে রবিজ্ঞান কিছু থাকলে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নেওয়া যায়। কলেজের পরীক্ষার খাতাতেও রবীন্দ্রনাথ এই লিখেছেন সেই লিখেছেন বলে পাতার পর পাতা নিজের কথা লিখে যেতেন। কোন পরীক্ষকের সময় আছে খুঁজে দেখার রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন বইয়ে কোন কথাটি লিখেছিলেন! কেবল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য সময় খরচ করে ফেললেই তো চলে না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে একবার যেতেই হয়। যাই। নিখিল সরকারের বাড়িতে নেমন্তন্ন, ওখানে শান্ত হয়ে বসো, ধীরে সুস্থে কথা বলো, লেখালেখি কেমন হচ্ছে বলো, দেশের অবস্থা বলো, দেশের বন্ধুরা এই দুঃসময়ে পাশে আছে কী না বলো। জীবনের সব কথা খুলে বলি নিখিল সরকারকে। তিনি আপন। খুব আপন। এত আপন আমার আর কাউকে মনে হয় না। আসলে আপন হতে গেলে আত্মীয় হতে হয় না। না হয়েও নিজের বাবার চেয়ে ভাইয়ের চেয়ে আপন হতে পারে কেউ কেউ। নিখিল সরকারের একটি ছেলে ছিল, পাপু নাম। পাপু যখন তার মাত্র আট বছর বয়স, রাস্তায় খেলতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। অসম্ভব প্রতিভাবান ছেলে ছিল পাপু। ওই বাচ্চা বয়সেই ছবি আঁকত, ছড়া লিখত। আজও মীরা সরকার, নিখিল সরকারের স্ত্রী পাপুর কথা ভেবে চোখের জল ফেলেন, প্রতিদিন। প্রতিদিন তিনি দেয়ালে পাপুর ছবি আর পাপুর আঁকা ছবিগুলোর ধুলো নিজের আঁচল দিয়ে মোছেন। এখনও। এখনও প্রদীপ জ্বেলে দেন প্রতি সন্ধেবেলা পাপুর ছবির সামনে। হ্যাঁ এখনও। মীরা সরকারের বেদনা আমাকে এমনই স্পর্শ করেছিল যে একদিন বলেছিলাম, *ধরে নিন আমিই আপনাদের পাপু, পাপু তো বেঁচে থাকলে আমার বয়সীই হত।* পাপুর লেখা ছড়া আর ছবির একটি বই জ্ঞানকোষ প্রকাশনীকে দিয়ে বাংলাদেশে বের করেছি। বইটি নিখিল সরকারের হাতে দিয়ে আমার আনন্দ হয় খুব। নিখিল সরকার, ময়মনসিংহের ধোবাউড়ার ছেলে এখন কলকাতা বিশেষজ্ঞ, অনেকগুলো বই লিখেছেন কেবল কলকাতা নিয়েই। যত নিখিল সরকারকে দেখি, তত আমি মুগ্ধ হই। বাড়িভর্তি বই, পড়ছেন, কেবল পড়ছেন। নানা বিষয়ে আগ্রহ তাঁর। দেশি বিদেশি ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য শিল্পকলার কোনও ভাল বইএর নাম শুনলেই তিনি তা যে করেই হোক যোগাড় করে পড়ে নেন। তাঁর এই একটিই নেশা, পড়া। নিখিল সরকারের কাছে এলে নিজের অজ্ঞানতা মূর্খতা দাঁত মেলে প্রকাশিত হয়, তবু তিনি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন না। মহীরূহর পাশে তুচ্ছ

তৃণ, তবু আমি ভালবাসা পাই তাঁর। ভালবাসা পেয়েছি অন্নদাশংকর রায়ের, শিবনারায়ণ রায়ের, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। নিজের সৌভাগ্যের দিকে মাঝে মাঝে বড় বিস্ময়-চোখে তাকাই। সবই অলীক বলে মনে হয়, যেন সত্যি নয়, যেন এ ঘটছে না, যেন এ কেবলই একটি স্বপ্ন। জেগে দেখব আমি সেই আমি, লোকের থু থু খাচ্ছি, লাথি খাচ্ছি, ঘৃণা আর নিন্দার কাদার তলে অর্ধেক ডুবে আছি। বাংলাদেশের জন্য নিখিল সরকারের অদ্ভুত এক ভালবাসা কাজ করে। বাংলাদেশের ভাল সাহিত্যিকরা যেন আনন্দ পুরস্কার পান, সে ব্যবস্থা তিনি তৈরি করে দিতে চান। ডক্টর আনিসুজ্জামানকে পুরস্কার কমিটির সদস্য করার পেছনে তিনিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঐতিহ্যের অঙ্গীকার নামে অনেকগুলো অসাধারণ ক্যাসেট করার জন্য যে বছর নরেন বিশ্বাস এবং আনিসুজ্জামানকে আনন্দ পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত হল, এক ঝড়জলের রাতে বহু কষ্টে বাড়ি খুঁজে খুঁজে সুখবরটি দিয়ে এসেছিলাম নরেন বিশ্বাসকে। যেবার শামসুর রাহমান পেলেন, সেবার যে কী ভীষণ আনন্দ হয়েছিল! দৌড়োদৌড়ি লেগে গেল আমার,খবর নিচ্ছি, দিচ্ছি। শামসুর রাহমানের পাসপোর্ট নাও, ভিসা কর। বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়ে এসো। তখন নিজের পাসপোর্টটি থাকলে আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঠিকই চলে আসতাম কলকাতায়। তিনি যোগ্য এই পুরস্কার পাওয়ার। আমি যে এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ছিলাম না, সে আমি জানি। আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ যত ছিল, এটি পাওয়ার লজ্জা আমার কিছু কম ছিল না। আনন্দ পুরস্কার নয়, এই পশ্চিমবঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া কিছু অসামান্য মানুষের স্নেহ আর ভালবাসা। এটি অমূল্য সম্পদ। আনন্দ পুরস্কারের টাকা খরচ হয়ে যাবে হাবিজাবিতে, পুরস্কারের সনদ ধূসর হতে থাকবে দিন দিন, কিন্তু ভালবাসা থেকে যাবে, বন্ধুত্ব উজ্জ্বল হতে থাকবে যত দিন যাবে।

স্টেটসম্যানে আমার সাক্ষাৎকারটি যেদিন ছাপা হল, সেদিন সকালেই নিখিল সরকার আমার হোটেলে ফোন করলেন। বেশ রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি স্টেটসম্যানের সাংবাদিককে বলেছো যে তুমি কোরান সংশোধন করতে চাও?

ডড না তো!

ডডলিখেছে তো!

ডডকি বলছেন এসব! কোরান সংশোধন? কোরান আবার সংশোধন করা যায় নাকি? এরকম উদ্ভট কথা আমার মাথায় কোনওদিন আসেনি। বলার প্রশ্ন ওঠে না। আমি কোরান বিশ্বাস করি না, আমি কেন এর সংশোধন চাইব! কোরান বিশ্বাস করলে তো কোরান সংশোধনের প্রশ্ন আসে।

ডডবলনি, তাহলে লিখল কেন? নিশ্চয়ই এধরনের কিছু বলেছো!

ডডশরিয়া আইনের কথা বলেছিলাম। না এর সংশোধন চাইনি। কারণ সংশোধনে কাজের কাজ সত্যিকার হয় না। বলেছিলাম শরিয়া আইন পাল্টাতে চাই। মানে একে বিদেয় করতে চাই। এই আইনের বদলে নারী পুরুষে সমান অধিকার আছে এমন আইনের কথা বলেছিলাম।

ডডকী বলতে যে কী বল!

ডডকী বলতে কী নয়। আমি যা বলেছি, স্পষ্ট করে বলেছি। এটা কোনও নতুন কথা নয়। এ কথা আমি দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি। লিখে আসছি। আমি নিশ্চিত, যে মেয়েটি সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল, সে জানেনা কোরান আর শরিয়ার মধ্যে পার্থক্য। শরিয়া বলতে সে কোরান বুঝেছে।

ডডযাই হোক, দেরি কোরো না। এক্ষুনি একটা সংশোধনী পাঠিয়ে দাও।

ডডএরকম কত ভুল লেখে পত্রিকায়, তার জন্য সংশোধনী তো কোনওদিন পাঠাইনি!

ডডএ *যে সে* ভুল নয়। এই মন্তব্য নিয়ে বিপদ হতে পারে।

দেরি না করে নিখিল সরকারের আপিসে গিয়ে স্টেটসম্যান সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখে দিই যে আমি কোরান সংশোধনের কথা বলিনি, এ কথা বলার প্রশ্নও ওঠে না কারণ আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না। সব ধর্মগ্রন্থই আমি মনে করি এ যুগের জন্য অচল। সব রকম ধর্মীয় আইন সরিয়ে, যেহেতু ধর্মীয় আইনে নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীন একটি আইন ব্যবস্থার দাবি আমি দীর্ঘ দিন থেকে করছি। ধর্মই যদি না মানি, তবে কোরান সংশোধনের বিষয়টি সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। ডড এটি লিখে আমার স্বস্তি হয়। স্টেটসম্যানের লেখাটি পড়ার পর সত্যি আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একটি ভুল বাক্য আমাকে কী রকম আস্তিক বানিয়ে ছাড়ল। ধর্মে বিশ্বাস করলেই তো প্রশ্ন আসে ধর্মগ্রন্থ সংশোধনের। একটু পাল্টে পুল্টে একে মেনে চল, একে মাথায় তুলে রাখো। ছিঃ, আমি কি তাই বিশ্বাস করি নাকি! এতকাল ধরে তবে কিসের সংগ্রাম করছি আমি! আমি কি ক্রমাগতই বলে চলছি না যে পুরুষতন্ত্র আর ধর্মের শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা না পর্যন্ত মেয়েদের সত্যিকার মুক্তি নেই!

আবৃত্তিলোক থেকে একটি অনুষ্ঠান করা হল, সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বলা যায় একে। কবিতা পাঠ হবে। কে কবিতা পড়বে? আমি। আর কেউ? না, আর কেউ নয়, একা আমি। এর কোনও মানে হয়! ওঁরা বললেন, মানে হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বসলেন আমার বামে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ডানে। *আপনারাও পড়ুন কবিতা,* আমি কাতর অনুরোধ করি। *না, আজ আমরা তোমার কবিতা শুনব।* শক্তি বলেন। আমি সংকোচে মরি। বাংলা সাহিত্যের দুজন শ্রেষ্ঠ কবির মাঝখানে বসে কবিতা পড়তে যে মনের শক্তি লাগে, সেটি আমার নেই। নেই, তবু বসতে হয় কবিতা পড়তে। মুখে পড়ছি কবিতা আর মনে মনে বলছি ধরণী দ্বিধা হও। ধরণী দ্বিধা হয়নি। আমাকে বোধহয় আকাশে ছুঁড়ে না দিয়ে ধরণীর শান্তি নেই। কবিতা পাঠের পর খাওয়া দাওয়া, খাওয়া দাওয়ার আগে অবশ্য চিরাচরিত মদ্যপান। সন্ধের পর এই মদ্যপানটি কলকাতার উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তের অনেকটা নিয়মিত ব্যাপার। ঘরে ঘরে মদ নিয়ে বসে যাচ্ছেন স্বামী, এমনকী স্ত্রীও। অতিথি এলে তো কথাই নেই, আর কিছু না চলুক, মদ চলবেই। সন্ধের অতিথিকে ঢাকার শিল্পাঙ্গনের মধ্যবিত্তরা সম্ভবত এখনও চা দিয়েই আপ্যায়ন করেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সামান্য মদ্যপান করেই, লক্ষ্য করি, আমার পেছন পেছন হাঁটছেন আর বলছেন, তসলিমা তোমাকে আমি এত ভালবাসি কেন, বল তো! এই সেরেছে। এই তুচ্ছ মানুষটিকে এত আদর যত্ন করা হচ্ছে, এমনকী আকাশে তোলা হচ্ছে, তারপর কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যদি এখন এই ভরা আসরে

এমন হুট করে আমার প্রেমে পড়ে যান, তবে এত আমি সামলাবো কি করে! কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। লজ্জায় আমি কোথায় মুখ লুকোবো তার জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি *শক্তিদা কিছু খাবেন, আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসি,* বলে তাঁর পাশ থেকে দ্রুত সরে যাই, যেন এর মধ্যে তিনি তাঁর প্রেমকে আপাতত স্থগিত রাখার প্রয়াস পান। তাঁর জন্য খাবার আনতে যাই, যেন মুখে খাবার পুরতেই তিনি ব্যস্ত থাকেন, যেন প্রেমের বাক্য আওড়ানোর কোনও সময় তাঁর না জোটে। কিন্তু পেছন পেছন আবার তিনি, ফিসফিস করে বলছেন, *তোমাকে কেন এত ভালবাসি আমি!* খাবারের থালাটি তাঁর হাতে দিই, তিনি বাধ্য শিশুর মত বসে খেতে শুরু করলেন। লক্ষ করি ঠিকমত তিনি খেতে পাচ্ছেন না, খাবারগুলো মুখে তুলতে গেলে ছড়িয়ে পড়ছে এদিক ওদিক। মীণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শক্তির স্ত্রী ছিলেন খানিকটা দূরে। তাঁর কাছেই দৌড়ে যাই, *বৌদি, শিগগিরি আসুন, শক্তিদা কেমন যেন করছেন। খেতে পাচ্ছেন না।*
ও কিছু না! বলে মীণাক্ষী যার সঙ্গে মন দিয়ে গল্প করছিলেন, করতে লাগলেন। শক্তির কেমন করাকে তিনি মোটে পাত্তাই দিলেন না। আমি এদিকে মহা মুশকিলে পড়েছি। একা আমি শক্তির প্রেম সামাল দিতে পারছি না। তিনি তো খাওয়া দাওয়া ফেলে আবার আমাকে বলতে শুরু করেছেন যে তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। কেন আমাকে তিনি এত ভালবাসেন, তা বারবারই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। আমি কি করে জানব তা! আমার কাছে তো উত্তর নেই। এ এমনই এক অস্বস্তিকর ব্যাপার যে আমি না পারছি বসে বসে শুনতে তাঁর প্রেমের প্রলাপ, না পারছি কাউকে বলতে। এমন বোকা কি যেখানে সেখানে মেলে! বুঝতে আমার দুদিন লেগেছে যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সত্যি সত্যিই আমার প্রেমে পড়েননি। পেটে মদ পড়লে তিনি একটু উল্টো পাল্টা বকেন, এই যা।

কলকাতায় সময় ফুরোতে থাকে দ্রুত, খুব দ্রুত। ইচ্ছে করে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখি দুরন্ত সময়টিকে, পারি না। সময় কর্পুরের মত হাওয়ায় উড়ে যায়। দেশে ফিরে যাওয়ার আগে আগে কলকাতায় সময় সত্যিই দ্রুত ফুরোয়। কলকাতাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু যেতে হয়।

ঢাকায় ফেরার পর দেখি তাণ্ডব শুরু হয়েছে সারা দেশে। স্টেটসম্যান পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছে বাংলাদেশের পত্রিকায়। আমি কোরান সংশোধন করতে চাই, এ খবরটি ফলাও করে প্রচার করে মৌলবাদীরা এক ভয়ংকর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ হচ্ছে কি! আমি তো কোরান সংশোধনের কথা বলিনি। আমার কথা কে শোনে! ভেবেছিলাম লজ্জা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর মৌলবাদীদের পালে যে হাওয়া লেগেছিল, ফতোয়া জারির পর সরকারের নিষ্ক্রিয়তা যেমন উসকে দিয়েছিল আগুন, সে হাওয়ার জোর, সে আগুনের তাপ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। কমেওছিল কিছু। পুলিশ পাহারাও অনেকটা আছে আছে নেই নেই রকম ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে হাওয়া ক্ষিপ্ত, তপ্ত, নতুন করে দ্বিগুণ তেজে ত্রিগুণ বেগে ধাবিত হচ্ছে! আমার কত বড় স্পর্ধা যে আমি পবিত্র কোরান শরীফে কাঁটাছেঁড়া করতে চাইছি, স্বয়ং আল্লাহর বাণী সংশোধন করতে চাইছি! এর মানে এই যে আমি

মনে করছি আল্লাহ সঠিক কথা বলেননি, আল্লাহ ভুল বলেছেন, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি, আমি আল্লাহর চেয়ে নিজেকে বেশি ক্ষমতাবান মনে করছি। মৌলবাদীদের কাছে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কী থাকতে পারে! দেশী বিদেশি সাংবাদিকদের ভিড়, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আদৌ কি আমি বলেছিলাম কোরান সংশোধনের কথা? আমি কি পাগল হয়েছি যে কোরান সংশোধন করতে চাইব! ধরুন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি বই লিখেছেন। সেটির আমি সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু সেটি আমি সংশোধন করতে পারি না। আমার বইয়ের কথাই বলছি, আমার বই সংশোধন করার অধিকার একমাত্র আমার আছে, অন্য কারওরই নেই। আমার মৃত্যু হলেও আমার বই যে সব ভুল ত্রুটি নিয়ে আছে, সেভাবেই থাকবে। এরকমই তো নিয়ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে লিখেছিলেন, আমরা কেউ কি চাইব ভেঙে মোর ঘরের চাবির বদলে ভেঙে মোর ঘরের তালা করে দিতে? না। চাইব না। প্রশ্নই ওঠে না। কোরানে তো লেখাই আছে যে এর কোনও শব্দও পরিবর্তন করা যাবে না। কোরান একটি বহুল পঠিত গ্রন্থ, আমি কোন ছার যে এটি সংশোধনের দাবি করব! এ ব্রহ্মাণ্ডের কেউ এ দাবি করতে পারে না।

আমি আর যে সব বইয়ের উদাহরণ দিলাম, তা মানুষের লেখা, কিন্তু কোরান তো আল্লাহ তায়লার লেখা। আমি তুলনা করি কি করে কোরানের সঙ্গে মানুষের লেখা বইয়ের? তুলনা করি এই জন্য যে কোরানও মানুষেরই লেখা। ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্বেষী, নারীবিদ্বেষী,নিষ্ঠুর নির্দয় পুরুষের লেখা। এ মানুষের নির্বুদ্ধিতা যে মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ জিবরাইলকে পাঠিয়েছেন মুহম্মদের কাছে তাঁর কথাগুলো পৌঁছে দিতে। মুহম্মদ জিবরাইলকে দেখতে পেতেন না, কিন্তু আওয়াজ শুনতেন জিবরাইলের গমগমে কণ্ঠস্বরের। তিনি যা শুনতেন, তা লিখে নিতেন। নিজে তো লিখতে পড়তে জানতেন না, অন্যকে লিখতে বলতেন। সে যুগে, আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে অন্ধতা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা চারদিক ছেয়ে ছিল, তখন   অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস   করত লোকে, এ কোনও অবাক করা ব্যাপার নয়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, এই বিজ্ঞানের যুগে, যখন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি চিন্তা অনেক অগ্রসর, মানুষ কী করে বিশ্বাস করে এসব রূপকথা?

তবে কিসের সংশোধনের দাবি করছেন? শরিয়া নামের বর্বর আইনকে বিদেয় করার দাবি করছি। এই আইনের সংশোধন এ যাবৎ অনেক হয়েছে, কোনও সংশোধনই নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করেনি। নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা শরিয়া আইনের মূল লক্ষ্য নয়, বরং এর উল্টো। কোনও সংশোধনই মূল লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটাবে না। যদি আমরা রাষ্ট্রের সংবিধানটি অক্ষত রাখি, যে সংবিধান বলে যে সব মানুষের অধিকার সমান, তবে আইনটি রক্ষা করার কোনও যুক্তি নেই।

সব পত্রিকায় আমার বিবৃতি ছাপা হয়েছে যে আমি কোরান সংশোধনের কথা বলিনি তারপরও তাণ্ডব থামার কোনও লক্ষণ নেই। মৌলবাদীরা আর্তনাদ করছে, ইসলাম ভেসে গেল, কোরান ধ্বংস হয়ে গেল। কে ভাসাচ্ছে, কে ধ্বংস করছে?

তসলিমা। সুতরাং জ্বালাও পোড়াও, ফাঁসি চাও, আন্দোলনে নামো। মুসলমান তোমরা যে যেখানে আছো বেরিয়ে পড়ো, বজ্রকণ্ঠে স্লোগান দাও, তসলিমার ফাঁসি চাই। তসলিমার মৃত্যু চাই। হ্যাঁ, আমার মৃত্যু চাওয়ার লোকের সংখ্যা বাড়ছে। মিছিলে লোক আগের চেয়ে অনেক বেশি। সময় গেলে বেশির ভাগ আন্দোলনের তেজ এ দেশে কমে আসে জানতাম। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে, তত বাড়ছে তেজ। চারদিকে কেবল একটিই হুংকার, তসলিমাকে হত্যা কর, ইসলাম বাঁচাও। রাজনৈতিক অরাজনৈতিক যত ইসলামী সংস্থা সংগঠন আছে দেশে, সবখানেই ফুঁসে ওঠা লোকের ভিড়, জোট বাঁধো, পথে নামো, ইসলাম বাঁচাও। প্রতিদিন আমার ফাঁসি চেয়ে জঙ্গী মিছিল বেরোচ্ছে। প্রতিদিন। লিফলেট বিলি হচ্ছে, হাজার হাজার লিফলেট ---

---

কেন তসলিমার বিরুদ্ধে আন্দোলন?

সম্মানিত দেশবাসী!
আসসালামু আলায়কুম,
কেন তসলিমার বিরুদ্ধে আন্দোলন? তসলিমার এজেন্ট এবং ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এ প্রশ্ন তুলছে। এদেশের সর্বস্তরের জনগণ তার মৃত্যুদণ্ড দাবী করেছে। স্মরণাতীতকালের সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছে এ দাবীতে। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রয়েছে। বিশ্ব ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের আশ্রয়ে দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে সে ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়েছে। সম্প্রতি আবার ফিরে আসায় স্বাভাবিকভাবেই দেশপ্রেমিক ইসলামী জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এবারে দেশী-বিদেশী ইসলাম বিরোধী চক্রটি তাকে কেন্দ্র করে মাথা চারা দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক এক বক্তব্য তাদের ইসলাম ও দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের বৈধতা ও উৎসাহ যুগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, তসলিমার বিরোধিতাকারীরা বাড়াবাড়ি করছে। অথচ তসলিমা আল্লাহ রাসুল ও কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে, বাংলাদেশের মানচিত্রকে অন্য দেশের সাথে মিশিয়ে না দিয়ে স্বস্তি পাচ্ছে না। সে অবাধ যৌন সংসর্গের প্রকাশ্য ইন্ধন যোগাচ্ছে, বিয়ের শৃঙ্খল ভাঙবার জন্যে নারীদের আহবান জানাচ্ছে আর অকথ্য, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করেছে আলেম উলামা পীর মাশায়েখ ও মসজিদের ইমামকে। মসজিদকে বলছে বৈষম্যের প্রতীক। শেখ হাসিনা কেন মাথায় ঘোমটা দেয় এজন্যে যার আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয় ---- এই দেশদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীর জন্যে একটি চিহ্নিত মহলের উকালতি নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক। একটা ভদ্র সমাজের মানুষ, স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক কি তা মেনে নিতে পারে? ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে নিয়ে কটাক্ষ ও উপহাস করার অধিকার তাকে কে দিল?

সম্মানিত দেশবাসী! তসলিমার অসংখ্য অশ্লীল ও অসভ্য বিষোদগার থেকে নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ করুনঃ

- *আমি ছোটখাটো কোনও পরিবর্তনের পক্ষে নই। এর দ্বারা কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কুরআনের পুরোপুরি সংশোধন করা প্রয়োজন।* (০৯/০৫/৯৪ তারিখে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ঝবন জড়তঢ়নড়লতশ পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তসলিমার উক্তি) উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করলে ১১/০৫/৯৪ তারিখে The Statesman পত্রিকায় তার একটি চিঠি ছাপা হয়। তা পূর্বের চাইতে মারাত্মক এবং ভয়ংকর। তসলিমার কথায়, এই ব্যাপারে আমার মত পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট। আমার মত হলো কুরআন, বেদ, বাইবেল এবং এ ধরণের যাবতীয় গ্রন্থ যা তাদের অনুসারীদের জীবন পরিচালনা করে তা আজকের স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। যে সমাজ ইতিহাসের পটভূমিতে এগুলো লেখা হয়েছিল, তা আমরা অতিক্রম করে এসেছি। সুতরাং এই সবের দ্বারা পরিচালিত হবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। আংশিক বা পুরোপুরি সংশোধনের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা যদি উন্নতি করতে চাই তাহলে এই পুরোনো গ্রন্থগুলোকে পরিত্যাগ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।
- এখানে হাসান হোসেন থেকে শুরু করে মুহম্মদ পর্যন্ত কেউই পুতপবিত্র মানুষ নয়। সকলেই দোষে গুণে লোভে মোহে, হিংসায় এজিদ মাবিয়ার মত অর্থাৎ অন্ধকার সমাজের আর সব মানুষের মত। (ছোট ছোট দুঃখ কথা)
- আমি নামাজ বা কোরান বিশ্বাস করি না। আমি যখন কোরান পড়ছিলাম, তখন তাতে দেখেছি, কোরানে বলা হয়েছে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। আমি তখন আমার মাতৃদেবীকে বলেছিলাম আমি বিজ্ঞানের বই পড়ে জেনেছি যে, সূর্যেরই চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। কাজেই আল্লাহ একজন মিথ্যাবাদী।

  (বোম্বে থেকে প্রকাশিত ফ্যাশন ম্যাগাজিন Savvy র নভেম্বর ৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত তসলিমার আত্মকথা)
- রবীন্দ্রনাথকে আমি ঈশ্বর বলে মানি। আমার চোখের সামনে ঈশ্বরের যে ছবিটি ভেসে ওঠে, সে তার রক্তমাংস শিল্পসহ কেবলই রবীন্দ্রনাথ। এই আমার ধর্ম, আমি এই এক ঈশ্বরের কাছে পরাজিত। আর কোনও ঈশ্বর দোষ, আর কোনও লৌকিক বা পারলৌকিক মোহ আমার নেই। জগতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনও দেয়াল রাখিনি। আর কোনও গন্তব্য নেই আমার। (নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য পৃঃ ৮০)
- এইসব আখেরাত, পুলসেরাত, দোযখ, বেহেস্ত এগুলো আমার বিশ্বাস হয় না। আল্লাহ টাল্লা আবার কি? সব বাহানা। (নিমন্ত্রণ পৃঃ ২৯)

- হ্যাঁ আমি ইসলামকে আঘাত করে থাকি। কারণ ইসলাম নারী স্বাধীনতা দেয় না। (Savvy নভেম্বর ৯২)
- ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে/ জিবরাইলের কাশি/মুনকার আর নাকির গেছে হুরের নিমন্ত্রণে/ফেরেশতারা যে যার মত সাত আকাশে ঘোরে/ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে শিঙ্গা ফুঁকবে কে?/পুলসেরাতে একলা বসে শেষ বিচারক কাঁদেন/আর, আখেরাতের দাড়িপাল্লা কব্জা খসে পড়ে। (কবিতাঃ ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে, সূত্র সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ১৭ নভেম্বর ৯৩)
- এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে আমি লজ্জা লিখেছি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে। আমি বাবরি সম্পর্কে লিখেছি, কারণ এটা বৈষম্যের এক প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। (পূর্ণিমাঃ ১৭ নভেম্বর ৯৩)
- চরিত্র গঠনের জন্য খাদিজা কেন অপরিহার্য এই দেশে? হযরতের তের বা চৌদ্দজন বিবির জীবনী পড়ে স্কুলের মেয়েরা কোন আদর্শে দীক্ষিত হচ্ছে তা আমার জানবার প্রয়োজন বৈ কি!..তাদের কেন জোন অব আর্ক, মেরি ওল্টস্টনক্রাফটের জীবনী, বাংলার মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু, বেগম রোকেয়া, ননীবালা দেবী, লীলা নাগ, ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণা দেয়া হয় না? (নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য পৃ: ১২১)
- এদেশে নানা জাতের অসাধু পুরুষ আছে, তাদের মধ্যে পীর অন্যতম। .. দেশের আনাচে কানাচে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা পীর নামে পরিচিত মানুষগুলোর মূল পেশা অসাধুতা। লম্বা চুল, দাড়ি, জোব্বার আড়ালে অর্থ ও নারী লিপ্সাই পীর চরিত্রের প্রধান দিক। .. পীর বলতে এখন আর সিদ্ধ সাধু পুরুষের ভাবমূর্তি মনে আসে না। পীর মানেই দুশ্চরিত্র, লম্পট, পীরমাত্রই ঝাঁক ঝাঁক যুবতী বেষ্টিত প্রচণ্ড কামুক পুরুষ। (নির্বাচিত কলাম পৃঃ ২৭)
- আমাদের মত সমাজে মেয়েদের কখনও বিয়ে করাই উচিত নয়। কারণ তার ফলে তারা পুরুষের ক্রীতদাসীতে পরিণত হবে। .. যৌনতার ব্যাপারে বলি আমি অবাধ যৌন সংসর্গে বিশ্বাস করি তার জন্য আপনাকে বিয়ে করার দরকার নেই। (Savvy নভেম্বর ৯২)
- জরায়ুর স্বাধীনতা নারী মাত্রেরই প্রয়োজন। সে পতিতা হোক কী অপতিতা হোক। (সাক্ষাৎকার পাক্ষিক সোনার তরী ১-১৫ ডিসেম্বর ৯৩)
- নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যাভিচার করতে অভ্যস্ত হোক। (নির্বাচিত কলাম পৃ: ১১৮/কলিকাতা ১৯৯২)
- শালা শুয়োরের বাচ্চা বাংলাদেশ। (লজ্জা পৃষ্ঠা ৫৭)
- স্বৈরাচারী সরকার এই দেশের জন্য একটি রাষ্ট্রধর্ম তৈরি করেছে। যে ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মানুষ ভারত বিরোধিতায় ভোগে এবং দেশে একটি ইসলামতন্ত্র চালু করতে চায়। (যাবো না কেন, যাবো , পৃঃ ৪৯)

- বাঙালি বলতে আমি উনিশ কোটি মানুষকে বুঝি। দেশ বলতে বঙ্গদেশ বুঝি। আমরা তোমরা বলে কথা বলতে আমি পছন্দ করি না। আজ না হয় ধর্মের দেওয়াল উঠেছে। আমাদের মাঝে এ তো সূর্যের মত সত্য যে একদিন এই দেওয়াল ভাঙবে। ধর্ম নির্বাসিত হবে, বাঙালি ফিরে পাবে তার পূর্ব পুরুষের মাটি, দিগন্ত অবধি অবাধ সবুজ ধানক্ষেত, আম জাম কাঁঠালের বন। মাটির মূর্তির পায়ে ফুলপাতা রেখে কেউ নমো নমো বলবে না, পাপী আর সন্তপ্ত মানুষ মসজিদে পাঁচবেলা কপাল ঠুকবে না। একদিন নিশ্চয়ই বাঙালিরা হাতে হাত ধরে হাঁটবে বনগাঁ থেকে বেনাপোল, রংপুর থেকে কুচবিহার, মেঘালয় থেকে হালুয়াঘাট, শিলং থেকে তামাবিল, ভাটিয়ালি গাইতে গাইতে বৈঠা বাইবে মাঝি পদ্মা থেকে গঙ্গার উত্তাল জলে। এরকম একটি স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমি বাঁচি। (বন্দি আমি ডড তসলিমা নাসরিন ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১ অক্টোবর, ৯৩)
- দেখুন, যেটুকু নিরাপত্তা এখন পাচ্ছি সেটাতো বিদেশি সংস্থাগুলো দিয়েছে বলে। (সাক্ষাৎকার সোনার তরী ১-১৫ ডিসেম্বর ৯৩)
- ভারতবর্ষ কোনও বাতিল কাগজ ছিল না / যে, তাকে ছিঁড়ে/টুকরো করতে হবে/সাতচল্লিশ শব্দটিকে আমি রাবার দিয়ে মুছে ফেলতে চাই/সাতচল্লিশ নামের কাঁটা আমি গিলতে চাই/উগড়ে দিতে চাই/উদ্ধার করতে চাই আমার পূর্ব পুরুষের অখণ্ড মাটি। (কলকাতা, দেশ ১২ মার্চ ৯৪ঃ কবিতা - অস্বীকার, তসলিমা নাসরিন)

সম্মানিত ভাইয়েরা,
ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কারো উপর কোনও জোর জবরদস্তি নেই। তেমনি কেউ ইচ্ছে করলে অন্য দেশের নাগরিকত্বও নিতে পারে। কিন্তু ইসলামের নাম পরিচয় ব্যবহার করে ইসলামের মূল আক্বিদা বিশ্বাসকে অস্বীকার করা, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সুবিধা ভোগ করে এর স্বাধীন মানচিত্রকে অন্যদেশের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বিশ্বের কোনও ধর্মীয়, নাগরিক এবং মানবীয় আইনেই স্বীকৃত নয়। অনেক দেশেই ধর্মীয় মূল্যবোধের অবজ্ঞাকারী শাস্তির জন্য ব্লাসফেমি আইন আছে। কিন্তু আশ্চর্য, বাংলাদেশে অনুরূপ কোনও আইন নেই। অথচ বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল ও বিশ্বাস সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম। এদেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ইসলামের অনুসারী। তসলিমা প্রকাশ্যে এসবকে অশ্লীল, অশিষ্ট ও অনাগরিক ভাষায় পদদলিত করেছে। তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা বিরোধী। অথচ এদেশে এতসব কিছুর পরও তসলিমাকে সরকার আশ্রয় ও শেল্টার দিচ্ছে। তাহলে কি এদেশে আমরা মুসলমান পরিচয় নিয়ে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারবো না? আমরা আমাদের ঈমান ও দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে আপোস করতে পারি না। রাসুল (সঃ) বলেছেন, তোমরা কোনও অন্যায় দেখলে তৎক্ষণাৎ তা শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ কর। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তসলিমাদের এই অন্যায় ঔদ্ধত্যের প্রতিরোধ

শুধু মুখের প্রতিবাদ ও নিছক অন্তরের ঘৃণা দিয়ে সম্ভব নয়। সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

আসুন! দেশ প্রেমিক ধর্মপ্রাণ ভাইয়েরা! ঈমান ও দেশ রক্ষার জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের মর্যাদাকে সর্বোচ্চে বুলন্দ করি এবং আওয়াজ তুলি।

মুরতাদদের মৃত্যুদণ্ডের আইন পাস কর
তসলিমার মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে দিয়ে দাও

ই স লা মী ঐ ক্য জো ট

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৪৪/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

সোনার তরী আর পূর্ণিমা খাঁটি মৌলবাদীদের পত্রিকা। এসব পত্রিকায় আমি কখনও কোনও সাক্ষাৎকার দিইনি। কিন্তু যখন তাদের কোনও প্রয়োজন হয় আমার মুখে কিছু বাক্য বসাবার, তারা নিজ দায়িত্বে সেসব বসিয়ে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে। এ দেশের মানুষ মুদ্রিত যে কোনও লেখাকে খুব বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসটিই ইনকিলাব গোষ্ঠীর মূলধন। মুখে ফেনা তুলে ফেলছে কোনও একটি কথা বলে বলে, কারও কানে ঢোকে না তা, আর যখনই লিখে দিচ্ছে সে কথা, পড়তে গিয়ে লোকের মস্তিষ্কে তা সুরুৎ করে ঢুকে যায়। মস্তিষ্কগুলোই এখন এই গোষ্ঠীর খুব প্রয়োজন। এই জাতির মস্তিষ্কের ওপরের আবরণটি খুব পাতলা, খুব স্বচ্ছ, খুব সহজে যে কোনও মাল আবরণ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়, গোবর ঢোকালে গোবরও ঢুকে যায়, ধর্ম ঢোকালে ধর্মও। আমার বিবৃতিটিই কেবল ঢোকেনি। আমি যে লিখেছি কোরান সংশোধনের কথা আমি বলিনি, সেটির দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। অথবা তাকালেও মনে মনে বলছে, তুমি কোরানের সংশোধনের কথা এখন হয়তো না বলতে পারো, তাতে কি! কোরান সম্পর্কে কম বাজে কথা এ যাবৎ বলেছো ! এখন জল ঘোলা করোনি, কিন্তু আগে তো করেছো। ভাল যে বলেনি, তুমি জল ঘোলা না করলেও তোমার বাপ ঘোলা করেছে, বাপ না করলেও তোমার বাপের বাপ করেছে, তাই তোমাকে আমরা চিবিয়ে খাবো।

চিঠি আসছে বিদেশ থেকে। নভেম্বরে নরওয়ের লেখক সম্মেলনে যাবার আমন্ত্রণ, অক্টোবরে ফ্রান্সের বই মেলায়, সুইডেনের লেখক-সংগঠন থেকে আমন্ত্রণ, আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাসের জন্য লেখালেখির ওপর বিদ্যে নেওয়ার আমন্ত্রণ, নিউ ইয়র্কে মেরেডিথ ট্যাক্স এর নারীবাদী লেখক সভায় আমন্ত্রণ। আমি নিজেই অবাক হই এমন সামান্য লেখকের জন্য এত বড় সম্মান দেখে। বিদেশি কেউ কেউ আমাকে বলেন, *আমাদের আশংকা হয় কবে কখন কে আপনাকে মেরে ফেলে। আপনি বরং অন্য কোনও দেশে চলে যান। বাংলাদেশ আপনার জন্য*

নিরাপদ নয়। আমি হেসে উড়িয়ে দিই এমন অলক্ষুণে প্রস্তাব। এ দেশ আমার, এ দেশ ছেড়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাবো কেন? আমি কি পাগল হয়েছি নাকি যে এমন কথা ভাবব? যতদিন বাঁচি এ দেশেই থাকবো। এ দেশে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আমি একা লড়াই করছি না। মৌলবাদ-বিরোধী একটি বড় শক্তি এ দেশে আছে, আমরা সবাই মিলে দেশটিকে মৌলবাদ মুক্ত করতে চাইছি, সবাই মিলে দেশটির মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। অন্য দেশে গিয়ে নিরাপদে জীবন যাপন করার কুৎসিত ভাবনাটি আমার দুঃস্বপ্নের মধ্যেও মুহূর্তের জন্যও কখনও উঁকি দেয় না।

তাণ্ডবের মধ্যেও জীবন যাপন করছি। শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি। লড়াকু বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, আলোচনা করছি, প্রেরণা পাচ্ছি, প্রেরণা দিচ্ছি, ভাবছি, লিখছি, পড়ছি, প্রতিবাদ করছি, মিছিলের মুখে পড়ছি, উল্টোদিকে দৌড়োচ্ছি, মিছিল চলে গেলে বেরোচ্ছি, আবার দৌড়োচ্ছি। গন্তব্য অনেক দূর, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে আমাদের। কিছু একটা করা শক্ত, কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। শামুকের মত গুটিয়ে থাকলে চলবে কেন! শান্ত হও, বাঁধন মানো, ধীরে বল, চিৎকার কোরো না। কিন্তু আমি শান্ত হচ্ছি না, বাঁধন মানছি না, ধীরে বলছি না, আমি চিৎকারই করছি। একটি সম্ভাবনাকে পিষে ফেলা হচ্ছে, সেই সম্ভাবনাকে ছিনিয়ে নিতে চাইছি দুর্বৃত্তদের হাত থেকে। আমি কি একা? না, আমার সঙ্গে অনেকেই আছেন। সরব এবং নীরব অনেকে। কাছের এবং দূরের অনেকে।

হঠাৎ একদিন অভাব এসে আমার দরজায় কড়া নাড়ে। অনেকদিন থেকেই আসছি আসছি করছিল, এবার এসেই পড়ে, ঢুকেই পড়ে চৌহদ্দিতে। না, এমন অভাবকে বরণ করলে চলবে না। আমার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, এই খবরটি চাউর হয়ে গেলে আমাকে খুবলে খাওয়ার জন্য শকুনের ভিড় বাড়বে। এতদূর এসে এখন কোনওভাবেই মাথায় হাত দিয়ে আমার বসে গেলে চলবে না। আমাকে সাহায্য করার জন্য কোথাও কোনও প্রাণী অপেক্ষা করে নেই। যত রকম মেরুদণ্ড আছে, সব মেরুদণ্ডই শক্ত করে আমাকে স্রোতের বিপক্ষে বৈঠা বাইতে হবে। কলাম লিখে টাকা রোজগারের একটি পথই এখন অবশিষ্ট। কিন্তু কলাম থেকে আসা টাকা দিয়ে সংসার চলে না। আমার লেখা থাকে বলে পত্রিকা আপিসে হামলা হয়, পত্রিকাগুলোও এখন লেখায় সরকার বা ধর্ম বিষয়ে কোনও মন্তব্য থাকলে ছাপছে না। ভয়। ভয় সরকারি বিজ্ঞাপন হারাবার। সরকারি রোষানলের শিকার হবার ভয়, মৌলবাদীদের হামলার ভয়। ইয়াসমিন আর মিলন সংসারের বাজার খরচ দিচ্ছে, তার ওপর ভালবাসার জন্য ওদের খরচ আছে। আমার টেলিফোনের বিল বাকি, বিল বাকি বিদ্যুৎএর। প্যারিস ছাড়ার পর ফরাসি প্রকাশক ক্রিশ্চান বেস আমার ঠিকানায় লজ্জা বইটির জন্য অগ্রিম রয়্যালটির চেক পাঠিয়েছিলেন। চেকটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম আমি।

চেক আসে না, কিন্তু ফোন আসে ক্রিশ্চান বেস এর। মাঝে মাঝে ফোন করে ভাল আছি কি না, নিরাপদে আছি কি না, কোনওরকম কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না ইত্যাদি জানতে চান। তাণ্ডবের খবর তো সবখানেই যাচ্ছে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন। টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলতে আমার এমনিতে লজ্জা হয়, কিন্তু ক্রিশ্চানকে আমি লজ্জার মাথা খেয়ে একদিন জিজ্ঞেস করেই বসি যে তাঁর যে চেক পাঠানোর কথা ছিল, তা কি তিনি পাঠিয়েছেন? ক্রিশ্চান আকাশ থেকে পড়েন শুনে।

ডডবল কি? আমি তো সেই কবেই তোমার ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকে চেক পাঠিয়েছি। সেই চেক তুমি নিশ্চয়ই জমা দিয়েছো তোমার ব্যাংকে। কারণ আমাদের ব্যাংক থেকে সে টাকা অনেক আগেই চলে গেছে।

ডডঅসম্ভব। এ হতে পারে না। আমি কোনও রেজিস্ট্রি ডাকে আসা কোনও চিঠি পাইনি, কোনও চেক পাইনি। কোনও চেকই ব্যাংকে চেক জমা দেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি জোর দিয়ে বলি।

ক্রিশ্চান ব্যাপারটির তদন্ত করবেন বলে ফোন রেখে দেন।

এর কদিন পর আবার ফোন করে বলেন ডডদেখ, আমি ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলেছি আমাকে তোমার চেক এর কপি পাঠাতে। ওরা চেক এক কপি যোগাড় করে আমাকে পাঠিয়েছে। আমার কাছে আছে, চেক এর পেছনে তোমার সই আছে।

আমি বলি, ক্রিশ্চান, আমি কোনও চেক পাইনি। কোনও চেক এর পেছনে আমি সই করিনি।

ক্রিশ্চান বলেন, এ কি করে হবে! তুমি না দাও, তোমার অ্যাকাউন্টে অন্য কেউ জমা দিয়েছে। তুমি খোঁজ নাও তোমার ব্যাংকে।

আমি কূল কিনারাহীন ভাবনায় ডুবতে থাকি। যে চেক আমার হাতে পৌঁছেনি, সেই চেক আমার অ্যাকাউন্টে কেউ জমা দিয়েছে। কিন্তু কারও হাতে যদি পড়ে আমার চেক, কি করে সে জানবে কোন ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট আছে?

আমি ব্যাংকে খোঁজ নিই। ব্যাংক থেকে জানানো হল, আমার অ্যাকাউন্টে কেউ কোনও চেক জমা দেয়নি।

তবে কার হাতে চেক পড়েছে? কে রেজেস্ট্রি ডাকের চিঠি রিসিভ করেছে? যদি অন্য কেউ রিসিভ করেই থাকে, তবে চেক ভাঙাবে কি করে, আমার নামের চেক আমার অ্যাকাউন্ট ছাড়া জমা হবে না। যদি আবদুল জলিল নামের কোনও চোর আমার চিঠি চুরি করে, চিঠির ভেতরে একটি চেক ও পেয়ে যায়, তবে চেকটি তো তার কোনও কাজেই লাগবে না।

এর মধ্যে ক্রিশ্চান আমাকে চেকএর কপিটি ফ্যাক্স করে পাঠান। যেহেতু আমার নিজের ফ্যাক্স মেশিন নেই, ইয়াসমিনের আপিসের ফ্যাক্স নম্বর দিয়েছিলাম তাঁকে। জরুরি কোনও চিঠি পত্র তিনি ফ্যাক্সে পাঠাবেন বলেছেন। চেক পেলাম বটে। তবে এ সত্যিকারের চেক নয়, আসল চেকটির ফটোকপির ফ্যাক্সকপি। চেক এর পেছনে বাংলায় তসলিমা নাসরিন লেখা। লেখা বটে, কিন্তু আমার হাতের লেখা নয়। এটি সই বটে, কিন্তু আমার সই নয়।

ভাবনার জলে ডোবা আমি পাশের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় কড়া নাড়ি। অ্যাপার্টমেন্টটি একজন ব্যাংকারের। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই চেক এর জট খোলার। তাঁকে সব বলি, চেকটি দেখাই। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, খুব সোজা ব্যাপার। যে আপনার চেক পেয়েছে, সে আপনার নাম দিয়ে যে কোনও ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়েছে।

ডড কিন্তু সে কি করে প্রমাণ করবে সে তসলিমা নাসরিন?

ডডএটি তো আরও সোজা, এই নামের একটি আইডি করে নেবে।

ডডযদি কোনও পুরুষ এটি পায়? তসলিমা নামের আই ডি কি করে করবে?

এর মত সহজ জিনিস আর হয় না। লোকটির বউ কিংবা বোনের ছবি দিয়ে নাম তসলিমা নাসরিন বলে একটি মিথ্যে আইডি করে নিল। কে এখানে খোঁজ নিচ্ছে কার আসল নাম কী! আর যদি সিঙ্গাপুরে হয়..

সিঙ্গাপুরে?

হ্যাঁ ওখানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল দল আছে, এদের কাজই ডাকে পাঠানো চেক চুরি করা। ওখানে বা অন্য কোনও দেশে চেক ভাঙালে তসলিমা নামটি যে কোনও মেয়ের নাম, তাও তো বুঝবে না।

আমি আঁতকে উঠছি এসব শুনে। এত জটিল কথা ব্যাংকার এমন ভাবে বলছেন, যেন এসবের মত সহজ সরল জিনিস আর হয় না।

'একটি প্রশ্ন। আমার ঠিকানায় তো চিঠিপত্র আসছে। কোনও চিঠি তো মার যায় না। কিন্তু চেকঅলা চিঠিটি মার গেল কেন?'

'পোস্টাপিসে অভিজ্ঞ লোকেরা থাকে, খাম দেখলেই বোঝে কোন খামের ভেতর চেক আছে।'

'কিন্তু আমি এখন কি করে টাকা পাবো?'

'আপনি পাবেন না।' গলাটি এখন আরও শান্ত। নিশ্চিন্ত।

হলুদ হলুদ লাগে সবকিছু। সর্ষেফুলও বুঝি কারও চোখে এত হলুদ লাগে না।

'তাহলে টাকাটা কিছুতেই আমার আর পাওয়া হচ্ছে না?'

মাথা নাড়লেন, 'না'।

ব্যাংকারের ব্যাখ্যার পরও আমার ইচ্ছে করে না কোনও অন্যায় চুপচাপ মেনে নিতে। জাতীয় ডাকঘর আপিসে নিজে গিয়ে এর *মাথার* কাছে আমার শান্তিনগরের বাড়ির ঠিকানার চিঠি যে চুরি হয়েছে বলি। তিনি আমাকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলেন। তাও দিই। *মাথার* কোনও মাথাব্যথা নেই আমার চিঠি আর চিঠির পেটের চেক চুরি হওয়া নিয়ে। তদন্তের কোনও রিপোর্ট আমার কোনওদিনই পাওয়া হয় না।

তদন্ত করতে কেউ ডাকঘরে যান না, তবে তদন্ত করতে আমার বাড়িতে আসেন। যখন হতাশা আমাকে ভাসাচ্ছে ডোবাচ্ছে, অভাবের হুলঅলা হিংস্র মশকরা আমাকে নিয়ে নিরবধি মশকরা করছে,তখন ইনকাম ট্যাক্সএর আপিস থেকে দুজন লোক এলেন আমার বাড়িতে। ঘরে ঢুকে ঘরের জিনিসপত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বললেন, কমপ্লেইন এসেছে, আপনার বাড়িতে নাকি দামি ফার্নিচার আছে। আমরা তদন্ত করতে এসেছি।

আমি যে অকারণে অপদস্থ হচ্ছি, অপমানিত হচ্ছি, আমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আমাকে যে পাঁকে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, আমি বুঝি। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যে শক্তি আর সাহস ছিল আমার, সেটি টেনে ছিঁড়ে টুকরো করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে মানুষ। আমি আমার মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছি, আমাকে ধাককা দিয়ে গভীর খাদে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে। খাদে পড়ে যেন আমি মরি অথবা যদি না মরি আমি যেন কেঁচোর মতো পড়ে থাকি, আর সব কেঁচোর সঙ্গে কেঁচোর জীবন যাপন করি। আমি মুঠোবন্ধ করি দুই হাত। আমার শেষ শক্তিটুকু কেড়ে নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠছে লোকে। আমার অক্ষমতার জন্য আমার রাগ হয়। লজ্জায় ঘৃণায় হতাশায় আমি কুঁকড়ে থাকি। আমার শক্তি সাহস সব উবে যেতে থাকে। মনে হতে থাকে আমি কোনও গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি। গর্তে আর সব কেঁচোর সঙ্গে কেঁচোর জীবন যাপন করছি।

কেঁচো তার গর্ত থেকে শুনতে পাচ্ছে বাইরের চিৎকার, *ফাঁসি চাই, দিতে হবে।*

চার, জুন। শনিবার

ফোন এল। একটি কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরটি অচেনা।

ডডআপনার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট হয়েছে। আপনি বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।

ডডআপনি কে বলছেন?

ডডআমাকে আপনি চিনবেন না।

ডডনাম বলেন।

ডডআমার নাম শহিদ। আমি আপনার শুভাকাঙ্খী। আপনার বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে, আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দেরি করবেন না।

কি কারণে হুলিয়া জারি এসবের কিছুই না বলে ফোন রেখে দিল লোকটি। শহিদ নামের কোনও লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। ভাবি, কী কারণ থাকতে পারে এই ফোনের! লোকটি যে ই হোক, লোকটি চাইছে আমি যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। কোনও ষড়যন্ত্র এর পেছনে লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই। ভাবতে ভাবতে আমি বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে থাকি সামনের রাস্তায় কোথাও কেউ সন্দেহজনক দাঁড়িয়ে আছে কি না। সম্ভবত আশে পাশের কোথাও থেকে লোকটি ফোনটি করেছে, আমি বেরিয়ে গেলে সে তার দলের লোক নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কৌশলে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে আমাকে মেরে ফেলার ফন্দি এঁটেছে লোক। বাইরে বেরোবার দরজা দুটো একবার দেখে নিই খিল আঁটা আছে কি না। কদিন আগে একটি ফোন এসেছিল এরকম, সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে সোজা বলল, আপনার বাড়িতে পুলিশ আসছে। কেন পুলিশ আসছে, কি করতে আসছে কিছুই জানায়নি সেই সাংবাদিক। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে যাদুকর জুয়েল আইচ ফোন করলে পুলিশ আসছে এই খবরটি দিই। জুয়েল আইচ তক্ষুনি ভীত উত্তেজিত স্বরে বললেন, তসলিমা আপনি এক্ষুনি বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।

ডডকোথায় যাবো এ সময়?

ডডকোথাও কারও বাড়িতে চলে যান। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, কি ভয়ংকর কাণ্ড যে হয়ে যেতে পারে। পুলিশের ওপর কোনও বিশ্বাস নেই।

ডডএ সময়ে কার বাড়িতে যাবো! রাত হয়ে গেছে..। মিনমিন করি।

ডডরাত হয়েছে তাতে কি! আশে পাশের ফ্ল্যাটে কোথাও চলে যান।
ডডকাউকে তো চিনি না।
ডডআমার এক চেনা লোক আছে দু নম্বর বিল্ডিংএ। আমি তাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। আপাতত তার বাড়িতে চলে যান।
ডডকিন্তু গিয়েই বা কি লাভ। ফিরে তো আসতেই হবে নিজের বাড়িতে। কারও বাড়িতে লুকিয়ে থেকে কি আর অ্যারেস্ট এড়ানো যাবে। পুলিশ আজ না হোক কাল আমাকে খুঁজে পাবেই। তার চেয়ে যেখানে আছি সেখানেই থাকা ভাল।
জুয়েল আইচ আরও কয়েকবার আমাকে বাড়ি ছাড়ার জন্য অনুরোধ করে ফোন রাখলেন দু নম্বরের চেনা লোককে ফোন করতে। আমি যাইনি বাড়ি ছেড়ে। পুলিশও আসেনি আমার বাড়িতে।
এ ধরনের কোনও ফোনের খবরকে বিশ্বাস করার কোনও মানে হয় না। এটি নেহাত ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। ফোনে আমাকে হুমকি দেওয়া হয়, গলা কেটে রাস্তায় ফেলে রাখবে, মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে, কিন্তু বলাই সার, হাতে নাতে আততায়ীরা আমাকে কখনও পায়নি। এবার বোধহয় এই ফন্দিই এঁটেছে, পুলিশ আসছে বলে ভয় দেখিয়ে বাড়ির বার করবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই খপ করে ধরে ফেলে গলাটি আল্লাহু আকবর বলে কেটে সওয়াব কামাবে। চলে যাই আমার লেখার ঘরে, যে লেখাটি লিখছিলাম লিখতে থাকি। এরপর আধঘন্টা পর আবার ফোন। এবারের লোকটিও অচেনা। এবারের লোকটিও বলল, আমাকে আপনি চিনবেন না।
কে আপনি? নাম কি?
বললাম তো, আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি কোর্ট থেকে বলছি। এডভোকেট শাহাদাত। আপনার বিরুদ্ধে গভরমেন্ট কেইস করেছে। অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে গেছে। আপনি বাড়ি থেকে আপাতত কোথাও চলে যান।
এই ফোনটি আমাকে ভাবালো। দুটি ভিন্ন লোক দুটি ভিন্ন জায়গা থেকে বলছে যে আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছে। তবে কি সত্যিই হুলিয়া জারি হয়েছে? তাই বা হবে কেন! মৌলবাদীদের মিছিল বেরোলে সরকার থেকে আমাকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে, যদিও গোয়েন্দা পুলিশ আছেই পেছনে, কিন্তু বাড়ির সামনে তো কিছু পুলিশ অন্তত দাঁড় করানো হয় যখন মিছিল যায় আমার ফাঁসি চেয়ে! এই সরকার কেন আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে? মামলা যদি করে কেউ, সে তো মৌলবাদীর দল। দ্বিতীয় লোকটি যখন কথা বলছিল ফোনে, প্রচুর লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। হতে পারে লোকটি যা বলছে, ঠিকই বলছে যে সে কোর্ট থেকে কথা বলছে। লোকটি যদি সত্যিই উকিল হয়ে থাকে, তবে তার পক্ষে হুলিয়ার খবরটি জানা কঠিন নয় মোটেও। কিন্তু তারপরও আমার বিশ্বাস হতে চায় না যে সরকার আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো আমাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নিরবধি বলে যাচ্ছে। ফতোয়ার খবরটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। এখন সরকার আমাকে নিরাপত্তা না দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে! আমি ধন্দে পড়ি। কিছুই ঠিকমত আমার মাথায় ঢুকছে না। অংকে মিলছে না কিছুই। নিচে এখন দুরকম পুলিশ বসে, গত একমাস থেকে পাহারা পুলিশ বসছে ইস্টার্নের গেইটের

সামনে আর সাদা পোশাকের গোয়েন্দাগুলো তো হাঁটাহাঁটি করছেই বাড়ির চারপাশে। আবার আমি বারান্দা থেকে উঁকি দিই ভিড়ের রাস্তায়, কোথায় কিসের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আততায়ী, খুঁজি। কোনও লোক তাকাচ্ছে কি না ঘন ঘন এই বাড়িটির দিকে, দেখি। রাস্তা থেকে চোখদুটো সরাতে নিলেই চোখ পড়ে রাস্তার ওপারের তিনতলা একটি বাড়ির বারান্দায় দুটো লোকের দিকে, আমাকে দেখছে লোক দুটো, দেখছে আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আগে কখনও লোকদুটোকে দেখিনি ও বাড়িতে! ফোনের ওপারের লোকদুটোর সঙ্গে কি বারান্দার এই দুটো লোকের কোনও সম্পর্ক আছে! আছে হয়তো। আমাকে কৌশলে বারান্দায় বের করে চাইছে গুলি করতে! খুব সহজে ওই বারান্দা থেকে আমার দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়া যায়! চকিতে একটি ঠাণ্ডা কিছু বুকের ভেতর উথলে ওঠে। দ্রুত সরে আসি বারান্দা থেকে। পর্দা টেনে দিই। কত রকমের আধুনিক অস্ত্র যে এখন মানুষের হাতে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু ধনী দেশ থেকে এখানে অর্থ আর অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে আসছে। আততায়ীর অভাব হওয়ার তো কথা নয়।

এ মুহূর্তে ঠিক কি করা উচিত আমার বুঝে পাই না। পায়চারি করি। শেষ পর্যন্ত ফোন করি ডক্টর কামাল হোসেনের আপিসে। ফোন ধরলেন সারা হোসেন। সারাকে বললাম, দুটো লোক কিছুক্ষণ আগে ফোনে আমাকে জানিয়েছে যে আমাকে অ্যারেস্ট করার জন্য ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার, তা কেন হবে!

তাই তো! সারাও বললেন, তা তো হওয়ার কথা নয়। এরকম কিছু তো সারাদিন শুনিনি। দেখি আমি খবর নিচ্ছি। কিছু খবর জানতে পারলে আপনাকে জানাবো।

সারা নিজে দায়িত্বটি নিয়ে আমাকে নির্ভার করেন।

আমাকে আধঘন্টা পর ফোন করে জানালেন সারা যে তিনি আদালতে লোক পাঠিয়ে জেনেছেন খবরটি সত্য। মতিঝিল থানা থেকে নূরুল আলম নামের এক পুলিশ অফিসার মামলা করেছে আমার বিরুদ্ধে। আমাকে গ্রেফতার করার জন্য হুলিয়া জারি হয়েছে।

মাথা চরকির মত ঘুরে ওঠে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কি করব। যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ ঢুকবে ঘরে, হাতদুটোতে হাতকড়া পরাবে, কোমরে হয়ত রশিও বাঁধবে, টেনে নিয়ে যাবে নিচে, ঘাড় ধাককা দিয়ে পুলিশের ভ্যানে ওঠাবে।

ডডকী অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে?

ডড আপনি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন।

ডডএখন কী করা উচিত? সারাকে নিস্তেজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি।

সারা শান্ত গলায় বললেন, জামিন নিতে হবে। অন্যান্য উকিলের সঙ্গে কথা বলে জামিনের ব্যাপারটা দেখছি।

খানিকটা স্বস্তি জোটে। জামিন নেওয়ার পর মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কামাল হোসেনের মত উকিল থাকতে আমার মুষড়ে পড়ার কিছু নেই। কিছু নেই কিন্তু তারপরও একটি সংশয় আমার ভেতর থেকে যায় না। পুলিশ যদি আমাকে সত্যি সত্যিই গ্রেফতার করে নিয়ে যায়! আজকাল আদালতের বিচারকদের মধ্যেও

মৌলবাদী থাকে, পুলিশের মধ্যেও নিশ্চয়ই মৌলবাদী আছে। আমাকে তো হাজতেই পিষে মেরে ফেলবে। সংশয়টি মাকড়শার জালের মত আমাকে আটকে ফেলে।

নানি আর ঝুনু খালা বেড়াতে এসেছেন, মা ওঁদের জন্য রান্না করছেন। মিলন আর ইয়াসমিনের দিকে ছুঁড়ে দিই হুলিয়া জারি হওয়ার খবরটি। ওরা তেমন গা করে না। অনেকদিন থেকেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর শুনতে শুনতে ওরা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। হুলিয়া ব্যাপারটি যে ঠিক কি, তা সম্ভবত ওরাও অনুমান করতে পারে না। দুজনের কারও মুখে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করি না। ওরা, যে কোনও খবরের মত খবরটি শুনে যে যার কাজে চলে যায়। ইয়াসমিন ভালবাসাকে ঘুম পাড়াতে, মিলন গোসল করতে।

মা, আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু হইছে। পুলিশ আইতাছে। শেষ পর্যন্ত মাকে বলি।

মা বলেন, কি কস এইসব আজে বাজে কথা!

ডডআজে বাজে না। ঠিকই কইতাছি।

ডডপুলিশ আইব কেন? কি করছস তুই?

ডডজানি না কি করছি। সরকার নাকি মামলা করছে। মতিঝিলের কোন এক পুলিশ অফিসার নাকি কইছে যে আমি তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিছি।

ডডতরে কত কইছি আল্লাহ রসুল নিয়া কিছু লেখিস না। আমার কথা ত শুনছ না।

মাও সম্ভবত বিশ্বাস করছেন না যে সত্যি সত্যিই পুলিশ আসছে আমাকে গ্রেফতার করতে। এর আগে বাঘ আসছে বাঘ আসছের মত পুলিশ আসছে তিনি শুনেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে পুলিশ আসেনি। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন পুলিশ আসছে, তখন বিশ্বাস করতে কেউ চায় না। অসহায় রাখালের মত নিজেকে লাগে। এবারের পুলিশ আসছে রবটি যে কোনও গুজব নয় তা কি করে কাকে বোঝাবো!

নানি এই প্রথম এসেছেন আমার বাড়িতে। বাড়ি কেনার পর মাকে বলেছিলাম যেন একবার নানিকে নিয়ে আসেন ঢাকায়। নানি তাঁর ময়মনসিংহের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চান না। তাঁকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসা ঝুনুখালার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল। নানির সঙ্গে বসে খাবো আমি, মা খাবার দিচ্ছেন টেবিলে। খেয়ে দেয়ে পানের বাটা খুলে নানির হাতের বানানো একটি পান খাবো, পাশাপাশি শুয়ে গল্প করব, কত দিন পর আমাদের দেখা! নানি বারবারই বলছেন, নাসরিন, আমার কাছে আইসা ব একটু, ক কেমন আছস। খবর টবর ক।

মাথায় আমার হুলিয়া, স্থির হয়ে কি করে বসব আমি!

মা ডাকছেন খেতে। ক্ষিধে উবে গেছে অনেকক্ষণ। অস্থিরতা আমাকে ফোনের কাছে টেনে নেয়। একটি ফোন করি চেনা একজন আইনজীবীকে, সেই একজনের নাম ধরা যাক ক। ককে জানালাম বৃত্তান্ত। ক সব শুনে আমাকে বললেন, এক্ষুনি বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।

ডডকোথায় যাবো আমি? কিছু তো বুঝে পাচ্ছি না..

ডডকোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে চলে যান।

ডডকিন্তু..

ডডকিন্তু কি?
ডডপালাবো কেন! বাড়িতে থাকাই তো ভাল।
ডডউফ আপনি বুঝতে পারছেন না। আপাতত আমার বাড়িতে চলে আসুন। এখানে বসে ঠিক করেন কোথায় যাবেন।
ডডএখনও তো পুলিশ পাহারা আছে। পুলিশ একদিকে আমাকে যদি নিরাপত্তা দেয়, তবে আবার গ্রেফতার করবে কেন?
ডডকি মুশকিল! পুলিশ যদি আমাকে গ্রেফতার করতে চায়, তবে তো কোনও বাড়িতে গিয়েও কোনও লাভ হবে না। খুঁজে তো আমাকে পাবেই।
ডডএসব ভেবে সময় নষ্ট করবেন না তো। বাড়ি থেকে বেরোন তাড়াতাড়ি।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপদেশটি আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু এ সময় নিজের বুদ্ধিতে কিছু করার চেয়ে আইন অভিজ্ঞ মানুষের উপদেশই পালন করা উচিত, পছন্দ না হলেও। মিলন গোসল সেরে বেরোতেই মিলনকে বাইরে যাওয়ার জন্য দ্রুত তৈরি হতে বললাম।
ডডকই যাইবেন?
ডডতাড়াতাড়ি চল। কথা কওয়ার সময় নাই।
মিলন লুঙ্গি পাল্টে প্যান্ট পরে নিল। আমি যে কাপড়ে ছিলাম, সেটি পরেই।
মার মুখ মুহূর্তে পাল্টে গেল যখন দেখছেন আমি দরজার দিকে এগোচ্ছি।
কই যাইতাছস? কখন ফিরবি? মার কাঁপা কণ্ঠ।
জানি না। বলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকি নিচে।
পেছনে দরজায় হতভম্ব দাঁড়িয়ে আছেন মা, নানি, ঝুনুখালা, ইয়াসমিন।
দৌড়ে গাড়িতে উঠি। মিলনও। সাহাবুদ্দিনকে দ্রুত পার হতে বলি ইস্টার্ন পয়েন্ট। যেন বাইরে থেকে গাড়ির ভেতরে বসা আমার চেহারাটি কারও দেখার সুযোগ না হয়, যেন আমাকে চিনে ওঠার আগেই আমার গাড়ি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন কারও সময় এবং সুযোগ না হয় গাড়িটি থামানোর। গেটের কাছে পাহারার দুটো পুলিশ বসে আছে। সাহাবুদ্দিন কখনও গাড়ি দ্রুত চালান না। সাহাবুদ্দিন তো বটেই আমিও পছন্দ করি ধীর গতিতে গাড়ি চালানো। আজ আমার তাড়া দেখে তিনি ঝড়ের বেগে চালালেন। ক তাঁর বাড়িতে বসে ছিলেন আমার অপেক্ষায়। গাড়িটি যদি পুলিশের চোখে পড়ে তাহলে জেনে যাবে যে আমি এখানে। সুতরাং বাড়ির সামনে থেকে গাড়িকে বিদেয় করতে হবে। ব্যাপারটি আমার মাথায় আসেনি, এসেছে কর মাথায়। ক-ই মিলনকে বললেন চলে যেতে। পই পই করে বলে দিলেন,কাউকে যেন সে না জানায় আমি কোথায়, কার বাড়িতে ইত্যাদি কোনও কিছু। ক ইতিমধ্যে তাঁর কজন আইনজীবী বন্ধুকে ফোন করে জেনেছেন এ সম্পর্কে। দণ্ডবিধির ২৯৫ (ক) ধারাটি, দেড়শ বছর আগের পুরোনো আইন, ব্রিটিশের তৈরি, এই প্রথম কারো বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হল। কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে যদি কেউ আঘাত করে, তবে এর শাস্তি দু বছরের কারাদণ্ড আর জরিমানা। কিন্তু সবচেয়ে বাজে ব্যাপারটি হল, এই মামলায় জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়।
তার মানে কি? জামিন হবে না?

ক মাথা নাড়েন। হবে না।
এ কোনও কথা হল? সবারই তো শুনি জামিন হয়।
হ্যাঁ হয়। খুনীর বিরুদ্ধে মামলা হলেও তো জামিন হয়।
খুনীদের হয়! তবে আমার জামিন হবে না কেন?
ক হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, আপনাকে হয়ত খুনী বদমাশের চেয়েও ভয়ংকর কিছু ভাবছে সরকার।
পুলিশ অফিসার মামলা করেছে, এই মামলা ব্যক্তির না হয়ে সরকারের হবে কেন? কর কাছে জানতে চাই।
ক বলেন, পুলিশ অফিসার যখন মামলা করেন, তবে তা সরকারি মামলাই। আরেকটি অদ্ভুত নিয়ম, সরকারি অনুমোদন ছাড়া এ মামলা কেউ করতে পারে না। তার মানে আমি যদি এই আইনে শায়খুল হাদীসকে ফাঁসাতে চাই, বলি যে শায়খুল হাদীস আমার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে, হবে না। সরকারের অনুমোদন লাগবে। প্রধানমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সই চাই। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনও আদালতই এই মামলা নেবে না।
কর মা খ ঢোকেন আমাদের আলোচনায়। ক তাঁর মাকে আগেই জানিয়েছেন ঘটনা। খ বললেন, এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে জামিনের জন্য চেষ্টা করা।
আমি বলি, কিন্তু জামিন নাকি হবে না!
খ বলেন, খুব বিদঘুটে ব্যাপার। কিন্তু অন্য কোনও উপায় তো নেই। তোমার উকিল এসব ব্যাপারে জানবেন ভাল। তাঁরা হয়ত কোনও ফাঁক ফোকর পেতে পারেন।
নাকি পুলিশের কাছে ধরা দেব? আমি জিজ্ঞেস করি।
ক বলেন, ধরা দেওয়া ঠিক হবে না। ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপার, পুলিশের মধ্যেই মৌলবাদী থাকতে পারে।
খ ও এই ব্যাপারে এক মত। তিনি বললেন, তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য মৌলবাদীরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। তুমি গ্রেফতার হলে তাদের জয় হবে। সরকারকে চাপ দিয়ে তারা এই মামলা পর্যন্ত করিয়ে নিতে পেরেছে। চাপ দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাও করতে পারে।
ক গম্ভীর গলায় বললেন, সময়টা বড় খারাপ তসলিমা। খুব ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হুট করে কিছু করা চলবে না। জামিন না হওয়া পর্যন্ত আপনি কোথাও লুকিয়ে থাকুন, কোনও নিরাপদ জায়গায়।
কিন্তু কোথায় লুকোবো?
এ বাড়িতে আপনি লুকিয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু..
খ বললেন, এ বাড়িতে সম্ভব নয়। ওর গাড়ি ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছে এ বাড়িতে। ওর গাড়ি তো এমনিতেই পুলিশ ফলো করে। তাছাড়া অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট পেয়ে পুলিশ এখন ওর নিজের বাড়িতে ওকে না পেয়ে যে সব বাড়িতে ওর যাতায়াত ছিল সেসব বাড়িতে ওকে খুঁজতে যাবে, এবাড়িতেও আসতে পারে।

এত কথা আমার মাথায় আসেনি। ক এবং খ দুজনে নিজেদের মধ্যে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে এ বাড়ি থেকে যত শীঘ্র সম্ভব চলে যেতে হবে। কিন্তু কোন বাড়িতে আমি লুকোতে যাবো! কারও বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটি আমার কাছে বিচ্ছিরি লাগছে। কিন্তু ক এবং খর কাছে লুকিয়ে থাকার বিষয়টি যেন বিষয়ই নয়। বাড়ি নিয়ে ভাবনার দায়িত্ব ক এবং খ নিলেন।

রাত নামার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রাত ঘন না হলে রাস্তায় বেরোনো যাবে না। ওদিকে পুলিশ আমাকে খুঁজছে নিশ্চয়ই। এদিকে পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্য রাতের আশ্রয় খোঁজা হচ্ছে। খ কারও সঙ্গে কথা বললেন ফোনে, বললেন যে তিনি যাচ্ছেন তাঁর বাড়িতে, একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। বিস্ময়টি কি ওপাশ থেকে জানতে চাওয়া হয়। খ কিছুই ভেঙে বলেননি। রাত ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে ফোন করে ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে আসতে বললেন। খ নিজের গাড়িতে আমাকে নিয়ে কোথাও যাবেন না। কারণ পুলিশ যদি এর মধ্যে জেনে যায় যে আমি খর বাড়িতে এসেছি, তবে খ র গাড়ি কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে তার খোঁজ নেবে। আত্মীয়ের গাড়িটি এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। পেছনের আসনে আমাকে বসিয়ে দু পাশে ক এবং খ বসেন। আত্মীয় সামনে। ক আর খ দুজনই আমার মাথায় শাড়ির আঁচল টেনে দিতে বললেন। আঁচল টেনে অভ্যেস নেই আমার, পারি না টানতে। লজ্জায় হাত যায় না আঁচলে। খ নিজে আঁচল উঠিয়ে দেন। মুখ ঢেকে রাখতে হল আঁচলে যেন রাস্তার আলো আমার মুখে পড়লেও কেউ বাইরে থেকে চিনতে না পারে যে এ আমি, খুনের আসামীর চেয়েও বড় আসামী। ক, খ এবং খ এর আত্মীয় অনেকক্ষণ কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন না। সকলের এক চোখ ভেতরে, আরেক চোখ বাইরে, ভিড়ের রাস্তায় গাড়ির গতি স্লথ হলে চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনজনই। না, এভাবে স্তব্ধ বসে থাকলে চলবে না। চলবে না বুঝেই সম্ভবত খ কথা বলতে শুরু করলেন। এমনি কথা, ঘর সংসারের কথা। বাইরে থেকে পুলিশের যদি চোখে পড়ে গাড়িটি, যেন না ভাবতে পারে যে এই গাড়ির ভেতরের মানুষগুলো ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। গাড়ি থামালে সর্বনাশ। পাঁচটা টুপি পরা লোক হনহন করে এগিয়ে আসছে ফুটপাত ধরে, গাড়ি থেমে আছে রিক্সার ভিড়ে, ক আমার মুখটি তার মাথা দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছেন। এরপর খ আমার পিঠে ধাককা দিয়ে শরীর উপুড় করে দিলেন। রিক্সা কাটিয়ে গাড়ি কিছুদূর সামনে এগোনোর পর মাথা তুলি, ভয় কেবল আমার হৃদপিণ্ডে হাতুড়ি পেটাচ্ছে না, ক এবং খকেও নিস্তার দিচ্ছে না, বুঝি। মাথা তোলার পরই দেখি দু গজ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের গাড়ি। খ গলা চেপে বললেন, *শুয়ে পড়।* ওটুকু জায়গা শুয়ে পড়ার জায়গা নয়। চোখ নামিয়ে রাখি, নাক মুখের ওপর আঁচল টেনে দিই, মাথা ঢাকা। ক খ সকলেই নিজ নিজ মাথায় আঁচল বা ওড়না তুলে দেন। খর আত্মীয়ও তাই করেন। গাড়ির চারজনের মধ্যে একজন পর্দানশীন হলে পুলিশের সন্দেহ হতে পারে। সকলে আমরা মুহূর্তের মধ্যে ভদ্র ঘরের পর্দানশীন মহিলা বনে যাই। মৌলানা বরকতউল্লাহর দুই বিবি আর দুই কন্যা কোনও আত্মীয়র বাড়ি যাচ্ছে, পুলিশকে এরকম একটি সাধারণ কিছু ভাবার সুযোগ দেওয়া হয়। পুলিশ পার হলে

গাড়ির ভেতরের মানুষগুলোর মাথা থেকে আঁচল খসে না। বলা যায় না, আবার কোন মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের লোক। গাড়ি নিঃশব্দে পথ পেরিয়ে গুলশানের একটি বাড়ির দরজায় থামে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে মিশে বাড়ির সামনের মাঠে এসে থামি। পর্দার তলায় একটি কালো মিশমিশে ভয় দাঁত মেলে আছে। গালে দুটো শক্ত চড় কষিয়েও এর দাঁত লুকোতে পারি না।

বাড়ি থেকে ঘেউ ঘেউ করে একটি কুকুর বেরিয়ে এল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামাতে একজন ভদ্রলোক পেছন পেছন দৌড়ে এলেন। ভদ্রলোক কুকুর নিয়ে ভেতরে ঢুকে বারান্দার আলো নিবিয়ে দিলেন। অন্ধকারের পেছন পেছন আমরা। ভদ্রলোকের স্ত্রী, ধরা যাক তিনি গ, আমাদের ভেতর ঘরে নিয়ে ক এবং খ র মুখে ঘটনার অতি সামান্য শুনেই গ ঘরের আলো কমিয়ে দিলেন। দরজা জানালা সব বন্ধ করে আমাদের সামনে চিন্তিত মুখে আইনের একটি বই হাতে নিয়ে বসলেন। আইন নিয়ে ক এবং গর মধ্যে কথা হয়। খুব নিচু স্বরে কথা হয়। কারও মুখ তেমন স্পষ্ট করে আর দেখা যায় না। কথা যা হয়, বেশির ভাগ কথাই আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। গর সঙ্গে কথা শেষ করে ক আমাকে বললেন যে কাল তিনি আমার উকিলের সঙ্গে জামিনের ব্যাপার নিয়ে কথা বলবেন, জানতে চাইবেন কোনও রকম ফাঁক ফোকর আছে কি না জামিন নেওয়ার। আজ রাতটি গ রাজি হয়েছেন আমাকে তাঁর বাড়িতে রাখতে। এক রাতের বেশি তিনি রাজি নন, কারণ, তাঁর ভয় আশেপাশে দূতাবাস থাকার কারণে প্রচুর পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়, যে কোনও সময় তারা জেনে যেতে পারে যে আমি এ বাড়িতে আছি। এ বাড়ির চাকর বাকর আমার বদনখানি দেখলেই চিনে ফেলবে আমি কে, বাইরে গিয়ে কারও কাছে যদি বলে দেয় অতিথির পরিচয়, তবেই জানাজানি হয়ে যাবে। ক আরও বললেন, জামিন পেতে যদি দেরি হয়, তবে কোথায় আমি লুকিয়ে থাকব, সে ব্যবস্থা যেন আমি করে নিই। তিনি মিলনকে খবর দেবেন, মিলন আমাকে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে কোনও গোপন জায়গায়। গোপন জায়গাটির কথা যেন আমি ভেবে রাখি।

জায়গা তো কতই আছে। কিন্তু গোপন কোনও জায়গা তো আমার নেই। কার বাড়িতে আমি যাবো নিজেকে লুকিয়ে রাখতে, ভাবি। খ জিজ্ঞেস করলেন আমার কোনও আত্মীয় আছে কি না ঢাকায়। মামা আর খালা আছেন, বলি। বন্ধু আছে? কোনও বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া যায় না? তা নিশ্চয়ই যায়। বন্ধুরা খবর শুনলে তো আমাকে সব রকম সাহায্য করবে। ক বললেন, পুলিশ ওসব জায়গায় আপনাকে খুঁজতে যেতে পারে। এমন কেউ আছে যাদের আপনি চেনেন কিন্তু তাদের বাড়িতে আগে যাননি?

অসহায় বালিকা মাথা নাড়ি। মনে হচ্ছে মাথা পাথর হয়ে আছে, মাথায় কিছু ঢুকছে না, মাথা থেকে কিছু বেরোচ্ছে না।

গ বললেন, এ সময় তো ওকে কোনও অ্যামবেসিতে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দিতে পারে। কারও বাড়িতে থাকার চেয়ে অ্যামবেসিতে থাকা নিরাপদ। কোনও অ্যামবেসিতে ঢুকে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না।

আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠি মনে মনে তুড়ি বাজিয়ে, আমার সঙ্গে আমেরিকান অ্যামবেসির ফার্স্ট সেক্রেটারির পরিচয় আছে। তিনিই তো আমার পাসপোর্ট নিয়ে দিলেন।

বাহ! ক,খ, গ নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেললেন।

গ বললেন, আপনি আজ রাতেই ফোন করুন অ্যামবেসির লোককে। এরকমও হতে পারে আজ রাতেই আপনাকে ওরা নিয়ে যাবে।

গ আমেরিকার দূতাবাসের ফোন নম্বর যোগাড় করে আমাকে দেন। দূতাবাসে ফোন করলে একজন রক্ষী ফোন ধরেন। অ্যাণ্ড্রুর খোঁজ করলে রক্ষী জানান, অ্যাণ্ড্রু এখন বাড়িতে। রক্ষীকে অনুরোধ করি যেন অ্যাণ্ড্রুর বাড়িতে ফোন করে জানান যে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই, চাই আজ রাতেই। আধঘন্টা পর আবার ফোন করে রক্ষীর কাছ থেকে অ্যাণ্ড্রুর বাড়ির টেলিফোন নম্বর নিই। রাত তখন অনেক, অ্যাড্রু শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে হুলিয়ার খবরটি দিয়ে কোনও রকম রাখ ঢাক না করে আমাকে যেন দূতাবাসে তিনি আশ্রয় দেন, সেই অনুরোধ করি। অ্যাড্রু বললেন এই রাতে এখন কিছুই করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, আমি যেন কাল সকালে তাঁকে আপিসে ফোন করি।

ক, খ এবং আত্মীয় চলে গেলেন, আমাকে বলে গেলেন, আমি যেন ভুলেও ফোন না করি আমার বাড়িতে। কারণ বাড়িতে ফোন নিশ্চয়ই ট্যাপড হচ্ছে, পুলিশ জেনে যাবে আমি কোথায় আছি।

সারারাত একটি অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকি। এক ফোঁটা ঘুম আসে না।

পাঁচ জুন, রবিবার

সকালে গ অনেকগুলো পত্রিকা সামনে নিয়ে বসেছিলেন। প্রতিটি পত্রিকায় প্রথম পাতায় আমার ছবি সহ গ্রেফতারি পরোয়ানার খবর। আমি পত্রিকাগুলো দেখতে চাইলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন যে সকালে তিনি কাজের লোককে দেখেছেন মন দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। লোকটি লেখাপড়া জানে, সুতরাং কেবল ছবি দেখেই শেষ করেনি, খবরও পড়েছে। এ বাড়ির অতিথির দিকে কাল রাতে তার চোখ না পড়লেও আজ তো চোখ পড়বে। তাকে, কাজের লোককে হঠাৎ করে তিনি এখন ঘরবন্দি করতে পারেন না। বাইরে পাঠিয়ে দিতেও পারেন না। তাহলে সন্দেহ আরও ঘন হবে।

প্রতিটি পত্রিকায় গ্রেফতারি পরোয়ানার খবর।

<u>ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনার অভিযোগ এনে তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি</u>

লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ঢাকার মতিঝিল থানার ওসি মোঃ নুরুল আলমের দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে গতকাল ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম শহীদউদ্দিন আহমেদ এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছেন। বাদী তার আরজিতে উল্লেখ করেন, তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও সাম্প্রতিককালে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম বিদ্বেষী বহু কটূক্তিপূর্ণ মন্তব্য করছেন যা বহুলভাবে প্রচারিত হচ্ছে। বিবাদী সজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এইরূপ দুরভিসন্ধিমূলক কাজে লিপ্ত আছেন। বাদী তার আরজিতে বলেন, গত ৯ মে তসলিমা নাসরিন তাঁর দেওয়া কলকাতার ইংরেজি দৈনিক দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পবিত্র কোরান শরীফ মানব সৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি কোরান শরীফের আমূল পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন চান। ১১ মে উক্ত পত্রিকায় তাঁর লেখা একটি চিঠি বেরিয়েছে, চিঠিতে তসলিমা নাসরিন পবিত্র কোরান শরীফকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী নয় বলে মন্তব্য করেন এবং কোরান অনুযায়ী পরিচালিত না হবার জন্য মতামত প্রকাশ করেন। বাদী আরও উল্লেখ করেন, তসলিমা নাসরিন তাঁর ধর্ম বিরোধী স্বেচ্ছাচারমূলক ও বিকৃত মতামত, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে সকলের ধিককারের পাত্রী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ২৯৫ (ক) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। উল্লেখ্য, তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য বাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৩৮/ বিবিধ ৪৮/৯৪ (আইন) তারিখ ৬.৪.৯৪ ইং মোতাবেক মঞ্জুরিপ্রাপ্ত হয়েই গতকাল আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। আদালতে অভিযোগকারীর পক্ষে এপিপি বোরহানউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। মামলায় ১১ ব্যক্তিকে সাক্ষী করা হয়েছে, তাঁরা হলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) আনিস ওয়াইজ, প্রিন্সিপাল বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ; মুফতি মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, প্রিন্সিপাল লালবাগ আলিয়া মাদ্রাসা; এডভোকেট এবিএম নূরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, অধ্যাপক আবু আহমেদ চৌধুরী, প্রফেসর এজিএম চৌধুরী, আলহাজ্ব মেজবাউর রহমান চৌধুরী, মাওলানা জুমায়েত আল হাবীব, মাওলানা আবদুল জব্বার, মাওলানা মহীউদ্দিন খান, মাওলানা আবদুল লতিফ। মামলার পরবর্তী তারিখ আগামী ৪ঠা জুলাই। এদিকে তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার করার জন্য মতিঝিল থানার ২টি স্কোয়াড ছাড়াও গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ স্কোয়াড গতকাল থেকেই তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তসলিমা নাসরিন যেন আকাশপথে বা সীমান্তপথে দেশের বাইরে যেতে না পারে সে ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে পুলিশের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বাকি খবরগুলো আমার বিরুদ্ধে মিছিলের, বিবৃতির। ১২৯ জন আলেম বিবৃতি দিয়েছেন, (তখনও তাঁরা জানেন না যে আমার বিরুদ্ধে সরকার মামলা করেছে) ইহুদি নাসারাচক্র তসলিমা নাসরিনদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে এই দেশ থেকে ইসলাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। সরকারের কাছে বারবার দাবি জানাবার পরও

সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। পরন্তু পুলিশি পাহারা বসিয়ে তাদের নাস্তিকতা প্রচারে সহায়তা করছে। অবিলম্বে মুরতাদদের ফাঁসি না দিলে তৌহিদী জনতার হাতেই তাদের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। ইয়ং মুসলিম সোসাইটি বিশাল ব্যানার নিয়ে আমার ফাঁসি চেয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিল শেষে সভায় ডাঃ নুরুল ইসলাম বলেন, তসলিমা নাসরিনের মত নির্লজ্জ মহিলা আমার সত্তর বছর বয়সে একজনও দেখিনি। এই মহিলাকে শাস্তি না দিলে দেশবাসী বিএনপি সরকারকে ক্ষমা করবে না।

<u>তসলিমার শাস্তির দাবিতে গোটা জাতি ফুঁসে উঠেছে,</u> এই হল শিরোনাম। জামাতে ইসলামি, জাতীয় যুব কমাণ্ড, খেলাফত আন্দোলন, সচেতন যুব সমাজ, ওলামা কমিটির বিবৃতি, বিক্ষোভের খবর এর তলায়। এছাড়া আরও খুঁটিনাটি, কাল কটার সময় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কটা পর্যন্ত বাড়ি ফিরিনি। কি রঙের গাড়িতে করে বেরিয়েছি। গাড়ির নম্বর কি ছিল। উত্তরে গেছি নাকি দক্ষিণে। পুলিশ কবার গেছে আমার বাড়িতে, কটা থেকে কটা পর্যন্ত ছিল। কাকে কাকে জেরা করেছে। কাকে বেঁধেছে, কাকে ছেড়েছে।

গ আজ আমার কারণে আপিস কামাই দিয়েছেন। সকালে এক কাপ চা খাবার তৃষ্ণাটি তাঁকে জানালে তিনি নিজে চা বানিয়ে দেন। কোনও কাজের লোককে আমার আশেপাশে ভিড়তে দিচ্ছেন না। বড় ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। কাজের লোকদের কেউ যেন বাড়ির বাইরে যেতেও না পারে। সারা শহরে পুলিশ যাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, তিনি তাকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর বাড়িতে। গ স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারছেন না। আমার দিকে বিরক্ত-চোখে খানিক পর পর তাকাচ্ছেন। আমি যেন এ বাড়িতে এসে একটি মহা অপরাধ করে ফেলেছি। চা এ চিনি দেওয়া হয়নি, চিনি ছাড়াই চায়ে চুমুক দিই, গর কাছে চিনি চেয়ে তাঁকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ আমার, নটা বাজতেই উঠি অ্যান্ড্রুকে ফোন করতে। তাঁকে নতুন করে কিছু বলতে হয় না আজ, তিনি পত্রিকায় সব খবরই পড়েছেন।

আমাকে আশ্রয় দিন আপনাদের দূতাবাসে। এ শহর বা শহরের বাইরে আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে নিরাপদ কোনও আশ্রয় দিতে পারে। দূতাবাস ছাড়া আর কোথাও নিরাপত্তা নেই। দ্রুত বলি, কণ্ঠ আমার কাঁপে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আশংকা, নিরাপত্তাহীনতায়।

অ্যান্ড্রু বললেন, *দূতাবাস হুলিয়া মাথায় নিয়ে ঘোরা কোনও আসামীকে আশ্রয় দিতে পারে না।*

অ্যান্ড্রুর ওপর যে বড় ভরসাটি ছিল আমার, মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে।

ডডআমি শুনেছি দূতাবাসে আশ্রয় চাওয়া যায়। এ সময় আশ্রয় আমাকে দিতেই হবে। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না! আমাকে জেলে পোরা হবে, জেলে তো আমাকে মেরে ফেলবে। আপনারা আমার নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, পাসপোর্ট পাইয়ে দিলেন। এখন আমার জীবন বাঁচাবার জন্য কেন চেষ্টা করবেন না! পাসপোর্টের চেয়ে তো জীবনের মূল্য বেশি! নাকি না!

অ্যান্ড্রু নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, আপনি আপনার উকিলের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার উকিলকে বলুন জামিনের জন্য চেষ্টা করতে।
ডডজামিন যদি না হয়! এই মামলায় তো জামিন হয় না। আর জামিন যে কদিন না হবে, ততদিন কি হবে? কে আমাকে আশ্রয় দেবে।
---*সে ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারছি না।*
---*আপনারা তাহলে কোনও সাহায্যই করবেন না?*
---*শুনুন তসলিমা,আপনাকে পাসপোর্টের জন্য সাহায্য করেছিলাম। তা আপনি পত্রিকায় লিখে দিয়েছেন। ওটা তো জনগণকে জানানোর ব্যাপার ছিল না। একটা ডিপ্লোমেটিক ব্যাপার এরকম পাবলিক করে দিয়ে খুবই অনুচিত কাজ করেছেন আপনি।*
অ্যান্ড্রু আমাকে অবাক করেন। তাঁকে বরং আমি প্রশংসা করছি পাসপোর্ট পাইয়ে দিয়েছেন বলে। প্রশংসা করলে কই খুশী হবে তা নয় ব্যাটা রাগ করছে।
---*আমি খুবই দুঃখিত। আমি জানতাম না যে জানানো উচিত নয়। এখন আপনার শরনাপন্ন হলাম এই কারণে যে বিদেশি দূতাবাসের অন্য কাউকে আমি চিনিনা, এক আপনাকে ছাড়া। এখন আমি কি করব বলুন। আমি কি আশ্রয় চাইতে পারি না! শুনেছি রাজনৈতিক আশ্রয় নাকি চাওয়া যায় যখন দেশে বিপদ ঘটে!*
ডডতা নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু এভাবে কাজ হবে না। এ দেশের আইনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দেখাতে হবে তসলিমা। বিশেষ করে হুলিয়া যখন জারি হয়ে গেছে। রাজনৈতিক আশ্রয় পেতে হলে আপনাকে এ দেশ থেকে বেরোতে হবে। আপনি ভারতে চলে যান। ভারতে গিয়ে আপনি আশ্রয় চান। এ দেশের আইনে আপনি এখন আসামী। কোনও দূতাবাসই এখন আপনার জন্য কোনও কিছুই করতে পারে না। আপনার বিরুদ্ধে হুলিয়া না থাকলে আমরা হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।
ডডভারতে যাবো? কি করে যাবো? আমার জন্য সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার তো এ দেশ থেকে এখন বেরোবার উপায় নেই।
ডডআমি খুবই দুঃখিত তসলিমা। আপনাকে আমরা কোনও সাহায্য করতে পারছি না এখন। আমি আপনার উকিলের সঙ্গে কথা বলব মামলা নিয়ে। আপনার পরিবারের কাউকে, আপনার কোনও এক ভাইকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন। আপনার খবরাখবর নেওয়া যাবে।
ডড আমি মরে গেলে আমার খবর দিয়ে আর কি করবেন আপনারা?

আমি ফোন রেখে দিই। কণ্ঠের কাছে যে কষ্ট জমাট বেঁধে ছিল, সেটি বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসে। বাচ্চা মেয়ের মত কেঁদে উঠি। আমার জন্য আরেকটি বুক ভাঙা কান্না অপেক্ষা করছিল। আমি জানতাম না যে অপেক্ষা করছিল। না, তা আমার জানার কথা নয়। রাজনৈতিক আশ্রয়ের চেয়ে বড় একটি আশ্রয় আমার আছে, তিনি শামসুর রাহমান। সেই আশ্রয়কে, সেই নিরাপত্তাকে, সেই নির্ভয়কে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় আগুনে রোদ্দুরে যিনি ছাতার মত, তাঁকে আমি ফোন করি। তিনিই ফোন ধরেন।

আমি শুধু বলি, রাহমান ভাই, আমি। ওপাশে এক মুহূর্ত নীরবতা। পরের মুহূর্তেই তাঁর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর, শোন, কোনও কথা বলা যাবে না। আমার টেলিফোন ট্যাপড হচ্ছে।

ওপাশে ফোন রেখে দেওয়ার খটাশ শব্দ।

শব্দটি বুকে এসে লাগে। বুকে যেন বজ্রপাত হল। যেন বুকের মাংস ছিদ্র হয়ে ঢুকে গেল তীরের মত কিছু। ফোন তো ট্যাপড হবে আমার, আমার মত অপরাধীর। সমাজের নামী দামী মানুষের ফোন কেন ট্যাপড হবে! এ কি একধরনের বাঁচা যে তুমি মরছ মরো, এখন ভাই তোমাকে জন্য আমাদের কিছু করা সম্ভব নয়। তোমার জন্য আমরা মরব কেন! অতএব আমার ফোন ট্যাপড হচ্ছে। তুমি আর যোগাযোগ করো না।

মনে মনে কি আমি ভাবিনি শামসুর রাহমান বলবেন, কোথায় আছ তুমি? খবরটি শোনার পর অস্থির হয়ে আছি। আমি অনেকের সঙ্গে তোমার বিষয়ে কথা বলেছি। আমরা তোমাকে নিরাপদে কোথাও রাখার জন্য চেষ্টা করছি। আমার বাড়িতে এক্ষুনি চলে এসো। অথবা তুমি কোথায় আছো বলো, আমরা তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসবো। আমরা লড়ে যাবো এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কোনও রকম দুশ্চিন্তা কোরো না।

ভাববো না কেন! শামসুর রাহমান তো ছিলেনই আমার পাশে সবসময়। ব্যক্তিগত, আদর্শগত ঘনিষ্ঠতা আমার সবচেয়ে বেশি ছিল তাঁর সঙ্গেই। তাঁরও তো সেই একই। আমি কি তাঁর খুব কাছের মানুষ ছিলাম না! এই আচমকা বিপদ এলে আমি যদি তাঁর কাছে না যেতে পারি, কার কাছে যাবো!

ক আসেন সকালেই। ককে জানাই যে দূতাবাসে আমার আশ্রয় হবে না। কর মুখটি মুহূর্তে করুণ হয়ে ওঠে।

ডডতাহলে কি করবেন এখন? কোথায় যাবেন, ঠিক করেছেন কিছু?

ডডআমার কোথাও যাবার নেই। আত্মসমর্পণ ক'রা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ক আমার পাশে বসে মৃদুকণ্ঠে বললেন যে তিনি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলেছেন। উকিল আজই জামিন নেবার জন্য আদালতে যাচ্ছেন।

ডডতাহলে কি জামিন হবে? আমি উদগ্রীব।

ডডহলে তো আপনি জানতেই পারবেন। কিন্তু আজ রাতে তো কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে তো গ রাজি হচ্ছেন না। গ কে বলেছিলাম যেন আজকের রাতটা এখানে থাকতে দেন।

ক কিছু খবর দ্রুত দিয়ে গেলেন। মিলন তাঁর কাছে সকালেই এসেছিল। কাল রাতে পুলিশ আমার বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছে। বাড়ি তছনছ করেছে। রীতিমত সন্ত্রাস যাকে বলে। সবাইকে জেরা করেছে। জেরার নামে চিৎকার চেঁচামেচি অনেক করেছে। মিলনকে জিজ্ঞেস করেছে কোথায় গিয়েছিল সে আমাকে নিয়ে। হাজতে নিয়েও মিলনকে ঘন্টাখানিক জেরা করেছে, তারা জানে যে সে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল, কোন বাড়িতে আমাকে সে পৌঁছে দিয়েছে সেটি জানার জন্য তাকে ঘামিয়ে কাঁপিয়ে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। মিলন তবু বলেনি। সাহাবুদ্দিনকেও গুঁতিয়েছে, কোন বাড়িতে তিনি আমাকে নিয়ে বিকেলে বেরিয়েছিলেন তা জানতে। সাহাবুদ্দিনের

পেট থেকে পুলিশ একটি শব্দও বের করতে পারেনি। ক মিলনকে পরামর্শ দিয়েছেন আপাতত বাড়িতে না গিয়ে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে।

ক চলে গেলেন আজ রাতের জন্য কোথাও কোনও বাড়ি পাওয়া যায় কি না দেখতে। ক র উদভ্রান্ত মুখ দেখে বড় মায়া হয়। ক আমার এমন কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় যে এত বড় দায়িত্ব তাঁকে আমি দিতে পারি। আমাকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েই এখন দেখছেন তাঁর ঘাড়ের ওপর বসে আছি আমি। ক বলেছেন এ সময় কোনও বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া আর আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পাওয়া এক কথা। কেউ আশ্রয় দিতে চাইবে না। ক ভুল বলেননি। পুরো দেশের সবচেয়ে বড় খবর এটিই এখন। মৌলবাদীরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। দেশ এখন আক্ষরিক অর্থেই তাদের দখলে। মৌলবাদীদের ভয়, পুলিশের ভয়। কার এত বড় বুকের পাটা যে বলে যে হ্যাঁ আশ্রয় দেব! ঝুঁকি নেব। যে আমাকে আশ্রয় দেবে সে-ই অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে আইনের চোখে। তার ওপর মৌলবাদীরা পেলে আমাকেই কেবল ছিঁড়ে খাবে না, আশ্রয়দাতা বা দাত্রীকেও কাঁচা খেয়ে ফেলবে।

সারাদিনই গ উৎকণ্ঠায় ছিলেন। ঘরের জানালাগুলো একটিও খোলা হয়নি। দরজাগুলো তালাবন্ধ। বারবারই তিনি ঝিম ধরে বসেছিলেন আর অপেক্ষা করছিলেন রাত হওয়ার। রাত হচ্ছে কিন্তু ক আসছেন না আমাকে নিতে। ক র বাড়িতে ফোন করে ককে আসতে বলবেন সেটিও করছেন না, কারণ কর বাড়ির ফোনে আড়ি পাতা হতে পারে। ক'র বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম এই খবরটি জেনে গেলে পুলিশ ককে সন্দেহতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবে। ক নিজেও বলেছেন তাঁর বাড়িতে যেন ফোন না করা হয়। গ তাঁর স্বামীকে পাঠিয়ে দিলেন ক র বাড়িতে, যেন ক অথবা খ এসে আমাকে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যান। আমার বিশ্বাস, ক কোনও বাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না আমাকে রাখার। কিন্তু বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক আমাকে এ বাড়ি থেকে আজ রাতে বিদায় নিতেই হবে। গ র স্বামী খবর দিয়ে চলে এসেছেন। কিন্তু তারপরও ক র দেখা নেই। গ একবার উঠে দরজার কাছে যান, একবার জানালার কাছে, একবার ফোনের কাছে। কোনওটিই তিনি স্পর্শ করছেন না, কিন্তু করতে চাইছেন স্পর্শ।

যদি ক কোথাও না পেয়ে থাকেন লুকিয়ে থাকার জায়গা! এক চিলতে, এক ফালি জায়গা।

তাহলে কর বাড়িতে থাকবেন বা কিছু।

কিন্তু..

শুনুন, গ বলেন, আপনি কিন্তু ভাববেন না আপনাকে আমি চলে যেতে বলছি আমার নিরাপত্তার জন্য। এটা আপনার নিরাপত্তার জন্য। এখানে থাকলে আপনাকে পুলিশে ধরার আশংকা খুব বেশি।

এক দমে গ কথাগুলো বলেন। মানবাধিকার বিষয়ের আইনজ্ঞ তিনি, তিনি ফালতু কথা বলেন না।

ক রাতে আসেন। মলিন মুখ। কর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বারবারই তিনি হাতের পিঠে ঘাম মুছে নিচ্ছেন। ঘাম আবার জমছে। তাঁর ইশারায় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে

আসি। অন্ধকারে রাখা গাড়িটিতে উঠি। ক আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন পেছনের আসনে। একটি চাদর বিছিয়ে দিলেন আমার ওপর। চাদরের ওপর কিছু কাপড় চোপড় ব্যাগ ইত্যাদি ডাঁই করে রাখলেন। বাইরে থেকে কারও যদি চোখ যায় ভেতরে, ভেবে নেবে গাট্টি বোঁচকা নিয়ে নিশ্চয়ই যাচ্ছে এরা ঢাকার বাইরে কোথাও। পথের বিপদ আপদ পেরোতে পেরোতে গাড়ি যাচ্ছে। আজ বিশাল মিছিল হয়েছে মৌলবাদীদের। আনন্দে তারা শহরময় নৃত্য করছে। খুব সাবধানে গাড়ি চলছে, সন্দেহের কিছু মাত্র যেন কারও মনে না জাগে। ভেতরে কতগুলো প্রাণ কি অবস্থায় আছে, তা ভেতরের মানুষগুলোই জানে।

গাড়ি থামলে আমাকে নিয়ে দ্রুত একটি অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকানো হল। এই অ্যাপার্টমেন্টে আমি এসেছি আগে। ধরা যাক এটি যার বাড়ি, তার নাম ঘ। ঘ ঘরের আলো প্রায় নিবিয়ে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। ক অনেক চেষ্টা চরিত্র করে এ বাড়িটিই পেয়েছেন যে বাড়িতে আমাকে থাকতে দেওয়ায় কোনও আপত্তি নেই। ঘ আমার লেখালেখি পছন্দ করেন। শান্তিবাগের বাড়িতে তিনি দুবার গিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। দুবার আমাকে এ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। চমৎকার মহিলা এই ঘ। নিজেও লেখালেখি করেন। ঘ র স্বামীও বেশ নামী লোক। আমাকে ছোট একটি ঘর দেখিয়ে বললেন, ওটিই আমার ঘর। এ বাড়িতে একটিই অসুবিধে সে হল কাজের লোক। আমি যদি সারাদিন ঘরের বাইরে না বেরোই, তবে কাজের লোক আমার মুখ দেখবে না। ক জিজ্ঞেস করলেন, কয়েকদিনের মামলা কিন্তু। জামিন না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে পারবে তো! ঘ বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ওর এই বিপদের সময় আমাদের তো কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই ওকে সাহায্য করতে হবে। ঘ বলে চললেন, এই এলাকাটা খুব নিরাপদ। এলাকায় আজে বাজে লোক নেই বললেই চলে। ছোট ঘরটি বাইরে থেকে বন্ধ থাকে। এটি বন্ধ থাকলে কেউ বুঝবেও না যে ঘরে কেউ আছে। আমার মেয়ে যখন বেড়াতে আসে, তখন এ ঘরটিতে থাকে। ওর ইদানীং এখানে আসার কোনও পরিকল্পনা নেই।

ঘ র স্বামী বললেন, কোনও ভয় নেই। ওর যতদিন ইচ্ছা, ততদিন ও এখানে থাকবে।

ক র মুখে হাসি ফোটে। আমার মুখেও। অপ্রত্যাশিত একটি প্রস্তাব। এর চেয়ে স্বস্তিকর আর কী আছে এ সময়!

ঘ আমাকে একটি লম্বা জামা দিলেন শাড়ি পাল্টে ঘরে পরে থাকার জন্য। কিছু বইও দিয়ে গেলেন পড়তে। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। দশ ফুট বাই দশ ফুটের ঘরটিতে কেবল একটি চৌকি, চৌকিতে শক্ত তোশকের বিছানা। একটি জানালা আছে, সাঁটা। এমন একটি ঘরকেই আমার রাজপ্রাসাদের মত মনে হয়।

ছয় জুন, সোমবার

সকালবেলা ঘ নিজে আমার জন্য ট্রেতে করে নাস্তা নিয়ে আসেন। হাতে বানানো পাতলা রুটি, ডিম, আলুপটলভাজা, চা। কাজের মহিলা দিনে দুবেলা আসে, সকালে নাস্তা আর দুপুরের রান্না করে চলে যায়, আবার সন্ধেয় এসে রাতের জন্য রান্না বান্না করে। মহিলা যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত, ঘ এলেন এ ঘরে, চোখে তাঁর করুণা। যখন আমাকে এ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল আগে, তখন ওই চোখে দেখেছি আমাকে নিয়ে তাঁর গর্ব। অনেককে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমার সঙ্গে পরিচিত হতে। আমাকে নিয়ে সেই উচ্ছ্বাস আর নেই, গর্বের জায়গায় দুফোঁটা করুণা চিকচিক করছে। কাজের মহিলার চোখ ফাঁকি দিয়ে বেড়ালের মত দৌড়ে গিয়ে আমাকে টুপ করে ঢুকতে হয়েছে পেচ্ছাবখানায়। তিনি সতর্ক। কোনও জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ যেন আবার দেখে না ফেলে আমাকে। নাস্তা খেয়ে বন্ধ ঘরটিতে বসে বসে আজকের পত্রিকাগুলো পড়ি। একটি পত্রিকাতেও কোনও বিবৃতি নেই। কেউ প্রতিবাদ করেনি আমার বিরুদ্ধে সরকারের এই মামলার, এই হুলিয়া জারির। আমি কী আশা করেছিলাম? আজকের পত্রিকা ছেয়ে যাবে প্রতিবাদে? বিবৃতিতে? হ্যাঁ আশা করেছিলাম। আমার ফাঁসি চেয়ে গত শুক্রবারে যে মিছিলটি বায়তুল মোকাররম থেকে বেরিয়েছিল, সে মিছিল থেকে কিছু লোক জনকণ্ঠ পত্রিকা আপিসে ঢিল ছুঁড়েছিল। জনকণ্ঠে ইসলামের ন্যায় নীতি আদর্শ মহিমা ইত্যাদি বর্ণনা করার জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ থাকে, ইসলামের প্রশংসা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেদিন এই বিভাগটিতে কোন একটি সুরার ব্যাখ্যা মৌলবাদীদের পছন্দ হয়নি। পছন্দ হয়নি বলে ঢিল ছোঁড়া। সেদিনই ঢিল ছোঁড়ার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু মিছিলগুলো যে আমার ফাঁসির জন্য ছিল এবং সেই কথার জন্য, যে কথা আমি বলিনি এবং তা পত্রিকায় প্রকাশিত, তারপরও কেউ সেই বিবৃতিতে বলেননি যে, যে কথা তসলিমা বলেনি সে কথার ভিত্তিতে তার ফাঁসি চাওয়া অন্যায়।

আজকের পত্রিকাগুলোর খবর ঃ তসলিমা নাসরিনকে পুলিশ খুঁজছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। গতকাল সারা রাত এবং গতকাল রোববার সারাদিন গোয়েন্দাশাখার কয়েকটি দল ঢাকা মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায়। তার আত্মীয় স্বজনের বাসায় পুলিশ তার খোঁজ করেছে। আত্মীয় স্বজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশের ধারণা তসলিমা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ঢাকা মহানগরী অথবা দেশের অন্য কোথাও নিরাপদ জায়গায় আত্মগোপন করে আছেন। দেশের বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বা সীমান্ত এলাকায় তাকে পেলে গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। তসলিমাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের কয়েকটি বিশেষ দলকে ময়মনসিংহ সহ ঢাকার বাইরে পাঠানো হয়েছে। এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, আমরা নাজুক অবস্থার মধ্যে আছি। তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতারের দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার-কনস্টেবলদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। সব কটি দল তাকে গ্রেফতার অভিযানে ব্যস্ত রয়েছে।

আমার বিরুদ্ধে সরকারের মামলা আর আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতেই মৌলবাদীরা খুশিতে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটায়নি। বরং আন্দোলনে এখন

জোর বেড়েছে। আজ তাদের প্রশ্ন, এখনও কেন তসলিমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না? তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, এ কোনও কথা হল? তাকে পেতে হবে এবং ফাঁসি দিতে হবে। এক্ষুনি। তাদের তর সইছে না। কেবল আমাকেই নয়। আরও দাবি এখন তাদের। অন্যান্য মুরতাদদেরও ফাঁসি দিতে হবে। তাদেরও গ্রেফতার কর। এনজিও বন্ধ কর। কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা কর। জনকণ্ঠ বন্ধ কর। মৌলবাদীদের পত্রিকায় প্রধান খবর, তসলিমার ফাঁসির দাবি অব্যাহত। জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সভা সংগঠনের আমীর গোলাম আযমের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহীদের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। জামাতে ইসলামী আগামী ৮ জুন দাবি দিবস পালন করবে। ওলামা পরিষদ, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ, মসজিদ রক্ষা আন্দোলন, বাংলাদেশ মসুল্লি কমিটি, আঞ্জুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, খাদেমুল ইসলাম ছাত্র পরিষদ, নাস্তিক নির্মূল কমিটি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন থেকে কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী *ভারতের পদলেহী জাতির কলংক কুখ্যাত মুরতাদ* তসলিমা নাসরিনকে সরকার এখনও গ্রেফতার করে ফাঁসি দিচ্ছে না বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলনে শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেছেন, কতিপয় নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির ঔদ্ধত্য চরমসীমা লঙ্ঘনের পর্যায়ে। এরা কোরান ও হাদিসের সংশোধন ও পরিবর্তনের মত মারাত্মক দুঃসাহস দেখাচ্ছে। এই মহল দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও ঈমান আকিদার ওপর নগ্ন হামলা করছে, এর আগে যা কখনও হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে দেশে যে সরকার ক্ষমতাসীন তারা বিসমিল্লাহর দোহাই দিয়ে ভোট বাগিয়ে মসনদে বসেছে। বলা হয়ে থাকে যে সাংবিধানিকভাবে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অথচ ইসলামের ওপর ফ্রি স্টাইলে আক্রমণের মোকাবেলায় সরকার নিস্ক্রিয় সাক্ষী গোপালের ভূমিকা অনুসরণ করে চলেছে। এমন কী নাস্তিক মুরতাদদের সুকৌশলে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে চলেছে। তিনি সরকারের তীব্র নিন্দা করেন। অবিলম্বে নাস্তিক মুরতাদদের ধর্ম বিরোধী তৎপরতার জন্য কঠোর শাস্তির দাবি জানান। এবং সেই সঙ্গে ধর্মদ্রোহীতা আইন প্রণয়ণের দাবি জানান। দেশ ও ধর্মের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও গণতৎপরতা বন্ধ করতে প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে আগামী ১০ জুন শুক্রবার বাদ জুম্মা ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল হবে, আগামী ১৬ জুন বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং স্মারকলিপি পেশ। ১৭ জুন শুক্রবার সকাল নটায় ওলামা মাশায়েখ দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী সম্মেলন এবং বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

কেবল ঢাকায় নয়, সারা দেশেই মৌলবাদীদের সভা সম্মেলন চলছে। প্রতিটি সভায় বলা হচ্ছে, তসলিমার ফাঁসি চাই। মৌলবাদী সংগঠনের বিবৃতি তো আছেই। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬২ জন শিক্ষকও বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁরাও আমার ফাঁসির দাবি করেছেন। ১৬২ জন শিক্ষকের মধ্যে আছেন, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জহুরুল হক ভুঁইয়া, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

সমিতির সহ সভাপতি ডঃ মোঃ আবদুল হক, ডঃ মোঃ তাজুল ইসলাম, ডঃ মোঃ ইকবাল হোসেন, ডঃ মোঃ মইনুদ্দিন, অধ্যাপক এম এ ফারুক, ডঃ আবদুল হামিদ .।

না, কোথাও আমার বিরুদ্ধে সরকারের করা মামলাটির প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি নেই, একটি প্রতিবাদ নেই। খুঁজতে খুঁজতে একটি অখ্যাত পত্রিকার এক কোণে দেখি বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ সরকার বিবৃতি দিয়েছেন ডড দেশে যে মুহূর্তে ফতোয়াবাজ ধর্মান্ধ শক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালাচ্ছে, তখন সরকার ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের ওই জাতীয় অপকীর্তিতে ইন্ধন জোগানোর জন্য লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা করেছে। ভারতীয় দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় কথিত বক্তব্য প্রকাশিত হবার পর তসলিমা নাসরিন তার প্রতিবাদ করেছেন। তসলিমার সেই প্রতিবাদ স্টেটসম্যান এবং বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হবার পরও মামলা দায়েরের ঘটনা লেখকের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের সামিল এবং ফতোয়াবাজ মৌলবাদী শক্তির কাছে আত্মসমপর্ণের নামান্তর। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বেলাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতনও বিবৃতি দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সদস্যরা বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ও মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে সরকার ও সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট চক্রের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির প্রতি আহবান জানিয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছেন।

বাসদ একটি ছোট রাজনৈতিক দল। জাসদ ভেঙে বাসদ হয়েছে। সেই বাসদও টুকরো হয়ে গেছে। বাসদের একটি টুকরো এই বিবৃতিটি দিয়েছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটও ছোটখাটো একটি জোট। কিন্তু বড় দলগুলো কোথায়? যে আওয়ামী লীগ বিএনপির পান থেকে চুন খসলেই যে রাস্তায় নেমে পড়ে, সেই আওয়ামী লীগ কোথায়? কোথায় বড় বড় বামদল? মানবাধিকারের এই লঙঘন কেন তাদের চুপ করিয়ে রাখছে! আমার বন্ধুরা কোথায়? আমার কবি বন্ধুরা? লেখক বন্ধুরা? কোথায় বুদ্ধিজীবীরা? যাঁরা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন! সবাই কেন চুপ হয়ে আছেন? আমার পক্ষে কথা বলতে ইচ্ছে যদি না হয়, বলবেন না। এখন পক্ষ বিপক্ষ বড় কথা নয়। বড় কথা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ করছেন না কেন তাঁরা? তাঁরা কি ভাবছেন এটি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার! এটি কি সত্যিই আামার ব্যক্তিগত ব্যাপার! আমি কি কাউকে খুন করেছি যে আমার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদ করতে সংকোচ হচ্ছে! জার্মানীর এক প্রোটেস্টান্ট নেতা মার্টিন নিয়েমোলেরএর কথা মনে পড়ছে, নাৎসীরা যেভাবে ধরে ধরে মানুষ মারছিল, সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন, *প্রথম ওরা কম্যুনিস্টদের জন্য এল, আমি প্রতিবাদ করিনি, কারণ আমি কম্যুনিস্ট নই, এরপর ওরা ইহুদির জন্য এল, আমি প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি ইহুদি নই, এরপর ওরা ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের জন্য এল, আমি প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি ট্রেড ইউনিয়নিস্ট নই, এরপর ওরা ক্যাথলিকদের জন্য এল, আমি প্রতিবাদ করিনি কারণ*

আমি ক্যাথলিক নই। এরপর ওরা আমার জন্য এল, তখন আমার পক্ষে কথা বলার দেখলাম কেউ নেই।

সমাজতান্ত্রিক দলের যাঁরা আমার পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আমার কোনওদিন আলাপ হয়নি। তাঁদের সঙ্গে কখনও আমি ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করিনি দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা নিয়ে কথা বলে, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা নিয়ে। কিন্তু করেছিলাম তো অনেকের সঙ্গে। আমরা তো অনেকেই একই আদর্শের জন্য লড়াই করছিলাম, তাঁরা আজ হঠাৎ হারিয়ে গেলেন কেন? তাঁরা আজ কেউ আমার সঙ্গে নেই কেন!

বুকের ভেতর হু হু করে। আচমকা একটি আশঙ্কা আমাকে আঁচড় কাঁটতে থাকে। বন্ধ জানালাটির দিকে চোখ রেখে শুয়ে থাকি। জানালার ছিদ্র দিয়ে যে সরু একটি আলো ঘরে ঢুকছিল, ধীরে ধীরে সেটি দেখি কমে যাচ্ছে। বাইরে অন্ধকার। ভেতরেও অন্ধকার। দুই অন্ধকারের মাঝখানে আমি, আমি আর আশঙ্কা।

সাত জুন, মঙ্গলবার

গতকাল জামাতে ইসলামী আমার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। হাজার হাজার মানুষ ছিল সে মিছিলে। মিছিলের সামনে যে ব্যানারটি নিয়ে তারা হেঁটেছে, ওতে তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি চাই লেখা নয়, লেখা ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইন চাই। বিপদের ঘন্টাধ্বনি বাজছে। শুনতে পাচ্ছো কেউ, শুনতে পাচ্ছো! জামাতে ইসলামি কেবল তসলিমার ফাঁসি দিয়ে তুষ্ট হতে চাইছে না। সংসদে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তির আইনের জন্য বিল পাস করার দাবি করছে। জামাতের সভায় বলা হচ্ছে, খোমিনীর ফতোয়ার ভয়ে রুশদি পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তসলিমারও তাই অবস্থা। তসলিমাদের খুঁটির জোর আধিপত্যবাদী ভারত, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ঐক্যবদ্ধ জেহাদের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে। গোলাম আযমের প্রতিটি দিনই এখন স্বর্ণালী দিন। তিনি এখন দিন রাত ব্যস্ত। সরকারকে চাপ দিয়ে অনেক কিছু তো করানো হল, এটি হয়ে গেলে রাজ্যজয় হবে গোলাম আযমের জামাতের। মুসলিম লীগও নেমেছে আন্দোলনে, ইসলাম বিষয়ে তসলিমার অমার্জনীয় ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির বিরুদ্ধে বিবৃতির ঝড় বইছে পত্রিকায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১০১ জন ছাত্রও বিবৃতি দিয়েছে, তারাও তসলিমার ফাঁসি চায়। ফাঁসি চায় জাতীয় ইসলামিক দল। তাহাফফুজে হারমাইন কমিটি। ইসলামি ছাত্র মজলিশ। একশ রকম দল। কেবল ঢাকায় নয়। সারা দেশে। এত যে ইসলামি দল আছে দেশে, আমার জানা ছিল না। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর অনেকে বলতেন, *মৌলবাদীরা খুবই ক্ষুদ্র একটি শক্তি, এদের নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে নেই। এরা লাফায় বেশি কিন্তু ভোট*

তো পায় না। ঠিক, এরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারেনি। কিন্তু আগে পেত তিনটে আসন, এখন পায় বারোটি আসন। কিন্তু যত কম আসনই পাক, এরা যা দাবি করছে, সরকার তো তার সবই মেনে নিচ্ছে। এরা আজ যে ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আইনএর জন্য দাবি তুলছে, সরকার যদি এক সময় এটিও মেনে নেয়! এরা ক্ষুদ্র দল, তা জানি। কিন্তু ক্ষুদ্র দল সবসময় ক্ষুদ্রই থাকে না। ক্ষুদ্র দল অলক্ষ্যে দানবের মত বড় হতে থাকে। বিশেষ করে এদের যদি শুরু থেকেই প্রতিহত না করা যায়। ক্ষুদ্র বলে তুচ্ছ করে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে অনেকে, অনেক মৌলবাদ বিরোধী প্রগতিশীল মানুষ। মৌলবাদীদের ভিন্ন ভিন্ন দল থাকতে পারে কিন্তু এরা সঙ্ঘবদ্ধ। প্রগতিশীলদের দলে বিরোধ লাগে, কোন্দল হয়, দল শত টুকরো হয়, মতের অমিল হলে জন্মের শত্রু বনে যায়। মৌলবাদীদের মধ্যে তা হয় না। তারা বৃহৎ স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। বৃহৎ স্বার্থটি, দেশে ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম করা ডড দেশটির আগপাশতলা ইসলামে মোড়ানো ডড দেশটির বুকে ইসলামের পেরেক গাঁথা। ইসলাম এখন আর কোনও ধর্ম নয়, ইসলাম এখন রাজনীতি। এই রাজনীতি জনপ্রিয় হওয়ার দিন আসছে। ঢেউ উঠছে ইসলামি জিগিরের। আশংকাটি এখন আর আঁচড় কাটে না, এখন ধারালো দাঁতে কামড়াতে থাকে। আর কতদিন ভেবে সুখ পাবে মানুষ যে মৌলবাদী দলটি একটি ক্ষুদ্র দল! ক্ষুদ্র দল ভেবে যে এদের মাঠে ছেড়ে দিয়েছো, ভেবেছো তোমার আঙিনায় এরা দখল বসাবে না, আহা তোমার দেখা হয়নি গায়ে গতরে কেমন বেড়েছে এ, কেমন ধারালো হয়েছে এর দাঁত নখ! কেবল তোমার আঙিনায় নয়, দরজা ভেঙে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছে! ধর্মের দৈত্যটি দেখ কেমন তোমার ঘাড়ের ওপর চড়ে বসেছে, এখন দেখ কেমন তোমার গলা টিপে ধরেছে। শ্বাস নিতে এখন কেমন লাগছে, বল তো!

পুলিশ আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। সারা দেশে খোঁজা হচ্ছে আমাকে। ময়মনসিংহের বাড়িতে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব চেনা পরিচিতদের যত বাড়ি আছে, খোঁজা হচ্ছে। শান্তিনগরের বাড়িতে নাস্তানাবুদ হচ্ছে একেকজন। মোতালেবকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। আমি কোথায় আছি, বাড়ির কেউ জানে না, কিন্তু পুলিশের ধারণা, জানে। তাদের পেট থেকে আমার খোঁজ খবর বের করার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। আমার আত্মীয়রা আমার উকিলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। আমি আজ যাবো কাল যাবো উচ্চ আদালতে বা নিম্ন আদালতে, এরকম খবর প্রতিদিনই ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে আর ভিড় বেড়ে যাচ্ছে আদালত প্রাঙ্গনে। কিন্তু বৃথাই ভিড়, আমার টিকিটি কোথাও দেখা যায়নি। আরেকটি খবর পিলে চমকে দেয়, আমি যেহেতু ধরা দিচ্ছি না, আমার সম্পত্তি ক্রোক করার কথা ভাবছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়।

খবরঃ ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি দিতে সংসদে আইন পাস করার দাবি নিয়ে জামাতে ইসলামি বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রাঙ্গণে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। জামাতে ইসলামি বাংলাদেশের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ বলেছেন, *তসলিমা নাসরিনসহ ধর্মদ্রোহীদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীকে স্পষ্ট বক্তব্য দিতে হবে। দেশবাসীকে জানাতে হবে খালেদা হাসিনা কি ধর্মদ্রোহী তসলিমার পক্ষে, না সাধারণ জনগণের পক্ষে। তসলিমা পবিত্র কোরান*

উল্টে দিতে চায় অথচ খালেদা হাসিনা একটা কথাও বলেন না। তসলিমার লাগামহীন বক্তব্য ও ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রের সাথে তার কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সে বলছে। কলকাতার সল্ট লেকে তাকে বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছে বিজেপি। তসলিমা নিজেকে বেশ্যা বানিয়েছে, এখন আরও মহিলাকে সে বেশ্যা বানাতে চাচ্ছে। আগামী শুক্রবার জুম্মাহর নামাজের পর খুৎবায় তসলিমা সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি মসজিদের ইমামদের আহবান করেছেন। বক্তাদের মধ্যে জামাতে ইসলামির বড় নেতারা ছিলেন, সংসদ সদস্যও ছিলেন। তাঁরা বলেছেন, এবারের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে শুধু রাজপথের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ না রেখে একটা পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে বাংলাদেশে আর কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে। ভণ্ডামির একটা সীমা আছে, তসলিমাকে পুলিশ পাহারা দেবে আর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এটা কেমন কথা!

খবরঃ সারাদেশে তসলিমার ফাঁসির দাবি তুঙ্গে উঠেছে। পবিত্র কোরান সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য কুখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি এবং দৈনিক জনকণ্ঠ নিষিদ্ধ করার দাবিতে সারাদেশে প্রতিবাদ সভা, মিছিল ও বিবৃতি অব্যাহত রয়েছে এবং তসলিমার প্রতি ঘৃণা ও ধিককারের জোয়ার প্রবলতর হচ্ছে। ঢাকা তো আছেই, এ ছাড়াও খুলনা, চট্টগ্রাম রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন সভা সমিতি সংগঠন থেকে দাবি উঠেছে, নাস্তিকতাবাদের নেত্রী লজ্জার কুখ্যাত লেখিকা নির্লজ্জ তসলিমার বিরুদ্ধে কেবল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে চলবে না, ফাঁসি দিতে হবে। জনকণ্ঠ পত্রিকায় সুরা ত্বীন এর অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, জনকণ্ঠ নিষিদ্ধ করতে হবে। হাদিস ফাউণ্ডেশনের পরিচালক ডঃ মুহম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব বিবৃতিতে বলেন, আট হাজার পাশ্চাত্য লেখক ও ছয় হাজার তিনশ পাশ্চাত্য সংগঠন যে তসলিমার পক্ষে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছে, নিশ্চয়ই সে ইহুদি নাছারাদের এ দেশীয় এজেন্ট, এতে কোনও সন্দেহ নেই। আর সে কারণেই সরকার এই কুখ্যাত মেয়েটি ও তার লেখনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভয় পায়। সম্প্রতি তাকে গ্রেফতারের এক চমৎকার নাটক দেখিয়ে বর্তমান সরকার তার ভোটারদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে চালাকি বুঝতে কারো কষ্ট হয়নি।

গ্রেফতারি পরোয়ানার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (কোনওদিন নাম শুনিনি), লেখক শিল্পী সংসদের ২৫ জন তরুণ লেখক লেখিকা (মৃগাঙ্ক সিংহ ছাড়া কোনও নাম আগে শুনিনি)। ব্যক্তিগত বিবৃতি দিয়েছেন বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম (নাম শুনেছি)। বলেছেন যে তিনি অবাক হচ্ছেন আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিরুদ্ধে কেউ কোনও প্রতিবাদ করছেন না দেখে।

ঘ আজ সকালে আমার জন্য নাস্তা নিয়ে এসে চোখ টিপে বলেছেন আজ তিনি কাজের মহিলাকে সকাল সকাল বিদেয় করে দেবেন। তখন আমি এ ঘর ছেড়ে বেরোতে পারব, আমি এমনকী চাইলে সোফায় গিয়ে বসতে পারব। এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে চমৎকার। এই ঘরটি যদি প্রাসাদ হয়, তবে পাশের ঘরের সোফা তো

রাজদরবারের মত। রীতিমত মসনদে গিয়ে বসা। পত্রিকার ওপর আমার এমন ঝুঁকে থাকা দেখে ঘ বলেন, এত কী পড়? বাদ দাও পড়া। আজ না হয় কাল তুমি জামিন পেয়ে যাবে। হৈ চৈ আর থাকবে না। দেখো তুমি!

জামিন যদি না হয়! আমার মলিন স্বর।

এও একটা কথা। জামিন যদি না হয়। এই সরকার যদি তোমাকে জেলে পাঠাতে চায়, যে করেই হোক পাঠাবে। এ দেশের জুডিশিয়াল সিসটেম তো ইনডিপেনডেন্ট না, সরকারি ইনফ্লুয়েন্সেই সব চলে। লোয়ার কোর্ট সরকারের ডাইরেক্ট আণ্ডারে। হাইকোর্ট অফিসিয়ালি ডাইরেক্ট না হলেও ইনডাইরেক্টলি আন্ডারে। তা না হলে হাইকোর্ট কিভাবে গোলাম আযমকে নির্দোষ প্রমাণ করে, বল! এই সরকার গোলাম আযমকে মুক্তি দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন হাইকোর্টকে সরকারের আদেশ শুনতে হবে। তাছাড়া জাজরা তো আবার এক একটা পার্টির লোক।

হয়ত জেলই আছে কপালে। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলি।

ঘ বললেন, 'জেলে তো আর পলিটিক্যাল প্রিজনারদের সঙ্গে তোমাকে রাখবে না। রাখবে ক্রিমিনালদের সঙ্গে। খুনী বদমাশদের সঙ্গে। তোমার বিরুদ্ধে যে কেইস, সেটা তো ক্রিমিনাল কেইস। তোমাকে ক্রিমিনাল হিসেবে ট্রিট করা হবে। জেলে তুমি থাকবে কি করে! অসম্ভব। আমি দেখেছি জেলের ভেতরটা। ক্রিমিনালদের যেখানে রাখা হয়, সেখানে খুবই জঘন্য অবস্থা। ফ্লোরে শুতে হয়, কোনও বেড দেওয়া হয় না। গাদাগাদি করে শোয় সব। ঘরে কোনও ফ্যান নেই। দুর্গন্ধ। আন-হাইজিনিক আন-হেলদি পরিবেশ। পেচ্ছাব পায়খানার অবস্থা কল্পনা করা যায় না। যেখানে ঘুমোয়, সেখানেই পেচ্ছাবপায়খানা করে। জঘন্য খাবার দেওয়া হয়। দুর্গন্ধ, বাসি পচা। মোটা মোটা লোহার মত শক্ত রুটি। উফ!' ক্ষণে ক্ষণে শিউরে ওঠার কাঁপুনি ঘএর গায়ে, 'এসব তো আছেই, গার্ডরা মহিলা প্রিজনারদের রেপ করছে যখন তখন। না না, জেলের নাম নিও না। আমি ভাবতেই পারি না. .. '

দুপুরবেলা। চনমনে ঘ হঠাৎ তিতিবিরক্ত। বললেন, মালেকা বেগম ফোন করেছিলেন। দেশের অবস্থার কথা উঠল। এখন তো দেশের অবস্থার কথা ওঠা মানে তোমার কথা ওঠা। তা উনি কি বললেন জানো?

ডডনাহ। তা তো জানি না কি বললেন!

ডডআচ্ছা, তোমার সাথে কি মালেকা বেগমের কোনও গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

ডডনা তো!

ডডআমি জিজ্ঞেস করলাম মহিলা পরিষদ থেকে কোনও প্রতিবাদ করা হচ্ছে কি না। বললেন, প্রশ্নই ওঠে না। এ কেমন নারীবাদী গো! ছি ছি ছি।

আমি চুপ হয়ে বসে থাকি। তিনিও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তোমার খুব নিন্দা করছিলেন মালেকা বেগম। আমার ভাল লাগেনি, যেভাবে তিনি কথা বলছিলেন।

ডডকিরকম নিন্দা? জিজ্ঞেস করি।

ড়ড়বললেন, যা হয়েছে ভাল হয়েছে। শিক্ষা হয়েছে। বিজেপির টাকা নিয়ে লজ্জা লিখেছে বেশ হয়েছে। ধর্ম নিয়ে বাজে কথা বলেছে, শাস্তি হবে না কেন? ফ্রান্সে গিয়েছিল টাকা আনতে, ওর ফাঁসি হওয়াই উচিত।

ড়ড়মালেকা বেগম এসব কথা বলেছেন? আমি অবিশ্বাস্য চোখে তাকাই ঘ র মুখে।

ড়ড়হ্যাঁ, বলেছেন। কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

না বোধক মাথা নাড়তে গিয়ে নাড়ি না। কী জানি, হবে হয়ত। আজকাল কত কিছুই তো উদ্ভট ঘটছে। যাদের বন্ধু বলে ভাবি, দেখা যায় তারা আসলে সত্যিকার বন্ধু নয়। ঘ যদিও বলছেন, তিনি মালেকা বেগমের মন্তব্য পছন্দ করেননি। কিন্তু একটি জিনিস টের পাই, ওই মন্তব্য তাঁর সঙ্গে আঠার মত সেঁটে আছে।

এর পর মালেকা বেগম নয়, অন্য কিছু নিয়ে কথা হয়। বিকেলের চা নিয়ে, গরম পড়া নিয়ে, বিছানার চাদর-বালিশ নিয়ে।

একসময় ঘ বলেন, কপালে অনেকগুলো এলোমেলো ভাঁজ, আচ্ছা, তুমি এত চমৎকার নির্বাচিত কলাম লিখলে! এত সুন্দর কবিতা লেখো তুমি। আমি তোমার সবগুলো কবিতার বই পড়েছি। কিছু কিছু কবিতা মুখস্তও হয়ে গেছে পড়তে পড়তে। মেয়েদের কথা তুমি যেভাবে লিখতে পারো, আর কেউ পারে না সেভাবে লিখতে! তুমি মেয়েদের মনের কথাগুলো প্রকাশ করছিলে, যে কথা মেয়েরা প্রকাশ করতে জানে না। তুমি তো কেবল মেয়েদের মনের কথাই কেবল বলোনি, তাদের তুমি অনেক প্রেরণা দিচ্ছ, সাহস দিচ্ছ। অনেক মেয়েই আমাকে বলেছে, তোমার লেখা পড়ে তাদের জীবন এখন পাল্টে গেছে, তারা এখন নতুন করে নিজেদের চিনতে পারছে, তারা এখন নিজেদের মূল্য দিতে শিখছে। তারা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাইছে। এ কত বড় কাজ, তুমি বোঝো! যেভাবে লিখছিলে, সুন্দর লিখছিলে। সব কিছু তো ভালই ছিল। কিন্তু, তুমি হঠাৎ কেন লজ্জা লিখতে গেলে?

বড় একটি চমক আমার জন্য। ঘ এবং তাঁর স্বামী মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর এই ঘ কি না বলছেন আমি কেন লজ্জা লিখতে গেলাম!

তোমার মাথা টাথা কি খারাপ হয়েছিল?

এর উত্তর কি দেব আমি তা না বুঝতে পেরে অপরাধীর মত নখ খুঁটি। নখ থেকে চোখ তুললেই দেখি ঘ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার উত্তরের জন্য।

মৃদু কণ্ঠে বলি, এখানে হিন্দুদের ওপর অন্যায় অত্যাচার হয়েছে। এগুলোর প্রতিবাদ করেছি। করাটা কর্তব্য মনে হয়েছে।

ড়ড়শোন, তুমি নারীবাদী লেখক, তুমি নারীবাদী লেখা লিখবে। হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে লেখার জন্য তো অনেকেই আছেন। এসব পলিটিক্যাল লেখা। তুমি তো আর পলিটিক্স কর না। তোমার একটা ফিল্ড আছে, সেই ফিল্ডে তুমি নাম করেছিলে। তুমি নারীবাদ নিয়েই ফিক্সড থাকতে পারতে! খামোকা কেন তুমি ডিরেইল্ড হলে? তোমার লজ্জা লেখাটা উচিত হয়নি।

ড়ড়লজ্জা লিখেছি বলে আমি যে মেয়েদের সম্পর্কে লেখা বন্ধ করে দিয়েছি, তা তো নয়। আমি তো লিখছিই।

ডডলিখছ কিন্তু লজ্জা লেখার জন্য অনেকে এখন তোমার নারীবাদী লেখাগুলোও আর ভাল ভাবে নিচ্ছে না। মালেকা বেগম বললেন তুমি বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে লিখেছো লজ্জা, এ কথা তো শুধু তো মালেকা বেগমই বলেন না, এ কথা অনেকেই বলে। এই লজ্জা লিখে নিজের অনেক ক্ষতি করেছো তুমি তসলিমা।
এ সময় কানদুটো যদি বধির হয়ে যেতো! যদি সত্যিই বধির হত কান, আমার স্বস্তি হত।
ডডতুমি কি জানো না ভারতে মুসলমানদের কি করে মারছে? জ্বলন্ত উনুনে ওদের ফোটাচ্ছে, জানো না?
উনুনে ফোটানোর কথা বলতে গিয়ে ঘ র শরীর কাঁপুনি দিয়ে উঠল। জ্যান্ত মানুষগুলো যেন তাঁর চোখের সামনে উনুনে ফুটছে।
ডডএরকম শুনিনি তো! জ্বলন্ত উনুনে ..
ঘ উত্তেজিত।
ডডতাহলে তুমি জানো না! একটা বিষয় যদি না জানো, তবে বিষয়টি নিয়ে লিখতে যাও কেন! তোমার তো জানতে হবে ওখানে কী হচ্ছে।
আমি অসহায় বসে থাকি। মাথা নত।
ঘ র গলার স্বর উঁচু থেকে খাদে নেমে আসে। তিনি ধীরে, প্রায় গলা চেপে, প্রায় কানে কানে বলেন, এখানেও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তা ঠিক। কিন্তু তা বলতে যাবে কেন? ওরা কি মুসলমানদের ওপর ওখানে যে অত্যাচার হচ্ছে সেগুলো বলে? এসব বলতে হয় না। তুমি খুব ভুল করেছো লজ্জা লিখে।
ইচ্ছে হয় প্রতিবাদ করি। বলি যে না, আমি ভুল করিনি। ওখানে কি হচ্ছে, তা আমি দেখিনি, তা আমি জানি না। এখানে যা হচ্ছে, এখানে যা আমি দেখেছি, তা লিখেছি।
ঘ আমার নীরবতার কিছু একটা অনুবাদ করে নিয়ে বললেন, এটা একটা সেনসিটিভ ইস্যু। এটা দুদেশের পলিটিক্যাল ব্যাপার। এটা নিয়ে তুমি ডীল করতে পারো না। কারণ তোমার কাছে ইনফরমেশন নেই দুদিকের। তাছাড়া তুমি তো আর পলিটিক্স বুঝবে না। পলিটিক্স করলে পলিটিক্স বুঝতে।
এর উত্তরে আমি কিছু বলি না, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমি জানি ঘ এখন যা বলছেন, তা এদেশের অধিকাংশ লোক বলছেন। নাহ, প্রতিবাদ এখন আর আমি করছি না। আমার মানসিক শারীরিক সব শক্তি আমি হারিয়ে বসে আছি।

ঘ বিশ্রাম নিতে তাঁর নিজের ঘরে চলে যান। বাইরে থেকে আমার ঘরের দরজাটি বন্ধ। অন্ধকার জানালায় মুখ করে শুয়ে ছিলাম। যদিও রাজদরবারে গিয়ে মসনদে বসার কথা ছিল আমার, বসা হয়নি। মসনদের জন্য আমার কোনও আগ্রহ জন্মে না, এই ঘরে শুয়ে বসে অপেক্ষার এক একটি মুহূর্ত তো নয়, যুগ পার করছি জামিনের খবর শোনার জন্য। কেবল ক র আসার অপেক্ষা। ক আমার জন্য জামিন হওয়ার একটি সুসংবাদ নিয়ে দেবদূতের মত উদয় হবেন। তাঁর উদয়ের পথে আমি উদগ্রীব প্রাণ নিয়ে তাকিয়ে আছি। এসময় হঠাৎ ঘরে ঢোকেন ঘ। ক র কথা জিজ্ঞেস করেন। ক কোথায় আছে তা আমি জানি কি না জানতে এসেছেন।

না আমি জানি না।
ঘ বললেন ককে তাঁর খুব দরকার। ককে কেন দরকার তাঁর, তা আমি জিজ্ঞেস করি না। কিন্তু তিনি নিজেই বলেন, কর আজ   আসা দরকার আমাকে নিয়ে যাবার জন্য।
 কান তুমি বধির হও।
 কান বধির হয় না।
ডডআপনি তো বলেছিলেন, আমি এখানে যতদিন দরকার হয়. ততদিন থাকতে পারব! নিজের স্বরে নিজেই চমকে উঠি, স্বরটি কান্নার মত শোনাচ্ছে।
ডডবলেছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি এ যে কত বড় ঝুঁকির ব্যাপার। ক কোথায় আছে এখন, তুমি জানো না?
মাথা নাড়ি। গলায় আর স্বর ফুটছে না।
আবারও অস্ফুট কণ্ঠ আমার, কাল আমার জামিন হয়ে যাবে হয়ত। আজকের রাতটা অন্তত থাকি..
ঘ বললেন, দেখ, একটা রাত কেন, অনেকগুলো রাতই তুমি থাকতে পারতে। কিন্তু আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা আমার বাসায় দুবার কড়া নেড়েছে। দুবারই আমি তাকে দেখেছি দরজায় বাইরে থেকে ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। কখনও সে এমন করে না। নিশ্চয়ই সে সন্দেহ করছে..
ডডক এখন আমাকে নিয়ে কোথায় যাবেন? ক র তো কোনও জায়গা নেই আমাকে রাখার!
ডডসে ক জানবে।
স্বরটি থেকে লু ছুটে   আমার চোখ মুখ পুড়িয়ে দিতে চায়।
অবিরল অশ্রুধারা পোড়া থেকে বাঁচায় আমাকে।
ঘ অন্য ঘরে চলে যান। ঘ র কণ্ঠস্বর ভেসে আসে অন্য ঘর থেকে। ‘আমার বাসায় তুমি একটা কলম রেখে গেছিলে, কলমটা নিয়ে যেও আজ। আজই কিন্তু নিতে হবে, কারণ আমি কাল সকালেই ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছি। তুমি না আসতে পারলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিও নিয়ে যেতে। উহ, যে গরম পড়েছে এ সময় জার্নি করাও মুশকিল...’

মধ্যরাতে ক আর খ আসেন। দুজনের মুখেই দুশ্চিন্তার কালো দাগ। আমি যে কত বড় বোঝা এখন, আমি যে কত বড় ঝুঁকি এখন তাঁদের কাছে, দাগটি দেখেই বুঝি। হাড়ে মজ্জায় টের পাই। ক কে আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, কিছু হল জামিনের? ক মাথা নাড়েন। না বোধক। ঘ একবার ক কে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় এখন নিয়ে যাচ্ছ? ক উত্তর দেন নি। ঘ আমার মাথার ওপর তাঁর নিজের একটি চাদর ফেলে বললেন যেন এটি দিয়ে মুখ মাথা সব ঢেকে ফেলি। ঢেকে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে হয়। যেন কেউ কোনও বাড়ির দরজা খুলে এ সময় বেরিয়ে আমাকে দেখে ফেলার সুযোগ না পায়। মুখ মাথা ঢেকে বসে থাকতে হয় পাথরের মূর্তির মত গাড়িতে। কেউ কোনও কথা বলছে না। গাড়ি কোথায় কোনদিকে যাচ্ছে, কিছুই আমার বোধে আসে না। গাড়ি হঠাৎ একসময় থেমে যায়, হঠাৎই অন্ধকার থেকে লাফিয়ে কেউ একজন

গাড়িতে ওঠেন। গাড়িতে যিনি ওঠেন, তাঁর নাম ধরছি ঙ। ক, খ এবং ঙর মধ্যে কোনও কথা হচ্ছে না। ঙ কেবল গাড়ির চালককে বামে, ডানে, সামনে শব্দগুলো বলছেন। গাড়ি যখন এক গলিতে ঢুকলো, গলির ভেতরে একটি ট্রাক আমাদের উল্টো দিক থেকে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো, কারও পাশ কেটে যাওয়ার কোনও অবস্থা নেই। ট্রাকের পেছনে দুটো গাড়ি এসে থামল, আমাদের গাড়ির পেছনে একটি গাড়ি, পাশে চারটে রিক্সাও থামল। ট্রাক চালক নেমে এল যানভিড় হালকা করার জন্য। আমাদের গাড়ির চালককে পেছনে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। গাড়িগুলো ভেঁপু বাজাচ্ছে, কিছু পথচারী থেমে আছে জটলার মধ্যে। গাড়ির আলো এসে পড়ছে মুখে। উপুড় হয়ে বস্তার মত পড়ে থাকব ভেতরে, সেটিও সম্ভব হচ্ছে না। পথচারির চোখে পড়তে পারে বস্তা হওয়ার দৃশ্য। মুখ বেশি ঢাকা যাচ্ছে না, বেশি করে মুখ ঢাকলে সন্দেহ হবে, এমনিতে গরমকালে শীতের চাদরে মাথা ঢাকাটাই উদ্ভট। আমি শাড়ির আঁচল দিয়ে নাক ঢেকে রাখি, যেন নাক ঢাকছি ধুলো বালি এড়াতে। নাক ঢাকতে গিয়ে চিবুক ঢাকা হয়ে যাচ্ছে, ঠোঁট ঢাকা হচ্ছে, গাল হচ্ছে। চাদর মাথার ওপরে বেশি টেনে দেওয়ার ফলে কপালের খানিকটা ঢাকা হয়েছে। বাকি আছে চোখদুটো। চোখদুটোতে আশংকা, এই আশংকাই কারও নজরে পড়লে সংশয় জাগাবে। কিন্তু আশংকাকে কোথায় লুকোই আমি! আশংকা নিয়ে চোখদুটো নত হয়ে থাকে। কিন্তু রাস্তায় যান বাহন জট পাকাচ্ছে, আমি তো আর আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা নই, আমি কেন চোখ তুলে দেখছি না কি হচ্ছে না হচ্ছে! গাড়ির ভেতর এক চালক ছাড়া আমরা সব শ্বাস বন্ধ করে রাখছি। আমার মাথাটি আলতো করে ধরে খ তাঁর নিজের কাঁধে রাখেন। এবার আমি মনে মনে বুঝি, আমাকে কি করতে হবে, আমাকে চোখ বুজে থাকতে হবে, আমি যে অসুস্থ এক মহিলা, গাড়ি করে কোনও হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি, অথবা হাসপাতাল থেকে এসেছি, তা যেন অনুমান করে নেয় যে কেউ, যারই চোখ আমার মুখে পড়ে। গাড়ির জট খুলে রাস্তা পরিষ্কার হতে বারো মিনিট সময় নেয়, এই বারো মিনিট আমার কাছে বারো বছরের মত দীর্ঘ। যেন বারো বছর ধরে আমার সশস্ত্র আততায়ীটির চোখের সামনে নিরস্ত্র বসে আছি। গাড়ি থামলে আমাকে আর সবার সঙ্গে নেমে পড়তে হয়। মুখ মাথা ঢাকা আমি, কেবল চোখদুটো খোলা। দোতলা একটি বাড়ির দোতলায় উঠি মুখ মাথা খোলাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে। ঘর অন্ধকার করে ভেতরে যে মেয়েটি বসেছিলেন, তার নাম চ। ঘরের আধো আধো আলোয় আমি ঙ কে চিনতে পারি, ঙ দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বড় মাপের একজন বুদ্ধিজীবী। ঙ র বাড়িতে আমি আগে দুবার গিয়েছি, একবার কজন সাহিত্যিককে ডেকেছিলেন একটি ঘরোয়া আলোচনায়, আর একবার ঙ এবং ঙর স্ত্রী আমাকে এবং আরও কজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। ঙর মত এত বড় একজন মানুষ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, এটি আমাকে নিরাশার গাঢ় অন্ধকার থেকে টেনে আলোতে ওঠায়। কি করে ক র সঙ্গে ঙ র যোগাযোগ হল, কিছু আমি জানি না। যে বাড়িতে ঙ আমাদের নিয়ে এলেন, এটি তাঁর কন্যার বাড়ি। চ নামের মেয়েটি তাঁর কন্যা।

আধাঁর আঁধার ঘরটিতে ক, খ, ঙ, চ এবং আমি। আমাদের মধ্যে খুব নিচু গলায় কথা হয়। ক বলেন যে তিনি আমার উকিলের কাছে গিয়েছিলেন, উকিল এখনও আদালতে যাননি আমার জামিনের জন্য। ডঃ কামাল হোসেন দেশে ছিলেন না, তিনি ফিরে এসে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছেন। ক আরও বললেন যে যেহেতু এই মামলায় জামিন হয় না, সুতরাং জামিনের জন্য যদি উকিল লড়তে চান, তবে দেশের জনগণ যে আমার বিরুদ্ধে জারি হওয়া মামলা আর গ্রেফতারি পরোয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, তা বলতে হবে, তার প্রমাণ দেখাতে হবে। তাই আমার পক্ষে এখন জনমত দরকার, পত্রিকায় আমার পক্ষে বিবৃতি দরকার। এটিই এখন সরচেয়ে জরুরি। ক নিজে বিবৃতি যোগাড় করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, কিন্তু কেউ, কোনও বুদ্ধিজীবী, লেখক, রাজনীতিক বিবৃতি দিতে চাইছেন না। কে দিতে চাইছেন না, তা আমার জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। আমি বলি, কিছু বিবৃতি তো গেছে।
কর মুখে দুশ্চিন্তার দাগটি আরও ঘন কালো দেখায় যখন বলেন, ও কটা বিবৃতিতে কিচ্ছু কাজ হবে না।
খ বললেন, তোমার জন্য এ দেশের লোকের সাপোর্ট আছে, তোমার পক্ষে দাঁড়াবার জন্য এটিই একমাত্র বেইস।
ঙ বললেন, বিদেশি কিছু ইম্পর্টেন্ট অরগানাইজেশন তো প্রতিবাদ করেছে।
ক বললেন, হ্যাঁ বিদেশি অরগানাইজেশনের সাপোর্ট আছে। কিন্তু দেশি সাপোর্ট লাগবে। দেশি সাপোর্টএর মূল্য এখন বেশি।
সারা হোসেনের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? ক কে জিজ্ঞেস করি।
ক বললেন, আপনার ভাগ্য খুব ভাল যে আপনি ডক্টর কামাল হোসেনের মত উকিল পেয়েছেন। তাঁর মেয়ে সারা হোসেন আপনার জামিনের ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। কোর্টে আপনার অনুপস্থিতিতে জামিন নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ কোর্টে যাওয়া তো আপনার জন্য রিস্কি। যতদূর মনে হচ্ছে জামিন পাওয়া মোটেও সহজ নয়। এ দেশে কজন উকিল এধরনের কেইস করার ঝুঁকি নিতে পারে? চারদিকে খবর হয়ে গেছে যে কামাল হোসেন আপনার উকিল। পাবলিক সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। কখন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় উকিলের অফিস কে জানে! কামাল হোসেন একটা পলিটিক্যাল পার্টির লিডার। আপনার পক্ষ নিলে তাঁরও ক্ষতি হবে।
দীর্ঘ একটি শ্বাস গোপন করি।
খ বললেন, ঙ যে কত উপকার করলেন আজ। ঙর সঙ্গে যদি আজ দেখা না হত তবে তোমাকে কোনও বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা ছিল না। ঘ যখন জানিয়ে দিলেন যে তোমাকে তিনি আর রাখতে চাইছেন না, মোট সাতজনের সঙ্গে আমি গোপনে কথা বলেছি, কেউ তোমাকে রাখার ঝুঁকি নিতে চান না। একমাত্র ঙ রাজি হয়েছেন।
ক হঠাৎ অপ্রাসিঙ্গকভাবে লজ্জার কথা তুললেন। বললেন, আপনার উচিত ছিল লজ্জা বইটাতে একটা ব্যালেন্স রাখা। ভারতের মুসলমানের ওপর কি হয়েছে, সেটা আপনি পুরো এড়িয়ে গেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এ দেশের মানুষ আগে যেমন আপনাকে পছন্দ করত, এখন আর তেমন করে না।

দীর্ঘশ্বাস জানে কতটা দীর্ঘ তার পথ।
ক হঠাৎই উঠে পড়েন, উঠে বিরক্ত গলায় বলেন, আপনি এত দীর্ঘদিন থেকে নারীবাদী লেখা লিখছেন। আপনার কেন কোনও মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না! কেন করেননি যোগাযোগ? দেশে এত সংগঠন, আপনি কোনও সংগঠনের সদস্য নন। আজ যদি আপনি কোনও একটা মহিলা সংগঠনের সদস্য হতেন, আপনার এই অসুবিধা হত না।

যাবার আগে ক চকে বললেন দরজা তো বটেই, জানালাগুলোও সব সময় বন্ধ রাখার জন্য, যেন বাইরে থেকে কেউ আমাকে দেখার সুযোগ না পায়। টেলিফোন তালাবন্ধ রাখার জন্য যেন কোনওভাবেই আমার হাতের নাগালে টেলিফোন না আসে কারণ ভুল করে আমি এমন কাউকে ফোন করে ফেলতে পারি যার বাড়ির ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে, পুলিশ তখন জেনে যাবে কোন বাড়িতে আমি আছি, তখন কেবল আমার সর্বনাশ হবে না, চ র ও হবে।

আট জুন, বুধবার

যে ঘরটিতে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সে ঘরটিতে একটি জানালা আছে, জানালাটি বন্ধ। ঘরে কোনও পাখা নেই। জুন মাসের গা সেদ্ধ করা গরম। সারারাত গরমে ঘামি, ছটফট করি, উঠে বসি, আবার শুই। মশা ভনভন করছে, কামড়াচ্ছে। অন্ধকারে এপাশ ওপাশ করছি, জলতেষ্টায় কাতরাচ্ছি, কোথায় আলো পাবো, জল পাবো, একটি হাতপাখা পাবো, জানি না। এক রাতেই ঘামাচিতে ভরে গেছে পুরো মুখ। মশার কামড়ের লাল লাল দাগ হাতে পায়ে গালে গলায়। সকালে এককাপ চা খাবার তৃষ্ণায় অস্থির হই। কিন্তু কোথায় পাবো চা! এ বাড়িতে চায়ের চল নেই। চ সকালেই তাঁর চার বছর বয়সী কন্যাটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, ওকে ইশকুলে ছেড়ে দিয়ে তিনি আপিসে যাবেন। বিকেলে বা সন্ধ্যায় ফিরবেন। চর স্বামী ঢাকার বাইরে থাকেন। এ বাড়িতে চ তাঁর কন্যা নিয়ে থাকেন, বাড়ির কাজ কর্ম করার জন্য দশ এগারো বছর বয়সী বল্টু নামের একটি ছেলে আছে। বল্টু রান্না বান্না করে খেয়ে দেয়ে খাবার ঘরে বসে থাকবে। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে পাখাহীন ঘরটিতে বসে থাকব। পেচ্ছাব পায়খানায় যেতে হলে আশপাশ দেখে নিয়ে মাথায় কাপড় চোপড় দিয়ে নিজেকে যতটা সম্ভব অচেনা করে ঢুকে যাবো। যদি ক্ষিধেয় মরে যেতে থাকি, কিছু খাবার পেটে না দিলেই নয়, তবে, টেবিলে, আশেপাশের বাড়ির বারান্দা বা জানালা থেকে কেউ কোনও রকম ছিদ্র দিয়েও যেন আমাকে দেখতে না পায় এমন ভাবে বসতে হবে, খেতে হবে। হাঁটাচলা করতে হবে নিঃশব্দে, যেন নিচের তলার লোকেরা টের না পায় যে এ বাড়িতে একটি মানুষ হাঁটছে। মাথার কাপড় যেন কখনও না খসে আমার, বল্টুর যেন কোনও সন্দেহ না হয় যে আমি চর কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয় নই, আমার স্বামী মারা যায়নি, আমি শহরের

আত্মীয়দের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য আসিনি। বল্টুর সঙ্গে চোখাচোখি মুখোমুখি পারতপক্ষে না হলে ভাল। সদর দরজায় হঠাৎ বাইরে থেকে তালা পড়লে এখন সন্দেহ জাগবে। বল্টুর তো জাগবেই, প্রতিবেশিদেরও জাগবে। সুতরাং যা চ আগে করছিলেন, তাই করেছেন, শোবার ঘরে তালা দিয়ে গেছেন। খোলা শুধু রান্নাঘর আর গরম ঘরটি, আর এক চিলতে খাবার ঘর নামক জায়গাটি। সকাল পার হতে থাকে, চা পাওয়া হয় না, কিন্তু মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে, যেন গহীন গ্রামের লজ্জাশীলা ফুলবিবি, দুটি রুটি আধা চিবিয়ে আধা গিলে গরমে সেদ্ধ হতে চলে আসি জানালা বন্ধ ঘরটিতে। টেলিফোনের লেজটি বেরিয়ে এসেছে চর শোবার ঘরের দরজার তল দিয়ে। খাবার ঘর থেকে সরিয়ে ফোনটি শোবার ঘরে বন্দি করা হয়েছে। যেন আমি শিশু, আমার নাগাল থেকে কাচের বাসন কোসন সরিয়ে রাখা হচ্ছে। তা হোক, আমি তো অনেকটা শিশুই এখন, অন্যের ওপর নির্ভর করে আছি সব কিছুর জন্য। কোথায় সেই স্বাধীনচেতা মানুষটি! মানুষটির দিকে এখন তাকাতে পারি না। কী হচ্ছে দেশে, জামিন কবে পাবো, কবে মুক্তি পাবো এই লুকিয়ে থাকা থেকে! কিছুই জানি না। সম্ভবত কোনও জামিন আমার হবে না, সম্ভবত আমাকে ছুঁড়ে ফেলা হবে কারাগারে। এই কারাগারের মত বাড়িটিতে সম্ভবত আমার একরকম মহড়া চলছে সত্যিকার কারাগারে থাকার।

সকালেই ঙ আসেন। এসেই খাবার ঘরের জানালর কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের চারদিক দেখে আবিষ্কার করেন যে পাশের তিনতলা বাড়িটির বারান্দা থেকে এ বাড়ির খাবার ঘরটি চাইলেই কেউ দেখতে পারে। একটি পর্দা টাঙিয়ে দেবেন কী না জানালায় তা নিয়ে ভাবেন। কিন্তু আবারও ভাবেন যে হঠাৎ করে পর্দা টাঙিয়ে দিলে কারও যদি আবার সন্দেহ হয়! বাড়িতে একটি ঘোমটা পরা মহিলাকে দেখা গেছে একদিন, তার পরই জানালায় পর্দা ঝুলছে! সন্দেহের কারণ বটে। ঙ সরে আসেন জানালা থেকে, গলা চেপে বলেন, ওদিকটায় যেও না। যাবো না। ঙ কি আজ জানালা দরজা পরীক্ষা করতে এসেছেন! কোথায় আমি যাবো, কোথায় আমি যাবো না তা দাগিয়ে দিতে এসেছেন! না, এসব কারণে আসেননি ঙ। ঙ এসেছেন খুব জরুরি একটি কাজে। আমাকে দিয়ে এক্ষুনি তিনি একটি চিঠি লিখিয়ে নিতে এসেছেন, চিঠিটি আমাকে লিখতে হবে জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে। ঙর কপালে, গালে, গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম, ঘাম গরমের নাকি ভয়ের তা নিয়ে যখন ভাবছি, বললেন, দেশের অবস্থা খুব খারাপ তসলিমা। আমরা কেউ বুঝে পাচ্ছি না কি হতে যাচ্ছে .। সংসদ ভবনে বাংলাদেশের পতাকার বদলে চাঁদ তারার পতাকা উড়েছে সেদিন।

এসব বলছেন কি! এত বড় স্পর্ধা ওদের!

আতঙ্ক আমাকে আঁকড়ে ধরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঙ বলেন, দেশের মানুষকে কি জানাতে চাও, বল। তোমার কথা তাদের শোনা দরকার। কোরান সংশোধনের কথা যে বলনি তা লেখ।

বিরক্ত কণ্ঠে বলি, আমি তো বলেইছি যে আমি বলিনি। কতবার বলব!

আবার বল। আবার লেখ। এই চিঠি স্পীকারের কাছে যাবে, সব পত্রিকায় যাবে। আমি ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছি। তাঁরাও আমাকে বললেন যে স্পীকারের কাছে চিঠি লিখে দেখা যাক কি হয়।

ডডকী লিখব, আমি কোরান বিশ্বাস করি না সুতরাং কোরান সংশোধন করার কথা বলার আমার কোনও কারণ নেই!

ডডকোরান বিশ্বাস কর না, এ কথা বলার তোমার দরকার নেই এখন। এসব কথা আগে অনেক বলেছো। খুব বিনীত হয়ে এই চিঠিটি লেখ।

ঙ আমার দিকে কাগজ কলম এগিয়ে দেন। আমি দ্রুত লিখতে থাকি,

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

সম্প্রতি সরকার আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি নাকি কোরান শরিফ সংশোধনের কথা দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে বলেছি। অথচ কোরান শরিফ সংশোধনের কথা আমি কখনও কোথাও কোনওদিনই উচ্চারণ করিনি। আমার বিশ্বাস এবং মতবাদ নিয়ে আমার রচিত ২১টি বইয়ের কোনও বাক্যেও কোরান সংশোধনের প্রসঙ্গ নেই।

কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার জন্যে যে অমুসলমান মেয়েটি আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল, সে কোরান ও শরিয়া আইনের মধ্যে কী পার্থক্য তা স্পষ্ট জানে না। তাই শরিয়া বিষয়ে আমার উত্তরকে কোরানের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলে। তার প্রশ্ন ছিল, তিরিশের দশকে আল্লামা ইকবাল শরিয়া আইনের পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, এ সম্পর্কে আপনার মত কি? আমি তখন উত্তরে বলি, শরিয়া আইনের অল্প পরিবর্তন আমি চাই না, ১৯৬১ সনে আমাদের দেশে শরিয়া আইনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আমি চাই সংশোধিত শরিয়া আইন অর্থাৎ মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তে একটি আধুনিক আইন (য়শভপষক্ষল দভৎভর দষধন)যাতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত হয়। এই দাবি আমার একার নয়, দেশের প্রতিটি নারী আন্দোলন সংস্থা এই দাবি দীর্ঘদিন থেকে করে আসছে। স্টেটসম্যানের অনভিজ্ঞ সাংবাদিকটি আমার এই বক্তব্যকে সংক্ষেপ করে শরিয়ার স্থলে কোরান বসিয়ে দিয়েছে। কোরান যে সংশোধন করা যায় না তা আমি এর আগের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে বলেছি কোরানের একটি শব্দও কেউ কখনও পরিবর্তন করতে পারবে না। এই বক্তব্য দ্য স্টেটসম্যানের সাক্ষাৎকারে ছাপাও হয়েছে। ৯ই মে তারিখে বড় বড় ভুলসহ আমার সাক্ষাৎকারটি স্টেটসম্যানে ছাপা হবার পরদিনই আমি প্রতিবাদ করি, যা ওই পত্রিকার ১১মে তারিখে ছাপা হয়েছে। প্রতিবাদের মূল কথা ছিল, আমি কখনও কোথাও কোরান সংশোধনের কথা বলিনি। যারা এখন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যে কথা আমি বলিনি সে কথা প্রচার করে আমার ফাঁসি চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে, কোনও তথ্য যাচাই না করে আমাকেই আসামী করে সরকার মামলা রুজু করেছেন। এটি যে কোনও মানুষেরই মৌলিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি হতাশাজনক দৃষ্টান্ত। আমি এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করছি।

এটুকু লেখার পর ঙ বললেন, কোরানের আগে পবিত্র শব্দটি বসিয়ে দাও।
না, এটা লিখব না। আমি বলি।
পবিত্র শব্দটি জুড়ে দিলে কী ক্ষতি?
কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু কোরানকে আমি পবিত্র বলে মনে করি না। আমার বইগুলোতে কোরান সম্পর্কে বিস্তর সমালোচনা আছে। তাছাড়া বেদ বাইবেল ও কোরানের নারী নামের লেখাটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। সবাই জানে যে আমি কোরানকে মোটেও পবিত্র ভাবিনা। তাছাড়া পবিত্র লিখলেই কি না লিখলেই কি, কোরান তো কোরানই। যারা এটিকে পবিত্র মনে করে তারা করবেই।
ঙ ঠোঁট সজোরে যুক্ত করে ভেবে বলেন, নিরাপত্তার কথা লেখ। তোমার, তোমার ফ্যামিলির। ফ্যামিলির কাকে কাকে নাকি পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তোমার বাবার ওপর হামলা হচ্ছে। মৌলবাদীরা ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে আক্রমণ করার জন্য।
লিখে যাই, আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীরা এবং আমার প্রাণনাশের হুমকি প্রদানকারীরা কেবল আমার জীবন বিপণ্ন করছে না, আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনও বিপন্ন করে তুলেছে। যে কথা আমি কখনও উচ্চারণ করিনি তার জন্যে আমাকে দায়ী করে আমার বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছে, সেই মামলা প্রত্যাহার করার জন্যে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আমি সরকারের কাছে আমার এবং আমার পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আবেদন জানাচ্ছি।
এটুকুর পর ঙ বললেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাওনি এ কথা বল।
বলি, আমি যা সত্য মনে করি লিখি। কারও ধর্মীয় অনুভতিতে আঘাত লাগবে কি লাগবে না তা ভাবি না।
কিন্তু তুমি তো ইচ্ছে করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেবার জন্য লেখ না। তোমার কি উদ্দেশ্য অন্যের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত করা?
না এত স্থূল উদ্দেশ্য আমার নেই।
তবে লিখে দাও।
আশা করি আমার এই বিবৃতির পরে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। কেননা আমার মতামত দ্বারা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না, এবং নেই।
সই করি। তারিখ লেখার সময় ঙ আমাকে থামিয়ে একটু ভাবলেন, ভেবে বললেন, গতকালের তারিখ দাও।
কেন?
সবই তোমার নিরাপত্তার কারণে। আজকে যে লোক চিঠিগুলো চিঠির বাক্সে গোপনে রেখে আসবে, তার চিহ্নিত হলে চলবে না।
ঙ চলে যান, রেখে যান আজকের পত্রিকাগুলো।
এবার বন্ধ ঘরে বসে আগুনে পোড়ো। আগুন পাখাহীন হাওয়াহীন ঘরের নয়, আগুন পত্রিকার খবরের।

<u>তসলিমার কর্মকাণ্ডে নাটের গুরুর ভূমিকায় ভারতের একটি মহল</u>

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা ইনকিলাবের প্রথম পাতায় প্রধান খবর হিসেবে ছাপা হয়েছে একটি চিঠি এবং চিঠির ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য।

‘Dearest Taslima, 25th May,1994

Further to our telephone conversation this afternoon, here is my latest information.
It seems that, due to an oversight by somebody in our financial depertment, a cheque of $ 5,144.21 (the advance payment of Lajja), dated 15th of April and in your favour was sent directly to your address(instead of a bank order, to your bank account, as per my instructions).
This cheque was cashed and our account debited by the clearing bank in New York on the 19th of May.
I have asked the BNP (our bank) to fax me the copy of this cheque. I can’t understand what happened unless it was stolen and your signature forged.This is what we want to find out.
The two other payments were made according to my instructions on the 15th and 16th of May, and have gone to your bank who should have the money very shortly if not already.
Needless to say that I am pursuing my enquiries. I shall talk to our financial controller tomorrow to see how to solve the problem.
I am awfully worried about you, and the more furious that such a stupid thing should happen at such an inconvenient time.
With lots of love
Christaine Besse

বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা দীর্ঘদিন থেকে ইসলাম ধর্ম, আইন, ভারত বিভাগ, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, দেশের শ্রদ্ধাভাজন পীর মাশায়েখ, আলেম উলামাদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিকর মন্তব্য এবং লেখালেখি করে আসছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কথাবার্তা ও লেখালেখির মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ খোলাখুলি প্রকাশিত হয়েছে। তসলিমার এসব কর্মকান্ডের পিছনে ইন্ধনদাতা তথা নাটের গুরু হিসেবে যে ভারতের একটি বিশেষ মহল কাজ করছে, তা আজ সুবিদিত। মূলত তসলিমা নাসরিনকে ভারত তার দীর্ঘলালিত মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব প্রসূত কর্মকাণ্ড বা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হাসিলের লক্ষ্যে প্রণীত নীল নকশা বাস্তবায়নের খুঁটি হিসেবেই ব্যবহার করছে। তাই দেখা যায়, ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকার জন্য তসলিমা নাসরিন যখন দেশপ্রেমী জনগণ কর্তৃক ধিকৃত ও ঘৃণিত, তখন ভারত ও সে দেশের একটি বিশেষ মহল তাকে পরম সমাদরে লুফে নিচ্ছে এবং নগদ অর্থ ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানসহ প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করে তাকে প্রায় দেবীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই যে উপন্যাস পড়ে মানুষ লেখিকার প্রতি ঘৃণা ও ধিককারে সোচ্চার হয়ে ওঠে, সেই লজ্জা উপন্যাস ভারতের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হয়েছে। মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তায় ঠাসা উপন্যাস নামের এ অপ উপন্যাসটি পড়ে ইতোমধ্যেই ছাত্র ছাত্রীরা বিভ্রান্ত হতে শুরু করেছে। সেখানকার অভিভাবক মহলে এই বইটি পাঠ্য করায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে অতি সম্প্রতি লজ্জা উপন্যাস লেখার জন্য বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ভারতীয় অর্থ পাওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় বিশেষ মহলের সুকৌশলী ব্যবস্থাপনায় রুপি নয়, এখন তার নামে দফায় দফায় বিদেশি ডলার আসার চাঞ্চল্যকর প্রমাণ পাওয়া গেছে। তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর এতে ভিত্তিহীন, মিথ্যা তথ্যের ব্যাপক উপস্থাপন দেশপ্রেমিক জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য ও তথ্যে ভরা এ উপন্যাসটি সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী হওয়ার কারণে সরকার তা নিষিদ্ধ করে। কিন্তু বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হলেও প্রতিবেশী দেশ ভারতের একটি বিশেষ গোষ্ঠী ও মৌলবাদী দল বিজেপি লজ্জাকে লুফে নেয় এবং সেখানে উপন্যাসটির ব্যাপকভাবে মুদ্রণ ও প্রচার শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, বিজেপি এ উপন্যাসটি লেখার জন্য তসলিমাকে ৪৫ লাখ টাকা দিয়েছে। বাংলাদেশে তসলিমার অনুরাগী ও ভক্ত মহলটি সাথে সাথে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং তসলিমাকে ভারতীয় অর্থ মদতানের বিষয়টি *মৌলবাদীদের প্রচারণা* বলে আখ্যায়িত করে একে ভিত্তিহীন প্রমাণের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু বিধি বাম। অতিসম্প্রতি অপ্রত্যাশিত ভাবে হস্তগত হওয়া তসলিমার নামে নিউইয়র্ক থেকে প্রেরিত একটি ফ্যাক্স থেকে তার ভারতীয় অর্থলাভের চাঞ্চল্যকর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ফ্যাক্স থেকে দেখা যায় লজ্জা উপন্যাসের জন্য ভারত থেকে তসলিমাকে অর্থ প্রেরণের ঝুঁকি এড়াতে ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ভারত থেকে

সরাসরি নয়, অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে আমেরিকার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে। এভাবে ধর্ম রাষ্ট্র ও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী তসলিমা নাসরিনকে অর্থের মদদ জোগানো হচ্ছে ডড যা তসলিমাকে ধর্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমিক মানুষের ধিককার ও প্রতিবাদের প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা প্রকাশের সাহস যোগাচ্ছে।
অন্যদিকে গত ৩ জুন কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় এক খবর প্রকাশ করেছে। এ খবরে বলা হয় বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে বাগে আনতে মুসলিম মৌলবাদীরা এবার তাঁর বাবার ওপর চাপ দিতে শুরু করেছে। পত্রিকা জানায়, তসলিমার বাবা হওয়ার জন্য ডাঃ রজব আলীকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অবশ্য আনন্দবাজার পত্রিকা তসলিমা সম্পর্কে তার আব্বার মন্তব্যও তুলে ধরেছে। জনাব রজব আলী বলেছেন যে আমি ধর্ম বিশ্বাসী মুসলমান হিসেবে ওর(তসলিমা) ধর্মবিরোধী লেখা সমর্থন করি না। ধর্ম সম্বন্ধে ওর বক্তব্যের বিরোধী আমি।
লক্ষণীয় যে, তসলিমার আব্বার এ সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং অবস্থান সত্ত্বেও ধর্মবিরোধী লেখা থামাতে তসলিমার বাবাকে চাপ শিরোনামে খবরটি চিহ্নিত করার মধ্যে ভারতের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বিশেষ মহলটির সাথে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বিশেষ উদ্দেশ্যটিরই নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে।'

লেখাটি প্রায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে আমি ভাবতে বসি, ক্রিশ্চান বেস এর পাঠানো ফ্যাক্স ইনকিলাবের লোকদের হাতে পড়ল কি করে! এই ফ্যাক্স আমি পাইনি। আমার যেহেতু ফ্যাক্স মেশিন নেই, ইয়াসমিনের আপিসের ফ্যাক্স নম্বরটিই ক্রিশ্চান বেসকে দিয়েছিলাম। ফ্যাক্সটি ইয়াসমিনের হাতে না পড়ে নিশ্চয়ই অন্য কারও হাতে পড়েছে। যার হাতেই পড়েছে, দিয়েছে ইনকিলাবের লোকদের। নাকি ক্রিশ্চান ফ্যাক্স নম্বর লিখতে ভুল করেছেন, আর গিয়ে পড়েছে কোনও ইনকিলাবের লোকের হাতে, অথবা অন্য কারও হাতে যে কি না ইনকিলাবের লোককে দিয়েছে! কিছু একটা হবে। তবে নিউইয়র্ক থেকে অবশ্যই এই ফ্যাক্স পাঠানো হয়নি। ফরাসি দেশের ফ্রাঁ নিউইয়র্কের ব্যাংকে ডলার হয়ে পরে বাংলাদেশের ব্যাংকে এসে টাকা হয়। এরকই নিয়ম। কিন্তু ইনকিলাব নিউইয়র্কের ব্যাংকের নাম দেখেই ভেবে নিয়েছে ফ্যাক্স নিউইয়র্ক থেকে এসেছে। ভেবে নিয়েছে অথবা ইচ্ছে করেই বানিয়ে লিখেছে। পত্রিকা ঘাঁটতে গিয়ে দেখি বিএনপি দলের পত্রিকা দৈনিক দিনকালে এই চিঠি ছেপে বিশাল করে লিখেছে তসলিমার কাছে ভারত থেকে সরাসরি নয়, ভায়া আমেরিকা হয়ে মোটা অংকের ডলার আসছে। ইয়াসমিন একবার বলেছিল, তার আপিসের মালিকের বড় ভাই মাইদুল ইসলাম বিএনপির সঙ্গে যুক্ত, জিয়ার আমলে মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই কি তবে তাঁর দলের পত্রিকায় ছাপার জন্য চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছেন! হতে পারে! আরেকটি পত্রিকায় আজকের খবর---

ধর্মদ্রোহী নাস্তিক তসলিমার আন্তর্জাতিক মদদদাতাদের আংশিক সন্ধান পাওয়া গেছে। গত মাসের শেষ সপ্তাহে ফ্রান্স থেকে পাঠানো এক ফ্যাক্স

অনুযায়ী দেখা যায় ফ্রান্সের খ্রিস্টান বিশি তসলিমাকে তার লজ্জার জন্য অগ্রিম বাবদ পাঁচ হাজার ১৪৪ দশমিক ২১ ডলার পরিশোধ করেছে। এছাড়াও গত ১৫ ও ১৬ মে আরো দু দফায় অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফ্যাক্স অনুযায়ী ১৫ এপ্রিলে পাঠানো প্রথম কিস্তির টাকা গায়েব হয়ে গেছে। এ নিয়ে দু পক্ষে ২৫ মে বিকেলে ফোনে আলোচনা হয়েছে। অর্থ গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে ফ্রান্সের বিশি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই তিনি লিখেছেন, আমাদের ব্যাংকের নিউইয়র্ক শাখা থেকে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে মিঃ বিশি তাঁদের ব্যাংক বিএনপিকে চেকের কপি পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ধারণা স্বাক্ষর জাল অথবা চেকটি চুরি না হলে এ ঘটনা ঘটতে পারে না। কারণ চেকটি সরাসরি তসলিমার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। চেকটি ভুলবশত তসলিমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে না গিয়ে বাসায় গিয়েছে বলে ফ্যাক্সে বলা হয়েছে। ফ্যাক্সে উল্লেখ করা হয়েছে মিঃ বিশি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রয়েছেন। উল্লেখ্য, তসলিমা নাসরিন তার বৈধ পাসপোর্ট ফেরত পাবার পর প্রথমে ফ্রান্স পরে নিউইয়র্ক ও কলকাতা হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তসলিমার লজ্জা উপন্যাস ভারতে বিজেপির মুখপত্র হিসেবে কাজ করছে।

এই পত্রিকার লোকের হাতেও ফ্যাক্স টি গেছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। অন্তত এই লোকেরা জানে যে ফ্যাক্সটি পাঠানো হয়েছে ফ্রান্স থেকে। তবে কোন কোন দেশ হয়ে আমি বাংলাদেশে এসে পৌঁচেছি তা বলতে গিয়ে নিউইয়র্ক উল্লেখ করার সম্ভবত একটি কারণ, ফ্যাক্সে নিউইয়র্কের ব্যাংক প্রসঙ্গটি আছে, আমি ও শহরটা হয়ে এলে অর্থযোগের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। সুতরাং আমি ও শহরে না গেলেও পত্রিকাটি আমাকে ও শহরে ঘুরিয়ে আনবে, কার কি বলার আছে! বিজেপি আমাকে ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে লজ্জা লেখার জন্য, এটি যারা এতকাল বিশ্বাস করেনি, তাদের বিশ্বাস করাবার জন্য চমৎকার একটি প্রমাণ দেওয়া হল। অনেকে বলে, যা রটে, তা কিছুটা বটে। সুতরাং ৪৫ লক্ষের রটনা যে কিছুটা বটেও, সে ব্যাপারে আজ দেশের কত লক্ষ লোক নিশ্চিত হবে, অনুমান করতে চেষ্টা করি। মাথা বন বন করে ঘুরে ওঠে। আজ যদি ঙ আসেন, চ এসে সামনে দাঁড়ান, অথবা ক, অথবা খ, তাঁরা কী চোখে তাকাবেন আমার দিকে? নিশ্চয়ই বলবেন, যে, না, তোমাকে আমরা আর সাহায্য করতে পারছি না। তুমি এবার নিজের পথ দেখ। তবে কী করব আমি? বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নেব? রিক্সায় আমি কতদূর যেতে পারব আমাকে রিক্সা থেকে টেনে নামিয়ে রাস্তায় যখন পিষে মারবে? আমার লাশ নিয়ে বড় একটি জয়ের মিছিল হবে সারা শহরে! ঠিক কতক্ষণ পর তা হবে, আমি বেরোনোর কত মিনিট পর! অনুমান করতে চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি বমির উদ্রেক হচ্ছে। পেচ্ছাবখানায় গিয়ে বল্টুর গু মুতের তীব্র গন্ধের মধ্যে দরজা বন্ধ করে মেঝেয় বসে থাকি। বমি আসছে কিন্তু আসছে না। গা জ্বলছে, গলা জ্বলছে। গোঙানোর শব্দ শুনতে থাকি নিজের। একসময় নিজেকে টেনে তুলে বিছানায় নিয়ে যাই। বিছানায় ছড়িয়ে আছে পত্রিকার স্তূপ। এক একটি হাতে নিই, চোখ বুলোই।

<u>তসলিমাকে ধরতে পুলিশ কোর্ট এলাকায় ওৎ পেতে ছিল।</u>

পুলিশ লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টা পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশ জানিয়েছে যে তাকে গ্রেফতারের জন্য মতিঝিল থানা ও গোয়েন্দা শাখার একাধিক বিশেষ দল ঢাকা মহানগরী ও দেশের কয়েক জায়গায় তৎপরতা চালাচ্ছে। কোথাও তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তসলিমা আদালতে আত্মসমর্পণ করতে আসতে পারেন, এ ধরনের গুজবের প্রেক্ষিতে পুলিশ গত ২ দিন হাইকোর্ট ও জজ কোর্ট এলাকায় ওৎ পেতে ছিল। (দৈনিক সংবাদ)

তসলিমাকে ব্যাপক খোঁজাখুঁজি

গত তিনদিনে তসলিমাকে ধরার জন্য দুই শতাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও ঢাকাসহ দেশের পাঁচ শতাধিক সম্ভাব্য স্থানে অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু তসলিমাকে পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশের ধারণা, তিনি দেশের ভেতরেই আত্মগোপন করে আছেন। ঢাকা ময়মনসিংহসহ দেশের সকল সম্ভাব্য স্থানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কড়া নজর রাখা হচ্ছে তসলিমার আত্মীয়স্বজনসহ ঘনিষ্ঠজনদের গতিবিধির ওপর। জয়দেবপুরের প্রভাবশালী যুবক কায়সারের আশ্রয়ে তসলিমা রয়েছেন, এ খবর পেয়ে পুলিশ সেখানেও অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তসলিমার বাসাসহ তার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে এমন বেশ কয়েকটি টেলিফোনের কথাবার্তা পুলিশ রেকর্ড করছে বলে সূত্র জানিয়েছে। পুলিশের অপর একটি সূত্র জানায়, সিএমএম আদালত ও হাইকোর্ট এলাকাতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। গত রোববার এক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হোটেল শেরাটনের বেশ কয়েকটি কক্ষে অভিযান চালায়। (ভোরের কাগজ)

তসলিমাকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে বিবৃতি বিক্ষোভ সমাবেশ

ধর্মদ্রোহী তসলিমা নাসরিনকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবিতে সারাদেশে সভা সমাবেশ বিবৃতি ও বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত রয়েছে। নেতৃবৃন্দ ধর্মদ্রোহীদের ইসলামি বিধানমতে শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানান। জনকণ্ঠসহ ধর্মদ্রোহী সকল পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল, ধর্মবিরোধী বইপুস্তক নিষিদ্ধ এবং লেখক, প্রকাশক, সম্পাদকের কঠোর শাস্তি ও এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধের দাবিতে ৩০ জুন বৃহস্পতিবার ইয়ং মুসলিম সোসাইটি বাংলাদেশ আহুত দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আজ সকাল ১১টায় হোটেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনালএ সবুজবাগ, মতিঝিল, ডেমরা, সূত্রাপুর থানা ও ইউনিট প্রধানদের বৈঠক। একই দিন বিকাল ৫টায় সবুজবাগ থানা শাখার উদ্যোগে বাসাবো ওহাব কলোনির মোড়ে গণসমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় হোটেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এ লালবাগ, কোতায়ালি, রমনা, ধানমণ্ডি থানা ও ইউনিট প্রধানদের বৈঠক। একই দিন বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ চত্বর ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রাহী তৎপরতা প্রতিরাধ মোর্চা ঘোষিত যুব সমাবেশে যোগদান। শুক্রবার সকাল ৯টায় হোটেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল মোহাম্মদপুর, মীরপুর, পল্লবী, তেজগাঁও, ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, উত্তরা থানা ও ইউনিট প্রধানদের বৈঠক। একই দিন বাদ জুম্মা ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা আহুত মিছিলে যোগদান। গতকাল ৩৩ মিন্টো রোডে

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দল আয়োজিত এক সভায় ধর্মদ্রোহী তসলিমা নাসরিনকে অবিলম্বে গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। বড় কাটরা মাদ্রাসা ছাত্র সংসদের প্রতিবাদ সভায় তসলিমার ফাঁসির দাবি জানানো হয়। তমদ্দুন মজলিশ আয়োজিত আলোচনা সভায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তুল্য বিদেশি অর্থপুষ্ট এনজিওসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, কুখ্যাত তসলিমা নাসরিনসহ একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও কিছু পত্রিকার ইসলাম বৈরি তৎপরতা দমন এবং আমাদের স্বাধীনতা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদেশি মদদ পরিচালিত অপপ্রচার মোকাবেলা করার আহবান জানানা হয়। ফ্রীডম পার্টির আলাচনা সভায় বলা হয়, শত প্রলোভনের পশরা সাজিয় এদেশের মানুষকে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য প্রলুব্ধ করা হলেও জনগণ তাদের ঈমান বিক্রি করবে না। চট্টগ্রাম মাদ্রাসা শিক্ষক মিলনায়তনে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা কুখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ইসলাম ও কুরআন সম্পর্ক ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের নিন্দা করেন এবং তার সকল বই বাজেয়াপ্ত করা এবং তার ফাঁসির দাবি করেন। ২৬৮ এলিফেন্ট রোডে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির (ন্যাপ ভাসানী) সভায় তসলিমা নাসরিন সহ সকল মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে শাস্তির জোর দাবি জানানো হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ মুসলীম লীগ, বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া, ঈমান বাঁচাও দেশ বাঁচাও আন্দোলন, বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রসমাজ অবিলম্বে তসলিমাকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বাংলাদেশ সীরাত মিশনের সভাপতি মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার অবিলম্বে তসলিমা নাসরিনকে খুঁজে বের করতে লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। ধর্মদ্রোহীদর শাস্তি প্রদান, সংসদে ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি আইন পাসএর দাবিতে আজ বিকাল সাড় ৪টায় জামাতে ইসলামির উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন জামাতে ইসলামির সেক্রেটারি ও জামাত সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামি, প্রখ্যাত মোফাসসির কুরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসন সাইদী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গণসমাবেশে দলে দলে যোগদান করার জন্য প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রতি উদাত্ত আহবান জানানা হয়েছে। সিলেট মৌলভীবাজারের ৮৫ জন আলেম, শিক্ষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি পৃথক দুটি বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা মনে করি দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত মুরতাদী অপতৎপরতা একটি গভীর আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার পরিকল্পিত অংশ। বিবৃতিতে জাতিকে একতাবদ্ধ দ্বীনি অনুপ্রেরণায় ইসলামদ্রোহী আধিপত্যবাদী এ সকল খ্রিস্টান মিশনারি ও ইহুদিবাদী চক্রান্তকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান করছি।

বরিশালে বিবির পুকুরপাড়ে বিকাল ৩টায় ইসলামি শাসনতন্ত্রের জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (দৈনিক ইনকিলাব)

<u>নাস্তিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িতে হইবে</u>

ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা গঠনের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ও উলামা কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মুফতী ফজলুল হক আমিনী নাস্তিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। মোর্চা ঘোষিত ৯ ই জুনের যুব সমাবেশ ও ১০ই জুনের বিক্ষোভ দিবস সফল করার লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার লালবাগের জামেরা কোরানিয়া আরাবিয়ায় আয়োজিত এক দোয়া সমাবেশে বক্তৃতাকালে মাওলানা আমিনী বলেন, আল্লাহর নিদর্শন যে জাতি অবমাননা করে, আল্লাহর বিধান হইল সে জাতিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। পবিত্র কোরানের সহিত যে চরম বেয়াদবি ও উপহাস করা হইতেছে তাহাতে যে কোনও সময় এই জাতি ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। তাই এ দেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে প্রতিটি মুসলমানকে প্রতিবাদমুখর হইতে হইবে। (দৈনিক ইত্তেফাক)

জামাতে ইসলামির পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামে আজকের সম্পাদকীয়

<u>তসলিমাকে রক্ষার অভিনব উদ্যোগ</u>

ধর্মদ্রোহী তসলিমার বিরুদ্ধে বিলম্বে হলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় যখন একটি জামিনের অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে, তখন তসলিমাকে রক্ষাকারী ও তার অপসৃষ্ট মুদ্রণ-প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণকারী এনজিও সেক্যুলারবাদীরা পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য সম্ভবত পতাকা নাটকের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। তসলিমা, আহমদ শরীফসহ মুরতাদ ইসলামবিরোধী মহলের ঢালাও অপপ্রচার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সারাদেশে যখন ধর্মপ্রাণ জনগণের মাঝে স্বতস্ফূর্ত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, তখন নাস্তিকতাবাদী মুরতাদপন্থীরা ষড়যন্ত্রের চোরাপথে তসলিমাকে রক্ষার জন্য নতুন নাটক শুরু করেছে। জাতীয় সংসদের কার্যক্রম যখন স্থগিত ছিল, তখন সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় পতাকার বদলে কে বা কারা এক টুকরো বিতর্কিত রঙিন কাপড় টানিয়ে দিয়েছে এবং এই নিয়েই তসলিমা পন্থীরা সারাদেশে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকাও তসলিমা ও মুরতাদপন্থীদের আস্কারা দেবে। তসলিমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিকে শেখ হাসিনা বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করে তার ও তার দলের অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে নারী জরায়ুর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যে নারী পুরুষ ধর্ষণের মত অশালীন কুৎসিত কথা বলে, যে নারী পবিত্র কোরান সংশোধনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করে, শেষ হাসিনা সেই নারীর রক্ষক হতে চাইছেন। শেখ হাসিনাদের হজ্ব, মাজার জিয়ারত যে কত ভণ্ডামি এতেই তার প্রমাণ মিলছে। ইতিমধ্যেই কথা উঠেছে, ইসলামের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হতে দেবার ক্ষেত্রে শাসকদল ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সরকারের যে পুলিশরা এতদিন তসলিমাকে নিরাপত্তা দিয়েছে, তাদের চোখকে এখন ফাঁকি দিয়ে তসলিমা কিভাবে আত্মগোপন করল? তসলিমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির সময়ই কি তাহলে তাকে খবর দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে? পুলিশ নাকি দশ মিনিটের ব্যবধানে তাকে ধরতে পারেনি। তসলিমার ব্যাপারে সরকারের রাজনৈতিক

সিদ্ধান্তহীনতা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রিতা নানাধরনের প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। সরকারের পুরো কার্যক্রমই মনে হচ্ছে আই ওয়াশ। অবশ্য স্পীকারও বলেছেন, তসলিমার ধর্মদ্রোহীতামূলক আচরণের প্রসঙ্গ জাতীয় সংসদে আলোচনা করা হবে।

তবে তসলিমার মত একটি ধিকৃত নষ্ট মেয়েকে রক্ষা করার জন্য তার ভক্ত অনুরক্ত মৌলবাদবিরোধী চক্রটি শেষ পর্যন্ত জাতীয় পতাকার মত স্পর্শকাতর ইস্যুকেও ব্যবহার করে ছেড়েছে। পতাকা নামানো এবং সেখানে একখন্ড কাপড় ঝোলানোর এই ঘটনার জন্য সংসদ সচিবালয়ে প্রেসনোট ইস্যু করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছে। এছাড়া এ ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেবার লক্ষ্যে ব্যাপক পুলিশী তদন্ত চলছে। কিন্তু তারপরও এনজিওবিরোধী ফতোয়াবাজ মৌলবাদীদের এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করার অপপ্রয়াস চলছে। বামপন্থী গুটিকতক লোক এ নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করেছে, মিছিল পর্যন্ত বের করেছে। এমনকি কেউ কেউ পতাকার মর্যাদা রক্ষায় সরকারী ব্যর্থতার প্রসঙ্গ টেনে সরকারের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করেছে। একদল তো তসলিমার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নিন্দা করেছে। সরকারের বিরুদ্ধে তারা নানা ধরনের বাক্যবান নিক্ষেপ করেছে। সরকার নাকি মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তসলিমার বিরুদ্ধে যখন আদালতে মামলা বিচারাধীন, সেই অবস্থায় ইস্যুটি রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিভাবে? একশ্রেণীর পত্রপত্রিকা একই ইস্যুতে সংবাদপত্রের নীতিমালা লঙ্ঘন করে বিকৃত উস্কানিমূলক খবর প্রচার করে যাচ্ছে। এই বাড়াবাড়ির অবসান হওয়া দরকার। সরকার যদি এসব সমাজবিরোধী শান্তিবিনাশী কর্মকাণ্ড কঠোর হাতে দমন না করে, তাহলে তসলিমাকে গুম করার নাটকও হয়ত আমাদের দেখতে হবে। কেননা, তসলিমা এখন মহলবিশেষের হাতে তুরুপের তাস। তসলিমা গ্রেফতারের নাটক যত চলতে থাকবে, পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে।

<u>তসলিমা নাসরিনের ব্যাপারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগ</u>

তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তা বিধান এবং তার ওপর হয়রানি বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আহবান জানিয়েছে। ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কুটনীতিকরা তসলিমার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চেয়েছেন তাঁর ব্যাপারে। মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তসলিমার বিরুদ্ধে যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেই করা হয়েছে। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। তসলিমার উচিত আইন অমান্য না করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা। (আজকের কাগজ)

<u>তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রতিবাদ</u>

উইমেন ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নারীর সমঅধিকার ও উন্নয়ন বিরোধী অপতৎপরতার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সভায় তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারি পরোয়ানার নিন্দা করা হয়। বলা হয়, তসলিমা পবিত্র কোরান সম্পর্কে কোনও কটূক্তি করেনি, সরকার এই মামলা করে মৌলবাদীদের উৎসাহিত করেছে। সভায় মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, মৌলবাদীরা ফতোয়া দিয়ে নারীপুরুষকে দোররা মারা, পুড়িয়ে

মারা, বিষপানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা, উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থার স্কুল অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, জাতীয় পতাকার অবমাননা ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হলেও এ নিয়ে সরকারসহ সংশ্লিষ্টমহল কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ হঠাৎ করেই সরকার তসলিমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছে। ২২ জন মহিলা সই করেন, রোকেয়া কবীর, সাহিদা বেগম, আফরোজা পারভিন, শিরিন বানু, সালেহা খাতুন..। নারীপক্ষ থেকেও বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। নারীপক্ষের আহবায়ক ফিরদৌস আজিম বলেছেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমনাগরিকত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাক স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, এবং এমন একটি পরিবেশ যেখানে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে সুরক্ষিত ডড একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য এগুলোই হচ্ছে ন্যূনতম শর্ত। বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকার এ পরোয়ানা জারি করে আমাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে আঘাত করেছেন। তিনি অবিলম্বে এ গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং তসলিমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের আফরোজা বেগম তসলিমার গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি করেন। নারী নির্যাতন গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারি ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের ৫২ জন আইনজীবী একই দাবি জানান।

চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদে তসলিমা পক্ষ, শিবচর থানার বরহামগঞ্জ তসলিমা পক্ষ তসলিমার বিরুদ্ধে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবিতে সভার আয়োজন করে। (ইত্তেফাক)

জ্ঞানকে জ্ঞান দিয়ে মোকাবেলা করার মধ্যেই প্রকৃত মনীষা নিহিত

মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট লেখক মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল আবীর আহাদ এক বিবৃতিতে তসলিমা নাসরিনকে সংগ্রামী এবং মানবতাবাদী লেখিকা হিসেবে আখ্যায়িত করে তথাকথিত ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে সরকারের মামলা দায়েরকে দুর্ভাগ্য বলে অভিহিত করে বলেন, ধর্মের সমালোচনা করলে যদি ধর্মের ক্ষতি হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে ধর্মটি অতি ঠুনকো। কোরানে যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ইসলামকে আল্লাহ নিজেই রক্ষা করবেন, সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে কে কি বলল না বলল তাতে কার কি আসে যায়? ধর্মের সমালোচনাকে গোনাহ বলে কোরানে উল্লেখ রয়েছে এবং গোনাহর বিচার করবেন একমাত্র আল্লাহ। সে ক্ষেত্রে ইসলামের সমালোচনাকারীদের বিচারের ভার আল্লাহ কোনও মানুষকে দেননি। অথচ ইসলামের নামাবলী জড়িয়ে একশ্রেণীর অশিক্ষিত ধুরন্ধর মোল্লারা আল্লাহর দায়িত্বটা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে প্রকারান্তরে তারাই আল্লাহ-দ্রোহিতার পরিচয় দিচ্ছে। অবিলম্বে তিনি এই দুর্বৃত্তদের চক্রকে শায়েস্তা করার জন্যে প্রশাসনের প্রতি আহবান জানান। (আজকের কাগজ)

আমি অবাক হচ্ছি, আমার বিরুদ্ধে সরকারের এই অন্যায় মামলার প্রতিবাদ করছেন না কোনও গণ্যমান্য লেখক, নামী দামী বুদ্ধিজীবী, বড় রাজনৈতিক দল, সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সংগঠন! তাঁরা তো সবসময়ই যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, বিবৃতি দেন। আমার বোঝার সাধ্য নেই কি কারণ সকলের এমন নীরবতার। আইনজীবীদের যে বিবৃতি বেরিয়েছে, আমার বিশ্বাস তা ক যোগাড় করেছেন। ৫২ জন আইনজীবী সই করে দিয়েছেন, ব্যাপারটি কেমন যেন বিশ্বাস হতে চায় না, সম্ভবত ক একটু বেশি করেই নামধাম লিখে দিয়েছেন। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টএর বিবৃতির পেছনে আমার বিশ্বাস সাজু আর জাহেদার হাত আছে। তারাই এই বিবৃতি দিয়েছে। উওম্যান ডেভেলপম্যান্ট ফোরামের যে বিবৃতি, হয়ত খ করেছেন যোগাড়। দিব্য-চোখে দেখি আমার জন্য হাতে গোণা কজন মানুষ লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বিবৃতি ভিক্ষে চাইছেন। আজ আমার এমনই পরিণতি। রাতে ঙ এসে বললেন যে তিনি বুদ্ধিজীবীদের একটি বিবৃতি যোগাড় করতে চাইছেন, কিন্তু সই করার লোক বেশি নেই বলে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ঙর সঙ্গে ক ও এসেছেন। বলেছেন যে দেশের অবস্থা দিন দিন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। লুকিয়ে থাকলে বেঁচে যাবোড্ডএর কোনও নিশ্চয়তা নেই, যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে, বিশেষ করে মৌলবাদীদের কেউ যদি আমার খোঁজ পেয়ে যায়। জামিনের অনিশ্চয়তা দিন দিন বাড়ছে। আমাকে জামিন দেওয়া হবে না, আদালতের এই সিদ্ধান্তের কথা কোনও না কোনওভাবে আমার উকিলদের কানে গিয়েছে। জামিন না দেওয়ার সিদ্ধান্তই যদি হয়ে থাকে তবে আমাকে উন্মত্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে আদালতে উপস্থিত করার কোনও অর্থ হয় না। জামিন তো পাওয়াই হবে না, মাঝখান থেকে আমার জীবনটি যাবে। জামিনের এই অনিশ্চয়তা, সর্বোপরি জীবনের এই অনিশ্চয়তা নিয়ে আমি একটি কাজ করতে পারি, এ মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল সমাধান অন্য কিছু আর নেই, সে হল পালিয়ে যাওয়া।

স্মাগলড আউট।

প্রথম ভেবেছিলাম বুঝি মজা করছেন ওঁরা। কিন্তু লক্ষ্য করি, মোটেও মজা করার জন্য নয়, ক এবং ঙ দুজনেই এ বিষয়ে রীতিমত গুরুগম্ভীর আলাপ করলেন, এবং একমত হলেন। দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়াড্ড হাজার রকম অসম্ভব জিনিস আমি কল্পনা করতে পারি, কিন্তু এটি পারি না। আমার দিকে চারটে চোখ যখন প্রশ্ন নিয়ে তাকালো, আমি বললাম, আমি অবৈধভাবে দেশ ছাড়ব না। আমি পালাবো না।

দেশের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হবে, তখন হয়ত পালানোর আর কোনও সুযোগও থাকবে না। এখনও হয়ত ঝুঁকি নিয়ে হলেও এ কাজটি করা যায়। কোনও একটা গাড়ির ব্যবস্থা হবে, গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে কোথাও কোনও সীমান্তের দিকে অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমার চেহারা বেশভুষা সম্পূর্ণ অন্যরকম থাকবে, ওখানে ধরা পড়লেও যেন কেউ চিনতে না পারে। হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে যাবো। বাঁচার জন্য মানুষ তো অনেক কিছু করে। আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে খুব দ্রুত। কারণ দিন দিন দিন জটিল হচ্ছে। সরকার মৌলবাদীদের হাতের পুতুল হয়ে উঠছে। কথায় কথায় জনকণ্ঠের কথা ওঠে। জনকণ্ঠে গতমাসে ক্লান্ত পথিক ছদ্মনামে এটিএম

শামসুদ্দিনের একটি কলাম ছাপা হয়েছিল, শামসুদ্দিন মূলত সেই মোল্লাদের সমালোচনা করেছিলেন, যারা গ্রামে গ্রামে এনজিওতে কাজ করা মেয়েদের ফতোয়া দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গের গরিব মেয়েদের তুত গাছ লাগানোর কাজ দিয়েছিল ব্র্যাক। কিন্তু গ্রামের মোল্লারা মেয়েদের লাগানো তুত গাছ কেটে ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েদের বলে দেয় তারা যদি এনজিওতে কাজ করা বন্ধ না করে তবে তাদের সমাজচ্যুত করা হবে, স্বামীদের বাধ্য করা হবে তাদের তালাক দিতে। কলাম লেখক কাঠমোল্লারা যে কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করে ফতোয়া দিচ্ছে তাই বলতে গিয়ে তাঁর ছোটবেলার একটি শোনা ঘটনা বর্ণনা করেন, ঘটনাটি এরকম, আমিন নামের এক লোকের কাছে সুন্দরী বিধবা জৈয়তুনের একটি বলদ বর্গা ছিল। আমিন জৈয়তুনের কাছে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হলে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে গরুটি বিক্রি করে দেয়। তো জৈয়তুন টাকা চেয়ে পাঠায় বলদের। কিন্তু আমিন বলদটি তার নিজের ছিল বলে দাবি করে। গ্রামের মোল্লাদের কাছে জৈয়তুন বিচার চায়। বিচার বসে। এদিকে কিন্তু কাঠমোল্লাদের কিছু টাকা পয়সা দিয়ে আমিন ব্যবস্থা করে রেখেছে। সালিশ বসে গ্রামে, কাঠমোল্লারা সুরা ত্বিন থেকে পড়ে *ওয়া হাজাল বালাদিন আমিন,* এর অর্থ ওরা বলে, পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে বলদটি আমিনের। নিরক্ষর জৈয়তুন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যায়। এই হল জনকণ্ঠের দোষ, মোল্লাদের নিয়ে ঠাট্টা করে লেখা একটি কলাম ছেপেছে জনকণ্ঠ। ক্লান্ত পথিক তো তবু মোল্লাদের সম্মান করেছেন। কেবল কাঠমোল্লাদের গাল দিয়েছেন, কাঠমোল্লাদের তো মোল্লারাই গাল দেয়। মূর্খ লোকেরা যারা নিজেদের মোল্লা বলে দাবি করে লোক ঠকানোর ব্যবসা করে, তাদের বলা হয় কাঠমোল্লা। কোরানে ভাল কথা লেখা আছে, কিন্তু কোরান হাদিস সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই বলে কাঠমোল্লারা কোনও আয়াতের বা কোনও সুরার সঠিক ব্যাখ্যা না করে অপব্যাখ্যা করে নিজেদের স্বার্থে, এ কথাই ক্লান্ত পথিক বলেছেন। লেখাটিতে কাঠমোল্লাদের দোষ দেওয়া হয়েছিল, কোরানের সুরাকে দোষ দেওয়া হয়নি। কিন্তু মৌলবাদীদের কিছু একটা ধরতে হয়, ধরতে হয় বলেই জনকণ্ঠকে ধরা। আমাকে যখন ধরে, তখন কিন্তু ঠিক ঠিকই ধরে। আমি তো কোরানের সুরা আয়াতকেই নিন্দা করেছি। আমার ফাঁসির দাবিতে যখন মৌলবাদীদের আন্দোলন সারাদেশে বিশাল আকার ধারণ করল, তখন তারা সুযোগ পেয়ে গেল একটি একটি করে মৌলবাদবিরোধী শক্তিকে ঘায়েল করার। সরকার মৌলবাদীদের প্রতিটি দাবি মেনে নিচ্ছে। আজ জনকণ্ঠের চারজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ২৯৫ (ক) ধারায় সরকার মামলা করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে, দুজন সাংবাদিককে ধরেছে পুলিশ, দুজন পলাতক। মৌলবাদীদের দাবি মেটানো ছাড়া সরকারের এখন আর বড় কোনও কাজ নেই। আমার পরিস্থিতির সঙ্গে জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের পরিস্থিতির তুলনা করা যায় না। কারণ জনকণ্ঠের কোনও সাংবাদিকের ফাঁসির দাবি মৌলবাদীরা করেনি, দাবি করেছে জনকণ্ঠ পত্রিকা নিষিদ্ধ করার। জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের নামও মৌলবাদীরা জানে না, চেহারাও চেনে না। সুতরাং সরকার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে একই মামলা করলেও আমি হচ্ছি মৌলবাদীদের মূল টার্গেট।

ক এবং ঙ আমার পালাবার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তার একটি ছক আঁকলেন। ঘরে অতি সামান্য আলো। কথাবার্তা নিচু স্বরে। কেমন ভূতুড়ে লাগছে সবকিছু। কানে একসময় কারও কোনও কথা পৌঁছয় না। কাঠ কাঠ লাগে শরীরটি। নিজের স্বরে নিজেই আমি চমকে উঠি, যখন শুনি যে বলছি, আমি পালাবো না। তার চেয়ে ভাল আত্মসমর্পণ করব।

এ সময় আত্মসমর্পণ করা আর মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করা যে সমান কথা, এ বিষয়ে ক এবং ঙ অনেকটা একমত। এই সরকারের ওপর কারও আস্থা নেই। মৌলবাদীদের দাবি মেনে আমার ফাঁসির ব্যবস্থা যে এই সরকার করবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

আত্মসমর্পণ!

হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ। আমার বিচার করতে চায় বিচার করুক। যত হোক দেশের আইন। আইন সবাই মানছে, আমি মানবো না কেন!

ভেবে বলছ কথাটা? ঙ জিজ্ঞেস করেন।

এই আইনে দুবছরের জেল হয়। দুবছর জেল খাটব। কত মানুষই তো জেল খাটে। বলে একটি দীর্ঘশ্বাস সামলে নিই।

ঙ বললেন, জেল জেল যে করছ, জেলে তোমার নিরাপত্তা কি?

আমি বলি, নিরাপত্তা তো দেওয়া হয় জেলে। হয় না কি?

তুমি কি জানো যে জেলে অনেক পলিটিক্যাল মার্ডার হয়! আর তোমার কেইস তো পলিটিক্সের চেয়েও বেশি সেনসিটিভ। রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই। এর চেয়ে ভয়াবহ জিনিস জগতে আর নেই।

ক শুকনো মুখে বসে থাকেন ঙর পাশে। চোখদুটো ধু ধু করছে। আমি জানি সে কথা। জানি যে জেলে আমাকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু দুটো খারাপ এর মধ্যে একটি খারাপকে বেছে নিলাম। চোরের মত পালাতে গিয়ে মরার চেয়ে জেলে খুন হওয়া ভাল। পালাবো কেন, আমি তো কোনও অন্যায় করিনি! আসলে এখন আমার অন্য কোনও উপায় নেই দুধরনের মৃত্যুর মধ্যে একটি মৃত্যুকে বেছে নেওয়া ছাড়া। আমি জেলের মৃত্যুকে বেছে নিলাম।

ক আর ঙ চুপ হয়ে থাকেন। চ শব্দহীন পায়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকেন। ক আর ঙর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন দেয়ালে হেলান দিয়ে। সবকটি প্রাণী চুপ। নৈঃশব্দ্য ভেঙে চ বলেন, কিছু খাবেন আপনি?

মাথা নেড়ে না বলি।

দুপুরে খাইনি, রাতেও না। ক্ষিধে বলতে কোনও কিছু আমি বোধ করছি না।

ক এবং ঙ দুজনে আমাকে দুটো চিরকুট দেন। ঙ দেন শামসুর রাহমানের লেখা একটি চিরকুট। *তসলিমা, মানসিক ভাবে আমি তোমার সঙ্গে আছি।* ক দেন ছোটদার লেখা একটি চিরকুট। *নাসরিন, আমরা সবাই তোর কথা ভাবছি। তুই ভেঙে পড়িস না। সত্যের জয় একদিন হবেই।* চিরকুটটি আমার হাতে দিয়ে ক বলেছেন, আপনার ভাই কামাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন তার কোনও খবর আমি জানি কি না জানার জন্য। আমি কিছু বলিনি

তাকে। আমাকে এই চিঠিটা দিয়ে গেছে, যদি কখনও আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়, যেন দিয়ে দিই। বলেছে, ময়মনসিংহ থেকে আপনার বাবা নাকি জানিয়েছেন, আপনার কোনও খোঁজ পেলে বলতে যে আপনি যেন মনের জোর রাখেন, যেন ভেঙে না পড়েন। কামাল তার বউ বাচ্চা নিয়ে এখন আপনার বাড়িতে থাকছে। আপনার উকিলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছে সে।

ক আর ঙ কতক্ষণ ছিলেন বসে আমার মনে নেই। কারও সঙ্গে আমার আর কোনও বাক্য বিনিময় হয়েছে কি না মনে নেই। মনে নেই সে রাতে আমার ঘুম পেয়েছিল কি না, আমি ঘুমিয়েছিলাম কি না।

নয় জুন, বৃহস্পতিবার

ঢাকা শহরের এমন কোনও রাস্তা নেই যেখানে মৌলবাদীদের জমায়েত হচ্ছে না বা মিছিল হচ্ছে না। গতকাল দেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে জামাতে ইসলামির জনসভায় হাজার হাজার লোক জমেছিল। জামাতে ইসলামির মহাসচিব, জাতীয় সংসদ সদস্য মতিউর রহমান নিজামী জনসভায় বলেন, তসলিমা বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। স্বাধীনতার চেতনার দাবিদার যে সমস্ত নেতা ও দল ওই লেখিকাকে সমর্থন করছেন তাঁরাও মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে থেকে যাচ্ছেন। বাইবেল বা যীশু-খ্রীস্টের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য বা কটূক্তি করলে বৃটেনসহ পশ্চিমাদেশগুলোতে যে শাস্তির বিধান রয়েছে, কোরান শরিফ সম্পর্কে দুঃসাহসিক বক্তব্যের কারণে তসলিমারও একই শাস্তি প্রাপ্য। বিজেপি, আনন্দবাজার পত্রিকা, পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থা যারা তসলিমাকে ইন্ধন যোগাচ্ছে, তারা ইসলাম ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আইনের দাবি।

জামাতে ইসলামির মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদী বক্তা হিসেবে জনপ্রিয় বেশ। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেট হাটে ঘাটে মাঠে ঝালমুড়ির মত বিক্রি হয়। তিনি অগুনতি জনতার সামনে বলেছেন, সমাজতন্ত্রের ধ্বস নামার পর নাস্তিক মুশরিক ও ইহুদিবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এখন ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। দেশ আজ তৌহিদী জনতা ও মুরতাদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মুরতাদ দলের নেত্রী হচ্ছে তসলিমা। সুতরাং তসলিমাকে ফাঁসি দেওয়া হলে দেশ মুরতাদ মুক্ত হবে।

শায়খুল হাদিসও তাঁর বাহিনী নিয়ে পথে নেমেছেন। আর অনেকের মত তিনিও এখন সরকারকে দোষ দিচ্ছেন, আমাকে এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না বলে। বলেছেন, জনতার রুদ্ররোষ থেকে বাঁচাবার জন্য সরকার তসলিমাকে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে। ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা মাওলানা ওবায়দুল হক তাঁর সভায় বলেছেন, জনমতের চাপে সরকার তসলিমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেও এখন

পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে না পারায় সরকারের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

আজ সব পত্রিকায় স্পীকারের কাছে লেখা আমার চিঠিটি ছাপা হয়েছে। ভাল কথা। খুব ভাল কথা। যে কথা আগেই জানিয়েছিলাম, সে কথা আবার জানালাম যে আমি কোরান সংশোধনের কথা বলিনি। এতে কী উপকার হবে আমার? এখন কি মৌলবাদীরা বলবে, যে, দুঃখিত আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছিল, তসলিমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, কারণ ও তো বলেনি কোরান সংশোধনের কথাড্ডসুতরাং আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি ওর ফাঁসি চাওয়া থেকে! সরকার কি বলবে, ইসরে কি মিথ্যে মামলা ঠুকে দিয়েছি। এখন ক্ষমা চেয়ে মামলা তুলে নিই! কেউ বলবে না। বলবে না কারণ সংশোধনের কথাটির জন্য মৌলবাদীরা আমার ওপর ক্ষিপ্ত নয়, কোরান সংশোধনের কথা শুনে সরকারের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতও লাগেনি। মৌলবাদীদের ইচ্ছে কোনও একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মাঠে নামা, নিজেদের তেজ দেখানো, রাগ দেখানো আর লোকদের ভয় দেখানো। ইচ্ছে, শক্তিমান হওয়া। এ তো মৌলবাদীদের ইচ্ছে। সরকারের ইচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। মাঝখান থেকে কে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে? আমি। ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দল বা বিরোধী দল আওয়ামী লীগ (এই দুটো দলই আকারে আকৃতিতে প্রতিশ্রুতিতে সন্ত্রাসে সবার ওপরে) কারও বুকের পাটা নেই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত কথা বলে, কারণ দুই বড় দলেরই সময় সময় এই মৌলবাদী দলের সঙ্গে আঁতাত করতে হয়। সম্ভবত সরকারি দলের ধারণা ছিল না, উসকে দিলে মৌলবাদীরা এত বিকট শক্তি ধারণ করতে পারে। অথবা ধারণা ছিল, সরকারের অন্তঃস্থলে যথেষ্টই ধর্মান্ধ বিরাজ করে।

আজ সব পত্রিকায় বিবৃতি বেরিয়েছে। বিবৃতি দিয়েছেন দেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবীগণ। দেশের যত রাজনৈতিক দল আছে (বিএনপি এবং মৌলবাদী দল ছাড়া), দেশের যত প্রগতিশীল সংগঠন, সংস্থা, সমিতি, পরিষদ আছে, খুব বড়, বড়, মাঝারি, ছোট, সবার, দেশের যত নারী সংগঠন আছে, যত সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছে, লেখকদের, কবিদের, নাট্যকারদের, শিল্পীদের, সাংবাদিকদের যত রকম সংস্থা আছে সবার, আবৃত্তির দলের, গানের দলের, নাচের দলের, খেলার দলের, হ্যাঁ সবারই বিবৃতি আজকের পত্রিকায়, প্রতিবাদে মুখর আজ দেশ, প্রতিবাদড্ডজনকণ্ঠের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদ। দাবিতে মুখর আজ দেশ, জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবার ওপরে আছেন শামসুর রাহমান। বিবৃতিটি কে লিখেছেন? নিশ্চয়ই শামসুর রাহমান। শওকত ওসমান, কে এম সোবহান, বেলাল চৌধুরী, বশীর আল হেলাল, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, মুস্তফা নুরউল ইসলাম. . .। বিবৃতির পর বিবৃতি। বাক স্বাধীনতার পক্ষে বিবৃতি, কিন্তু আমার বাক স্বাধীনতার পক্ষে নয়। সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম আছেন, ওদিকে হুমায়ূন আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, ইমদাদুল হক মিলন, আসাদ

চৌধুরী.... শত শত নাম। নামী দামী মানুষ। বিশেষজ্ঞ। পণ্ডিত। সমাজের মাথা। তাত্ত্বিক থেকে সাংবাদিক, শিক্ষক থেকে চিকিৎসক, বামপন্থী ডানপন্থী মধ্যপন্থী, পন্থীহীন, নাস্তিক আস্তিক, সকলেই বিবৃতি দিয়েছেন। দেশের প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী একটি প্রাণীও নিশ্চুপ নন। তন্ন তন্ন করে একটি, অন্তত একটি বিবৃতির মধ্যে আমার নামটি খুঁজি, জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের সঙ্গে এই সামান্য নামটি, মাত্র চার অক্ষরের নামটি খুঁজি, কোথাও কোনও শব্দের আড়ালে আছে কি না নামটি, যেহেতু একই ২৯৫ (ক) ধারায় মামলা জারি হয়েছে আমার বিরুদ্ধেও, যেহেতু অন্যায় ভাবে আমার বিরুদ্ধেও, যেহেতু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধেও, নামটি খুঁজি, ভুলেও যদি কেউ উল্লেখ করে থাকেন নামটি, খুঁজি। নেই। কোথাও নেই। কোনও বিবৃতিতে নেই। কোনও প্রতিবাদে নেই। তবে কি এই সত্য যে আমার বিরুদ্ধে মামলা করা সরকারের উচিত হয়েছে, এবং জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে করা উচিত হয়নি? বিবৃতির কোথাও আমি নেই, তবে আমার নামটি আছে, আছে পত্রিকার বাকি অংশ জুড়েড্ডমৌলবাদীদের সভায়, সম্মেলনে, মিছিলে, ব্যানারে, কেবল আমার নামটিই আছে, আর কারও নাম নেই।

জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের কাছে দাবি করছে, তাদের গ্রেফতারি পরোয়ানার প্রত্যাহারের দাবি করছে, তাদের বিরুদ্ধে জারি করা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি করছে তোমার সব প্রগতিশীল বন্ধুরা। তারা কেউ তোমার বিরুদ্ধে জারি করা মামলার কথা কিছু বলছে না। তোমার প্রগতিশীল বন্ধুরা কেউই তোমার গ্রেফতারি পরোয়ানার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করছে না।

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। বারবার পড়ি। আমি কি ঠিক দেখছি, ঠিক পড়ছি? হ্যাঁ তুমি ঠিক দেখছ, ঠিক পড়ছ। এটা ঘটেছে। বিস্মিত হচ্ছো? হ্যাঁ বিস্মিত হচ্ছি। বিস্ময় আমার হৃদয়ে, বিস্ময় আমার সর্বাঙ্গে। আমি বিস্ময়ের ঘোর থেকে একতিল নড়তে পাচ্ছি না। না ডানে, না বামে। বিস্ময় আমাকে একটি মূর্তির মত বসিয়ে রেখেছে সেই সকাল থেকে, সকাল পেরিয়ে গেছে, দুপুর গেছে, বিকেল গেছে। বিস্ময় কি কেটেছে তোমার? না কাটেনি।

আমার হৃদপিণ্ড কি চলছে? জানি না। আমার রক্ত চলাচল কি বন্ধ হয়ে গেছে, জানি না। বিস্ময় আমাকে মুক্তি দিচ্ছে না। মূর্তির চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। জল গড়াক। মূর্তির হাত জল মুছে ফেলতে সেই জলের দিকে এগোচ্ছে না। গড়াক। জল গড়াতে গড়াতে মূর্তিটি স্নান করে ফেলুক। তার আজ পাঁচদিন স্নান হয়নি। স্নানের প্রয়োজন ছিল তার।

দশ জুন, শুক্রবার

ড্ডতসলিমা, ঘুমিয়েছো রাতে?

ডডনা।

ডডঘুম আসছে না?

ডডনাহ!

ডডতুমি জানো আজ তোমার বিরুদ্ধে বায়তুল মোকাররমে গণবিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে!

ডডজানি।

ডডজানো আজ মিছিল তোমার বাড়ির দিকে যাবে! তোমার বাড়ি ঘেরাওএর কর্মসূচি আছে, জানো?

ডডজানি।

ডডতুমি জানো যে ৩০ তারিখ তোমার ফাঁসির দাবিতে সারাদেশে হরতাল ডাকা হয়েছে?

ডডজানি।

ডডতুমি জানো যে তোমার ঠিকানায় বিদেশ থেকে আসা চিঠিপত্র পত্রপত্রিকার পার্সেল কাস্টমসএ আটক করা হয়েছে?

ডডনা।

ডডআজ পত্রিকা পড়েছো?

ডডনা।

ডডকেন পড়নি? ভয় হয় বুঝি! আবার যদি দেখ তোমার পক্ষে কোনও বিবৃতি কেউ দেয়নি! তোমার বাক স্বাধীনতার পক্ষে কেউ কথা বলেনি! ভয় কেন! মানুষের সত্যিকার চেহারাটা এবার একটু চিনে নাও। ওঠো। দেখ। পড়। বোঝো।

ডডকেউ কি লিখেছে কিছু আজ?

ডডতোমার মত বোকা আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। আজও সব পত্রিকায় বিবৃতি গেছে, গতকাল কুলিয়ে উঠতে পারেনি ছেপে। আজও বিবৃতিতে ভরে আছে পত্রিকা! কেউ বলেনি তোমার কথা। তোমার কথা বলবে কেন? তুমি কে? তুমি কিচ্ছু না। তুমি একটা ঘোড়ার ডিম। তুমি বোকার মত একা বসে বসে কেবল লিখেছো, সমাজের সমস্ত অন্ধকার দূর করার জন্য লিখেছো। কি লাভ হয়েছে লিখে? আজ সবাই জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের মুক্তি চেয়েছে, তাদের মামলা হুলিয়া তুলে নেওয়ার দাবি করেছে। একটা কথা কি জানো? ধর্মের সমালোচনা তো অনেকেই করে, কিন্তু মৌলবাদীরা তোমাকে টার্গেট করেছে কারণ তারা জানে যে তুমি একা, তুমি অসহায়, এ দেশে তোমার পক্ষে দাঁড়াবার মত কোনও ব্যক্তি নেই, সংগঠন নেই, কোনও রাজনৈতিক দল নেই। মৌলবাদীদের এই উত্থানে মদত দিচ্ছে কারা, তা জানো? দিচ্ছে তাবৎ রাজনৈতিক দল, প্রগতিশীল ব্যক্তি, সংগঠন, আর বুদ্ধিজীবী - বিবৃতিঅলাদের নীরবতা। তোমাকে ফাঁসি দিচ্ছে আসলে মৌলবাদীরা নয়, ফাঁসি দিচ্ছে প্রগতিশীলরা। আজও মৌলবাদীদের পত্রিকা ছাড়া আর সব পত্রিকায়, বাংলা বল ইংরেজি বল সব পত্রিকায় জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সরকারের মামলা দায়েরের নিন্দা করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে, উপসম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। কলাম ছাপা হয়েছে। কোথাও কেউ ভুলেও যোগ করছে না তোমার নাম। কেউ ভুলেও প্রতিবাদ করছে না তোমার মামলার।

ডডকেউই আমার কথা উল্লেখ করেনি? কেউই না?

ডডনা। কেউ না। তবে একজন উল্লেখ করেছেন। গোটা কলামটাই তিনি তোমাকে নিয়ে লিখেছেন। তিনি বদরউদ্দির উমর। লিখেছেন তোমার কোনও অধিকার নেই প্রগতিশীল হওয়ার, কারণ তুমি কোনও দিন মিছিলে যাওনি, কোনওদিন স্লোগান দাওনি।

ডডমিছিলে না গেলে, স্লোগান না দিলে কি প্রগতিশীল হওয়া যায় না?

ডডউমর তো বলছেন হওয়া যায় না।

ডডতবে আমি কী? প্রতিক্রিয়াশীল?

ডডতুমি তারও চেয়ে অধম। তুমি একটা বাজে লেখক। লিখতে জানো না। রাজনীতির কিচ্ছু জানো না। ধর্ম সম্পর্কে তোমার যা মত, তা পেটের ভেতর রাখতে পারো না, বিপদ জেনেও ফটফট করে বলে দাও। ধর্মের বিরুদ্ধে লিখে প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষতি করেছো। তোমার লেখালেখির কারণে মৌলবাদীরা একটা ইস্যু পেয়েছে।

ডডবদরুদ্দিন উমর কি জনকণ্ঠের সাংবাদিকদেরও দোষ দিয়েছেন? কারণ জনকণ্ঠকেও তো মৌলবাদীরা ইস্যু করেছে!

ডডনা তা দেননি, তিনি বিবৃতি দিয়েছেন জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের ওপর থেকে মামলা আর হুলিয়া তুলে নেওয়ার জন্য।

ডডআমার বিরুদ্ধে সরকারের মামলা আর হুলিয়া তুলে নিতে বলেননি?

ডডনা। তুমি ধর্মের সমালোচনা করেছো, তোমার এসব শাস্তি প্রাপ্য ছিল, এমনই তাঁর মত। তিনি লিখেছেন তুমি অন্যের ক্রীড়নক হয়ে লিখছ।

ডডকার?

ডডঅনুমান করে নাও। জানো তো কী দোষ তোমাকে দেওয়া হয়! বিজেপির, আনন্দবাজারের তুমি ক্রীড়নক!

ডডএগুলো তো মোল্লারা বলে। প্রগতিশীল বামপন্থীও বললেন? তিনি কি কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন তাঁর এইসব মিথ্যের? পারবেন না। আমি কি বিজেপির একটি লোককে চিনি? চিনি না। আনন্দবাজারের কেউ কি আমাকে বলে দেয় আমি কী লিখব না লিখব? কখনই না। পশ্চিমবঙ্গে আমার লেখা পাঠক পড়তে চায় বলে আনন্দবাজার আমার লেখা ছাপে বা বই ছাপে।

ডডতুমি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছো, এটাকে তোমার দোষ বলে ভাবা হচ্ছে।

ডডএ কী করে আমার দোষ হয়? আনিসুজ্জামান পেয়েছেন, শামসুর রাহমানও তো আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন, কই তাদের তো কেউ দোষ দিচ্ছে না?

ডডতাঁরা তো অনেক বড়। তাঁরা পেতেই পারেন আনন্দ পুরস্কার। তুমি এত ছোট হয়ে কেন পেলে, সেটাই তোমার দোষ। তুমি যদি কোনও পুরস্কার না পেতে, তুমি যদি পাঠক না পেতে, তাহলে আজ হয়ত তুমি করুণা পেতে কিছু!

ডডআচ্ছা, আমি কি প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষতি করেছি, নাকি মৌলবাদীরা করছে ক্ষতি? মৌলবাদীদের পক্ষ নিয়ে এই সরকার করছে ক্ষতি?

ডডবদরউদ্দিন উমর কোনও মৌলবাদীকে বা বিএনপি সরকারকে দোষ দিচ্ছেন না। দোষ দিচ্ছেন কেবল তোমাকে। বলছেন তুমি করেছো ক্ষতি। কেবল তিনিই নন

তসলিমা, প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রায় সব নেতাই এটা বলছেন। তুমি যাদেরকে বন্ধু মনে করতে, তাঁরাই বলছেন।

ডডএ কি করে হয়? আমি তো দেশটির মঙ্গলের জন্য লিখছিলাম, আমি তো বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি তো একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করছিলাম।

ডডকাজী শাহেদ আহমেদ আজকের কাগজে তোমার লেখা চাইতেন। তোমার লেখা থাকলে পত্রিকার কাটতি বাড়ে, তাই বলতেন তিনি। তুমি তো নিয়মিত লিখেছো ওই পত্রিকায়। তাঁর খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতেও নিয়মিত লিখতে। তোমাকে তিনি নিমন্ত্রণ করতেন, এবং তাঁর অনেক বন্ধু যাঁরা তোমার লেখার অনুরাগী, তিনি নিজে খুব গর্ব করে পরিচয় করিয়ে দিতেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর লেখকের। কি করেছেন সেই কাজী শাহেদ আহমেদ তুমি জানো? তিনি কাল একটি সভা ডেকেছেন, ডেকে তোমার মামলার কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জারি করা মামলার প্রতিবাদ করলেন। তা বিস্তারিত আজ ছাপাও হয়েছে আজকের কাগজ পত্রিকায়। তুমি তো যায় যায় দিন পত্রিকাতেও লিখতে। ওই পত্রিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় কলামটি ছিল তোমার। যায় যায় দিন পত্রিকার শফিক রেহমান একই কাজ করেছেন। সভা ডেকেছেন। সভায় জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার দাবি করলেন, তোমার ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার কথা কিন্তু বলেননি। যে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো প্রতি সপ্তাহে তোমার ছবি আর খবর ছেপে ব্যবসা করেছে এতকাল, সেসব পত্রিকার সম্পাদকও সাংবাদিকদের মুক্তি চাইল, ওদের মামলা প্রত্যাহার করতে বলল। তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করল, পয়সা করল, আর প্রতিবাদের বেলায় দায়িত্ব অনুভব করল অন্যের জন্য। তোমাকে বাদ দিয়ে। আসলে জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের পক্ষে ওরা ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে প্রতিবাদ করছে না, করছে একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব থেকে। এ যাবৎ লিখে, মৌলবাদীদের অত্যাচার নিরন্তর সয়ে তুমি কিছুই অর্জন করতে পারোনি তসলিমা, সব শূন্য। জীবন বিয়োগ দিয়ে যোগের ঘরে শূন্য জমেছে তোমার।

ডডতবে কি আমার বিরুদ্ধে মামলা কোনও অন্যায় মামলা নয়?

ডডতারা তা মনে করছে না। জনকণ্ঠ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান আর তুমি হচ্ছ একা। তোমার মাথার ওপর মৌলবাদী শক্তি আর সরকার, উভয়ে খড়্গহস্তে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জনকণ্ঠের সঙ্গে মৌলবাদী আর সরকারের খুব বেশি বিরোধ কখনও হবে না। রাজনৈতিক কারণেই হবে না। তারা কোনও না কোনও ভাবে একে অপরের পরিপূরক। তাছাড়া জনকণ্ঠের পেছনে বড় একটি শক্তি আছে, আওয়ামী লীগ। বিবৃতিকারীরা তাই কোনও একটি শক্তির পক্ষে গেল, স্রোতের পক্ষে গেল। যে একা, যার পক্ষ নিলে বিপদ, মৌলবাদীরা সত্যিকার অর্থে যার বিপক্ষে, সরকার যার অনিষ্ট করতে চায়, তার পক্ষে কথা বলা যাবে না। তা না হলে কোরান অবমাননার অভিযোগের এই ইস্যুর মধ্যে প্রগতিশীলরা কেন একটি পক্ষ নিচ্ছেন! যদি তাঁরা বলেন যে তোমার লেখালেখি পছন্দ হয় না, তাতে কি? মতবাদ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু যে কারণে তোমার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, সেটি তো নিঃসন্দেহে অন্যায়

একটি মামলা, তা কি তাঁরা জানেন না? ঠিকই জানেন। তোমার লেখালেখি পছন্দ হবে না বলে বিবেকবান মানুষ, নীতিবান মানুষ তোমার বিরুদ্ধে মামলাটি সমর্থন করবেন কেন!

ড্ডকিছু বুঝতে পারছি না । সব কিছু কেমন যেন খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

ড্ডঅদ্ভুতই ছিল। তুমি কেবল বুঝতে ভুল করেছিলে আগে। কাল জামাতের গণসভা হল। এখন তারা জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলছে না। তারাও বুঝে গেছে যে জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে লাভ হবে না। লাভ হবে তসলিমার ফাঁসি চেয়ে। এতে কাজ হয়। সকলের সমর্থন পাওয়া যায়। তোমার ফাঁসি চাইছে, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছে তারা তোমাকে মেরে ফেলবে, তারপরও সরকার চুপ, সবাই চুপ, এই সুযোগে জামাতিরা ব্লাসফেমি আইন করার দাবি জানাচ্ছে। নীরব-বাদীরা কি একবার ভেবেছে এই আইন এলে কি অবস্থা হবে দেশের? হয়ত ভেবেছে, তারা তো আর ধর্ম নিয়ে তসলিমার মত বাড়াবাড়ি লেখা লেখে না, তারা পার পাবে। সংসদে কে বিরোধিতা করবে এর? কেউ না। খুব সহজেই এই বিলটি সংসদে পাস হয়ে যাবে।

ড্ডএরকম ভয়ংকর আইনটি সহজে পাস হবে, কেন যেন আমার বিশ্বাস হয় না।

ড্ডব্লাসফেমির শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড। যখন তখন যাকে তাকে বলা হবে সে ব্লাসফেমি করেছে। পাকিস্তানে হচ্ছে না? খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই আইন ব্যবহার হচ্ছে। এখানেও অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে। এখানেও ফতোয়ার বিরুদ্ধে যারাই বলবে, যারাই শরিয়া আইনের সমালোচনা করবে ব্লাসফেমি করেছে বলে বলা হবে। কে মুক্তি পাবে তখন মৌলবাদী ছাড়া!

ড্ডসংসদে বিরোধী দল নিশ্চয়ই এটিকে আইন করতে দেবে না।

ড্ডশোনো, শেখ হাসিনা আজ সরকারের এই মামলা, যে মামলায় জনকণ্ঠের দুজন সাংবাদিককে ধরা হয়েছে, তাদের মুক্তি দাবি করেছেন। তাদের ওপর থেকে হুলিয়া প্রত্যাহার করার দাবি করেছেন। তাদের ঝামেলা করাতে সরকারের নিন্দা করেছেন। শেখ হাসিনা চারজন সাংবাদিকের নাম উল্লেখ করে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। নাম উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট করে এই জন্য যে ভুলেও যেন আবার কেউ মনে না করে যে তিনি তোমার মামলারও প্রত্যাহার চান। এই যদি হয় বিরোধী দলের নেত্রী, তবে কি তুমি আশা কর যে সংসদে যখন তোমাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য ব্লাসফেমি আইন আনা হবে, তখন তিনি প্রতিবাদ করবেন? না, তিনি প্রতিবাদ করবেন না, প্রতিবাদ তিনি করবেন না এই কারণে যে তিনি তবে ইসলাম বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবেন। আরও একটি কারণ হল, বিএনপি যেমন জামাতকে খুশি করতে চাইছে, আওয়ামী লীগও চাইছে। জামাতের এখন পোয়াবারো। জামাত এখন দুদলকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। আসলে দুদলেরই জামাতকে দরকার। যে দলই জামাতকে সঙ্গী হিসেবে নেবে, সে দলই বিপক্ষ দলের চেয়ে শক্তিতে বড় হবে। দেখ, বুদ্ধিজীবিরা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদ করলেন, তাঁরা কিন্তু ব্লাসফেমি আইন জারি করার জন্য এত যে চিৎকার করছে মৌলবাদীরা, এই ব্লাসফেমি আইনের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করেননি। কোনও বুদ্ধিজীবীর মধ্য থেকেও প্রতিবাদ আসবে না, কারণ তাঁরা নিশ্চিত যে তাঁরা কখনও ব্লাসফেমির মত

অপরাধ করছেন না, তাঁরা পেটে রেখে দিচ্ছেন তাঁদের ব্লাসফেমি, তসলিমাই কেবল পেটে রাখতে পারে না, উগলে দেয়। তাই এই ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে আইনটি কেবল তসলিমার জন্যই দরকার।

ড্ডকিন্তু আইন যদি বহাল হয়ে যায়, তবে আইন কি তাদের কি ছেড়ে দেবে?

ড্ডদেবে না। কিন্তু তারা হয়ত ভাবছেন, দেবে। দেবে, কারণ তারা তো তসলিমার মত বোকা নন। তারা বুঝে সুঝে কথা বলেন। তুমি একা তসলিমা। তোমার পাশে কেউ নেই। তুমি ভেবেছিলে তুমি ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধত্ব, অশিক্ষা, মৌলবাদড্ডসব তারা যেমন সরাতে চায়, তুমিও তেমন চাও। ভেবেছিলে তুমি যা বলনি তার ভিত্তিতে সরকার তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, হুলিয়া জারি করেছে, তোমার বিরুদ্ধে সরকারের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ সবাই করবে, ভেবেছিলে মৌলবাদীরা তোমার ফাঁসির দাবিতে দেশজুড়ে তাণ্ডব করছে, এই দুঃসময়ে প্রগতিশীল শক্তিটি তোমাকে সমর্থন করবে, মত-পার্থক্য থাকলেও ভেবেছিলে তাঁরা অন্তত বাকস্বাধীনতার জন্য হলেও তোমাকে সমর্থন করবে। কিন্তু তুমি ভুল ভেবেছিলে। কেউ তোমার পাশে নেই। তুমি একা। তুমি একা বিশাল এক মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে লড়ছিলে। তুমি একা তসলিমা, কেউ নেই তোমার। এখন তোমাকে যদি ফাঁসি দেয়, যাদের তুমি বন্ধু ভাবতে, ভাবতে একই আন্দোলনে জড়িত তোমরা, তারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমার ফাঁসি। তুমি কি মনে করছ তোমাকে হত্যা করছে মৌলবাদীরা? না। ছুরি তোমার পিঠে কোনও মৌলবাদী বসাচ্ছে না। মৌলবাদীরা রাস্তায় নামছে, নেপথ্যে দাঁড়িয়ে আছে প্রগতিশীল বলে দাবি করে, সেই ভণ্ডগুলো। তুমি যাদের আপন ভাবতে তারা। কত বড় ভণ্ড হলে আজ প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী কেউই তোমার ওপর সরকারি আর মৌলবাদী জঘন্য ভয়াবহ হামলার প্রতিবাদ না করে জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের ওপর হামলার ওপর প্রতিবাদ করে! কারা ওই সাংবাদিক? কি করেছে ওরা এ পর্যন্ত? কজন মানুষ পড়েছে ওদের লেখা? মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ওরা কি কোনও চ্যালেঞ্জ ছিল, সমাজ কতটুকু বদলাতে চেয়েছে ওরা? অন্ধত্ব কতটুকু ঘোচাতে চেয়েছে ওরা? তোমার প্রগতিশীল প্রতিবাদী বন্ধুদের সঙ্গে ওদের কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল? ওরা কি কোনও নাম মৌলবাদবিরোধী বা সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে? যারা আজ তোমাকে বাদ দিয়ে ওদের জন্য কাঁদছে, তারা কি ওদের লেখা পড়েছে? চেনে ওদের? তারপরও এটা ঠিক, যে, সরকার ওদের বিরুদ্ধে মামলা করে অন্যায় করেছে। প্রতিবাদ অবশ্যই করতে হবে সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে, কিন্তু গতকাল বা আজ যে বিবৃতিগুলো দেওয়া হল, কেন তোমাদের পাঁচজনের কথা উল্লেখ করা হল না একসঙ্গে, কেন ওদেরকে আলাদা করে কেবল ওদেরই মুক্তি চাওয়া হল! কেবল ওদের বাক স্বাধীনতার কথা বলা হল! তোমার বুঝি বাক স্বাধীনতা থাকতে নেই! যেদিন মামলা হল ওদের বিরুদ্ধে, তার পরদিনই এত শত শত বিবৃতির সই যোগাড় হয়ে যায় কেন? তোমার বেলায় হয় না কেন? কেউ তোমার পক্ষে দাঁড়াতে চায় না। তোমার পক্ষে না দাঁড়াক, তোমার ওপর অন্যায়ের বিপক্ষেও দাঁড়াতে চায় না। কেন চায় না জানো? চায় না কারণ তুমি একা। আবারও বলছি, বারবার বলছি, বলছি যে তুমি একা। এত বার

তোমাকে এ কথা শোনাচ্ছি কারণ তুমি বিশ্বাস করতে চাও না যে তুমি একা। জনকণ্ঠ পত্রিকা একা নয়, জনপক্ষ পত্রিকা একটি বড় শক্তি। সবলের পক্ষ নিলে কোনও ঝুঁকি নেই। দুর্বলের পক্ষে ঝুঁকি আছে। তোমার সঙ্গে আজ অনেকে মানসিক ভাবে আছেন, গোপনে গোপনে আছেন, কিন্তু বিবৃতিতে নেই, প্রতিবাদে নেই, প্রকাশ্যে নেই। তুমি সুন্দরী যুবতী, তোমার সঙ্গে মানসিক ভাবেই থাকা নিরাপদ কি না।

ডডবাজে কথা বোলো না। মানসিকভাবে সঙ্গে থাকাই তো সবচেয়ে বড় থাকা। আমি জানি যে তিনি আমার পক্ষে আছেন। তিনি আমার জন্য উদ্বিগ্ন। তিনি আমাকে ভালবাসেন।

ডডমানসিকভাবে থাকলে তোমার কী লাভ এখন? এখন তোমার বিবৃতি দরকার, সমর্থন দরকার। তা না থাকলে তোমার উকিল তোমার জন্য কিছুই করতে পারবেন না। পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে, আন্দোলনের মাধ্যমে, একই ধারার মামলার আসামী জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের সঙ্গে আছেন, আর তোমার সঙ্গে আছেন নিভৃতে, গোপনে, মানসিকভাবে। শামসুর রাহমান বলেছেন সই করার লোক পাওয়া যায়নি বলে তিনি তোমার পক্ষে বিবৃতি দিতে পারেননি। তিনি কি একাই বিবৃতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বড় ব্যক্তিত্ব নন? তোমার মত হতভাগা কেউ নেই। তিনি একটি কবিতা লিখেছেন তোমাকে নিয়ে, তোমাকে সেই কবিতাটা দিয়েছিলেন শারদীয়া দেশ এর জন্য পাঠিয়ে দিতে? পাঠিয়েছিলে?

ডডপাঠাইনি। সময় পেলাম কোথায়? হুলিয়া জারি হয়েছে পরদিনই।

ডডমনে হয় তিনি আর চাইবেন না কবিতাটি কোথাও ছাপা হোক।

ডডকেন চাইবেন না? নিশ্চয়ই চাইবেন। নিজের কবিতা কেউ কি আড়াল করে?

ডডএখন অন্যরকম অবস্থা তসলিমা। তোমার পক্ষে কবিতা লিখতে, কলাম লিখতে এখন লেখক বুদ্ধিজীবীরা ভয় পান। যদি লোকে মন্দ বলে, তাই ভয়। যদি লোকে ছি ছি করে তাই ভয়। সংখ্যালঘুদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলে, সুরঞ্জনদের কষ্ট দেখে কেঁদেছো। কিন্তু তুমি কি জানো, তুমি সুরঞ্জনদের চেয়েও অসহায়! যে সুরঞ্জনরা আজ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের জীবন কি তোমার চেয়ে অনিশ্চিত, নিরাপত্তাহীন! যে কোনও সংখ্যালঘুর চেয়ে বড় সংখ্যালঘু তুমি। যারা বিপদে আছে তাদের চেয়ে তুমি সহস্রগুণ বিপদে আছো। তুমি আরও অবাক হবে যদি শোনো যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সমিতি আজ বিবৃতি দিয়েছে জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের পক্ষে, তোমার কথা তারা উল্লেখ করেনি। কেউ তোমাকে মর্যাদা দেয়না তসলিমা। তুমি খামোকাই লিখেছো মানুষের জন্য। মানুষ তোমাকে ভালবাসে না। দেশ দেশ করে মরো, দেশ তোমাকে কী দিল? দেশ তোমাকে ঘৃণা দিল, অবজ্ঞা দিল, এবং খুব শীঘ্র তোমাকে ফাঁসি দেবে। যদি ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারো, তুমি এ দেশে থেকো না তসলিমা।

ডডকোথায় যাবো?

ডডচলে যাও অন্য কোনও দেশে। এ দেশ তোমার যোগ্য নয় অথবা তুমি যোগ্য নও এদেশের। কোনও সভ্য দেশে চলে যাও।

ডডকেন যাবো? আমাকে কি এ দেশের কেউ একটুও ভালবাসে না?

ডডভালবাসে। তারা ভালবাসে যাদের দিকে তুমি কখনও ফিরে তাকাওনি। যাদের ভালবাসার সময় তোমার একটুও হয়নি। তুমি ব্যস্ত থেকেছো তোমার প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিক বন্ধুদের নিয়ে, তোমার লেখালেখি নিয়ে, অন্যের ভালর জন্যই ভেবেছো কেবল। তোমাকে ভালবাসে তোমার বাবা, মা, ভাই, বোন। কোনওদিন কি সময় হয়েছে তোমার, তোমাকে যারা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে, তাদের কথা একটু ভাবার? তোমার বাবার চেম্বারে তোমার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে, তাঁর সামনে দিয়ে প্রতিদিন মিছিল যাচ্ছে। যে কোনও সময় তোমার বাবার ওপর হামলা হবে, যেহেতু তিনি তোমার বাবা। চেনা পরিচিত অনেক বন্ধুই এখন তোমার বাবার কাছে আর আসেন না। রোগীরাও তাঁর কাছ থেকে আর চিকিৎসা নিতে আসে না। তোমার বাবা বলে তিনি মানুষের ঘৃণা পাচ্ছেন। তারপরও তিনি তোমাকে সমর্থন করছেন। তোমার ভাইরাও বন্ধু হারাচ্ছে। তোমার ভাইয়ের ছেলেরা ইশকুলে গেলে তাদের ছি ছি করছে ইশকুলের ছাত্ররা, বলছে তোর ফুপুকে তো জেলে নেবে, তোর ফুপুর তো ফাঁসি হবে। কেউ লজ্জায় ভয়ে ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। তোমার বোনের চাকরিটি যাবে, কারণ সে তোমার বোন। সবাই তোমার জন্য ভুগছে, কিন্তু তোমাকে অসম্ভব রকম ভালবাসছে। তোমার বাবার কথাই ভাবো, তিনি মধ্যরাতে যখন রোগী দেখে চেম্বার থেকে বাড়ি ফেরেন, তিনি তো একা ফেরেন, তখন কেউ যদি পেছন থেকে তাঁর পিঠে ছুরি বসায়! যে কোনও দিন, তোমার ওপর আক্রোশে ধর্মান্ধ লোকেরা তো এই কাণ্ডটি করে ফেলবে। একই রকম তোমার দাদাকেও করবে। তোমার দাদাও তো সেই কত রাতে ওষুধের দোকান বন্ধ করে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরেন। ময়মনসিংহে ধর্মান্ধদের সভা হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে, ওরা তো তোমার বাবাকে ভাইকে চেনে। তোমার ভাইয়ের ছেলে শুভকে একদিন ইশকুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তুলে নেবে কেউ, নিয়ে কোনও ডোবায় পুঁতে রাখবে। আর ঢাকায়, তোমার শান্তিনগরের বাড়িতে! বোন তোমার রাস্তায় বেরোলে মেরে ফেলবে। অথবা বাড়িতে ঢুকেই ওরা ছুরি বসাবে বুকে। ছুরি বসানো তো ওদের কাছে ডালভাত। পড় না খবর কত জনকে ওরা যে এভাবে মারছে! যাকেই পছন্দ হচ্ছে না, যার ওপরই রাগ, তাকেই জবাই করে ফেলে রাখছে। শিবিরের সন্ত্রাসে আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাঁপছে পর্যন্ত। এগুলো গলা কাটা রগ কাটা ছুরি বসানো খুন করা ওদের কাছে ডাল ভাত। একদিন তুমি পত্রিকার পাতায় পড়বে, গত রাতে তসলিমার বাড়িতে ঢুকে একদল সশস্ত্র যুবক তার মা, ভাই, বোন, বোন বোনের মেয়েকে জবাই করেছে। তোমার আশংকা হয় না! চলে যাও এ দেশ ছেড়ে..

ডডআমার এই প্রিয় দেশ ছেড়ে, আমার ভালোবাসার মানুষদের ছেড়ে, প্রিয় নদী মাঠ বৃক্ষতল.ছেড়ে ..

ডডকত মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যায়..। তাতে কি? যে দেশের মানুষ তোমাকে ভালবাসে না, সে দেশে থাকতে তোমার ইচ্ছে করে কেন বুঝি না।

ডডকিন্তু আমি তো পালাতে চাই না।

ডডপালাবার তোমার কোনও পথও নেই। তোমার নিরাপত্তা কোথাও নেই। জেলে নেই, আদালতে নেই। পালাবার পথেও নেই। জামিনের কথা কল্পনাও কোরো না।

জামিন নিতে গেলে আদালতে যেতে হয়। আদালতে তোমার নিরাপত্তা কি? ওখানে তুমি কি ভেবেছো পুলিশ তোমাকে নিরাপত্তা দেবে? যাকে পুলিশ খুঁজছে গ্রেফতার করার জন্য, তাকে কেন নিরাপত্তা দেবে! তোমাকে বরং পুলিশই ছেড়ে দেবে লক্ষ্য থাবার মধ্যে। উন্মত্ত মোল্লা-কুকুরগুলো তোমাকে ছিঁড়ে খাবে, আর তোমার বন্ধুরা দূর থেকে মজা দেখবে, যেমন দেখেছিল গতবছর বইমেলায় তোমার ওপর হামলা হচ্ছিল যখন। বইমেলার সেই হামলার সঙ্গে তুলনাও করো না এই হামলার। এই হামলা সেই হামলার চেয়ে লক্ষগুণ ভয়ংকর হবে। আদালতে গোপনে হঠাৎ করে কাকপক্ষী না জানে এমন ভাবে জামিন চাইতে যাবে! তোমার উকিল বলেছেন, তোমার জন্য হাইকোর্টে জামিন চাইতে যাবেন। যাও আদালতে, মরো গিয়ে। তুমি ভাবছো, মোল্লারা খবর পাবে না তুমি যে যাচ্ছো! বোকা, বুঝতে পাচ্ছো না! খবর তো মোল্লাদের আদালত থেকেই দেওয়া হবে। কত বিচারক আছেন জামাতে ইসলামি দলের, জানো না? কত উকিল আছেন মোল্লা, জানো না? শায়খুল হাদিসের দলকে, আমিনীর দলকে, ইয়ং মুসলিম সোসাইটিকে খবর আদালতের লোকেরাই দেবে। জেলে যাবে, জেলেই বা তুমি বাঁচবে কি করে, ওখানেও তো কামড় বসাবে তোমার গায়ে, চোর ছ্যাঁচোড় সবারই ধর্মের প্রতি অনুরাগ ভীষণ। যদি জেলে তোমার মৃত্যু না হয়, যদি বেঁচে থাকো, জেল থেকে বাইরে বেরোলেও তো তোমার নিরাপত্তা নেই। তোমার কোথাও নিরাপত্তা নেই। তারপরও যদি বেঁচে যাওয়া অলৌকিক ভাবে সম্ভবই হয় তোমার, এ দেশে থেকো না। মানুষ তো মরবেই, তুমিও মরবে, আর যাই কর, মোল্লাদের হাতে নিজেকে মরতে দিও না। তুমি দেশে থাকলে ওরা তোমাকে একদিন না একদিন খুন করবেই।

ডডসত্যের জন্য যদি মরে যেতে হয়, মরব।

ডডখুব গ্যালিলিও গ্যালিলেই হয়ে গেছো! নিজেকে তোমার খুব জিয়োর্দানো ব্রুনো মনে হচ্ছে, তাই না! মনে রেখো, এই পৃথিবীতে অনেক লেখকের ওপর নির্যাতন হয়েছে, তারা নির্বাসনে জীবন কাটিয়েছেন। তুমি একা নও।

ডডনা, আমি নির্বাসনে যাবো না। ডক্টর কামাল হোসেন আমার জন্য লড়বেন। তিনি খুব বড় ব্যারিস্টার।

ডডদেখ, তোমার উকিল হতাশ হতে হতে, লোকের ধিককার পেতে পেতে হুমকি পেতে পেতে তোমার মামলা থেকে সরে দাঁড়ান কি না। । এরকম কিছু হওয়া এখন অসম্ভব নয় তসলিমা।

ডডআমার যে কত পাঠক ছিল! আমার পাঠকেরা আমাকে তো ভালবাসত। কত মেয়েরা! তারা কি হঠাৎ করে আমার বিরোধী হয়ে উঠেছে? নিশ্চয়ই নয়।

ডডসাধারণ মানুষের কথা বলছ তো! তুমি টের পাওনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও তোমার সমর্থন হ্রাস পেয়েছে। বই হয়ত বিক্রি হয়েছে অনেক। তোমার বই তো মোল্লারাও কেনে। কি লিখেছো, কত বাজে কথা লিখেছো, তা জেনে তোমাকে আক্রমণ করার জন্য কেনে। তাছাড়া হঠাৎ করেই পাঠকের সমর্থন তোমার কমে গেছে।

ডডকেন ?

ড্ডঅপপ্রচার, তসলিমা, অপপ্রচার। গসিপ ম্যাগাজিনগুলোয়, মৌলবাদী আর সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোয় প্রতিদিন তোমাকে নিয়ে নানারকম গল্প বানিয়েছে, দেখনি? যা তুমি লেখোনি, তাই তোমার উদ্ধৃতি দিয়ে চালিয়েছে। তুমি বিজেপির কাছ থেকে ৪৫ লক্ষ, কেউ কেউ বলেছে ৪৮ বলছে, টাকা নিয়ে নাকি লজ্জা লিখেছো, আনন্দবাজার তোমাকে ইসলামবিরোধী লেখায় প্রেরণা দিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে সল্টলেকে নাকি একটি বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে। তুমি দেশদ্রোহী, তুমি রএর এজেন্ট, ভারত থেকে টাকা পেয়ে তুমি দেশে বাড়ি গাড়ি কিনেছো, তুমি মেয়েদের সংসার ভেঙে দিতে চাও, মেয়েদের নষ্ট করছ, তুমি ফ্রি সেক্স বিশ্বাসী, তুমি পুরুষদের ধর্ষণ করতে চাও, একশ একটা পুরুষের সঙ্গে তোমার অবৈধ সম্পর্ক, তুমি জরায়ুর স্বাধীনতা চাও। সরকারি দৈনিকগুলোয় এসব খবর প্রথম পাতায় গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। এসব অপপ্রচার তোমার পাঠক নষ্ট করেছে।

ড্ডকিন্তু যারা এসব শুনেও আমার লেখা পছন্দ করেছে, তারা আজ কোথায়?

ড্ডতারা আছে। চুপচাপ ঘরে বসে আছে। তারা সংগঠিত নয়। বিবৃতি দেবার মত ব্যক্তিত্ব তারা নয়। প্রতিবাদ করার মত সাংগঠনিক জোর তাদের নেই। তার ওপর একটা ব্যাপার তো আছেই, ভয়। এগিয়ে আসতে ভয় পায় অনেকে। এবং এদের সংখ্যাই বেশি। মুখ খুলতে ভয় পায়। তোমার লেখা পছন্দ করলেও মুখ ফুটে বলবে না কিছু, তোমার ওপর অন্যায় হচ্ছে জেনেও বলবে না কাউকে যে অন্যায় হচ্ছে। যাদের এগিয়ে আসতে কোনও ভয় নেই, যাদের খুঁটির জোর ভাল, তারাই যখন চুপ হয়ে আছে, তখন অন্যদের আর দোষ দিয়ে লাভ কি! হতভাগা তসলিমা, চার সাংবাদিকের জন্য আজ ভালবাসায় মমতায় কাঁদছে সবাই, কেবল তোমার জন্য কেউ নেই দু কথা উচ্চারণ করার। তুমি লেখালেখি ছেড়ে দাও তসলিমা, আর লিখো না।

ড্ডঅসম্ভব, আমি ছাড়ব না লেখা।

ড্ডতুমি কেন লিখবে? কার জন্য লিখবে? যারা তোমাকে জেলে পাঠাচ্ছে, ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছে, তাদের জন্য? এত উদার হবে কেন তুমি? ঘাতকদের পায়ে ফুল নিবেদন করবে কেন, বল! যদি বেঁচে থাকো, লেখালেখি সম্পূর্ণ বাদ দিও। তবে এদেশে নয়, অন্য কোনও দেশে।

ড্ডনা, এ আমি ভাবতেই পারি না।

ড্ডতোমাকে ভাবতে হবে তসলিমা। এই দেশে তোমার দাঁড়াবার কোনও জায়গা নেই আর। তোমাকে হতেই হবে দেশান্তরী। আর যদি গোঁয়াড়ের মত মরতে চাও, তবে থাকো এ দেশে। মরো। সপরিবার মরো। তবে আমার উপদেশ, বেঁচে থাকলে অলেখক, অবিপ্লবী হয়ে বেঁচে থেকো। কোনও ঝুট ঝামেলা নেই, হুমকি হুংকার নেই, জেল ফাঁসি নেই, পত্রিকা নেই, সাক্ষাৎকার নেই, এরকম একটি শান্ত স্নিগ্ধ নিশ্চিত শান্তির জীবন বেছে নিও।

ড্ডবিদেশের অনেক মানবাধিকার সংগঠন, লেখক সংগঠন আমাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলছে।

ড্ডছোঃ! বিদেশের সব আবেদনই ময়লা ফেলার ঝুঁড়িতে চলে যাচ্ছে, দেখ গিয়ে। দেশে কি হচ্ছে সেটা বড় কথা। আগে তো ঘর সামলাও, তারপর বাহির। আগে গদি

সামলাও, তারপর অন্য কিছু। আচ্ছা বল তো, হলিডের সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান কি মৌলবাদী?
ডডনা।
ডডতাঁর পত্রিকায় আজ তিনি তোমার লজ্জা বইটির সমালোচনা ছেপেছেন। ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন, তুমি বিজেপির লোক, তুমি সাম্প্রদায়িক, দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার মিশন নিয়েছো। এ সময় এসব কথা লেখার অর্থ কি জানো তো! লোক ক্ষেপানো। মোল্লা লেলিয়ে দেওয়া তোমার পেছনে। সরকারকে ইন্ধন যোগানো। তুমি জেলে গেলে, তোমার ফাঁসি হলে, এরাই খুশি হবে বেশি। এরাই হাততালি দেবে বেশি। কি, চুপ করে আছো যে! কি ভাবছো!
ডডনা, কিছু ভাবছি না।
ডডভাবছো, ভাবছো তোমার কমপিউটারের হার্ডডিস্কের লেখাগুলোর কি হবে! লেখা লেখা লেখা। লেখাগুলো পুলিশেরা নষ্ট করে ফেলবে কি না ভাবছো! লেখা সব তোমার নষ্ট হয়ে যাক। পুলিশ নিয়ে নিক। লেখার কথা ভাবা বাদ দাও। বেঁচে যদি থাকো, তবে আর যাই হও, লেখক হওয়ার চিন্তাও কোরো না, আবারও বলছি। লেখক হওয়ার সাধ তোমার আশাকরি পূরণ হয়েছে। লেখক হয়ে অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলে, অন্ধকারই তো সবলে গ্রাস করে নিল তোমাকে। সবাই তো বাইরের আলোয় হাঁটছে, আনন্দ করছে, তুমি একা পড়ে আছো অন্ধকারে, অন্ধকারই এখন তোমার ঠিকানা। লিখে তুমি এই পেয়েছো। এই তোমার পুরস্কার। এখানে এই গুমোট ঘরটিতে বসে বসে এখন জেলখানায় অথবা কবরে থাকার মহড়া দিচ্ছ।
ডডকিন্তু আমার তো অনেক স্বপ্ন ছিল..
ডডস্বপ্ন! তুমি হাসালে। তোমার মত বেচারা আবার নানারকম স্বপ্ন দেখতেও জানত। তোমার স্বপ্নগুলো এখন মৃত, বিস্মৃত। তোমার স্বপ্নগুলো কাকে খাওয়া, চিলে নেওয়া, তোমার স্বপ্নগুলো লোকের কফ কাশির সঙ্গে পড়ে আছে। তোমার স্বপ্নগুলো লোকের জুতোয় তলায়।
ডডথামো, এগুলো শুনতে ইচ্ছে করে না।
ডডইচ্ছে না করলেও এগুলো সত্য, তুমিও তা জানো। তুমি যে হেরে গেছো, তুমি জানো।   ভেবেছিলে, তুমি সমাজের মঙ্গল কিছুটা হলেও বুঝি করতে পেরেছো, ভেবেছিলে নারী পুরুষের বৈষম্যহীনতার কথা বলে তুমি কিছুটা হলেও মানুষকে বৈষম্যের ব্যাপারে সচেতন করতে পেরেছো। ভেবেছিলে সামান্য হলেও সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, অন্ধকার, কুসংস্কার দূর করতে পেরেছো। কিচ্ছু পারোনি তসলিমা। তুমি প্রচণ্ডভাবে হেরে গেছো। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বই লিখে তুমি সাম্প্রদায়িক আখ্যা পেয়েছো। যাদের ভেবেছিলে সহযাত্রী, তারাই আজ মৌলবাদের হিংস্র থাবার মধ্যে তোমাকে তুলে দিচ্ছে। এই তোমার এতকালের সংগ্রামের পুরস্কার। এই পুরস্কার মাথা পেতে নিতে কাল বা পরশু তুমি কারাগারে ঢুকবে অথবা তুমি ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, তুমি অবধারিত মৃত্যুর দিকে রওনা হবে। তসলিমা, তোমার জন্য খুব মায়া হয় আমার। খুব মায়া হয়। তোমার মত এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে আর যেন কারও জন্ম না হয় এই পৃথিবীতে।

ডডআমাকে একা থাকতে দাও। কথা বোলো না। বিরক্ত কোরো না।
ডডথাকো, একা থাকো। তুমি তো একাই। ....কাঁদছো? কাঁদো তসলিমা, কাঁদো। অনেকদিন তুমি কাঁদোনি। অনেকদিন প্রাণভরে এমন করে কাঁদোনি। কাঁদো।

বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি আমি। আমার কান্নার শব্দ যেন কোথাও যেতে না পারে, তাই শব্দটিকে আটকে রেখে কাঁদি। যখন মাথা তুলি, চ আর চর বাচ্চাটির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। এ ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু ছিল একজন, নিশ্চয়ই ছিল, দীর্ঘক্ষণ যার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, সে ছিল। মানুষটি তো ওখানেই বসেছিল, ওই চেয়ারে, তারপর বিছানায় এসে বসল। আমাকে স্পর্শ করেছিল, কপালে একটি শীতল হাত এসে একবার থেমেছিল। আমাকে কাঁদতে বলল। আশা করেছিলাম একবার অন্তত বলবে, অনেক কেঁদেছো, আর কেঁদো না। আমাকে একটিবার বুকে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দেবে। আশা করেছিলাম, কাঁধে একটি হাত রাখবে সে।

দরজাটি ভেতর থেকে সিটকিনি আঁটা ছিল, এখন খোলা। আশ্চর্য, দরজা খুলে আমাকে না বলে নিঃশব্দে চলে গেছে সে! একবার বলে যাবে না!

এগারো জুন, শনিবার

সেই চার তারিখে বাড়ি ছেড়েছি যে কাপড়ে, সে কাপড়েই এখনও আছি। ঘামের দুর্গন্ধ সারা শরীরে। গা আঠা আঠা হয়ে আছে ধুলোয়, ঘামে, চোখের জলে। অসহ্য গরম। এক পশলা হাওয়া ঢোকার কোনও সুযোগ নেই ঘরে। যেন জ্বলন্ত চুলোর ওপর বসে আছি। দুর্গন্ধ বা আঠা দূর করতে নয়, গোসলখানায় যাই গা থেকে আগুন দূর করতে। গোসলখানায় কোনও সাবান নেই, কোনও তোয়ালে নেই। কোনও বালতি নেই, কোনও লোটা বা মগ নেই। কলটি মেঝে থেকে দু ফুট উঁচুতে। কলের তলে বসে গায়ের ওপর জল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও কায়দা নেই গা ভেজানোর। এই কলের তলে বল্টু গোসল করে উঠতে পারে, আমি পারি না। আমার পিঠ যায় তো মাথা যায় না। অগত্যা আলাদা আলাদা করে পা হাত মাথা ইত্যাদি কলের তলে নিয়ে ভেজাই, দুহাতে জল নিয়ে বুক পিঠ। জল তো জল নয়, যেন ফুটোনো জল, এমন গরম। এক চিলতে সাবান লেগে ছিল গোসলখানার মেঝেয়, সম্ভবত বল্টুর কাপড় ধোয়ার সাবান। সেটিকেই চিমটি দিয়ে তুলে তুলে গায়ে মাখি। মাখা ফুরোনোর আগেই সাবানের অস্তিত্ব ফুরিয়ে যায়। এর পর কি? গা মুছব কি করে! পরনের শাড়িটি দিয়ে গা মুছে ঘ র দেওয়া লম্বা জামাটি পরি। ঘ র জামাটি ও বাড়ি ছাড়ার সময় আমি খুলে রেখেছিলাম, ঘ আমার হাতে দিয়ে জামাটি, বলেছিলেন নিয়ে যেতে। গোসল হল কিন্তু এর নাম গোসল নয়। এর নাম যে ঠিক কী, জানি না। গোসলখানার গরম জল থেকে ফিরে আসি জ্বলন্ত উনুনের ওপর আবার। সারা শরীরে

কুটকুট করে কামড়াতে থাকা ঘামাচি নিয়ে বসে থাকি, বসে থাকি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এ ছাড়া করার কিছু নেই আমার। বসে থাকি আর অপেক্ষা করি কারওর। অপেক্ষা আমাকে একটি ঘরের মধ্যে স্থির বসে থেকে করতে হয়। কারওর অপেক্ষা করলে যে দরজা খুলে দাঁড়াবো, জানালা খুলে তাকাবো, যে অভ্যেসটা ছিল এতকাল, অভ্যেসটা শক্ত করে খামচে ধরে তোশকের তলায় রেখে দিই। বরং কান পেতে রাখি। কান পেতে রাখি পায়ের শব্দ পাওয়ার। কান দুটো বেড়ালের পায়ের শব্দও শোনে।

ঙ এলেন দুপুরে খুশির খবর নিয়ে। আজ বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। সই যোগাড় করেছেন ঙ। তসলিমার বিরুদ্ধে মামলা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। গতকাল শুক্রবার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে আইনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে মৌলবাদী চক্রের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। সরকারের এ আচরণকে সততা ও নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী অভিহিত করে বিবৃতিতে এর নিন্দা এবং তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে, লেখিকা তার সত্যতা অস্বীকার করে নিজের অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। লেখিকা স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি পবিত্র কোরান সংশোধনের কথা বলেননি, সুতরাং তিনি যে কথা বলেননি সে কথা দ্বারা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অভিযোগ অবাস্তব এবং অলীক। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শরিয়া আইন সংশোধনের দাবি করার অধিকার সকল নাগরিকের আছে এবং এ দাবি ইতিমধ্যে একাধিক মহল থেকে উত্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এ ব্যাপারে সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে ইতিমধ্যে বিল দাখিল করেছে।

মৌলবাদী শক্তির চাপে পড়ে সরকারের এই আচরণের আমরা নিন্দা করি এবং তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানাই। আমরা লেখিকার ও তার পরিবারের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। উগ্র মৌলবাদীরা বারবার তসলিমা নাসরিনসহ দেশের কয়েকজন বরেণ্য বুদ্ধিজীবীর প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে, অথচ সরকার এদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে লেখক ও সাংবাদিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। আমরা এই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান চাই। অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এই সরকার একটির পর একটি গণতন্ত্রবিরোধী কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে গণতন্ত্রকে ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে।

বাইশ জন বুদ্ধিজীবী সই করেছেন, কে এম সোবহান, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান, কবীর চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, কলিম শরাফী, মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ, রফিকুননবী, কাইউম চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, হাশেম খান, মোহাম্মদ রফিক, শফি আহমেদ, হায়াৎ মামুদ, পান্না কায়সার,

আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের, হারুন হাবীব, নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, আখতারুজজ্জামান, আলী আনোয়ার..।

আজ আটদিন পর একটি বিবৃতি। মাঝখানে এঁরাই বিবৃতি দিয়েছেন আমার মামলার পরে জারি হওয়া মামলার বিরুদ্ধে। আমি এমন একটি নাম, যে নামটি উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়, ভয় হয়। আমি জানি যাঁরা আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে, যাঁরা আমার লেখার সঙ্গে একশ ভাগ একমত তাঁদেরও লজ্জা ভয় যায় না। কি জানি কি বলে লোকে, এই আশংকা। কি জানি কি বিপদ ঘটে, আশংকা। আশংকার পরোয়া করে না গার্মেন্টেসএর ওই দরিদ্র শ্রমিকেরা। সাজু, জাহেদা, লাভলী বিবৃতি দিচ্ছে, সভা করছে। গার্মেন্টসএর আরও শ্রমিক নিয়ে *আমরা কজন তসলিমা পক্ষ* নামে দল করে সভা করেছে আবার, লিফলেট ছেপেছে। ওরা অচেনা অজ্ঞাত মানুষ, ওদের সভা বা বিবৃতির মূল্য নেই, কিন্তু তারপরও মরিয়া হয়ে অসাধ্য সাধনে নেমেছে। ওরা যেদিন খবর শুনেছে, সেদিনই প্রতিবাদ করেছে। আর আজ যাঁরা প্রতিবাদ করলেন, ভেবে চিন্তে করেছেন, তবু তো করেছেন, করুণা করে হলেও তো করেছেন, নাও করতে পারতেন। যে বিষাদ আমাকে গ্রাস করেছিল গতকাল, তা দূর হয়। দূর হলেও দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি জোটে না। এই বিবৃতির কারণে আমার ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়া হবে না, কিন্তু আমার কি অন্তত জামিন পাওয়া হবে? ঙ বললেন যে ক তাঁকে জানিয়েছেন যে আগামীকাল সকালে যে কোনও সময় সম্ভবত আমাকে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। হঠাৎ করে আদালতে উদয় হয়ে জামিন চাইতে হবে, এমন একটি ব্যবস্থা করছেন আমার উকিল। ক প্রায়ই উকিলের কাছে খবর নিচ্ছেন কি হচ্ছে না হচ্ছে। জামিনের জন্য যখন আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হবে, তখন যেন তাকে জানানো হয়, বলে রেখেছেন উকিলকে। ক ব্যবস্থা করবেন আমাকে আদালতে নেওয়ার। আগামীকাল কটার সময় যেতে হবে, কিভাবে যাবো তার আমি এখনও কিছুই জানি না। ঙর বক্তব্য, আগে থেকে কেউ আসলে কিছুই জানে না। উকিল ককে খবর দেওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে আদালতে যেতে হবে। বাতাসে খবরটি ওড়ার আগেই যেন আমি উপস্থিত হয়ে জামিন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। যাকে বলা হয় ঝড়ের বেগে। কিন্তু বেগটি আদপেই ঝড়ের হবে কি না এ বিষয়ে ঙ ঠিক নিশ্চিত নন। জামিন না হওয়াতক অনিশ্চিত প্রতিটি মুহূর্ত। জামিন আদৌ হবে কি না, হলে কবে হবে। লুকিয়ে থাকা সম্ভব আর হবে কি না, না হলে কী হবে! কে উত্তর দেবে এসবের! পুলিশের চেয়ে শত গুণ আশংকা মোল্লাদের নিয়ে। আজকাল ঘরে ঘরে মোল্লা। এ বাড়ির আশে পাশে কজন মোল্লা বাস করছে কে জানে! যদি কেউ একবার গন্ধ পেয়ে যায় আমার, কী হবে তা আমি এবং ঙ দুজনই অনুমান করতে পারি। ঙ চলে যেতে চান, তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বসার জন্য অনুরোধ করি। ঙ আধঘন্টা থাকলেও আধ মুহূর্ত বলে মনে হয়। ক বা ঙ এলে ঘড়ির কাঁটা আচমকা লাফাতে থাকে। এ সময় আমার আপন আর কে আছে ক আর ঙ ছাড়া! ক আর ঙ না থাকলে আমার কবেই তো মৃত্যু হত। একএকটা মুহূর্ত বেঁচে থাকি, এর মানে একএকটা মুহূর্ত ক আর ঙ আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

অবকাশে বাবার চেম্বারে তিন দফা হামলা। বাড়ি চেম্বার ভাঙচুর। জানিনা বাবা বা দাদার গায়ে কটা চাপাতি বা রামদার কোপ পড়েছে। জানিনা বাবার রক্তচাপ এই দুশ্চিন্তায় কতটা বেড়েছে। হৃদপিণ্ডে আরও একটি ধাককা লেগেছে কি? মস্তিষ্কে কি রক্তক্ষরণ হচ্ছে! কিছু একটা হচ্ছে নিশ্চয়ই। বাবাকে দেখেছি সামান্য কিছু ঘটলেই তাঁর রক্তচাপ এমন বেড়ে যায় যে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয় হয় এমন অবস্থা হয়, রক্তচাপ দ্রুত কমানোর জন্য নিফিডিপিন ট্যাবলেট দুটো তিনটে গিলে তিনি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখেন। বাবা কি এই ভয়ংকর সময়ে যখন তাঁর সামনে দিয়ে প্রতিদিন যাচ্ছে তাঁর কন্যাকে খুন করার জন্য বিশাল বিশাল মিছিল, তাঁর চোখের সামনে অবকাশের দেয়াল আর চেম্বারের দরজায় লাগানো হচ্ছে পোস্টার, *কুখ্যাত মুরতাদ তসলিমার ফাঁসি চাই,* তিনি কি পারছেন রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে! যে কোনও মুহূর্তে এসে যাওয়া মৃত্যুকে আর ঠেকাতে ঠেকাতে পারার তো কথা নয়! পত্রিকা কি সব খবর পায় আর! এমনও হতে পারে, বাবাকে ওরা কুপিয়েছে। পাঞ্জাবির তলে তো ওরা রামদা নিয়ে ঘোরে, কত কত মানুষকে তো কুপিয়ে মেরেছে, কোরবানির গরুর মত মানুষের গলা জবাই করেছে ওরা! বাবাকেও কি ওরা জবাই করবে, কুপিয়ে মারবে! জেল থেকে বেরিয়ে কি আমি আমার বাবাকে জীবিত দেখতে পাবো না! যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে, যন্ত্রণাটি বুক থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। কাল বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে হাজার হাজার লোকের মিছিল শান্তিনগরে গিয়ে উত্তেজিত হয়েছে! কেন উত্তেজিত হয়েছে! আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে আমার আত্মীয়দের গলা কাটার জন্যই তো! পুলিশ তো আর ওদের বাধা দেবে না এখন। কাল কি শুনতে হবে যে আমার পরিবারের চারজন অথবা পাঁচজন সদস্যকে খুন করা হয়েছে! চোখ বুজে বসে থাকি। হাতের পত্রিকা হাতে ঝুলতে থাকে। পত্রিকায় তপন দের ছবি। গতকাল দৈনিক খবরের সাংবাদিক তপন দে যখন মিছিলের ছবি তুলছিল, পুরানা পল্টনের মোড়ে মৌলবাদীরা তার ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেছে, প্রচণ্ড মেরেছে তপন দেকে, শেষ পর্যন্ত কিছু সাংবাদিক তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তপন দে পুলিশের সাহায্য চেয়েছিল, পুলিশ সাহায্য করেনি, সামনেই নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়েছিল।

জামাতে ইসলামি এবং আর সব মৌলবাদী দলের সঙ্গে এখন আরও রাজনৈতিক দল যোগ হয়েছে, ফ্রীডম পার্টি ডডশেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকারীরা যে রাজনৈতিক দলটি বানিয়েছে সেটি তো আছেই, একসময়ের বাম রাজনীতিবিদ আনোয়ার জাহিদ তাঁর দল নিয়ে ঢুকে গেছেন ইসলামি ঐক্যে, শফিউল আলম প্রধান একসময়ের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতা, তিনিও তাঁর জাগপা দল নিয়ে ঢুকেছেন। মৌলবাদীদের বিশাল বিরাট শক্তি দেখে এমনই মুগ্ধ তাঁরা যে ভেবে নিয়েছেন এই শক্তিটিই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে ক্ষমতায় আসছে, সুতরাং এই দলের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। আনোয়ার জাহিদ আর প্রধানের মুখে মৌলবাদীদের ভাষা, তসলিমার ফাঁসির জন্য তাঁরাও মিছিলের অগ্রভাগে থাকছেন, তাঁরাও স্লোগান দিচ্ছেন। গতকাল জুম্মাহর নামাজের পর হাজার

হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সভা হয় বায়তুল মোকাররমে। বক্তৃতা করেন বিখ্যাত সব ইসলামী নেতা। শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেছেন, ধর্মদ্রোহিরা শুধু ইসলামের শত্রু নয়, তারা দেশ ও জনগণেরও শত্রু। ধর্মদ্রোহী নাস্তিক মুরতাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা শুধু আলেম ওলামা বা পীর মাশায়েখদের আন্দোলন নয়, দেশের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মানুষ আজ এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই আন্দোলনের বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা বরগুনার পীর মাওলানা আব্দুর রশিদ বলেছেন, তসলিমা ও জনকণ্ঠ আমাদের মূল লক্ষ নয়, মূল লক্ষ হল ইসলাম ও কোরানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত নস্যাৎ করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তসলিমাকে গ্রেফতার করা না হলে বিএনপি সরকারের অবস্থা ভয়াবহ হবে। মাওলানা ওবায়দুল হক এম.পি বলেছেন, সংসদে চলতি অধিবেশনেই ধর্মদ্রোহিতা বিরোধী আইন পাস করুন। অন্যথায় জনগণ ধর্মদ্রোহীদের শাস্তির ব্যবস্থা নিজেরাই করতে বাধ্য হবে। ব্যারিস্টার কোরবান আলী বলেন, জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করা হবে আগুন নিয়ে খেলা করার সামিল। ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতার প্রতিরোধ মোর্চার আহবায়ক মাওলানা মহিউদ্দিন আহমেদ নাস্তিকদের জানাজা না পড়ানোর জন্য সব মোল্লা মুসল্লির প্রতি অনুরোধ জানান। লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ফজলুল হক আমিনী বলেন, ঈমান ও ইসলামের কথা বলা হলে আমাদের বলা হয় মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ ইত্যাদি। নামাজ রোজা হজ্ব পালন করলে যদি মৌলবাদী বলা হয় তবে হাসিনা খালেদাও মৌলবাদী। আমিনী ৩০ জুনের মধ্যে বিশেষ ট্রাইবুনালে তসলিমা নাসরিনের বিচারের দাবি করেন।

৩০শে জুনের আগেই তসলিমার ফাঁসি দিতে হবে। ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চার পক্ষ থেকে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ৩০ শে জুন পর্যন্ত সরকারকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন, এর মধ্যে তসলিমার ফাঁসি না হলে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল এবং পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। ৩০শে জুন হরতালের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন।

পত্রিকায় মিছিলের ছবি দেখি। হাজার হাজার লোকের মিছিল। নগরীর রাজপথ সাদা হয়ে আছে সাদা টুপিতে সাদা পাঞ্জাবিতে। সামনে ব্যানার, ব্যানারে লেখা তসলিমা নাসরিনসহ সকল নাস্তিকদের ফাঁসি, এনজিওদের অপতৎপরতা ও জনকণ্ঠ বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ, সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। এটি ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চার মিছিল। ঈমান বাঁচাও দেশ বাঁচাও আন্দোলনের মিছিলের ব্যানারে লেখা তসলিমা নাসরিন সহ সকল ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক মুরতাদের ফাঁসি ও বিদেশি মদদপুষ্ট ইসলাম বিরোধী এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধের দাবি। জামাতে ইসলামির মিছিলের ব্যানারে লেখা, **আল্লাহ, রাসুল(সাঃ) ও ইসলাম অবমাননাকারী ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি চাই, সংসদে ধর্মদ্রোহীদের শাস্তিমূলক আইন পাশ কর।** এনজিওদের অপতৎপরতা ও নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের মিছিলের ব্যানারে লেখা, **তসলিমা নাসরিন সহ সকল নাস্তিক মুরতাদদের ফাঁসি চাই। ধর্মদ্রোহীতা বিরোধী আইন প্রণয়ন কর। এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধ কর।** ঢাকার

রাজপথ কেবল টুপিতে সাদা হয়নি, ঢাকায় যা ঘটছে, ঢাকার বাইরেও তা ঘটছে, টুপিতে সাদা। রাস্তায় যানবাহন চলছে না, মিছিল চলছে।

আমার জীবদ্দশায় আমি মৌলবাদীদের এত বড় আন্দোলন দেখিনি। আমার জীবদ্দশায় মৌলবাদীদের এত সংগঠিত আর শক্তিশালী হতে দেখিনি।

তসলিমা ও মুরতাদ নাস্তিকদের শাস্তি দাবি অব্যাহত। এখনও আমাকে সরকার গ্রেফতার করতে পারেনি বলে সরকারের নিন্দা করছে বিভিন্ন গোষ্ঠী। চট্টগ্রামের জনসভায় বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান বলেছেন, কুলাঙ্গার তসলিমা কিতাবুল্লাহর সংশোধনী দাবির ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। অতএব ঈমান নিয়ে বাঁচতে হলে এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তার আনুগত্য কোরানের প্রতি নেই, বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তার আনুগত্য এ দেশের প্রতি নেই। আছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের প্রতি। সুতরাং ধর্মদ্রোহীতার পাশাপাশি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে তাকে অবশ্যই ফাঁসি দিতে হবে। তসলিমাকে নিয়ে সরকার ভানুমতির খেল শুরু করেছে। এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, এখনও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ দেশের ভেতরে থেকেই সে স্পীকারের কাছে চিঠি লিখে যাচ্ছে। নতুন নতুন সংগঠন যোগ দিচ্ছে আমার ফাঁসির দাবিতে। নারী অধিকার আন্দোলনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা চেমন আরা ও সেক্রেটারি হাবিবা চৌধুরী বিবৃতি দিয়েছেন, তসলিমা নাসরিন একজন নারী হয়েও নারী সমাজের অমর্যাদা করে চলেছেন, সুতরাং তাঁকে গ্রেফতার করা হোক, তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশ কেন্দ্রও আমার গ্রেফতার এবং বিচার দাবি করেছে। আরেকটি সংগঠন গড়ে উঠেছে, নাম ইয়ং হিন্দু সোসাইটি। এরাও আমার শাস্তি দাবি করেছে। ইয়ং হিন্দু সোসাইটির নেতা স্বপন কুমার বিশ্বাস, শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দে, সুভাষ চন্দ্র দে ধর্মীয় উত্তেজেনা সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত তসলিমা নাসরিন গংদের শাস্তির এবং ব্লাসফেমি আইনের আওতায় হিন্দু ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

আজ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের একটি বিবৃতিও ছাপা হয়েছে। মৌলবাদীরা সামাজিক সংহতি এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্টে পাঁয়তারায় লিপ্ত। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ থেকে জোটের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রামেন্দু মজুমদার এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করছি যে দেশে উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী চক্রান্তমূলকভাবে সামাজিক সংহতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং ধর্মানুভূতির অপব্যবহার করে এই ষড়যন্ত্র জোরদার করে চলেছে। তাদের এইসব অপতৎপরতা বন্ধের ব্যবস্থা না করে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সরকার বরং মৌলবাদী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে উঠছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের বর্ধমান অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অপব্যাখ্যাকারীদের ফতোয়া, জাতীয়ভাবে সম্মানিত প্রতিষ্ঠিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের মুরতাদ আখ্যাদান ও উস্কানিমূলক বক্তব্য, জাতীয় সংসদে স্বাধীনতার অবমাননাকর পাল্টা পতাকা উত্তোলন, সরকারি পত্রিকার স্থলে অশালীন অননুমোদিত পত্রিকা বিতরণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের নতুন করে সশস্ত্র হামলা ইত্যাদির

বিরুদ্ধে সরকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলছে। পক্ষান্তরে কথিত অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ সাংবাদিক তোয়াব খান ও নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আনীত অভিযোগের সুরাহার জন্য প্রেস কাউন্সিলের শরাণাপন্ন না হয়ে সরকার যেভাবে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তা গণতান্ত্রিক সমাজের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে সাংবাদিকদের মুক্তি দাবি করছি।

সেই সঙ্গে লেখিকা তসলিমা নাসরিন কর্তৃক প্রদত্ত অস্বীকৃতির পরও তার সাক্ষাৎকারের বিকৃত ভাষ্য নিয়ে ফায়দা হাসিলের খেলা বন্ধ এবং লেখিকার সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

আমার প্রসঙ্গ লেজের দিকে বলা হলেও বলা হয়েছে। কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হই। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট বড় ব্যাপার। ছোট দল তসলিমা পক্ষ একটি পোস্টার ছেপে ঢাকা শহরের বিভিন্ন দেয়ালে সেঁটেছে।

আমি পবিত্র কোরান সংশোধনের কথা কখনও কোথাও বলিনি
তসলিমা নাসরিন

০ তসলিমা নাসরিনএর উপর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার কর
০ স্বাধীন সংবাদপত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা চাই
০ ফতোয়াবাজদের রুখে দাঁড়াও

একটি লিফলেটও বের করেছে মুক্তবুদ্ধি চর্চা কেন্দ্র থেকে। জানি না এই কেন্দ্রটিতে সাজু জাহেদাদের দল আছে কি না। আমার নামটি উচ্চারণ করতে ওদের কোনও আড়ষ্টতা নেই।

তসলিমা নাসরিনের হুলিয়া প্রত্যাহার কর
ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও

প্রিয় দেশবাসী,

তসলিমা নাসরিনের কথিত কোরান সম্পর্কে উক্তির কারণে তার উপর সরকার মামলা দায়ের ও হুলিয়া জারি করেছেন। যে কথিত উক্তির জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা, সে উক্তি সম্পর্কে তসলিমা নাসরিন নিজেই বলেছেন, তিনি তা বলেননি। কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা ভুল ছেপেছে। স্টেটসম্যান পত্রিকায় পাঠানো প্রতিবাদ লিপিতে তসলিমা নাসরিন বলেছেন, কোরান পরিবর্তনের কথা তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন শরিয়া আইন পরিবর্তনের কথা।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত তসলিমা নাসরিনের কথিত এই উক্তি সম্পর্কে প্রথমে খবরটি প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলাবাজারে। তারপর খবরটি লুফে নেয় দৈনিক ইনকিলাব। এরপর প্রায় প্রতিদিনই ইনকিলাব পত্রিকায় তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে খবর ছাপা হচ্ছে। এই গ্রুপের সাপ্তাহিক পূর্ণিমা গত দুবছর ধরে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে একের পর এক করেছে কভার স্টোরি। অর্ধেক পৃষ্ঠার লেখায় দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী তসলিমার ছবি ছাপিয়ে পত্রিকাটি ব্যবসায়িক ফায়দা লুটেছে। কারণ তসলিমা নাসরিনের বিষয় নিয়ে কিছু লিখলে পত্রিকা চলে বেশি, পত্রিকার কাটতি বেশি। সম্প্রতি এই পত্রিকার নেপথ্য মালিক কুখ্যাত মাওলানা মান্নানের উস্কানিতে গঠিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি এনজিওদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষোদগার করছে। স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর থেকেই এনজিওরা এদেশে কাজ করে আসলেও এনজিওদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা এত চরমে ছিল না। এখন এর বিরোধিতা করার কি কারণ? এনজিওরা এখন ব্যাপক প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম শুরু করেছে। এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী চায় না যে, আমাদের দেশের মানুষ শিক্ষিত হোক। তারা তাদের মাতব্বরি খবরদারি টিকিয়ে রাখার জন্য এ দেশের মানুষকে অশিক্ষিত রাখতে চায়। এনজিওদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও গ্রামীণ মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের আঁতে ঘা লেগেছে। কারণ তাদের মহাজনি ও দাদন ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

এইসব সাম্প্রদায়িক ও ফতোয়াবাজ গোষ্ঠীর ব্যাপারে সরকার একেবারে নীরব। বরং বলা যায় প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে চলেছে। তসলিমা নাসরিন ও জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে মামলা তারই প্রমাণ করে। তাই আজকের প্রশ্ন, স্বার্থপর ধুরন্ধর এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে দেশ কি মধ্যযুগে ফিরে যাবে? নাকি আমরা গণতন্ত্রের পথে, ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে, মানুষের মানবিক মূল্যবোধের পথে অগ্রসর হব! আমাদের দাবি অবিলম্বে তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে আরোপিত মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করা হোক। দৈনিক জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের উপর আরোপিত মামলা প্রত্যাহার করা হোক। ফতোয়াবাজদের বেআইনি কার্যক্রম বন্ধ করা হোক।

ডডডডডডডডডডডডডডড মুক্তবুদ্ধি চর্চা কেন্দ্র ডডডডডডডডডডডডডডডডডডড

আজকের আরেকটি খবরের কথা আমি এখনও বলিনি। খবরটি খুব বড় খবর। পত্রিকার প্রথম পাতার খবর। না বলার কারণটি সম্ভবত বেঁচে থাকার একটি আশা, যত ক্ষীণই হোক তা, আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানি আমার বাঁচার আর কোনও সম্ভাবনা আর নেই। এই ফতোয়া সিলেটের ছাহাবা সৈনিক পরিষদের দেওয়া ফতোয়ার মত নয়। এ ফতোয়া অন্যরকম। এই ফতোয়া মুফতীর দেওয়া ফতোয়া। ইসলামি আইনে একমাত্র মুফতীরই অধিকার আছে ফতোয়া দেওয়ার। সম্ভবত আমার মৃত্যু না হলে কেউ এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না। যে কোনও সময় যে কেউ আমার মাথাটি কেটে নেবে। আগের পঞ্চাশ হাজার, আর এখনকার এক লক্ষ, মোট দেড়লক্ষ টাকা মূল্য আমার এই মাথার। মূল্যবান মাথাটি বনবন করে ঘোরে, মূল্যবান মাথাটি বাঁচাবার কোনও বুদ্ধিই এই মাথায় নেই।

তসলিমাকে হত্যার জন্য লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

খুলনা, ১০ই জুন। আজ বিকেলে স্থানীয় শহীদ পার্কে আয়োজিত এক সীরাতুন্নবী সম্মেলনে লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে হত্যার জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এর খুলনা জেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা রফি আহমেদ মহল্লী। সীরাতুন্নবী সম্মেলনের অন্যতম বক্তা মুফতী সৈয়দ নজরুল ইসলাম তসলিমা নাসরিনকে হত্যার ঘোষণা দিয়ে বলেন, ইসলামের দুশমন, কোরানের অপব্যাখ্যাকারী তসলিমা নাসরিনকে যে ব্যক্তি হত্যা করতে পারবে, তাকে ১ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ সময় তিনি তাঁর ব্যাংকের হিসাব নম্বরও উল্লেখ করেন। তসলিমার হত্যাকারীকে তিনি তাঁর ঢাকার বাসার (৩১৪/২ লালবাগ) ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান।

বারো জুন, রবিবার

ইনকিলাবের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত *তসলিমাগংদের* বিরুদ্ধে জেহাদি আন্দোলনের খবরই লেখা হয়। সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, মন্তব্য, কলাম প্রতিদিন যা চলছে, তা তসলিমার বিরুদ্ধে।

<u>তসলিমাসহ মুরতাদদের ফাঁসি ও ধর্মদ্রোহী পত্রিকা নিষিদ্ধ করতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ।</u>

<u>ইসলামের ক্ষতি করার জন্য যুগে যুগে কুলাঙ্গারের আবির্ভাব ঘটেছে,</u> বলেছেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। লেখিকা তসলিমা তাঁর যা ইচ্ছা তাই লিখুন, কিন্তু লেখার স্বাধীনতার নামে কারও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানার অধিকার তাঁর নেই। দেশজুড়ে যে জেহাদী আন্দোলন চলছে, তা তিনি সমর্থন করছেন এবং ধর্মদ্রোহীতার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ব্যাপারটিকেও তিনি সমর্থন করছেন।

মিজান চৌধুরী যে সে লোক নন, তিনি বড় রাজনৈতিক নেতা, একসময় আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন, তারপর এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। এখন তিনি জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। ভারপ্রাপ্ত এই জন্য যে আসল চেয়ারম্যান এখন জেলে। খালেদা তাঁকে জেলে ভরে রেখেছেন। নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী আন্দোলনে জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা কমে গেছে, তাই জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য মিজান চৌধুরী ইসলামী দলের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

দেশ ও ঈমানবিরোধী চক্রান্ত রুখতে আজকের সংগ্রামী মিছিলে শরিক হোন।

ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা গঠনের লক্ষে গঠিত সমন্বয় কমিটির আহবায়ক মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, সমন্বয় কমিটির আহবায়ক মুফতী ফজলুল হক আমিনী আজ ১২ই জুন সকাল দশটায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে দেশবাসীকে সমবেত হয়ে দেশ ও ঈমানবিরোধী অপতৎপরতা রুখতে সংগ্রামী মিছিলে শরিক হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, আমরা জনতার মিছিল নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবো এবং মুরতাদ তসলিমা নাসরিনগংদের ফাঁসি, জনকণ্ঠ নিষিদ্ধকরণ এবং ধর্মদ্রোহিতার জন্য মৃত্যুদন্ডের আইন প্রণয়নের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করব। এই নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়েই আমরা সেই সব হায়েনাচক্রের দাফন প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে যাবো, যারা একটি সরল, ধর্মপ্রাণ ও আত্মমর্যাদাবান জাতিকে বারবার বোকা মনে করে রক্তাক্ত করে চলেছে। এই চক্রের দুঃসাহস আজ সীমাহীন স্পর্ধার রূপ ধারণ করেছে। এরা মুক্তবুদ্ধি, প্রগতিশীলতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবতার জিগির তুলে অব্যাহতভাবে ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে সব রকম অস্ত্র প্রয়োগ করে যাচ্ছে। এই হায়েনাচক্র এখন জাতির মুখোমুখি দাঁড়াতে চাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে শহর বন্দর, গ্রাম পর্যায়ের সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ । এদের মৃত্যু সুনিশ্চিত করার জন্য ১২ জুনের স্মারকলিপি প্রদানের শোভাযাত্রায় শরিক হওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।

তসলিমার ফাঁসির দাবিতে বরিশালে স্মরণকালের বৃহত্তম মিছিল।

ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তুলন।

তসলিমার ফাঁসি ও জনকণ্ঠ নিষিদ্ধের দাবিতে সভা সমাবেশ অব্যাহত।

নাস্তিক মুরতাদের পক্ষে বিবৃতির পরিণাম ভয়াবহ হবে।

নাস্তিক মুরতাদদের ফাঁসির দাবিতে তৌহিদী জনতা রাজপথে।

মুরতাদ তসলিমার জন্য আনন্দবাজার গোষ্ঠী অস্থির হয়ে পড়েছে। মুরতাদ মহিলা তসলিমার জন্য ভারতের আনন্দবাজার গোষ্ঠী বড় বেচায়েন হয়ে পড়েছে। তারা জানিয়েছে, তসলিমা তাদের আত্মার আত্মীয়। আনন্দবাজারীদের এমন আপনজন বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা, ধিককার ও অবমাননাকর বিষাক্ত শেলে যেভাবে জর্জরিত হচ্ছে, তাতে তারাও অস্থির হয়ে পড়েছে। কারণ, এ শেল যে তাদের উপরও আঘাত হানছে, তসলিমার মত এমন ভ্রষ্টা নারীকেই তাদের প্রয়োজন যে ভ্রষ্টা হতেই গৌরব বোধ করে, যে নীতি-নৈতিকতার তোয়াককা করে না, যে দেশের স্বাধীনতাকে আনন্দবাজারীদের হাতে তুলে দিতে চায় এবং দেশের সার্বভৌম স্বাধীন সীমানাকে মুছে দিয়ে ভারতের সাথে এককার হয়ে যেতে চায়। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের মানসম্ভ্রম, ঐতিহ্য গৌরবকে ধুলায় ভূলণ্ঠিত করতে সহায়তা করতে পারে, এমন মুসলিম নামধারী কোনও পা চাটা কুলাঙ্গারকেই আনন্দবাজারীদের প্রয়োজন। এমন প্রয়োজনের ভ্রষ্টা নারী বাংলাদেশে অসুবিধার মধ্যে আছে, আনন্দবাজারীরা তা সইবে কেমনে! তারা অস্থির হয়ে উঠেছে, তসলিমা নামের কুলাঙ্গারকে উদ্ধার করার জন্য। তাদের উদ্বেগ যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশে তসলিমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় ইতোমধ্যে ভারতের উগ্র হিন্দু সংগঠন বিজেপি, যুবকংগ্রেস এবং নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। আনন্দবাজার গোষ্ঠী এতেও তৃপ্ত হতে পারছে না। যেন তাদের তর সইছে না। তারা চাইছে গোটা ভারতে ঝড় উঠুক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আনন্দবাজারীরা তাই বিভিন্নভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকারসহ ভারতের বিভিন্ন সংগঠনকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেওয়ার মত ঘৃণ্য কাজে মেতে উঠেছে। আনন্দবাজার লিখেছে, দুনিয়ার কোথাও পান থেকে চুন খসলেই প্রতিবাদে সরব হতে যাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না, সেই বামপন্থীদের পড়শি দেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ওপরে রাষ্ট্রযন্ত্রের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ব্যাপারে প্রাথমিক জড়তা কাটতেই বেলা বয়ে গেল। আনন্দবাজার পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার এবং কংগ্রেসকে এই মর্মে অভিযুক্ত করেছে যে তাদের ভোট নষ্ট হওয়ার ভয়েই তারা তসলিমার ব্যাপারে চুপ থাকছে। যারা প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসতে বিলম্ব করছে, আনন্দবাজার শক্ত ভাষায় তাদের আক্রমণ করছে। তবে দিল্লিতে সিপিএমএর মহিলা সংগঠন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বাংলাদেশের হাই কমিশনারের কাছে তসলিমার পক্ষে যে স্মারকলিপি দিয়েছে, তারা তাতে যেন তসলিমার জন্য কিছু করার পথে আশা দেখতে পেয়েছে। আনন্দবাজারীরা আরও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে এই দেখে যে, বাংলাদেশের ভেতরের গুটিকয়েক মুরতাদ তসলিমার অপকর্মকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে। আনন্দবাজার এখন এটাকে ঢালাওভাবে প্রচার করছে যে তসলিমার পক্ষেও এখন ঢাকা সরব। আনন্দবাজার লিখেছে, আজ একেবারে প্রকাশ্যেই তসলিমার সমর্থনে সরব হয়েছে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রী পার্টির মত দল।

আত্মার আত্মীয় তসলিমার জন্য অস্থির আনন্দবাজার গোষ্ঠী ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন সংগঠন তসলিমার পক্ষে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে না কেন, সে জন্য যেমন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, বাংলাদেশের গুটিকয়েক বিপথগামী তসলিমার পক্ষে কথা বলায় তেমনি আবার পুলকিত।

ইনকিলাবের লোকেরা ভারত বিরোধী হলেও ভারতে কোথাও আমার নিন্দা করা হলে সেটিকে লুফে নিয়ে পুনঃপ্রকাশ করে। ভারতীয় হিন্দু সোমক দাসকে রীতিমত সম্মান করছে ইনকিলাব গোষ্ঠী। রবিবারের প্রতিদিনএ প্রকাশিত সোমক দাসের *তসলিমা নাসরিনের নারীবাদ ও লেখক সত্তা* ইনকিলাবে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে। ডড-তসলিমা নাসরিনের হাতে দুটো তাস, যৌনতা ও ইসলাম। এই তাস দুটিকেই নানাভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছেন তিনি একের পর এক রচনায়, আলোচনায় ও সাক্ষাৎকারে। তাঁর নারীবাদে নারী স্বাধীনতার প্রশ্ন যৌন স্বেচ্ছাচারে পর্যবসিত। আসলে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের ব্যাখ্যা। লেখক হিসেবেই তিনি কতখানি বিষয় ও ভাষা সচেতন? এই প্রশ্ন তিনি নিজেই করেছেন এবং নিজে যা উত্তর দিয়েছেন তা ইনকিলাব গোষ্ঠীর খুব পছন্দ হয়েছে।

আমাকে এখনও গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন, এ নিয়ে এখন অনেকের সন্দেহ। সরকার কি ইচ্ছে করেই আমাকে গ্রেফতার করছে না! সত্যসন্ধ তাঁর নিয়মিত কলামে লিখেছেন, তসলিমা নাসরিন সরকারের দৃষ্টিতে আছেন বহুদিন থেকেই। সরকারি চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও সে পরিচয় গোপন করে বিদেশে যাবার সময় তাঁকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাধা দেয়া হয়েছিল এবং সেই সুবাদে তার পাসপোর্ট বহুদিন আটক ছিল। অতি সম্প্রতি বিদেশ সফরকালে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও এ দেশের গণমানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করার কারণে সারাদেশে তার বিচারের দাবিতে জনমত ফুঁসে উঠেছে। এ প্রেক্ষিতেই তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। কিন্তু গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে আজও গ্রেফতার করতে সম্ভব হয়নি। এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী উচ্চারণে যার রচনাবলী কন্টকিত, যার অবৈধ বহির্গমন প্রয়াসের কারণে পাসপোর্ট আটক হতে পারে এবং যিনি বিদেশে গিয়ে এ দেশের আইন ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে বক্তব্য দেবার স্পর্ধা রাখেন, যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের গভীর সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, তার গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশ খোঁজ রাখে না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? তা হলে পুলিশ বা স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রয়োজনটা কোথায়? আমরা নিশ্চয়ই গোটা পুলিশ বিভাগের কথা বলছি না। আমাদের আইন শৃঙ্খলা সংস্থার অধিকাংশ সদস্য কর্তব্যপরায়ণ না হলে দেশ এতদিন নিশ্চয়ই মনুষ্যবাসযোগ্য থাকত না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ সৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ। আমরা জানি যে তসলিমা নাসরিনের মত বির্তকিত ব্যক্তিদের গতিবিধি সম্পর্কে কড়া নজর রাখা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব এবং আমরা বিশ্বাস করি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পূর্বেও এ দায়িত্ব যথারীতি পালিতই হয়ে থাকবে। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর পরই তসলিমা নাসরিন উধাও হয়ে যাবার সুযোগ পেলেন কাদের প্রশ্রয় বা সহযোগিতায়। তাই বলি,বাংলাদেশে বুঝি সরকারের মধ্যেও আরেক অদৃশ্য শক্তি আছে যার কাজ নিয়মতান্ত্রিক সরকারের সব নীতি ও কর্মকাণ্ডকে নস্যাৎ করে দেওয়া।

সরকার ব্যর্থ হলে জনগণই মুরতাদদের বিষদাঁত ভেঙে দেবেভচট্টগ্রামে জামাতে ইসলামির সভায় বলা হয়েছে। সরকার ধর্মদ্রোহী তসলিমা নাসরিন, আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী গংদের শাস্তিদানে ব্যর্থ হলে দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণই ঐক্যবদ্ধভাবে এসব ধর্মদ্রোহীদের বিষদাঁত ভেঙে দেবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনঃজাগরণ ঠেকানো এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত উপমহাদেশে একটি রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেস্ট কেস হিসেবে এ দেশীয় এজেন্টদের দিয়ে এসব ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ঈমান আকিদায় আঘান হেনে পরীক্ষা করছে কতটুকু প্রতিবাদ আসে। অপরদিকে সরকার এসব ষড়যন্ত্রে মদদ যোগাচ্ছে। তসলিমাকে গ্রেফতার করতে না পারা জনগণকে ব্ল্যাকমেইল করা ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর আসমানী কিতাব পবিত্র কোরান সম্পর্কে তসলিমার ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও ধিককার জানিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রের অন্যতম সদস্য তসলিমার প্রকাশ্য ফাঁসির ব্যবস্থা করা আর ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি বিল পাস করার দাবি জানানো

হয়। পবিত্র কোরানের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের দাবি করে এবং ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করার মত অপরাধ করে কুখ্যাত লেখিকা তসলিমার আর আল্লাহর এই জমিনে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। সরকার আজ তসলিমাকে বাঁচানোর জন্য ফন্দি ফিকিরে রয়েছে, না হলে তাকে গ্রেফতার করা সরকারের জন্য এত কঠিন হয়ে দাঁড়াতো না।

রাজশাহীতে জামাতে ইসলামীর বিশাল বিক্ষোভ মিছিল শেষে সভায় বলা হয়েছে, নাস্তিক মুরতাদদের স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামের জাগরণের জোয়ার দেখে সাম্রাজ্যবাদীরা ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তাদের বেতনভোগী দালাল তসলিমাসহ কতিপয় বিকৃত মানসিকতার লেখক লেখিকা আল্লাহ রসুল ও কোরান হাদিস নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলছে। সরকার যদি তাদের রহস্যজনক নীরবতা ভেঙে মুরতাদদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আপামর জনগণ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

আমার পক্ষে বুদ্ধিজীবীরা বিবৃতি দিয়েছেন, তার সমালোচনা করে জামাতে ইসলামি দলের পত্রিকায় আজকের সম্পাদকীয়, ধর্মদ্রোহী রাহুর গ্রাস।

.. .. কয়েকজন আঙুলে গোনা চিহ্নিত বুদ্ধিজীবী ও কবি বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে উৎখাতের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা শুরু করেছেন। যখনই তারা নিজেরাই দলবদ্ধভাবে প্রগতির নামে কিছু করেন তখন যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রকাশ্যে আহত করার একটা চেষ্টা থাকে। তেমনি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত কোনও ব্যক্তিবিশেষ তার কোনও রচনায় কিংবা বক্তৃতা বিবৃতিতে যখন ইসলামি চেতনার ওপর আঘাত হানেন তখন আহত মুসলমানগণের প্রতিক্রিয়াকে বিপথে চালিত করার জন্য ঐ কয়েকজন মাত্র ব্যক্তি নানা বক্তৃতা বিবৃতি প্রচার করে ইসলামকে আঘাতকারী অন্যায়ের পক্ষপাত শুরু করেন। তাদের ধারণা ইসলাম, পবিত্র কুরআন এবং নবী রসুলকে আক্রমণ করে কিংবা আঘাত করে কিছু রচনা করা বা বলাটা হল তাদের প্রগতিশীল অধিকার। আর ধর্মের পক্ষে দাঁড়ানোটা প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ। কেউ ইসলামের পক্ষে দাঁড়ালে সেটা মহা অপরাধ। কারণ ধর্মটা হল তাদের দৃষ্টিতে ধাপ্পাবাজি।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা প্রচার করতে চান গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরূপে। ফলে তসলিমা নাসরিনের মত দেশ ও ধর্মদ্রোহিনীর পবিত্র কুরআন অবমাননাকেও তারা অত্যন্ত সাহসের সাথে সমর্থন করেন। তার অন্যায়ের সাফাই গাইতে এগিয়ে আসেন। তসলিমা যখন পবিত্র কুরআনের শুদ্ধির পরামর্শ দিয়ে বিদেশি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেন কিংবা দেশের সার্বভৌম সীমানা তুলে দিয়ে ভারতের সাথে মিশে যেতে বলেন তখন তার ঐসব মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাদী মুরুব্বীরা আড়ালে আবডালে বাহবা দিয়ে বেড়াতে থাকেন। যখন এরই প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশের আধ্যাত্মিক চেতনা সহসা প্রচন্ড আঘাতে গুমড়ে ওঠে, পথে পথে ক্ষিপ্ত জনগণের মিছিল বেরিয়ে আসে এবং ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ক্ষমতাসীন সরকার তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার করা হবে বলে তাকে আত্মগোপনের সুযোগ করে দিয়ে মজা দেখতে থাকেন, তখন ঐসব প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা তাদের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমাগত বিবৃতিতে সই করতে থাকেন, তসলিমার গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সরকার

মৌলবাদীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তসলিমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। সরকারের উচিত এক্ষুনি তা তুলে নেওয়া ইত্যাদি। বিবৃতিতে সচরাচর যাদের স্বাক্ষর দেখে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেই কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমান, খান সারওয়ার মুরশিদ, ফয়েজ আহমেদ ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর স্বাক্ষর থাকবেই। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিটি আঘাতকারী বিষয়ে কেন এরাই বার বার বিবৃতির স্বাক্ষরদাতা হন? এ দেশে এগারো কোটি মুসলমানের ইসলামের প্রতি আগ্রহ কি তবে তাদের ধারণায় কোনও মৌলিক অধিকারের আওতায় পড়ে না? কেবল তসলিমা নাসরিনের ইসলাম ও পবিত্র কুরআন অবমাননার অধিকারটাই মৌলিক নাগরিক অধিকার? তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনাশকারী গ্রন্থ লজ্জা নিয়ে যখন ভারতে দাঙ্গা বাঁধে এবং সেখানকার মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা জুলুম এবং অগ্নিসংযোগের মধ্যে ফেলা হয়, মুসলিম মেয়েদের নির্বিচারে ধর্ষণ করা হয় তখন কবীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমেদ, খান সারওয়ার মুরশিদ এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীরা কোথায় থাকেন?

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্বেষ প্রচার এ দেশের মানুষ এতদিন দমবন্ধ করে কেবল মৌলিক নাগরিক অধিকারের কথা ভেবেই কিনা জানি না, সহ্য করে এসেছে। এতে এটা ভাবা কারও উচিত নয় যে এগারো কোটি মুসলমান তাদের পবিত্র কুরআনকে বদলে ফেলার কথাও হজম করার পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন যা খুশী তাই বলা যায় এবং কেউ বললে বিবৃতি দিয়ে সমর্থনও করা যায়। হ্যাঁ, বর্তমান সরকারের আমলে আপাত দৃষ্টিতে এটাই প্রতীয়মান হয় বটে। কিন্তু আমরা সরকারকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানিয়ে দিতে চাই এটা সত্য নয়। বর্তমান সরকারের সাধ্য না থাকলেও এ দেশের এগারো কোটি মুসলিম নর নারীর সাধ্য আছে তাদের পবিত্র ধর্মকে নাস্তিক্যবাদী শয়তানের গোটা কয়েক সন্তানের বিদ্রূপ এবং অবহেলা থেকে বাঁচাবার।

কেবল বিবৃতি দিয়ে মৌলবাদী শক্তিকে ঠেকানো যাবে না, পথে নেমেছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। গতকাল বিকেল চারটায় নির্মূল কমিটির সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী পরাজিত শক্তি যে উদ্দেশ্যে একাত্তরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল সেই একই উদ্দেশ্যে আজ তারা আমাদের মুক্তবুদ্ধির সংবাদপত্রগুলোর ওপর হামলা করছে। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি তারাই পরাজিত শত্রুকে মাথা তুলতে দিয়েছি। এই শক্তি এখন দেশটাকে পাকিস্তান বানাতে চায়, পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত বদল করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে জেহাদে নামতে হবে। সমাবেশে জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের ওপর থেকে মামলা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা তুলে নেবার জোর দাবি জানানো হয়। ডঃ কামাল হোসেন গতকাল বরিশালের অশ্বিনী কুমার টাউন হলে গণফোরাম আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেছেন, বলেছেন, ধর্মের নামে যারা বিভিন্ন ব্যক্তির ফাঁসি চায় তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন। বর্তমান সংসদ কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এ সংসদ দেশে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে পারেনি। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল, সবাই ব্যর্থ। বহু

ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাকে রক্ষা করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব। দেশে ইসলাম বিপন্ন হয়নি। ধর্ম ব্যবসায়ীরা ইসলামকে বিপন্ন করেছে। আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা শ্বেতাঙ্গদের সাথে আলোচনায় বসতে পারেন। আরাফাত ইজরাইলের সাথে আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু আমাদের দুই নেত্রী দেশের উন্নয়নের জন্য আলোচনায় বসতে পারেন না। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে এখনও পৃথক করা হয়নি। .. সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার ও সাংবাদিকদের হয়রানি করছে। জনগণকে উপেক্ষা করে দেশ চালাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাথার মূল্য ধার্য করার প্রতিবাদ করেছে সেই সাজু, সেই জাহেদা, সেই লাভলী এবং তাদের দল। এছাড়া আজকের পত্রিকায় আমার মাথা নিয়ে আর কারও মাথা ব্যথা দেখা যায়নি। তবে মাথা নিয়ে বিবিসি একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে। খবরটি এভাবে বেরিয়েছে। খুলনায় মৌলবাদীদের একটি জনসভায় লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে হত্যার জন্য ১ লাখ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রসচিব আজিমউদ্দিন আহমেদ গতকাল শনিবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যে মাওলানা ওই ঘোষণা দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি ঠিক কি বলেছিলেন এবং খুলনাতে ঠিক কি ঘটেছিল সরকার তা জানার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, এটা যদি সত্যি হয় তাহলে যার বিরুদ্ধে এই কথা বলা হয়েছে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। তসলিমা এখন আত্মগোপন করে আছেন এমন অবস্থায় তিনি কি করে নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ করবেন? সচিব বলেন, তসলিমার উচিত সরকারের কাছে অথবা আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করা। মৌলবাদীরা সংবাদপত্রের ওপর আর তসলিমার বাড়িতে হামলা করেছে, এতে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি কোনও তদন্ত করছে? এটা একটা সাধারণ অপরাধ নয়, এটা কোনও সাধারণ ভাঙচুর বা গুন্ডামির অপরাধ নয়। এটা অন্য কিছু। কিন্তু কেউ যদি কোনও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে, অন্য কাউকে আহত করে, অথবা অন্য যে কোনও কাজ করে যা আইনের চোখে অপরাধ তাহলে ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে। এটুকু সংবাদ দেওয়ার পর বিবিসির সাংবাদিক জানান, আমি তাঁকে বাংলায় সাক্ষাৎকার দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, জবাবে তিনি জানান, তাঁর মাতৃভাষা বাংলা নয়, তাঁর মাতৃভাষা উর্দু।

আজ সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল কোনও খবর নেই ক বা ঙর। আমার যে যাবার কথা ছিল হাইকোর্টে! কেন আজকের এই যাওয়া বাদ দিতে হল, কিছুই আমি বুঝতে পারি না। চ আমাকে সঙ্গে নিয়ে রাতের খাবার খেলেন। খাওয়ায় রুচি নেই আমার, অল্প কিছু খেয়ে উঠে পড়ি। চ যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ব্যস্ত থাকেন তাঁর কন্যা নিয়ে। আজ রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি আমার কাছে এসে বসলেন কিছুক্ষণের জন্য। কিছু পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে বললেন যে আজ আপিসে এক মহিলার সঙ্গে আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, মহিলাই তুলেছিল প্রসঙ্গ,বলল লজ্জা একটা বাজে বই, লজ্জা বইটি লিখে আমি খুব ভুল করেছি। আমি চুপ হয়ে থাকি, মনে মনে ভাবি চ নিশ্চয়ই ওই মহিলার মতের সঙ্গে একমত হননি। কিন্তু চ এরপরেই বললেন,

আপনার সব বইই আমি পড়েছি, লজ্জাটা আমারও ভাল লাগেনি। খুব একপেশে লেখা।

একপেশে?

হ্যাঁ একপেশে। অনেক কিছু তো সত্য নয়। এ দেশে হিন্দু পলিটিশিয়ান আছে, হিন্দু আর্টিস্ট আছে, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হিন্দু আছে, হিন্দু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আছে, হিন্দু সাইন্টিস্ট আছে। লজ্জায় তো এদের কথা লেখেননি। কত বড় বড় মুভমেন্ট হল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, এসব কিছুই লেখা নেই লজ্জায়।

আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি। মাথা নিচু করে বুকের ধুকপুক শব্দ শুনতে থাকি। চর মুখের দিকে ভয়ে তাকাই না। যদি চ এখন ঘ এর মত বলেন যে এ বাড়িতে আমার আর থাকা হচ্ছে না!

তেরো জুন, সোমবার

গভীর রাতে ক আর খ এসে আমাকে একটি গাড়ির পেছনে শুইয়ে নিয়ে গেলেন একটি দেয়ালঘেরা মাঠ অলা বাড়িতে। বাড়ির ভেতর বৈঠকঘরে বড় এক সোফা জুড়ে বসেছিলেন একজন রাশভারী মহিলা। আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন। এটি এমন এক দৃষ্টি যে দেখলে গা ছমছম করে। আমাকে বসতে বললেন গমগমে গলায়। গা ছমছম করলেও তিনিই আমার রক্ষক। তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছেন। জীবনে অনেক মেয়ের উপকার করেছেন তিনি, আমারও করছেন। আসলে চর বাড়ি ছাড়ার কারণটি হল, ক যা বলেছেন, যে, এক বাড়িতে বেশিদিন থাকা ঠিক নয়। আত্মগোপনেরও পদ্ধতি আছে, আমার জানা ছিল না এতসব। এক জায়গায়, জায়গাটি নিরাপদ হলেও, দীর্ঘদিন থাকা চলবে না, স্থান বদল করতে হবে ঘন ঘন। আমার ধারণা, ক যদি আমার জন্য আশ্রয়ের জায়গা পেতেন, তবে তিনি প্রতিরাতেই আমাকে বেড়ালের মা যেমন তার ছানাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়, তেমন নিতেন। একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি আমাকে যখন এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, ক তখন কাউকে বলেন না কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। চ কে বলেননি যে ছ এর বাড়িতে যাচ্ছেন, ছ কেও বলেননি যে চ এর বাড়ি থেকে আমাকে আনা হল। ক এমনকী আমাকেও বলেন না কোথায় যাচ্ছেন। কোথাও পৌঁছে টের পেতে হয় কোথায় এসেছি। ছর বাড়িতে তুলে ছকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, ইনি ছ, ইনি বহুকাল থেকে নারী উন্নয়নের কাজে জড়িত। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হয় না। আমি ফেরারি আসামী। ফেরারি আসামীকে যে কেউ দেখলে চেনে।

কর কাছে জামিনের ব্যাপারে উকিল তাঁকে কিছু বলেছেন কি না জানতে চাই। ক আমাকে যা বললেন তা হল আমার উকিল শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন, কারণ গতকাল আদালতে যে বিচারক বসেছিলেন, তিনি ঘোর মৌলবাদী লোক। ওই বিচারক যে জামিন দেবে না, এ নিশ্চিত। যে কোনও বিচারকের সামনে আদালতে আমার জামিনের জন্য আমার উকিল চাইছেন না আবেদন করতে। ব্যাপারটি আমার

জীবন মরণের ব্যাপার। কোনও বিচারকের ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে তিনি জামিন দিতে পারেন বা দেবেন তবেই আমাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আদালতে হাজির করার কথা বিবেচনা করা যায়। এ সময় আরেকটি ব্যাপারে ডঃ কামাল হোসেন চেষ্টা করছেন, তা হল আমার অনুপস্থিতিতে জামিন নেওয়া। এটি যদি হতে পারে, খানিকটা দেরি হলেও, ভাল। আততায়ীর গুলিতে আদালতে নিহত হবার ঝুঁকিটি তবে থাকে না। নিম্ন আদালত ইতিমধ্যে জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে, এখন ভরসা উচ্চ আদালতই। জামিন দেওয়া হবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে তিনি এগোতে চাইছেন না। আমার বাড়ির কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয়েছে কি না জানতে চাইলে ক বললেন, উকিলের আপিসে ছোটদা আর দাদার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। ক মিলনের কথা জিজ্ঞেস করে জানলেন যে মিলন এখনও বাড়ি ফেরেনি। দাদা আর ছোটদাকে কিছুক্ষণের জন্য মাত্র দেখেছেন ক, এটুকু শুনে আমার স্বস্তি হয়ডড যেন ক নয়, আমিই ওঁদের দেখেছি। দাদা এখন তবে ঢাকায়! যে লোক ময়মনসিংহ ছেড়ে কোথাও যেতে চাননা, তিনি এখন ঢাকায় আমার উকিলের আপিসে বসে আছেন! আমি অনুমান করতে পারি, আমার পরিবারের কারও জীবন আর আগের মত নেই। জীবন পাল্টে গেছে সবার।

ছ যে ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছেন, তা এ পর্যন্ত যত ঘরে থেকেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল। পুরু গদির বিছানা, মাথার ওপর পাখা। বিছানার পাশে টেবিল, টেবিলে টেবিলল্যাম্প। দোযখ থেকে বেহেস্তে গেলে যেমন আনন্দ হয়, ঠিক তেমন না হলেও কাছাকাছি ধরনের একরকম আনন্দ আমার হয়। বেহেস্ত বাস অনিশ্চিত বলেই বোধহয় আমার আনন্দ হলেও আনন্দ তেমন তীব্র হয় না। বেহেস্তে আমার আয়েশের জন্য বিছানা পাতা। বিছানায় পরিষ্কার চাদর। আপাতত সুনিদ্রা যাও তসলিমা, মনে মনে নিজেকে বলি। আসলে আজকাল আমি লক্ষ্য করেছি নিজেকে অনেক সময় তসলিমা বলে আমার মনে হয় না। আগের তসলিমা আর এই তসলিমাকে আমি মেলাতে পারি না। আমি তসলিমার মত দেখতেই শুধু, আর কিছু মিল দুজনের মধ্যে নেই। সেই সাহসী মেয়েটির ফাঁসি হয়ে গেছে, এখন ধুকধুক আত্মা নিয়ে বেঁচে আছে একটি ভীতু, ভীরু, ত্রস্ত, শঙ্কিত একটি নির্জীব মেয়েমানুষ, ঘোমটা মাথার মেয়ে, নত চোখের মেয়ে, গলা শুকিয়ে আসা, জিভ শুকিয়ে আসা, স্বর বুজে আসা, একটি কাতর করুণ মেয়ে। নিজের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় এই আমাকে হাতের কাছে পেলে মোল্লাদেরও মায়া হবে মাথাটি কেটে নিতে।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে আজকের পত্রিকাগুলো পড়ি রাতে। সুনিদ্রা কোথায় কখন পালিয়ে গেছে আমাকে একা রেখে, টের পাইনি। মিছিলের ছবির দিকে তাকালেই গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, টুপির সংখ্যা বাড়ছে, কালো মাথার সংখ্যাও বাড়ছে। কালো মাথা যখন সাদা মাথার সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়ায়, সেটি শুভ লক্ষণ নয়। এবারের ব্যানার

তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি, ব্লাসফেমি এক্ট প্রবর্তন, এবং
দৈনিক জনকণ্ঠ নিষিদ্ধের দাবিতে
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বা দক্ষিণ গেটে প্রথম জনসমাবেশ ঘটে, মঞ্চে বড় বড় নেতা বক্তৃতা করেন, এরপর মিছিল বেরোয় শহরের বড় বড় রাস্তায়। একটি জিনিস লক্ষ করি, বক্তৃতায় আগের চেয়ে তাপ বেশি, তেজ বেশি। লোকসংখ্যা বাড়লে মনের জোর বাড়ে, মনের জোর বাড়লে মন ক্রমে শক্ত হতে থাকে। যে যত বেশি শক্ত কথা বলতে পারে, সে তত বেশি হাততালি পায়। বিরাট সমাবেশে নেতারা বলেছেন, কুখ্যাত তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি কার্যকর ও জনকন্ঠসহ ধর্মদ্রোহী পত্রিকাগুলো নিষিদ্ধ করতে সরকার যদি ব্যর্থ হয় তবে আগামী নির্বাচনে এই সরকার আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। জনগণের ঈমানী রোষে সরকার, তসলিমা ও জনকণ্ঠের সমর্থকদের কোনও ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্মদ্রোহী তসলিমাগংদের যারাই সাফাই গাইবে তাদেরও ফাঁসি দিতে হবে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও দ্বীনদার মুসলমানরা ধর্মদ্রোহীদের যে কোনও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে বদ্ধ পরিকর। যে সমস্ত নেতা নেত্রী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তসলিমা নাসরিন ও জনকণ্ঠের সাফাই গাইছে তারা ইহুদি ও ভারতীয় দালাল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় যে সব নেতা নেত্রী কোনও প্রতিবাদ ব্যক্ত করেনি তারা এখন ইসলাম বিরোধী জনকণ্ঠের পক্ষে বিবৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ধর্মদ্রোহী ও রএর এজেন্ট জনকণ্ঠের পক্ষে বিবৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা নিজের মর্যাদা নষ্ট করেছেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী যদি তৌহিদী জনতার সমর্থন চান, তাহলে তাঁকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এখন কথা বলার সময় শেষ, এখন ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমে পড়ার সময়। এটা মহরমের মাস, এই মাস বিপ্লবের মাস, এই মাস থেকে আমরা ইসলামি বিপ্লব শুরু করলাম। আমরা জ্বালাও পোড়াও চাই না। কিন্তু আমাদের জ্বালালে আমরাও তাদের জ্বালিয়ে ছাড়ব। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই দেশ দখল করতে পারবে না। ইনশাল্লাহ আমরা দিল্লির মসনদে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করব। চিহ্নিত একদল নাস্তিক অখন্ড ভারতের বুলি আওড়িয়ে দেশে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনকে উস্কানি দিচ্ছে, তাদের শেকড় উপড়ে ফেলা হবে। তসলিমা নাসরিনের ফাঁসির দাবি যদি সরকার বাস্তবায়ন না করে তবে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও ফাঁসির দাবি জনগণ বাস্তবায়ন করে ছাড়বে ইনশাল্লাহ। সভায় সকল বক্তাই এই ফাঁসির দাবিতে ৩০ জুন দেশব্যাপী হরতাল পালনের জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। ৬ দফা দাবির স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পেশ করে ইসলামি মোর্চা, তা হল, ১. তসলিমা নাসরিনসহ ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও ফাঁসি, ২. জনকণ্ঠ ও আজকের কাগজ সহ সকল ধর্মদ্রোহী পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা, ৩. ব্লাসফেমি এক্ট প্রবর্তন, ৪. এনজিওসমূহের অপতৎপরতা বন্ধ, ৫. রেডিওটিভিসহ সকল প্রচার মাধ্যমে ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচারণা বন্ধ, ৬. কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা।

জনকণ্ঠের সঙ্গে এখন আজকের কাগজ যোগ হল। পত্র পত্রিকার সঙ্গে যোগ হল রেডিও টেলিভিশন। আমার ধারণা দিন দিন ওরা আরও অনেক কিছু যোগ করবে। এখন তাদের মুঠোর মধ্যে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি।

আরও খবর, নারী জাতির কলঙ্ক কুখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার করে বিশেষ ট্রাইবুন্যালে বিচার ও জনকণ্ঠের ডিক্লারেশন বাতিল এবং ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের দাবিতে চট্টগ্রামে ঢাকার মত বিরামহীন সভা চলছে, মিছিল চলছে। নতুন আরও সংগঠন যোগ দিচ্ছে আন্দোলনে, আল্লামা তৈয়বিয়া সোসাইটি, কুতুবদিয়া ফাউণ্ডেশন , আলআমীন জামে মসজিদ পরিচালক কমিটি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ফর সোসাল ওয়েলফেয়ার। কেবল চট্টগ্রাম আর ঢাকায় নয়, সারা দেশেই এই হচ্ছে। জাতীয় সংগঠন বুঝি আর একটিও বাকি নেই, বাংলাদেশ মজলিসে হেফাজতে ইসলাম, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, বাংলাদেশ জমিয়াতুল আনসার, মুসলিম সাহিত্য পরিষদ, মাদ্রাসাই উলুমে দ্বীনিয়া ও এতিমখানা, জাতীয়াবাদী ওলামা দল, দেশীয় চিকিৎসক ও ক্যানভাসার কল্যাণ সমিতি। আমার একটি ধারণা হয়, আন্দোলন জোরদার হচ্ছে বলে অনেকে তড়িঘড়ি কিছু সংগঠনও দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। আমার আরও একটি ধারণা, কোনও আন্দোলন যদি বলিষ্ঠ হয়, তবে লোকে উৎসাহ পায় সেই আন্দোলনে যোগ দিতে। এমন নয় যে মৌলবাদীরাই কেবল সংগঠিত হচ্ছে, অনেক অমৌলবাদী কেবল ইসলাম ধ্বসে যাচ্ছে আশংকা করে সংগঠিত হচ্ছে। এটিই মারাত্মক।

৩০ তারিখে হরতাল সফল করার জন্য টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ জেগে উঠেছে। জামাতে ইসলামী ১৭ই জুন দাবি দিবস পালন করার ঘোষণা দিয়েছে। ফ্রীডম পার্টি আর যুব কমাণ্ড মৌলবাদী দলের দাবি সমর্থন করে ইসলামী মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেদের রাজনৈতিক বক্তৃতা করে যাচ্ছে। এই দলের মূল শত্রু আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করে বলে যাচ্ছে, ভারতীয় দালালচক্র পুনরায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, শেখ হাসিনা ধর্মবিদ্বেষী তসলিমার পক্ষ সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। জামাতে ইসলামী ফ্রীডম পার্টির সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়াচ্ছে। জামাতে ইসলামী বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দু দলেরই যদিও সমালোচনা করছে, কিন্তু জামাতের নেতারা জানে আগামী নির্বাচনে দুই বড় দলের একটির সঙ্গে তাদের দলকে মেলাতে হবে। শেখ হাসিনা এখন মৌলবাদী দলের খুব বিপক্ষে যাবার চিন্তা করছেন না, কারণ আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে হারাতে হলে তাঁর দরকার জামাতে ইসলামির সহযোগিতা। এই মৌলবাদী উত্থানে আশ্চর্যভাবে শেখ হাসিনা নীরব। ক্রমাগত দোষ দিয়ে যাচ্ছেন যাবতীয় কিছুর জন্য বিএনপিকে। কিন্তু জামাতে ইসলামী বা অন্য মৌলবাদী দলের বিরুদ্ধে রা শব্দ নেই। জামাতে ইসলামীর মত মূল্যবান এ মুহূর্তে আর কোনও রাজনৈতিক দল নেই। বিএনপিও চাইছে জামাতে ইসলামীকে হাতে রাখতে। শেখ হাসিনার জন্য এ একটি অস্বস্তিকর অবস্থা, বুঝতে পারি। এখন মৌলবাদীদের জাগরণ থামাতে তিনি যদি আন্দোলনে নামেন, তবে তাঁকে ধর্মবিরোধী হিসেবে দোষ দেওয়া

হবে। এই কাজটি তিনি করতে রাজি নন। কারণ মৌলবাদীর ভোট না জুটলেও তিনি দেশের পঁচাশি ভাগ মুসলমানের ভোট থেকে বঞ্চিত হতে চান না। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করার বিরুদ্ধে বললেও তসলিমার মামলার বিরুদ্ধে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। কারণ জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের গায়ে ধর্মহীনতার কালি তত নেই, যত আছে তসলিমার গায়ে। মূলত জনকণ্ঠের সাংবাদিকরা সকলেই আস্তিক, তাঁদের কেউ কখনও কোনওদিন দাবি করেননি যে তাঁরা ধর্মপ্রাণ মুসলমান নন। তসলিমার পক্ষে মুখ খুললে হাসিনার কোনও লাভও নেই, কারণ তসলিমার কোনও দল নেই, জনসমর্থন নেই।

গতকাল সংসদে তসলিমা নাসরিন প্রসঙ্গ উঠেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরীকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে যে আমার পাসপোর্ট আটক করা হয়েছিল এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। আমার অপকর্মের জন্য এই মামলা করার আগেও যে এই সরকার আমাকে কিছু শাস্তি দিয়েছে সে সম্পর্কে বলে তিনি প্রশ্নকারী সাংসদদের শান্ত করেন। এদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির ঢাকা মহানগরীর আহবায়ক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া উর্দুভাষী স্বরাষ্ট্র সচিবের অপসারণ দাবি করে বিবৃতি দিয়েছেন। বলেছেন, বাঙালিরা বুকের রক্ত দিয়ে লড়াই করে মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে অর্জন করেছে। স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের একজন সচিব হয়ে রাষ্ট্রীয় ভাষাকে অস্বীকার, হেয় প্রতিপন্ন, অবমাননা করে সচিব বলেছেন যে তাঁর মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দু, এতে প্রমাণ হয় যে তিনি এ দেশের নাগরিক নন। একজন বিদেশী নাগরিক, ভিন্নভাষী রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে ক্ষমতায় থাকতে পারে না।

ছোট খাটো ভুল ত্রুটি ধরে ছোট খাটো দল প্রতিবাদ করছে। কিন্তু মূল যে ইস্যু ইসলাম, সেটি নিয়ে কথা বলার সাহস কোনও দলেরই নেই। কেউ জোর বলতে পারছে না যে না আমরা ইসলামি শাসন চাই না, ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে আইন চাই না, তসলিমা ধর্মদ্রোহী হলেও তাঁর ফাঁসি আমরা চাই না। আমরা বাক স্বাধীনতায়, মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাস করি। যদি ধর্মের গীত গাওয়ার অধিকার থাকে মানুষের, ধর্মের সমালোচনা করারও অধিকার তেমন আছে।

আজকের আরেকটি খবর, মৃত্যুর হুমকি থেকে বাঁচার জন্য তসলিমার পরিবার আইনবিদদের সাথে আলোচনা করছেন।

মৃত্যুর হুমকি আমার পরিবারও পাচ্ছেন। আমার মৃত্যু হয় হোক, আমার কারণে কেন নিরপরাধ কিছু মানুষের মৃত্যু হবে! চোখে কি জল জমছে আমার। জমছে। দুফোঁটা জল পত্রিকায় *মৃত্যুর হুমকি* শব্দদুটোর ওপর টুপ করে পড়ে। *তসলিমার পরিবার* ডড এই শব্দদুটোয় আমি আলতো করে আঙুল রাখি। যেন স্পর্শ করছি আমার বাবাকে মাকে, স্পর্শ করছি দাদাদের, স্পর্শ করছি ইয়াসমিনকে, ভালবাসাকে। জীবনে আর হয়ত ওদের সঙ্গে দেখা হবে না আমার। তাই স্পর্শ করি। মা নিশ্চয়ই কাঁদছেন দিন রাত। বাবার চোখে তো জল কখনও দেখা যায় না, এ সময় তিনিও সম্ভবত কাঁদছেন। কাঁদছে ইয়াসমিন। বাড়িতে নিশ্চয়ই নাওয়া খাওয়া বন্ধ সবার। আমার কি হয় সেই ভয় তো আছেই, তার ওপর এখন নিজেদের কি হয়

তা নিয়েও আশঙ্কা। গভীর গম্ভীর আশঙ্কার সঙ্গে মানুষ কতদিন একটানা বাস করতে পারে!

চোখের জল কাগজে আরও পড়ে, যখন পড়ি কুমিল্লার ছোট একটি শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছোট একটি গ্রাম নাসিরনগর থেকে ছোট একটি মানুষ আজহারুল ইসলাম সরকারের লেখা ছোট একটি পত্রিকা সংবাদে ছোট একটি চিঠিঃসরকারের বোধগম্য হওয়া উচিত যে মোল্লাতন্ত্রের ফতোয়ায় সমগ্র দেশ আজ আক্রান্ত। সেই ফতোয়াবাজদের মদদে সরকার যদি তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার করেন তবে জাতির বিবেক কলঙ্কিত হবে। মুক্তচিন্তার স্বাধীনতায় কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাই এসব অপতৎপরতা বন্ধে এবং জননন্দিতা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানাচ্ছি।

চৌদ্দ জুন, মঙ্গলবার

সকালে আমার ঘরে ট্রেতে করে নাস্তা এল। রুটি তরকারি ডিম। ছ আমাকে এত সমাদর না করলেও পারতেন, কিন্তু ছ করেন। তিনি আমার নোংরা কাপড় ধুতে দেবার জন্য বলেন। ঘরের ভেতর ঘোমটায় মাথা ঢেকে বসে থাকার যুক্তি নেই, বলেন। ফাঁক ফোকর! নাহ ফাঁক ফোকর দিয়ে কেউ দেখতে পাবে না। কাজের লোক! কাজের লোকের সাহস হবে না কোনও কিছু রাষ্ট্র করা। তিনি নিজের কথা অনেকক্ষণ বললেন, ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়েননি। জীবনে অনেক বাধা এসেছে, সব বাধা অতিক্রম করেছেন নিজের একার মনোবল দিয়ে। শুনতে খুব ভাল লাগে সাহসী মেয়েদের কথা। আমি মন দিয়ে শুনি তিনি কেমন কেমন বাধার মুখোমুখি হয়েছেন, কেমন করেই বা ডিঙিয়ে এসেছেন। বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে, স্বামী অত্যাচার শুরু করলে স্বামীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, ডিগ্রি নিয়েছেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। কারও কোনও কুকথার পরোয়া করেননি। তিনি একটি নারী উন্নয়ন সংস্থা খুলেছেন, নিরক্ষর মেয়েদের জন্য এই সংস্থার ইশকুল আছে। সেলাইএর, বুননের কাজও দিয়েছেন বেকার মেয়েদের। বললেন, মেয়েদের জন্য কিছু করতে চাও তো তোমার যেতে হবে গ্রামে, গ্রামের মেয়েরা অসম্ভব পরিশ্রমী, ওরা শিক্ষিত হলে, স্বনির্ভর হলে দেশে কোনও সমস্যা থাকবে না। আমি সায় দিই ছর কথায়। এত বড় কাজ করার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। এখন তো বেঁচে থাকারই সুযোগ হচ্ছে না। লেখালেখি না করে গ্রামের মেয়েদের স্বনির্ভর করার কাজে সাহায্য করলে সত্যিকার কিছু করা হত, আমি বুঝি। নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হয়, বড় অপদার্থ মনে হয়।

ছ র পড়া শেষ হলে আজকের দুটো পত্রিকা ছ আমাকে পড়তে দেন। ৩০শে জুন হরতাল সফল করার আহবান জানানো হচ্ছে দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে। হরতালের কথা প্রথম তুলেছিল ইয়ং মুসলিম সোসাইটি, এরপর হরতালের প্রস্তাবটি খাচ্ছে

দেশের সব মৌলবাদী রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দল। দেশের সর্বত্র সভা মিছিল চলছে হরতাল সফল করার দাবিতে। মসজিদের নিরাপদ আঙিনা ছেড়ে মৌলবাদীরা এখন সভা করছে তাদের দাপট নেই এমন এলাকাতেও। ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় গতকালের সভায় মুফতী আমিনী বলেছেন, মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবার জন্য তসলিমা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। স্পীকারের কাছে লেখা আমার চিঠি সম্পর্কে বলেছেন যে আমি কোরান সংশোধনের কথা এখন অস্বীকার করছি, ভয়ে করছি। বলেছেন, সামান্য অপরাধের কারণে সরকার যদি আসামীদের গ্রেফতার করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে, তবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্রতম গ্রন্থ সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করার অপরাধে তসলিমাকে গ্রেফতারে পুরস্কার ঘোষণার বাধা কোথায়? ২৫শে জুন সকাল ১১ টায় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয় মুফতীর দল থেকে। বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্র পরিষদের সভায় বলা হয়েছে, কুখ্যাত লেখিকা মুরতাদ তসলিমা নাসরিনকে রহস্যজনক ভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। পরিস্থিতি বেশিদূর অগ্রসর হতে না দিয়ে এখনও সময় আছে তাকে গ্রেফতার করে বিচার করা হোক। তসলিমার ফাঁসির দাবিতে আগামীকাল সংসদ ভবন ঘেরাও করার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের তিনি আহবান জানিয়েছেন। সচেতন মুসলিম যুব ফোরাম, মান্দারপুর ইসলামি পাঠাগার, পাঞ্জেরী পাঠাগার হরতাল সমর্থনের বিবৃতি দিয়েছে। পাঠাগারের লোক পর্যন্ত সংগঠিত হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় উত্তেজনা এখন। এ কিসের লক্ষণ! আরও একটি বিবৃতি আমাকে কাঁপিয়ে দেয়। ১০১ জন আইনজীবী তসলিমার গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছে। ইত্তেফাকের খবরটি এরকম, বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের ১০১ জন আইনজীবী গতকাল সোমবার এক যুক্ত বিবৃতিতে ইসলামের শত্রুদের মদদ যোগাইতে পবিত্র কোরান শরীফ সম্পর্কে তসলিমা নাসরিনের অবমাননাকর উক্তিতে মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় চরম আঘাত ও সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ধাবিত করার অপপ্রয়াসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আইনজীবীগণ ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করিতে কেহ যেন সাহস না পায় উহার দৃষ্টান্ত সৃষ্টির জন্য অবিলম্বে তসলিমাকে গ্রেফতার ও বিচারের মাধ্যমে তাহাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের দাবি জানান। তাহারা বলেন, অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সকল দায় দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে। বিবৃতিদানকারী আইনজীবীদের মধ্যে রহিয়াছেন এস এম আবুল কাসেম, সাবেক বিচারপতি মোঃ আবদুল ওয়াহাব, ব্যারিস্টার শহীদ আলম, ব্যারিস্টার সৈয়দ এমদাদুর রহমান, ব্যারিস্টার ফরিদ উদ্দিন, মোঃ রেজা, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, মোঃ গোলাম মাওলা বকুল, মুঃ খলিলুর রহমান রোকনী, সৈয়দা মায়মুনা বেগম ও মোঃ মাহমুদ হোসেন।

আরও একটি খবর, প্রকাশ্যে জনসমাবেশে লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে হত্যার হুমকি ও তার মাথার দাম ঘোষণা করে তাকে হত্যা করতে অন্যকে প্ররোচিত করার অভিযোগে লেখিকার ভাই ফয়জুল কবীর নোমান গতকাল খুলনা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে ৯ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছেন। .. দাদা খুলনা গিয়েছেন মামলা করতে। মুফতী সৈয়দ নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা, যে

মুফতী সেদিন আমার মাথার মূল্য এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে। মামলা করার সিদ্ধান্তটি কবে কখন নেওয়া হল, কে নিল কিছুই আমি জানি না। আমি ধারণা করি, উকিলের আপিস থেকেই দাদাকে পাঠানো হচ্ছে খুলনায়। বুক ভরে শ্বাস নিই। এই শ্বাসের সঙ্গে একটি শক্তি আমার শরীরে নেমে আসে। হাতদুটো মুষ্ঠিবদ্ধ করতে পারি অনায়াসে। হাতের মুঠিদুটো আলগা হয়ে আসে যখন খুলনায় দাদার নিরাপত্তাহীনতার কথা ভাবি। দাদার ওপর অভিযোগ ছিল আমার অনেক, বিয়ের পর তাঁর হঠাৎ বদলে যাওয়া, অসহ্য রকম কৃপণ হয়ে যাওয়া, স্বার্থপর হয়ে যাওয়া। আজ দাদাকে তাঁর সব অন্যায়ের জন্য আমার ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে। আজ মনে হয় দাদা সত্যিই আমাকে ভালবাসেন, সেই ছোটবেলায় যেমন ভালবাসতেন, তেমন আজও। সেই যে আমার জন্য জামার কাপড় কিনে আনতেন, শীলার কাছে দিতেন নানারকম কায়দা করে জামা বানিয়ে দেবার জন্য, সেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাবার পয়সা বাঁচিয়ে ফুটপাত থেকে পুরোনো জামা কিনে আনতেন, রঙ কিনে দিতেন ছবি আঁকার জন্য, আমার আঁকা রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন দেয়ালে, সেই যে নিজে কবিতা লিখে আমার নামে ছেপে দিতেন তাঁর পাতা পত্রিকায়, চিত্ররূপা স্টুডিওতে সঙ্গে নিয়ে ছবি তুলতেন, সিনেমায় নিয়ে যেতেন, সেই যে সেঁজুতির পাণ্ডুলিপি নিয়ে যেতেন প্রেসে, টাকা দিতেন সেঁজুতি ছাপার, এই দাদাকে আমার সেই দাদা বলে মনে হয়। দাদার সঙ্গে কখনও কি আমার আবার দেখা হবে! খুব ইচ্ছে করে তাঁকে দেখতে। কিন্তু সে কি এ জীবনে আর সম্ভব! আমার সঙ্গে কারওরই কি আর দেখা হবে! পত্রিকাগুলো সরিয়ে আমি শুয়ে থাকি, শৈশব কৈশোর এসে আমার হৃদয় জুড়ে গোল্লাছুট খেলে। গোল্লাছুট খেলাটি হঠাৎ থেমে যায়, যখন চোখ পড়ে সাহাবা সৈনিক পরিষদের কর্মসূচিতে। সিলেটে সাহাবা সৈনিক পরিষদের জনসভায় ২৩ জুন সিলেটে অর্ধদিবস হরতাল পালনসহ দু সপ্তাহের লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, আজ মঙ্গলবার ১৪ই জুন থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময়, ১৭ জুন বেলা দুটোয় পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়, ১৮ থেকে ২১ জুন জনসংযোগ সপ্তাহ পালন, ২২ জুন হরতালের সমর্থনে মিছিল ও সমাবেশ এবং ২৩ জুন অর্ধদিবস হরতাল।

বাহ চমৎকার। খালি মাঠ পেয়েছো, খেলে যাও। গোল দিয়ে যাও যত ইচ্ছে। তোমাদের তো বাধা দেওয়ার কেউ নেই। বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছো প্রতিদিন, তোমাদের কোনও বিরোধী দল তোমাদের মত পথে নামছে না আজও। সুতরাং জয় তোমাদের। মেরে ফেলো আমাকে। মেরে ফেলো যত বুদ্ধিজীবী আছে দেশে সবাইকে, বন্ধ করে দাও প্রগতির পক্ষের সব পত্রিকা। আইন আনো ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে। ইসলামি শাসন কায়েম কর। মেয়েদের ধরে ধরে পুড়িয়ে ফেলো, পাথর মারো। তোমাদের জয় হবেই ইনশাল্লাহ।

দুপুরে খাবার দিয়ে যায় কাজের মহিলা। গোগ্রাসে শুরু করি। ফাঁসির আসামীদের তো ভাল খেতে হয়। খেয়ে নাও তসলিমা, মাছ মাংস খেয়ে নাও, কাল হয়ত তোমার

আর খাবার সুযোগ হবে না। বলি কিন্তু খেতে গিয়ে দেখি পারছি না। সুস্বাদু খাবার, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে না, দুমুঠো খেয়েই মনে হয় গলা পর্যন্ত ভরে গেছে খাবারে। বমি বমি লাগে।

বিকেলে ভেজানো দরজা খুলে ছ ঢোকেন ঘরে।

চল, বারান্দায় বসবে চল।

বারান্দায়? চমকে উঠি প্রস্তাব শুনে।

ঘরের মধ্যে যার লুকিয়ে থাকতে হয় দরজা জানালা বন্ধ করে, সে কিনা বাইরের আলো দেখবে! মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিয়ে ছর পেছন পেছন গিয়ে বারান্দার একটি চেয়ারে বসতে হয়। ভেতর বারান্দাতেই তিনি আমাকে ডেকেছেন বসতে। এখানে বসলে আশেপাশের বাড়ি থেকে কারও দেখার সুযোগ নেই। চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বলেন, আমার বাড়িতে কত আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির লোক এসে থেকেছে। আমি জানি কি করে তাদের রাখতে হয়।

এরপর তিনি বলতে থাকেন সেই কথাগুলো, যেগুলো আজ সকালেই তিনি বিস্তারিত বলেছেন। কি করে তিনি এই জায়গায়, যেই জায়গায় তিনি এখন, এসে পৌঁছলেন, কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁর, মনের জোর তাঁর কি রকম প্রচণ্ড ছিল।

হঠাৎ বললেন, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না, তোমার মত নিরীহ মেয়ে, যার গলায় স্বর নেই, মনে তেজ নেই, তোমাকে মোল্লারা মারতে চায় কেন?

আমি মাথা নত করি।

জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী লেখ যে মোল্লারা ক্ষেপে যায়?

ডডওই ধর্ম নিয়ে লিখেছিলাম বলে।

ডডধর্ম নিয়ে কী লিখেছিলে?

ডডআসলে ধর্ম তো মেয়েদের স্বাধীনতার পথে বাধা ..

ধমকে ওঠেন ছ। ডডকে বলল তোমাকে বাধা?

ধমকে চমক লাগে।

ডডআমার যে এনজিওতে এত মেয়েরা কাজ করে, গ্রামের মোল্লারা কি কোনও রকম অসুবিধা করতে পেরেছে? চেয়েছিল দুএকবার, পারেনি। আমি সোজা মসজিদের ইমামের কাছে গিয়েছি কোরান নিয়ে। কোরানের সুরা পড়ে পড়ে তর্জমা করে দিয়ে এসেছি, বলেছি এই দেখ কি লেখা, এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে মেয়েদের অধিকারের কথা..। কোরান তারা আমাকে শেখাবে কি, আমিই তাদের শিখিয়েছি।

ডডতাহলে কি আপনি মনে করেন যে ধর্মীয় আইনে মেয়েদের ..

আমি কথা শেষ করতে পারি না, তিনি বলেন, এ দেশে যে ধর্মীয় আইন আছে, তা যদি মেনে চলা হত, মেয়েদের ৯০ ভাগ দুর্দশাই কেটে যেত।

ডডধর্মীয় আইনে তো....

ডডতালাক হলে স্ত্রীকে খরপোষ দেওয়ার কথা আছে। কজন স্বামী খরপোষ দেয় স্ত্রীকে? দেয় না। মেয়েরাও জানে না যে এত ভাল আইন তাদের পক্ষে আছে। বিয়ের সময় যে দেনমোহরের কথা বলা হয়, কজন স্বামী দেনমোহর দেয় স্ত্রীকে? দেয় না। আইন অমান্য করে। মেয়েরা যদি জানত এইসব আইনের কথা, তারা মামলা করতে

পারত স্বামীদের বিরুদ্ধে। চার বিয়ের কথা বল? কোরানে স্পষ্ট লেখা আছে, যদি চারজন স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে না পারো, তবে চারটে বিয়ে করবে না, একটি করবে। এটাই তো প্রমাণ যে চারটে বিয়ে না করার জন্য বলা হয়েছে। কোন স্বামী পারবে তার চার স্ত্রীকে একইরকম মর্যাদা দিতে, একই রকম ভালবাসতে? পারবে না, নতুন বউএর প্রতি তাদের বেশি আকর্ষণ থাকবে। না, ধর্ম আমাদের জন্য কোনও সমস্যা নয়। সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। মেয়েরা যদি শিক্ষিত হয়, স্বাবলম্বী নয়, তবেই তাদের সব সমস্যা দূর হবে। ধর্ম তো কাঠমোল্লাদের নয়, ধর্ম আমাদের। আমাদের দাবি করতে হবে যে আমরা ধর্ম মানি। ধর্মকে বাজে লোকের সম্পত্তি করতে দিলেই তারা বাজে ভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করবে। ইসলাম ধর্মে মেয়েদের যত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অন্য অনেক ধর্মেই তত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের সম্পত্তি পায়, হিন্দু ধর্মে তো তা পায় না, ভারতে আইন করতে হয়েছে মেয়েদের সম্পত্তি দেবার জন্য। ইসলাম ধর্মে আছে যে সম্পত্তির ভাগ মেয়েদের দিতে হবে, কজন মেয়ে সেই সম্পত্তি সত্যিকারের পায়? পায় না, কেন পায় না? কারণ তাদের দেওয়া হয় না। ধর্মে যে অধিকারগুলো আছে, সেই অধিকার পাওয়ার জন্য আগে চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ করে তুমি ধর্মীয় আইন পাল্টে ফেলে একটা সমান অধিকারের আইন চালু করলে, তাতে কী হবে মনে করছো? মনে করছো ব্যাস এখন থেকে আর কোনও বৈষম্য থাকবে না সমাজে? ভুল।

আমি মন দিয়ে শুনি ছ র কথা। আমার মনে হয় না ছ কিছু ভুল বলছেন, বিশেষ করে সমান অধিকারের আইন চালু করলেই যে নিমেষে বৈষম্য দূর হবে না সে কথা। বৈষম্য তো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এত সহজে এই সমাজে নারী তার অধিকার পাবে, তা আমিও মনে করি না। তারপরও আমাকে যেন তিনি ভুল না বোঝেন আমি বলি, তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের পাশে আমার কণ্ঠটি বড় মৃদু, বড় নরম, বলি যে আমি কেবল ধর্ম সম্পর্কে লিখেছি তা নয়, মেয়েদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেছি। শিক্ষা আর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি সমঅধিকারের আইনও যদি থাকে তবে তো আরও ভাল। সেই আরও ভাল অবস্থার জন্য আমার স্বপ্ন ছিল।

ডডস্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন .... বসে বসে স্বপ্ন দেখলে কচু হবে। কাজ করতে হবে। বাস্তব জগতের মুখোমুখি হতে হয়। হয়েছো কখনও? কখনও গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছো? কথা বলতে হবে তাদের ভাষায়। জানো তাদের ভাষা?

আমি চুপ করে থাকি। মাথাটি ধীরে ধীরে নত হতে থাকে।

ডডদেশের আশি ভাগ মেয়ে অশিক্ষিত। তুমি যে দাবি করছ তুমি মেয়েদের জন্য লেখ, কজন মেয়ে তোমার লেখা পড়তে পারে? কোন মেয়েরা তোমার লেখা পড়ছে? লেখাপড়া জানা মেয়েরা পড়ছে। লেখাপড়া জানা মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ থাকে, তারা যদি সুযোগ না নেয়, তবে সেটা তাদের দোষ। যাদের স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছে, যাদের সুযোগ নেই, তাদের সাহায্য করতে হবে।

হঠাৎ উঠে পড়লেন ছ। অনেকক্ষণ বসে থাকলে পিঠে তাঁর যন্ত্রণা হয়। তাঁর এখন শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে দু ঘণ্টা।

আমি উঠে যাই ঘরে। ঘরে বসে থাকি। নিজেকে বড় তুচ্ছ, বড় অকর্মণ্য, বড় বোকা বলে মনে হতে থাকে। নিজের ওপর আমার রাগ হতে থাকে, ঘৃণাও হতে থাকে। নিজের দু গালে দুটো চড় কষাতে ইচ্ছে করে।

পনেরো জুন, বুধবার

ঙ আসেন ছর বাড়িতে। ঙ ছকে চেনেন ভাল করে। একসময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন। ছ ঙকে তাঁর ঘরে নিয়ে সেই তাঁদের আগের সময়ের গল্প করেন। দীর্ঘক্ষণ। এত জোরে কথা বলেন ছ যে আমার ঘর থেকে সেসব কথা শোনা যায়। ঙ কি বলছেন, তা শুনতে চেয়েও পারি না, ঙর স্বর অনেক খাদে। ছর গল্পের মধ্যে খানিকটা ফাঁক পেয়ে ঙ আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চান ছর কাছে। অনুমতি পেলে ঙ আমার ঘরে ঢোকেন। ঙকে দেখে কি যে ভাল লাগে আমার! একদমে জিজ্ঞেস করি, জামিনের খবর কি কিছু জানেন? ক কি জানেন জামিন হবে কি না? উকিলের কাছে ক বা আপনি কেউ গিয়েছিলেন? মৌলবাদীদের এই উত্থান ঠেকাতে কোনও দল কি পথে নামবে না? কর কাছে কি আমার দাদারা কেউ গিয়েছিলেন? আমার বাড়ির মানুষগুলো কি বেঁচে আছে? আমার উকিল কি আশা ছেড়ে দিয়েছেন? জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের তো জামিন হয়েছে, আমার হবে না কেন?

ঙর কপালে বিন্দু বিন্দু দুশ্চিন্তা। ঙ আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি, কেবল বললেন, এই সময়ে কি করা উচিত আমাদের, কিছু বুঝতে পারছি না। জামিনের ব্যাপারে তোমার উকিল এখনও এগোতে পারছেন না।

হঠাৎ ছ চিৎকার করে ঙকে ডাকলেন। ঙকে আমার ঘর ছাড়তে হল। ছ চা খেতে ডেকেছেন ঙকে। ও ঘরে চা বিস্কুট দেওয়া হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ছর ঘরে আমিও যাই, কিন্তু আমাকে না ডাকলে আমার যে ওঘরে ঢোকা উচিত হবে না। আমি একটি ডাকের অপেক্ষায় থাকি। অপেক্ষায় থাকি ঙ আবার আমার ঘরে ঢুকবেন। অপেক্ষার অস্থিরতা একবার আমাকে বিছানা থেকে উঠে চেয়ারে বসায়, চেয়ার থেকে আবার বিছানায়। আধঘন্টা পার হলে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে উঁকি দেন ছ, ছর ঘাড়ের পেছনে ঙর মাথা। ছ বললেন, ঙ চলে যাচ্ছেন। ঙ পেছন থেকে কেবল বললেন, যাচ্ছি তসলিমা।

ঙর কপালে তখনও বিন্দু বিন্দু দুশ্চিন্তা। আমার চোখের আকুলতাটি ঙ পড়তে পারেন। আমিও পড়তে পারি ঙর ব্যগ্রতা আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের সে সুযোগ দেয় না।

ছ কি কারণে আমাকে ঙর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দিলেন না, তা আমি বুঝতে পারি না। ঙ তো এ বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। ঙর জন্য মায়া হয় আমার। ঙ চলে গেলে ছ আমার ঘরে এলেন। বসে তিনি বলতে লাগলেন, কি

করে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ালেন, কে কে তাকে সাহায্য করেছিল, কে কে করেনি, তাঁর কন্যারা কে কোথায়, কি করছে ইত্যাদি। ছ র কন্যারা বড় বড় ডিগ্রি নিয়েছে, বড় বড় কাজ করছে। কেউ দেশে থাকে, কেউ বিদেশে থাকে। ব্যস্ত জীবন তাদের। ছর জীবন খুব সার্থক জীবন। খুব সুখী তিনি। অতৃপ্তির লেশমাত্র নেই। কিছু পাওয়া হয়নি বলে কোনও আফসোস নেই ছর। ছ জীবনে যা চেয়েছিলেন, তারও চেয়ে বেশি পেয়েছেন। এত সুখী তৃপ্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে হঠাৎ আমার মনে হয় সব অর্জন করা ছ তাঁর পিঠের যন্ত্রণার মত একটি সূক্ষ্ম একাকীত্বের যন্ত্রণাতেও ভোগেন।

ষোল জুন, বৃহস্পতিবার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

০ ধর্ম, জাতি ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তি
০ জাতীয় সংসদে জামায়াত কর্তৃক পেশকৃত ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি-বিধান বিল পাশ
০কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ও
০এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধের দাবিতে

বিক্ষোভ সমাবেশ

তারিখ	ঃ ১৭ই জুন, শুক্রবার, সময়ঃ বাদ জুমা
স্থান	ঃ বায়তুল মোকাররম, উত্তর গেইট
প্রধান বক্তা	ঃ মাওঃ মতিউর রহমান নিজামী এম.পি সেক্রেটারি জেনারেল ও জামায়াত সংসদীয় দলের নেতা
সভাপতি	ঃ এ,টি,এম, আজহারুল ইসলাম

দলে দলে যোগ দিন

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা মহানগরী

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে সারা দেশের সকল মাদ্রাসার প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য অতি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

তসলিমা নাসরিনসহ মুরতাদদের ফাঁসি, কুরআন অবমাননাকারী পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের দাবীতে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কর্মসূচী

আচ্ছালামু আলাইকুম,
বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে মুরতাদ তসলিমা নাসরিনসহ ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের ফাঁসি, ইসলাম-শরিয়ত, কুরআন হাদীস অবমাননাকারী পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তক প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ এবং ঈমান আকীদা বিরোধী প্রচারণা ও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী প্রচারণা ও প্রকাশনার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সম্বলিত ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের দাবীতে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য, আঞ্চলিক জমিয়াত, জেলা জমিয়াত, থানা জমিয়াতসহ সর্বস্তরের সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের প্রতি এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আবেদন জানানো যাচ্ছে।

কর্মসূচীসমূহ

২৪শে জুনঃ প্রতিটি থানা জমিয়াত এবং জেলা জমিয়াতের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিলসহকারে প্রতিটি থানার টিএনও, জেলার ডিসি এবং ডিভিশন্যাল কমিশনার সাহেবদের নিকট স্মারকলিপি পেশ।
২৫শে জুনঃ সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় জমিয়াত কার্যালয়ে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভা।
২৬শে জুনঃ সকাল ৯টায় বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে দেশের সকল মাদ্রাসার শিক্ষকদের মহাসমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল সহকারে সচিবালয় ঘেরাও, প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ।

এই বিজ্ঞপ্তিতে চূড়ান্ত দাওয়াত হিসাবে গণ্য করবেন। যিনি এই বিজ্ঞপ্তি পড়বেন আল্লাহ ও রসুলের সন্তুষ্টির নিয়তে, এই দাওয়াতনামাকে ফটোস্ট্যাট করে বিভিন্ন মাদ্রাসায় পৌঁছাবেন। বিশেষ করে থানা, জেলা ও আঞ্চলিক জমিয়াত এই দাওয়াত সকলের কাছে যাতে পৌছে সেই ব্যবস্থা করবেন। ঘোষিত কর্মসূচী যথাযথভাবে সফল করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
বিস্তারিত জানার জন্য প্রতিদিন সকাল ৮টা হতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত নিম্নের টেলিফোনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। ফোন ৬০৮২২৮, ৬০৮৩৩৮

আয়োজনে ও প্রচারে
বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন, ঢাকা

তসলিমা নাসরিনসহ মুরতাদদের শাস্তি ও জনকণ্ঠ নিষিদ্ধ করার দাবি অব্যাহত। ঢাকা সহ খুলনা বরিশাল রাজশাহী চট্টগ্রামে জনতার বিশাল বিশাল মিছিল। মিছিলের ছবি। সভার খবর। সভায় বক্তাদের বক্তব্য। একই কথা। একই ধরনের বক্তব্য। গোলাম আযম এখন মঞ্চে। জামাতে ইসলামির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কক্ষ থেকে অন্যত্রও তাঁর পদচারণা শুরু হয়েছে। যে কথাটি বলতে তিনি আজ ওলামা সমাবেশের মঞ্চে উঠেছেন, সেটি জামাতের স্বার্থের জন্য খুব মূল্যবান। তসলিমার ফাঁসি আন্দোলনে জামাতে ইসলামী দলের চেয়েও আকার আকৃতিতে বড় দেখাচ্ছে অন্যান্য ইসলামী দলগুলোকে। কারও ধর্মীয় অনুভূতি খুব প্রবল হলে, কেউ মৌলবাদী হলেই যে জামাতে ইসলামী দলের সদস্য হয় তা নয়। জামাতে ইসলামীর সঙ্গে ভিন্ন মত থাকলেও এই আন্দোলন যে একসঙ্গে একই প্লাটফরম থেকে করা উচিত, তার প্রয়োজনীতার কথা বললেন গোলাম আযম। জামাতে ইসলামী দলটিকে ভারী করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এত বড় একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার লোভ জামাত কি করে সামলাবে! জামাতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম বলেছেন, ইসলাম কারও অধীনে থাকার জন্য আসেনি। তাই আমাদের মূল কাজ হবে এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যতদিন দ্বীন প্রতিষ্ঠা না হবে, ততদিন কাজ হবে আলেম ওলামাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৎ কাজে উপদেশ দেয়া, অসৎ কাজে বাধা দেওয়া। সরকারকে দিয়ে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হলে লাখো জনতার উপস্থিতিতে বুলন্দ আওয়াজ তুলতে হবে। আর এর জন্য বাস্তবতা হচ্ছে সম্মিলিত নেতৃত্ব। মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব এর মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত হয়। কিন্তু দ্বীন কায়েম সম্ভব নয়। এগুলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আলেম ওলামারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হচ্ছে। ঐক্য কেন হচ্ছে না এবং না হওয়ার পেছনে কোন বাধা কাজ করছে সেটা জানতে হবে। আমার নাগরিকত্বের ব্যাপারটি ফায়সালা হলে আমি জনগণকে নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে নামব। আমরা দেখাবো এ দেশে ইসলামের শক্তি বেশি না বিপক্ষের শক্তি বেশি।
মতিউর রহমান নিজামী এবং বাকি নেতারা সমাবেশ এ একই কথা বলেন, ঐক্যবদ্ধ না হলে আল্লাহর গজব থেকে আমরা রক্ষা পাবো না। ইসলামের ওপর যে আঘাত এসেছে তা একা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। আলেম সমাজকে ঐক্যের সাথে লড়াই করতে হবে। আলেমদের ঐক্যই আমাদের শক্তি। একই প্লাটফরম থেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে।

অরাজনৈতিক মোল্লা, মুসল্লি, পীর, ওলামা, মাশায়েখ, আলেম, ইমামদের আজ রাজনৈতিক প্লাটফরম ব্যবহার করার আমন্ত্রণ জানানো হল।

এসব খবর জেনে ভয় হয়। ভয় হয় আর সৈয়দ শামসুল হকের লেখাটি পড়ে তাঁর কবিতাটি আওড়াই। *ফিরে এসো বাংলাদেশে, কোথায় যাচ্ছো তুমি ধেই ধেই করে?*
..

সৈয়দ শামসুল হক আজ লিখেছেন, এ বড় কঠিন সময়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি। রাতের পর রাত নিদ্রাহীন আমি, আমরা, আমাদের দেশমাতৃকা আজ। দেশের এখনকার অবস্থা, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ (আমার বিরুদ্ধে মামলার কথাটি বাদ দেননি) করে তিনি বলছেন, আমাদের ছুঁড়ে দিয়েছে কালো গহবরে, ভুলিয়ে দিতে চাইছে বাংলাদেশের মানুষের মানব-ধারাবাহিকতা, মুক্তিযুদ্ধের মূল কারণ ও চেতনা, এমনকি আমি এমনই শংকা করি যে আমাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের দিকে, যার পরিণামে গণতন্ত্র হবে নিহত, স্বৈরশাসন পুনর্জীবিত, এবং বাংলাদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য, চেতনা ও মূল্যবোধ হবে নির্বাসিত।

ঠিক এই আশংকাটিই আমি করছিলাম। এই আশংকাটি এখন আরও অনেকের মনে কি জাগছে না! ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের দেশটিতে শোষণপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার, অতীতের দুঃস্বপ্ন থেকে এই সবে জেগে উঠতে থাকা মানুষকে প্রগতিবিমুখ করে তুলবার একটি চক্রান্ত ভেতরে বাইরে কোথাও চলছে, আর রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া এবং যে কোনও ভাবেই হোক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা, টিকে থাকা, এই পণ কোথাও কেউ করে বসে আছে। এখনও মানুষ যদি সচেতন না হয়, দেশটিকে না রক্ষা করে ....আমার ভাবনার সুতোগুলো ছিঁড়ে যায় ছ'র ডাকে। ছ আমাকে তাঁর বাগানে নিয়ে যেতে চাইছেন, তাঁর ফুল ফলের গাছ দেখাবেন। ফুল ফলের গাছ দেখায় আমার মন বসে না, মনে সৈয়দ হকের কবিতা *ফিরে এসো বাংলাদেশ, কোথায় যাচ্ছো তুমি ধেই ধেই করে!*

সতেরো জুন, শুক্রবার

শুক্রবার দিনটি ভয়ংকর দিন। এই দিন ধর্মের দিন। মৌলবাদীর দিন। এই দিনের অপেক্ষা মৌলবাদীরা করে, কারণ এই দিনে মসজিদগুলোয় দুপুরের নামাজটি পড়তে সাধারণ লোকেরা যায়, যারা সপ্তাহের অন্য কোনওদিনই কোনও ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, তারা ছুটির দিন ঘুম থেকে উঠে নাস্তা টাস্তা খেয়ে গোসল টোসল সেরে মসজিদে যায় নামাজ পড়তে, ছোটবেলায় পড়া দুএকটি সুরা মনে করতে পারলে সেগুলোই বিড়বিড় করে অথবা সুরা টুরা না জানলেও ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে আর সবাই যেমন উঠবস করে, তারাও উঠবস করে। এই উঠবস করা মানুষগুলোর দিকেই এখন নজর মৌলবাদীদের, এদের তারা দলে ভেড়াতে চায়। সপ্তাহে একবার উঠবস করা মানুষগুলো সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। তারা মোল্লা নয়, মুসল্লি নয়, ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা নেই। রোজার সময় এলে রোজা করে, যত না ধর্মের কারণে, তার চেয়ে বেশি সামাজিক কারণে। খাচ্ছে দাচ্ছে চাকরি বাকরি করছে সংসার করছে সন্তান পালন করছে। বাস্তব এই জীবনটি নিয়েই তারা ব্যস্ত। সংসারের

নানারকম ভাবনার মধ্যে ধর্ম-ভাবনার অবকাশ জোটে না। তবে সুপ্ত একটি বিশ্বাস আছে ওপরে আল্লাহ বলে কেউ আছে, পরকাল বলে কিছু আছে, দোযখ বেহেস্ত বলে কিছু আছে। তারা নির্বাচনের সময় হয় আওয়ামী লীগকে নয় বিএনপিকে সমর্থন করছে। জামাতে ইসলামী দলটির দিকে বিশেষ কোনও মোহ নেই। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সুস্থ রাজনৈতিক অবস্থায় বিশ্বাসী, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিতে বিশ্বাসী, হাসপাতালে ওষুধের পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় বিশ্বাসী, সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণ কম হওয়ায় বিশ্বাসী, সন্ত্রাস বন্ধে বিশ্বাসী, হরতাল না হওয়ায় বিশ্বাসী। তাদের মাথার মধ্যে যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে ইসলাম ধ্বংস করে ফেলছে এক মহিলা, মহিলা ভারতের চর, হিন্দু মৌলবাদীদের প্ররোচনায় আর মুসলমানের জাতশত্রু ইহুদিদের সঙ্গে আঁতাত করে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে নেমেছে, তখন জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে বইকি! তখন তারা যায়, আজ না গেলেও পরশু না গেলেও তরশু গিয়ে শায়খুল হাদিসের মিছিলে গিয়ে দাঁড়ায়। যারা এখনও দাঁড়াচ্ছে না, তাদের মাথায় ইসলাম ধ্বংসের গল্পটি ঢুকিয়ে সভায় এবং মিছিলে টানার চেষ্টা ধর্মব্যবসায়ীদের।

ভাবছি আমি এসব নিয়ে সকাল থেকেই। আজকের বাংলাবাজার পত্রিকার একটি খবর নিয়েও ভাবছি।

তসলিমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা

সিলেটঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রঃ) যুব সংস্থা নামক একটি সংগঠন লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে ধরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। সিলেট শহরের ২৪, পূর্বাশা, তালতলা এলাকায় সংস্থার কার্যালয়। আলহাজ্ব নূরে আলম হামিদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংস্থার এক জরুরি সভায় দেশ জাতি ও ধর্মের স্বার্থে তসলিমা নাসরিনকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে সর্বস্তরের জনতার প্রতি আহবান জানানো হয়।

এই গরিব দেশে এমন পুরস্কারের লোভ দেখালে মৌলবাদী নয় এমন অনেক লোকও আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে। যেখানে ১০০ টাকা দিয়ে কাউকে খুন করার জন্য লোক ভাড়া করা যায়, সেখানে দেড় লক্ষ টাকা তো অনেক টাকা। আমাকে খুন করলে ধর্মান্ধ মূর্খদের বিশ্বাস, আখেরে বেহেসত নিশ্চিত হল। আমাকে খুন করলে এখন অভাবী লোকের জন্যও ইহজগতের অভাব দূর হল। কে না চাইবে আমাকে খুন করতে! খুন খারাবির মধ্যে না গিয়ে ধরিয়ে দিতে পারলেও ৫০,০০০ টাকা দেয়া হবে। এটি কম টাকা নয়। এত টাকা একসঙ্গে পাওয়ার স্বপ্নও অনেকে দেখেনি। কদিন আগে মৌলবাদী এক নেতা ঘোষণা দিয়েছে, *তসলিমাকে এখনও পুলিশ ধরছে*

না, আমরাই দায়িত্ব নেব তাকে ধরার, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাবো তসলিমাকে ধরার জন্য। এখন নিশ্চয়ই টাকার লোভে তল্লাশি সত্যি সত্যিই চলছে।

১৫৩ জন হাফেজে কোরান ৩০ জুনের হরতাল সফল করার জন্য বিবৃতি দিয়েছেন, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও কোরানের ইজ্জত তাঁরা রক্ষা করবেন। ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিরোধ মোর্চা যেটি হয় হয় করছিল, সেটি হয়ে গেছে গঠন। শুক্রবারটিতে তাই সুগঠিত মোর্চা নিয়ে নামা গেছে পথে।

ছ আমাকে তাঁর ঘরে ডাকেন, শুয়ে শুয়ে তিনি পড়ছিলেন আমার নির্বাচিত কলাম। বললেন, তিনি বেরিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন, ওখানে আমার এই বইটি পেয়ে নিয়ে এসেছেন। বইটি পড়া প্রায় শেষ। বসতে বললেন বিছানার পাশের চেয়ারটিতে। বললেন, এসব কী লিখেছো তুমি?

আমি চুপ।

তোমার লেখা খুব সুপারফিসিয়াল লেখা। তোমাকে লোকে নারীবাদী বলে কেন? এইগুলো তো নারীবাদ নয়।

আমি চুপ।

তোমার লেখায় কোনও কিছুর বিশ্লেষণ নেই। কোনও তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা নেই। কোথাও কোথাও সমস্যার কথা বলেছো, কিন্তু সমস্যা কেন, কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে এসবের জানো না তো কিছু।

আমি চুপ।

খুব হালকা লেখা। ভেবেছিলাম তোমার নাম হয়েছে, তুমি বোধহয় চিন্তা ভাবনা করে লেখো। ভাল লেখো। কিন্তু না। আমি খুব হতাশ হলাম।

আমি চুপ।

তুমি আমার লেখা কিছু বই পড়ে দেখো। তবে বুঝতে পারবে নারীবাদ কাকে বলে।

চুপ।

তুমি যা লেখো, এগুলোর নাম কি জানো?

চুপ।

এগুলোর নাম রোমান্টিকতা। এসব রোমান্টিকতা দিয়ে তুমি সমাজের কিছুই করতে পারবে না।

শ্বাস।

তুমি যদি সত্যিকার নারীবাদী হতে, সত্যিকার নারীবাদ নিয়ে লিখতে তবে মোল্লারা তোমার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলার সুযোগ পেত না।

শ্বাস।

না বুঝে ইসলাম ধর্মের কথা উল্টো পাল্টা লিখেছো বলেই তো ওরা ক্ষেপেছে।

নাতিদীর্ঘশ্বাস।

অনেকে তো তোমাকে দায়ী করছে মোল্লাদের উত্থানের জন্য!

দীর্ঘশ্বাস।

যখন ঘরে ফিরে আসি, চিৎ হয়ে শুয়ে ঘরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিজের এই অস্তিত্বটি আমাকে বড় অস্বস্তি দিতে থাকে। মনে মনে বলতে থাকি দিনের আলো যেন না ফোটে, যেন আমাকে আর না দেখতে হয় নিজের এই মুখটি।

আঠারো জুন, শনিবার

গতকাল আহমদ শরীফের বাড়িতে তিনটে বোমা ছোঁড়া হয়েছে। তাঁর ফাঁসির দাবি নিয়েও একসময় মোল্লারা পথে নেমেছিল। এখন তাঁর নাম উল্লেখ না করলেও তসলিমাগংদের মধ্যে আহমদ শরীফকে ফেলে। আহমদ শরীফ তাদের পুরোনো শত্রু। নতুন নতুন শত্রু নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও পুরোনো শত্রুর কথা তারা ভোলেনি। তাই বোমা হামলা। আজ বোমা হামলার নিন্দা করেছে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল(বাসদ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, সাম্যবাদী দল, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন। প্রগতিশীল দলগুলো মৌলবাদীর আন্দোলনকে তসলিমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে খুব বেশি উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু এখন টের পাচ্ছে এ হতে দেওয়া যায় না। ভয়ংকর ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সবাইকে ছাড়িয়ে মাড়িয়ে এই শক্তিটি। এখন বিবৃতি দিয়ে বসে থাকার সময় নেই আর। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আহবান জানিয়েছে ৩০ তারিখ হরতাল প্রতিহত করার। ২৪টি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিহতের ব্যাপারে সায় দিয়েছে। এসব সংগঠনের পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত বলা হল, সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দেশে উগ্র মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতির অপব্যবহার করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সামাজিক সংহতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংসের চক্রান্তে মেতে উঠেছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ছুতোয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর সরকারি নির্দেশে মামলা, হয়রানি ও জুলুম শুরু হয়েছে। সরকারের এই ভূমিকা মৌলবাদী চক্রকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনকে ব্যাহত করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে একাত্তরের ঘাতক জামাত শিবির এবং ক্ষমতাসীন সরকার একযোগে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করে চলেছে। জামাত-জাপার সহযোগিতায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর আওয়ামী লীগের আদর্শহীন রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িক জামাত শিবির পুরো ফায়দা তুলে নেবার সুযোগ পেয়েছে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এ সময় সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সংগঠন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশবাসীকে ফতোয়াবাজ সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছে।

বাম ফ্রন্টের অভিযোগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মৌলবাদী শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে। এখন আর বিবৃতি নয়, পথে নামবে বাম ফ্রন্ট। আগামী ২৭ জুন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট দাবি দিবস পালন করবে।

মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিহত না করলে চলবে না। টনক তবে নড়েছে নেতাদের। জাসদের নেতারা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে ইন্ধন দেয়ার মত আগুন নিয়ে খেলার নীতি অবলম্বে বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন, তসলিমা নাসরিনের সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী গোষ্ঠী যে নৈরাজ্যকর ও সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে দেশের গণতান্ত্রিক ও মানবতাবোধ সম্পন্ন মানুষ বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। ইতিমধ্যে দৈনিক জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ প্রভৃতি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সরকারি নির্দেশে মামলা, হয়রানি ও জুলুম শুরু হয়েছে। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থাকে পাশ কাটানোর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ইন্ধন দিয়ে সক্রিয় করার সরকারি নীতি ও আওয়ামী লীগের বিভ্রান্ত ও সংকীর্ণ রাজনীতির সুযোগে জামাত শিবির ও নরঘাতক গোলাম আযমরা নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের যে পরিকল্পনা করছে তা এখনই প্রতিহত না করলে ভবিষ্যতে এই জাতিকে অনেক খেসারত দিতে হবে।

সাম্যবাদী দল বলেছে, বর্তমান সংসদে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামাতের অশুভ আঁতাতের পটভূমিতে জামাত নতুনভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। এখনই যদি দেশবাসী সতর্ক না হয়, তবে জামাত ও সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ দিবস পালন করবে কাল। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মধ্যে ছাত্র লীগও আছে, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেমে গেলেও আওয়ামী লীগ নামছে না। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলন করছে জামাতে ইসলামী আর জাতীয় পার্টিকে নিয়ে, সুতরাং আওয়ামী লীগ জামাতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যত নষ্ট করতে চাইছে না। ছাত্রলীগের ছেলে মেয়েরা এখনও নোংরা রাজনীতিতে গা ডোবায়নি, তাই মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে তারা এগিয়ে এসেছে। আদর্শ আর সততা যেটুকু থাকে, তা অল্প বয়সেই থাকে, বড় নেতা হয়ে গেলেই সততা আর আদর্শ ক্রমে ক্রমে বিলীন হতে থাকে।

কলাম লেখা শুরু হয়েছে। কে এম সোবহান লিখেছেন মৌলবাদীদের কাছে সরকারের আত্মসমর্পণ এই শিরোনামে। উল্লেখ করেছেন আমার কথা। কিন্তু এখন আমাকে কি করেছে মৌলবাদী শক্তি বা সরকার এগুলোর চেয়ে বড় ভাবনার বিষয়টি হচ্ছে দেশের কি অবস্থা করছে, দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। এটি যে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, মৌলবাদীর উত্থান যে সকল মুক্তমনের মানুষের ওপর হুমকি, তা সম্ভবত এখন বুঝতে পারছেন অনেকে।

প্রতিরোধ মোর্চা ঘোষণা দিয়েছে ৩০শে জুনের হরতাল সফল করার জন্য দেশব্যাপী ঝটিকা সফর ও বিভিন্ন স্থানে জনসভা করার। ১৮ জুন শনিবার চকবাজার, ২০ জুন সোমবার সিলেট, ২১ জুন মঙ্গলবার বিবাড়িয়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে তারা

বিবাড়িয়া বলতে পছন্দ করে) ও ভৈরব, ২২ জুন বুধবার কুমিল্লা, মাইজদি, ফেনি, ২৩ জুন বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম, ২৪ জুন শুক্রবার খুলনা, ২৫ জুন ফরিদপুর, ২৬ জুন রোববার বগুড়া, এবং ২৭ জুন সোমবার মোমেনশাহী (ময়মনসিংহকে তারা মোমেনশাহী বলতে পছন্দ করে) ও কিশোরগঞ্জে জনসভা। ২৪ জুন শুক্রবার দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দিবস। বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামের সংগঠন মোর্চার কর্মকান্ডে যোগ দিয়েছে। ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও আয়োজন করেছেন সভার। আলোচনা সভাটিতে সকলে একমত হলেন এই ব্যাপারে যে মানুষের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ইচ্ছাকৃত আঘাত এবং এর বিকৃত উপস্থাপনা কোনওক্রমেই লেখকের স্বাধীনতার অধিকারে পড়ে না। সভায় ছিলেন দেশের জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ, ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, আধ্যাপক আবদুল গফুর, বিচারপতি নূরুল ইসলাম, ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশ, রাজিয়া খান আমিন, কবি জাহানারা আরজু, কবি আল মাহমুদ, শামস রশীদ, ফজল শাহাবুদ্দিন, হারুণ রশিদ। এঁদের মধ্যে ফজল শাহাবুদ্দিনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব পছন্দ করি। তাঁর প্রবল রসবোধের আমি খুব অনুরক্ত। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদীর্ঘদিন আমার দীর্ঘ আড্ডা দিয়ে কেটেছে। তাঁকে কখনও কোনও ধার্মিক লোক বলে আমার মনে হয়নি। আড্ডায় তিনি শামসুর রাহমান প্রসঙ্গে প্রচুর কথা বলতে পছন্দ করেন। বন্ধুতা তাঁর সঙ্গে তাঁর যেমন ছিল, এখন শত্রুতাও তেমন, গভীর। ফজল শাহাবুদ্দিনের প্রতিভা ছিল, কিন্তু এত প্রতিভা নিয়েও তিনি শামসুর রাহমানের মত বড় কবি হতে পারেননি, এই একটি বেদনা তিনি খুব গোপনে লালন করেন, এরকমই মনে হয়েছে আমার। নিজের ভাগ্যটি শামসুর রাহমানের মত খোলেনি বলেই কি তিনি জেদ করে শামসুর রাহমান যে দলে তার বিরোধী দলে অবস্থান করছেন! এই দলটি সরকারি দলের দিকে এলিয়ে কেলিয়ে পড়ে টাকা পয়সা, বই প্রকাশ ইত্যাদি বেশ আদায় করে নিয়েছে। এরশাদের এশীয় কবিতা উৎসবে ফজল শাহাবুদ্দিন ভিড়েছিলেন। এখন তিনি চিহ্নিতই হয়ে গেছেন প্রতিক্রিয়াশীল দলের কবি হিসেবে। আল মাহমুদও তাই। আল মাহমুদের কারণ আছে ও দলে ভেড়ার। তিনি প্রচণ্ড ধার্মিক লোক। আল্লাহ বিশ্বাস করেন বলে কনডমে বিশ্বাস করেন না। শুনেছি তেরো চৌদ্দটি কাচ্চা বাচ্চা তাঁর।

সৈয়দ আলী আহসান লোকটি প্যান্ট সার্ট পরা লেখাপড়া জানা মৌলবাদী। আর তিনিই হচ্ছেন বাংলাদেশ পেন (পি ই এন) এর প্রেসিডেন্ট। কবি লেখক, নাট্যকারদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম পেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট অন্নদাশংকর রায়, বাংলাদেশে সৈয়দ আলী আহসান। এই পেন সংগঠনটির মূল আন্দোলন লেখকের লেখার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। এই পেন যে কোনও সেন্সরশীপএর বিরুদ্ধে, বই বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে, লেখকদের ওপর কোনরকম আঘাতের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন করছে। কেবল এই বাংলাদেশ পেনেই হল লেখকের লেখার স্বাধীনতার বিপক্ষে। পেন এর সভায় বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, পেন লেখকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিশ্বাস করে। তবে এ অধিকার

প্রয়োগ করে জনগণের বিশ্বাস ও আদর্শকে বিদ্রূপ করা কোনও লেখকেরই উচিত নয়। কোনও লেখকরই অসত্যের আশ্রয় নেওয়া এবং কোনও ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা উচিত নয়। আমার বিশ্বাস, লণ্ডনে পেন এর মূল আপিসের কেউ জানে না যে চরম ডানপন্থী মৌলবাদীদের আওতায় বাংলাদেশের পেনটি।

গতকালের একটি মিছিলের ছবি আমাকে চমকে দেয়। মিছিলটি মেয়েদের মিছিল। বোরখা পরা মেয়েরা রাস্তায় নেমেছে বিশাল ব্যানার নিয়ে, হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড। ব্যানারে লেখা, *কুখ্যাত তসলিমার ফাঁসি চাই। এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধ কর। ইসলাম অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল। বাংলাদেশ ইসলামী মহিলা মজলিশ। বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রী মজলিশ।* হায়, শেষ পর্যন্ত মেয়েরাও!

জামাতে ইসলামীর সভায় মতিউর রহমান নিজামী, আমাদের সংসদ সদস্য বলেন, ‘তসলিমা এবং তার সমর্থনকারীরা হল আবর্জনা, ওই আবর্জনাগুলো একদিন গণজোয়ারেই ভেসে যাবে। তসলিমা নাসরিন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এই বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলতে চায় বলেই ভারত এবং পাশ্চাত্য জগত তাকে লুফে নিয়েছে। তসলিমা ও তাকে যারা সমর্থন করে তারা কেউই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হতে পারে না। তসলিমা ও তাকে সমর্থনকারী ঘাদানি (ঘাতক দালাল নির্মূল) কমিটি একই পথের পথিক। সংসদে জামাত ধর্মদ্রোহিতা বিরোধী বিল পাসের যে প্রস্তাব করেছে, তা পাস হলে তসলিমা-আহমদ শরীফ গংরা ইসলামকে আঘাত করার কোনও সুযোগ পাবে না। এই বিল শুধু জামাতে ইসলামীর বিল নয়, এই বিল সমস্ত মুসলমানের বিল। এই বিল পাস না করা ধর্মপ্রাণ মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।’ জামাতের আরেক নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ তাহের বলেছেন, ‘৩০ জুন তসলিমা নাসরিনের পক্ষে কেউ মাঠে নামলে তার পিঠের চামড়া তুলে ফেলা হবে।’ জামাতে ইসলামী পরবর্তী কর্মসূচী, আগামী ২১ থেকে ২৮ জুন দেশব্যাপী গণসংযোগ, ২৯ জুন বিক্ষোভ মিছিল, ৩০ জুন অর্ধদিবস হরতাল।

গতকাল অর্গানাইজেশন ফর পীস এর উদ্যোগেও বিশাল মিছিল বের হয় শহরে। ওদের জনসভায় সাম্প্রদায়িক শান্তি বিনষ্ট এবং দেশদ্রোহীতার অভিযোগে তসলিমা নাসরিনের নাগরিকত্ব বাতিলের দাবি করা হয়। গতকাল ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করেই সভা মিছিল সব হয়। নগরীর সব বড় বড় রাস্তা বন্ধ করে মঞ্চ বানানো হয়েছে, জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে হোক, তারা তো বড় আন্দোলনে নেমেছে, কষ্ট না করিলে কেষ্ট পাইবে কি করিয়া বন্ধু!

দেশের সব অঞ্চল থেকে আসা তসলিমা বিরোধী বিশাল বিশাল সভা আর মিছিলের খবর ছাপা হচ্ছে জাতীয় পত্রিকাগুলোয়। এদিকে সরকারি দলও মাঠে নেমেছে। রাজশাহীর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংসদ সদস্য আজিজুর রহমান, এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বড় বড় বক্তা নিয়ে আয়োজিত এক সভায় বলেছেন সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক বলেছেন, এদেশীয় রুশদীরা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এদের সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। ইসলাম একটি

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অপব্যাখ্যা সহ্য করা হবে না। ইসলামের গুণ গাইতে গাইতে তিনি বলেন, দুচারজন ইসলামের শত্রু ছাড়া বিশ্বের সকল মনীষী স্বীকার করেছেন আজকের জ্ঞান বিজ্ঞান যে পর্যায়ে এসেছে তা ইসলামের কারণেই। ইসলামের আলোকে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে।

এ বাড়ির পাট চুকেছে আমার। মধ্যরাতে ক আর ঙ এসে গাড়ির পেছনে মুখ মাথা ঢাকা আমাকে বসিয়ে নিয়ে যান ঙর বাড়িতে। পা টিপে টিপে ঢুকে যাই ঙর লাইব্রেরী ঘরটিতে। ঙ বলে দিয়েছেন বাড়ির অন্য কেউ জানে না যে আমি এ ঘরে আছি, সুতরাং এ ঘর থেকে আমাকে বেরোনো চলবে না, ঘরের ভেতর কোনও শব্দ করা চলবে না।

গোপনে গোপনে কেবল শ্বাস নিই, শ্বাস ফেলি। শ্বাস প্রশ্বাসের এই শব্দটুকুও না জানি কবে কখন শুনবো যে আমার করা চলবে না।

উনিশ জুন, রবিবার

শামসুর রাহমান কলাম লিখেছেন ভোরের কাগজে, *নইলে বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে।* শুরুতে বলেছেন 'আমরা যারা লেখক শিল্পী এবং সাংবাদিক তারা আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং বিপন্ন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে আমরা স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। পথে নেমেছি, বহু ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছি আমরা। .. স্বৈরশাসককে হটিয়ে আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম, তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়িত হবে ভেবে আশান্বিত হয়েছিলাম। .. জনগণের রায়ে একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। বহুদিন পর গণতন্ত্রের উজ্জ্বল মুখ দেখার আশায় উদগ্রীব হয়ে রইলাম। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়েই বেমালুম ভুলে গেল তিন জোটের রূপরেখার কথা। গণতন্ত্রের লেবাসের আড়ালে স্বৈরাচারই বহাল রয়েছে। বর্তমান সরকারের ক্রিয়া কলাপে আজ গণতন্ত্র সঙ্কটাপন্ন। গণতন্ত্রের একটি প্রধান শর্ত বাক স্বাধীনতা। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাক স্বাধীনতা খর্ব করার কোনও অবকাশ নেই। যত মত তত পথ। প্রত্যেকেরই নিজের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তি যেমন নিজের মত প্রকাশ করতে পারবেন, তেমনি একজন নিরীশ্বরবাদীও স্বমত প্রকাশ করতে পারবেন। নিজ নিজ মত প্রকাশের জন্যে কেউ নিগৃহীত, উৎপীড়িত হবেন না ডড এটাই গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করবেন। আস্তিক এবং নাস্তিকের অধিকার অভিন্ন থাকবে। ফরাসি লেখক ভলতেয়ার বলেছেন, তোমার মতের সঙ্গে আমি একমত নই, কিন্তু তুমি যাতে অকুণ্ঠচিত্তে নিজের মত প্রকাশ করতে পারো, সেজন্যে আমি আমার রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়ব। ভলতেয়ারের এই অমর উচ্চারণ প্রকৃত গণতন্ত্রেরই বাণী। কিন্তু আমাদের দেশে কী হচ্ছে? সত্যিকার গণতন্ত্রচর্চা কি হচ্ছে এখানে?

সখেদে বলতে হচ্ছে, না। মত প্রকাশের জন্য খণ্ডিত হচ্ছেন লেখক ও সাংবাদিক। মসিজীবীদের ওপর সবসময় খাঁড়া ঝুলছে। কবে কার গর্দান যাবে, কেউ বলতে পারে না। যে লেখক যা বলেননি তা লেখকটির ওপর আরোপ করে তাঁকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এখানে স্বাভাবিকভাবে তসলিমা নাসরিনের কথা এসে পড়ে। . .' এরপর আমার প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ বলে সাংবাদিকদের প্রসঙ্গে আসেন, আহমদ শরীফের বাড়িতে হামলার প্রসঙ্গ টানেন। তারপর বলেন, 'বিএনপি সরকার দেশটিকে ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদী দলগুলোর কাছে বন্ধক দিতে আদা জল খেয়ে লেগেছেন। যারা বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ছিল আগাগোড়া, যাদের নেতা (গোলাম আযম) বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও বিদেশে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, যারা একাত্তরে ভুল করিনি সগর্বে বলে বেড়ায়, তারাই যখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তিদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়, তখন তাদের কী আখ্যা দেওয়া যায় তা জনসাধারণের উপরই রইল।' এরপর, আগাগোড়া নাস্তিক শামসুর রাহমানকে খানিকটা ডিপ্লোমেট হতে হয়, তিনি বলেনডড-'ইসলাম, আমরা জানি, শান্তির ধর্ম। ইসলামের নামে যারা অশান্তির সৃষ্টি করে, ক্ষমতা দখলের জন্যে ধর্মান্ধতার আশ্রয় নেয়, ধর্মকে ব্যবহার করে সওদাগরের মত তখন কি আমরা মারহাবা মারহাবা বলে উল্লাসে ফেটে পড়ব? ইসলাম বিপন্ন, এ কথা সেই শৈশবকাল থেকে শুনে আসছি। যারা প্রকৃত আলেম এবং ধার্মিক,তাঁরা বোঝেন ইসলাম রক্ষার সর্বশক্তি আল্লাহতালার আছে। ইসলামের বিপন্নতা ঘোচানোর অজুহাতে কারো ইসলামের রাখওয়ালা সেজে অন্যদের শান্তি নষ্ট করার, দাঙ্গা ফ্যাসাদ করার কোনও প্রয়োজন নেই। যাকে তাকে মুরতাদ বলে গলাবাজি করাও নিরর্থক। যারা কোনও লেখকের মাথার বিনিময়ে লক্ষ টাকা ঘোষণা করে প্রকাশ্য জনসভায়, সর্বক্ষণ সরলমতি মানুষকে প্ররোচিত করে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার জন্যে, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আবর্জনা বলার ঔদ্ধত্য দেখায়, হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, সেসব ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে সরকার কেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন না? কাউকে হত্যা করতে উৎসাহ দান কি দণ্ডনীয় অপরাধ নয়? সরকারের কাছে আমাদের আরেকটি প্রশ্ন, আপনারা হরতাল বিরোধী, হরতাল হলে আপনাদের উন্নয়নের জোয়ারে ভাটা পড়ে, এমন কথা জোরে শোরে বলে থাকেন। কিন্তু ৩০ জুন যে তথাকথিত হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আপনারা নিশ্চুপ কেন? এই হরতাল সফল করতেই যেন নীরবে সমর্থন জানাচ্ছেন তাদের প্রতি। ..'

শেষের এই কথাগুলি খুব প্রয়োজনীয়। ডড'যে প্রতিক্রিয়াশীল, ফ্যাসিবাদী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির দাপট বাড়ছে বৈ কমছে না, তাদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির প্রতি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতি। এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে না পারলে বিপণ্ন হবে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি। মানবতাবাদী, প্রগতিশীল চিন্তাধারা রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা নিমজ্জিত হব মধ্যযুগীয় অন্ধকারে, কূপমণ্ডুকতায় আবিল হয়ে উঠবে আমাদের জীবন। যাদের পূর্বসুরীরা কাজী নজরুল ইসলামের মত মহৎ প্রাণ কবিকে কাফের আখ্যা দিতে পারে, তারা এ দেশের সৃজনশীল লেখক ও

ভাবুকদের বাকরুদ্ধ করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। এখন থেকেই সেই পাঁয়তারা চলছে তাদের। আমরা কি এদের বশ্যতা স্বীকার করবো, না কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো, এর সদুত্তর এই মুহূর্তেই দিতে হবে আমাদের। নইলে বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে। যেসব ফতোয়াবাজ মনে করে যে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা তারা ফণা তুলেছে, সেই ফণা দেখিয়ে অনেককে দলে টানার অপচেষ্টায় মেতেছে। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই ফণার ছোবল থেকে বাঁচাতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত আমাদের প্রাণের স্বদেশকে পাকিস্তান বানানোর চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে হবে।'

আজ কবীর চৌধুরী আর সৈকত চৌধুরী দুজন মিলে একটি কলাম লিখেছেন আজকের কাগজে। মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়? এই প্রশ্ন তাঁদের। কলামটি আমার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছেন, মামলার ব্যাপারটি তুলে মন্তব্য করেছেন, আবেগ এবং যুক্তির কথা বলেছেন। 'ধর্ম পুরোপুরিভাবেই ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতি ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়, মানুষ যখন আবেগের স্রোতে গা ভাসায়, তখন যুক্তির চোখ অন্ধ হয়ে যায়। বলেছেন, যুক্তি মানুষকে সভ্য হতে শেখায়, প্রগতি, কল্যাণ এবং এবং সভ্যতার ধারাবাহিত ক্রমবিকাশের গতিবেক ত্বরান্বিত করে। অন্ধ আবেগ সকল যুক্তির শালিনতাকে বর্বর ভাবে বর্জন করে, যা স্বাভাবিকভাবেই মানবসমাজ এবং মানবতাবাদের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। আর আবেগের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা সঙ্গত কারণেই কুসংস্করাচ্ছন্ন, অজ্ঞ, পশ্চাৎপদ ও দারিদ্র্যপূর্ণ জনজীবনে জায়গা করে নেয়। কারণ নিয়তিবাদী মানুষ ধর্মগ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং জীবন যাপনে ধর্মের পারলৌকিক বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। আবার এই আবেগকে পুঁজি করে একদল কায়েমী স্বার্থপর বংশীবাদক সমাজে তাদের সীমাহীন লালসার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। একচোখা, বৈষম্যপূর্ণ এই সমাজব্যবস্থায় নিপীড়নের শিকার জন সাধারণ মানুষ। রিক্ত নিঃস্ব এই মানুষগুলো পরবর্তীকালে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না যার ফলশ্রুতিতে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ব্যবস্থায় পুরোপুরি ধস নামে। ..

এদিকে মৌলবাদীরা যখন নুরজাহানকে মাটিতে পুঁতে হত্যা করছে, ধর্মের নামে অমানবিক ফতোয়া দিয়ে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র অফিসগুলোতে হামলা চালাচ্ছে, গত ৩ জুন পুরানা পল্টন সিপিবি অফিস সংলগ্ন বইয়ের দোকান পাঠকমেলায় অবাধ লুটতরাজ এবং কোরান হাদিস শরীফের অবমাননা করেছে তখন ধর্মের ভেকধারী এই সরকার কেন তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না? গোটা জাতির কাছে আজ এই প্রশ্নের জবাব সরকারকে দিতে হবে। নয়ত সরকার, প্রগতিশীল সকাল কার্য রোধ করার মাধ্যমে নিন্দিত, ঘৃণিত, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে তুষ্ট করছে বলে প্রমাণিত হবে। মূলত এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকার স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে মদদ যোগাচ্ছে। দলগুলোর লাগাতার সংসদ বর্জন, বাজেট অধিবেশনে বিরোদী দলগুলোর অনুপস্থিতি সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংকট থেকে

জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর কৌশল হিসেবে সরকার এই রাজনৈতিক অপকৌশল বেছে নিয়েছে । কিন্তু এই কৌশল সরকারের জন্যে আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত সময়ে তসলিমার জীবননাশের হুমকি, মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা, লজ্জা উপন্যাস নিষিদ্ধকরণ এবং তসলিমার পাসপোর্ট আটককে সরকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে চেয়েছিল। অবশ্য তসলিমার নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ জীবননাশমূলক উস্কানিদাতাকে গ্রেফতার না করায় সরকারের প্রতি সকল সচেতন মহলের নিন্দা অব্যাহত ছিল। বর্তমানে উদ্ভূত সংকট নিরসন না করে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোর চেষ্টায় সরকার তসলিমার বিরুদ্ধে একতরফা এই অপতৎপরতা শুরু করেছে। কিন্তু এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে লুকিয়ে রাখা সরকারের মৌলবাদী রূপটি জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যতই এই ছদ্মবেশ খসে পড়ছে, আমরা ততই আতঙ্কিত হচ্ছি। কারণ সীমাহীন কূপমণ্ডুকতা, পশ্চাদপদ চিন্তা চেতনা সরকারের চরিত্রে স্থায়ী ছাপ এঁকে দিচ্ছে। এতে করে খুব শিগগিরই আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশ মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। বস্তুত, তসলিমার বিরুদ্ধে সরকারের এই বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ সম্পূর্ণভাবে পূর্ব পরিকল্পিত। বিগত সময়ের ফতোয়ার মাধ্যমে তসলিমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তসলিমা আইনের আশ্রয় চেয়ে বসেন। বাধ্য হয়ে শুধু লজ্জা উপন্যাস নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং পাসপোর্ট আটকের মধ্য দিয়ে সরকারকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পরবর্তী সময়ে তসলিমার স্বপক্ষে এবং সরকারের বিপক্ষে বিশ্বব্যাপী যে জনমত গড়ে ওঠে তাতে সরকার তার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সরকার তককে তককে ছিল কবে, কখন, কোথায় তসলিমা সর্বজনীনতা উপেক্ষা করে নিজস্ব কোনও মন্তব্য করেন এবং সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আইনের(!) মাধ্যমে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এ কথা আজ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক তসলিমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, এবং জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তসলিমার বহির্গমনের বিধিনিষেধের সরকারি মৌলবাদী চরিত্রের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়েছে, যা তাদের ক্রোধান্বিত জিঘাংসারই বহিঃপ্রকাশ। তসলিমার প্রতি সরকারের এই আগ্রাসন লেখকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। তাই আমরা সরকারের প্রগতিবিরোধী সকল মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই এবং এর বিরুদ্ধে সকল প্রগতিশীল সকল বিবেকবান মানুষ, সমাজ ও সম্প্রদায়কে সোচ্চার হবার অনুরোধ জানাই।'

এ দুটো লেখা আমার মন ভাল করে দেয়। দেশের প্রধান দুজন বুদ্ধিজীবী আজ আমার কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে কোনও দ্বিধা করেননি, এবং এ সময়ে সব চেয়ে জরুরি যে বিষয়টি, মৌলবাদীদের প্রতিহত করা, তার আহবান তাঁরা জানিয়েছেন। আমার আর মনে হতে থাকে না যে আমার ফাঁসির ব্যাপারটি আজ খুব বড় একটি ইস্যু। আমার মাথার চেয়ে অনেক মূল্যবান এই দেশটি। দেশটিকে মৌলবাদের কবল থেকে রক্ষা করা এখন সবচেয়ে জরুরি। আমার দুঃখ হয়, মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে আমার অনুপস্থিতির জন্য। আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে

নিজের ফাঁসিটি ঠেকাতে। ব্যস্ত থাকতে হবে যায় যায় জীবনটিকে যেতে না দিতে। ঙর বাড়িতে আমি, অথচ ঙর সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সুযোগ নেই। ঙ এ ঘরে আমার সঙ্গে কথা বললে শব্দ শুনে নিচতলা থেকে যে কেউ উঠে আসতে পারে ওপরে। যে কারও সন্দেহ হতে পারে যে এ ঘরে ঙ ছাড়া অন্য কেউ আছে। ঙ যদি তাকে বাধা দেয় এ ঘরে ঢুকতে, তখন তার সন্দেহ আরও ঘন হতে পারে যে এই ঘরে নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ কেউ আছে। এবং তখন এই সন্দেহ একজন থেকে আরেকজনে সংক্রামিত হবে, এবং অবশেষে রাষ্ট্র হবে। নিঃশব্দে বসে থাকা, নিঃশব্দে শ্বাস ফেলা এখন আমার জন্য যেমন জরুরি, ঙর জন্যও তেমন। আমি আমাকে আর ঙকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি, যখনই সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ শুনি। দোতলায় ঙর শোবার ঘরের পাশেই এই লাইব্রেরি ঘরটি। নিচের তলায় অন্যদের ঘর, বৈঠক ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি। ঙ সকালে আমাকে পত্রিকা দিয়ে গেছেন পড়তে, আর ইশারায় বলে গেছেন, বাথরুমে যেতে হলে যেন একটি টোকা দিই টেবিলে, তাতে তিনি বুঝবেন, আশেপাশে দেখবেন কেউ আছে কি না, তারপর আমাকে ইঙ্গিত করলে আমি ঙর ঘরে দ্রুত ঢুকে লাগোয়া বাথরুমটি যেন ব্যবহার করি। ঙ পাশের ঘরে শুয়ে বসে বই পত্রিকা পড়বেন, কান খাড়া থাকবে আমার টোকায়। আর যেহেতু বাড়ির খাবার আমাকে দেওয়া সম্ভব নয়, আমার জন্য তিনি বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসবেন। দুশ্চিন্তায় গলা জিভ এমন শুকিয়ে আছে ঙর যে কথা তিনি চাইলেও শব্দ করে বলতে পারেন না।

মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে ৩০ জুনের হরতাল প্রতিরোধ কর্মসূচির আহবান প্রথম কোনও রাজনৈতিক দল জানায়নি, জানিয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। ২৭টি সাংস্কৃতিক সংগঠন একাত্মতা প্রকাশ করেছে জোটের সঙ্গে। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, আরণ্যক, ঢাকা থিয়েটার, নাট্যচক্র, দেশ নাটক, নাট্যকেন্দ্র, ঢাকা নাট্যম, পদাতিক নাট্য সংসদ, গ্রাম থিয়েটার, মুক্ত নাটক দল, নবধারা নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা সুবচন, বাংলাদেশ থিয়েটার, প্রেক্ষাপট, ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী, গণশিল্পী সংস্থা, ঢাকা থিয়েটার মঞ্চ, স্বরশ্রুতি, কণ্ঠশীলন, মুক্তধারা, কারক নাট্য সম্প্রদায়, শ্রোত আবৃত্তি সংসদ, নটরাজ, দিব্য ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় চারু শিল্পী পরিষদ। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আহবায়ক খালেকুজ্জামান এক বিবৃতিতে মৌলবাদী শক্তি কর্তৃক আহুত ৩০ জুনের হরতাল প্রতিহত করার জন্য সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবানকে স্বাগত জানিয়েছেন। বলেছেন, ‘মৌলবাদী শক্তি দীর্ঘদিন থেকেই গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার ওপর আঘাত হানার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ফলে তসলিমা নাসরিনকে উপলক্ষ্য করে ফতোয়াবাজ মৌলবাদী শক্তি বিভিন্ন মতামতের মধ্যে উন্মুক্ত তর্ক বিতর্কের পরিবেশ হরণ করতে চায় যা মত প্রকাশ ও লেখকের স্বাধীনতার পরিপন্থী।’ এদের অপতৎপরতা প্রতিহত করার জন্য সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মহল ও ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন তিনি। আজ বিকেল ৫ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে বাসদ। জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আশেক খান ও সাধারণ সম্পাদক সুরঞ্জন ঘোষ

ফতোয়াবাজ, ধর্মান্ধ, কট্টর মৌলবাদী ও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে প্রতিহত করার জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহবান জানান। ওয়ার্কাস পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হায়দার আকবর খান রনো বলেছেন ধর্মের আবরণে নৈরাজ্য সৃষ্টি ও ক্ষমতা দখলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সজাগ থাকতে হবে। ওয়ার্কাস পার্টি ৭ দফা কর্মসূচী নিয়ে ২৭ জুন সমাবেশ করবে। ২৭ জুন ঐক্যবদ্ধ নারীসমাজ ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে মিছিল করবে। বাংলাদেশ লেখক শিবির হরতাল প্রতিরোধ করার জন্য আহবান জানিয়েছে। আজ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য পরিষদ প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ থেকে হরতাল প্রতিরোধের আহবান জানানো হয়েছে।

আবার একটু শোনা যাচ্ছে যে মৌলবাদীদের হরতাল নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে বিরোধ চলছে। দেশে আওয়ামী লীগ কোনও হরতাল ডাকলে সরকার থেকে হরতালের বিরুদ্ধে বাণীর পর বাণী দিতে থাকে, কিন্তু এবারের হরতালের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। কিন্তু কিছু কিছু বিএনপির মন্ত্রী হরতাল বন্ধ করার কথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেও কোনওরকম মুখ খোলাতে পারেননি। বিরোধী দলের কেউ কেউ বলছে, যে, সরকারই এই হরতাল করাচ্ছে।

ওদিকে *ইবলিসের দোসর তসলিমার* ফাঁসির দাবিতে ৩০ জুন হরতাল সফল করার জন্য সভা সমাবেশ মিছিল চলছেই সারাদেশে। ইসলামী ঐক্যজোট ৩০ জুন যে করেই হোক হরতাল করার কথা বলছে। মুসলিম লীগ বলছে। মসজিদে মসজিদে সভা হচ্ছে। ফজলুল হক আমিনী চকবাজারের শাহী মসজিদ চত্বরের বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমাদের ঘোষিত ৩০ জুন তারিখের হরতাল হবে কোরানের ইজ্জত রক্ষার জন্য হরতাল। এই হরতাল প্রতিহত করার শক্তি এদেশে নেই। এই জমিনে আল্লাহর কোরানকে অবমাননা করা হয়েছে, ইনশাল্লাহ এই জমিনেই কোরানী শাসন কায়েম হবে। বর্তমান সংসদে যে অচলাবস্থা চলছে, কোরানী প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ অবস্থা থেকে উন্নতি সম্ভব নয়। এদেশের সংসদ চলবে কোরানের বিধান অনুযায়ী, অন্যথায় শান্তি আশা করা যায় না। জাতি আজ দুই শিবিরে বিভক্ত, একদল হল কোরানের ইজ্জত রক্ষা করতে চায়, অন্যদল চায় ইসলাম ও কোরানকে মিটিয়ে দিতে। আগামী ৩০ তারিখেই প্রমাণ হবে কারা থাকবে আর কারা ধুলোয় মিশে যাবে।'

এসব হচ্ছে, তারপরও আমার মন ভালো। ভালো এইজন্য যে মৌলবাদ প্রতিরোধের জন্য প্রগতির পক্ষের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

ঙ আমার জন্য ঠোঙায় করে দুপুরের খাবার নিয়ে এলেন। ফিসফিস করে আমাদের কথা হল কিছুক্ষণ দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। মৌলবাদী দল সরকারি দলের সহযোগিতায় প্রতিপক্ষের চেয়েও শক্তিমান হয়েছে, একে কি কোনও রকম প্রতিরোধ দিয়ে ঠেকানো সম্ভব! সম্ভব না হলেও সম্ভব করার সবরকম চেষ্টা করতে হবে, এছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। প্রতিরোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আমার জীবনের ঝুঁকি যে একবিন্দু কমেনি, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ঙ।

বাথরুমে যাওয়ার ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য সারাদিন খুব না হলেই নয় কিছু মুখে দিই। আমার ক্ষিধে তেষ্টাও পায় না আজকাল। একদিক দিয়ে ভালই। রোবটের মত জীবন। ঘুম নেই। সারারাত জেগে থাকি। নিঃশব্দে বই পড়ি। কাশি এলে মুখে বালিশ চেপে শব্দ গোপন করি। কান্না এলেও তাই।

কুড়ি জুন, সোমবার

গতকাল প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপতৎপরতা রোধ করতে *জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি* গঠন করা হয়েছে। প্রগতির পক্ষের সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকরা ছিলেন, নামী সাংবাদিকরা ছিলেন, শামসুর রাহমান, কবীর চৌধুরী, কে এম সোবহান, নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন। দুজন আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন, আবদুর রাজ্জাক আর আমির হোসেন আমু। পাঁচ দলের নেতা কাজী আরেফ আহমেদ ছিলেন। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির লোকও ছিলেন। কমিটিতে শামসুর রাহমান আহবায়ক, আজকের কাগজের সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ সদস্য সচিব। আগামী ৩০ জুন সকাল ১০টায় ঢাকাসহ সারাদেশে প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছে জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি। সেদিন সকলকে সাইকেল-রিক্সা, মটর সাইকেল, গাড়ি, বাস, ট্রাকসহ যে যেভাবে পারেন যানবাহনযোগে ঢাকাসহ সারাদেশে সংশ্লিষ্ট প্রেসক্লাবে সমবেত হওয়ার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে আহবান জানানো হয়েছে। দেশের সকল স্তরে জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করারও আহবান জানানো হয়।

জামাতে ইসলামী বা কোনও মৌলবাদী দল আজ পর্যন্ত এ দেশের কোনও ক্ষুদ্র অঞ্চলেও হরতালের ডাক দেওয়ার সাহস পায়নি। আজ তাদের সাহস কতদূর পৌঁচেছে যে তারা দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিচ্ছে। এ সাংঘাতিক একটি ঘটনা বটে।

সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক মোর্চা গড়ার চিন্তা ভাবনা করছে অনেকে। দেশজুড়ে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত ফতোয়াবাজ ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক শক্তির সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি মোর্চা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লেখক শিবির বলছে হরতাল প্রতিরোধ কর। জাসদ বলছে, কেবল প্রতিরোধ নয়, স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী চক্রকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। ঢাকার রাজপথে এতদিনে মিছিল বেরোলো মৌলবাদ বিরোধী দলের।

ধর্মের নামে ফতোয়াবাজি, উন্মাদনা, উস্কানি রুখে দাঁড়াও
সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও।

নেতারা বলেছেন, ৩০ জুন হরতাল কর্মসূচির দাঁতভাঙা জবাব এদেশবাসী দেবে। বলেছেন, আমাদের স্বাধীনতা ও পতাকার ওপর বিষ ফণা তুলে আছে একটি অশুভ

শক্তি, যে কোনও মূল্যে এদের রুখতে হবে। ছাত্রনেতারা ইনকিলাব আর দৈনিক সংগ্রাম নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। ২৩ জুন মিছিল, সমাবেশ, ২৫ জুন ফতোয়াবাজদের প্রতিরোধ করার দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করবে। হরতাল প্রতিরোধ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন এসেছে টেলিভিশন এবং মঞ্চ নাটকের বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছ থেকে।

ওদিকে গতকাল মাদ্রাসার ছাত্ররা সংসদ ভবনের দিকে বিশাল মিছিল নিয়ে গেছে। তসলিমার ফাঁসির দাবিতে সংসদ ভবন ঘেরাও অভিযান। ৩০ জুনের হরতালবিরোধী মহল মুতরাদচক্রের দোসর ও সমর্থক, এই ঘোষণা দিয়েছে ইতিমধ্যে। *বাংলাদেশের শহর বন্দর , গ্রাম গঞ্জ নির্বিশেষে সর্বত্র জোর আওয়াজ উঠেছে ধর্মদ্রোহী তসলিমা ও নাস্তিক আহমদ শরীফসহ তাদের সাঙ্গপাঙ্গ ও মদতদাতাদের ফাঁসি দিতে হবে।* তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি কার্যকর, জনকণ্ঠ নিষিদ্ধ, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা এবং এনজিওদের. ব্লা ব্লা ব্লা। ইসলামী ছাত্র শিবির বলেছে, দেশ থেকে মুরতাদচক্রকে উৎখাত করতে হবে। ইসলামী চিন্তাবিদরা ঐক্যের আহবান জানিয়েছেন। জাতীয় সুন্নী গণআন্দোলন প্রস্তুতি পরিষদের নেতারা বলেছেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
কেবল ছাত্রঐক্যের মিছিল নয়। বাসদের মিছিল বেরিয়েছে।
যুদ্ধাপরাধী ও ফতোয়বাজদের অশুভ আঁতাত রুখে দাঁড়াও

মৌলবাদীদের মিছিল, এবং মৌলবাদবিরাধী দুটো দলের মিছিল। এ দুই মিছিলের মধ্যে মৌলবাদীর মিছিলে যদি ৩০ হাজার লোক, মৌলবাদ বিরোধীতে ৩০০ লোক। এটি শুনতে ভাল লাগে না, এটি দেখতে ভাল লাগে না, এটি বিশ্বাস করতে ভাল লাগে না, তবে এটিই সত্য ঘটনা।

কলাম লেখা চলছে পুরোদমে। দু দলের পত্রিকায় সমানতালে। ফয়েজ আহমেদ লিখেছেন দেশের স্বার্থে ৩০ জুন অপশক্তির বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কৃষ্ণপদ সরকার লিখেছেন জাতীয় জীবনে এখন এসেছে বড় কঠিন সময়। বিপক্ষ দল থেকেও একটি ভাষায় আক্রমণ চলছে।

একুশ জুন, মঙ্গলবার

ঙর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে একজনের। ঙ গিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে যেখানে শিল্পীরা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। জ নিজে একজন শিল্পী। শিল্পীর চোখ বোঝে ঙর চোখ দুটোয় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শঙ্কা। ঙর চোখ যেন কিছু খুঁজছেও, কাউকে খুঁজছে। জ ও তাকিয়ে থাকেন ঙ র দিকে। ঙর চোখ দুটো চারদিকে ঘুরে ঘুরে জ র চোখে গিয়ে স্থির হয়। আবার দুজনের চোখ

চারদিকে ঘুরে এসে স্থির হয় দুজনের চোখে। সেই চারচোখে একটি ভাষা আছে। ভাষাগুলো দুজনই পড়তে চেষ্টা করেন। পড়তে পড়তে দুজন এগোতে থাকেন পরস্পরের দিকে। কাছে এসে খুব হালকা দুএকটি কথা শুরু হয় এভাবে।
ডডকেমন আছেন?
ডডএখন কি আর ভাল থাকার কোনও অবস্থা আছে!
ডডভাবাও যায় না এইসব হচ্ছে দেশে। প্রতিরোধ ছাড়া আর উপায় নেই।
ডডনিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।
জ বোঝেন ঙর ঠিক মন নেই এই প্রতিরোধের আন্দোলনে। ঙ কিছু নিয়ে গভীর চিন্তা করছেন।
জ হঠাৎ বলেন, আমি কি কোনও রকম সাহায্য করতে পারি আপনাকে?
ঙ চমকে ওঠেন, জিজ্ঞেস করেন, কি রকম সাহায্য?
ডডযে কোনও সাহায্যই। আমি পারব করতে। জ ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে ইতি উতি তাকিয়ে বলেন।
ডডকি পারবেন?
ডডআপনার যে সাহায্যটা এখন দরকার সেটা আমি করতে পারব।
ডডআমার যে কোনও সাহায্য দরকার তা কি করে বুঝলেন?
ডডআমি অনুমান করছি।
ডডকি রকম শুনি।
ঙ আর জ এগিয়ে যেতে থাকেন মানুষের ভিড় থেকে দূরে..
ডডআপনার কি কোনও নিরাপদ কোনও জায়গা দরকার?
ডডনিরাপদ জায়গা?
ডডহ্যাঁ নিরাপদ জায়গা। যদি দরকার হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। আর একটি কথা, আমাকে বিশ্বাস করবেন।
জ ঙর হাতে তাঁর টেলিফোন নম্বর লেখা একটি কাগজ দিয়ে ভিড়ে মিশে যান।
আশ্চর্য এই জ। জ আমার চেনা। ঙ আমার চেনা। কিন্তু জর সঙ্গে কোনওদিন ঙকে নিয়ে, অথবা ঙর সঙ্গে জ কে নিয়ে কোনও কথা আমার কোনওদিন হয়নি। জ এবং ঙ কারও জানার কথা নয় যে দুজনই আমার চেনা বা পরিচিত।

ঙ এরপর জর সঙ্গে কথা বলে নিরাপদ জায়গাটির সন্ধান পান। এরপর গভীর রাতে, হঠাৎ, এমন কী আমাকেও বলা হয় না সেটি যে আজ রাতেই, আমার মুখ মাথা, গা হাত পা ঢেকে গাড়িতে উঠতে হয়, গাড়িতে ওঠার সময় কারও যদি চোখ পড়ে আমার দিকে, ভেবে নেবে এবাড়ির কোনও পর্দানসীন বৃদ্ধা (ঙর মা) কে বুঝি হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে অথবা বৃদ্ধা তাঁর কন্যার বাড়িতে নাতনির অসুখ দেখতে যাচ্ছেন। গাড়ির পেছনে আমাকে শুয়ে পড়তে হয় কুকুর কুণ্ডুলি হয়ে, আমার শরীরখানা ঢেকে রাখা হয় হাবিজাবি জিনিস দিয়ে। গাড়ি কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে ডড আমার সাধ্য নেই অনুমান করি। যখন থামে, আমাকে দ্রুত নেমে আসতে হয়। ক আর ঙ আমার দু পাশে এমন ভাবে হাঁটেন যেন আমি আড়ালে পড়ে থাকি। কেউ নেই

সামনে আমাদের দিকে নজর দেওয়ার। সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন ঝ। এটি ঝর বাড়ি। ঝ আমাদের অপেক্ষায় বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা ঢুকে যেতেই তিনি দরজায় বড় একটি তালা লাগিয়ে দিলেন। এখন ঝ কে নিঃশব্দে অনুসরণ করছেন ক, ককে আমি, আমাকে ঙ। ঝ যে পথটি দিয়ে আমাদের তাঁর ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন, সেটি বাড়ির পেছন দিকের পথ। আড়াইতলায় একটি ঘরে আমাদের নিয়ে ঢুকলেন ঝ। ছোট্ট একটি ঘর। ঘরের মেঝেয় একদিকে একটি তোশক পাতা, অন্যদিকে দুটো চেয়ার। মাঝখানে কাঠের তৈরি একটি ভাস্কর্য। একটি দাড়িঅলা দৈত্যের মুখ, এক হাত লম্বা জিভ বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে।

ঝ আমার আগে থেকে চেনা। চেনা কাউকে দেখলে মানুষের মুখে হাসি ফোটে। সম্ভাষণ জানায়। অথচ ঝ র মুখ থমথমে। আমার মুখ ফ্যাকাসে। কেউ আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছি না কেমন আছেন বা কেমন আছো। আমরা জানি আমরা কেমন আছি। আমাদের জিজ্ঞেস করার কোনও প্রয়োজন হয় না। ক আর ঙর সঙ্গে খুব নিচু স্বরে কথা বললেন ঝ। বললেন এ বাড়িতে অনেক মানুষ আছে, আট বছর বয়সী ঝর একটি পুত্রসন্তান আছে, আর আছে তিনজন কাজের মানুষ, একজন দারোয়ান। সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাকে এ ঘরে বাস করতে হবে। ঘরের সঙ্গেই লাগানো ছোট একটি গোসলখানা, এটি ব্যবহার করতে হবে যথাসম্ভব নিঃশব্দে, যেন কোনও শব্দ নিচ তলায় না পৌঁছোয়। এ ঘর বাইরে থেকে তালা বন্ধ থাকবে। বাড়ির লোকেরা জানবে এ ঘরে কোনও প্রাণী নেই। এ ঘরের প্রাণীকে তাই অগাধ নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকারের মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। তৃষ্ণা মেটাতে হলে গোসলখানার জলই যথেষ্ট, ক্ষুধা মেটাতে ঝ বাড়ির লোকদের চোখ এড়িয়ে খাবার দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এই হল নিয়মাবলী। কতদিন আমি এখানে থাকতে পারব, এই প্রশ্ন করা হলে ঝ বলেন, যতদিন আমার প্রয়োজন। ঝর এই উদারতায় চোখে জল চলে আসে আমার। জল আড়াল করি হঠাৎ ঘরের পাশে বারান্দাটি দেখতে জানালায় উঁকি দিয়ে। ক আর ঙ চলে যান। কবে তাঁরা আসবেন, কবে আমি জানব জামিনের খবর, তা কিছুই জানি না। তাঁরাও আমাকে জানান না কিছু।

রাতে ঝ আমাকে ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দরজায় চলে যান। যাবার আগে কাঠের জিভঅলা দৈত্যের মুখটি দেখিয়ে কেবল জিজ্ঞেস করেছেন, চিনতে পারছো এই মুখটি কার? আমি উত্তর দেবার আগেই ঝ বললেন, গোলাম আযম। সারারাত আমার পার হয় অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে। কাঠের মত বসে থাকি, পাশে কাঠের গোলাম আযম।

বাইশ জুন, বুধবার

সকাল হয়। পাখির, মানুষের, যানবাহনের শব্দ শুনে বুঝি সকাল। বন্ধ জানালাটির ফাঁকে আটকে থাকা টুকরো টুকরো সাদা আলো দেখে বুঝি যে বাইরে সকাল। শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। বসে থাকি। একটানা বসে থাকতেও আর কতক্ষণ ভাল লাগে! একসময় দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে থাকি। কতক্ষণ আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। হাঁটি। খুব আস্তে পা ফেলে এক পা দু পা। কিন্তু মনে হতে থাকে পা ফেলার শব্দ খুব জোরে হচ্ছে। নিচতলায় শুনতে পাচ্ছে কেউ। অগত্যা বসে থাকি। সকাল দুপুরের দিকে হেলে পড়ে, আমি হেলে পড়ি মেঝেয়। ঝিমঝিম করে মাথা। শরীর অবশ অবশ লাগে।

যখন ঝ ঢুকলেন ঘরে, তখন বিকেল। ঝ আপিস থেকে ফিরে ফাঁক খুঁজছিলেন এ ঘরে আসার। ছেলে ঘুমিয়ে গেলে, ওদিকে কাজের মানুষগুলো একটু জিরোতে গেলে ঝ তাঁর নিজের ভাতের থালাটি নিয়ে উঠে এলেন এ ঘরে। ঝর ভাগের ভাতে আমার ভাগ বসাতে হয়। যে থালাটি ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটির মধ্যে আমার জন্য ভাত তুলে দেন ঝ। তরকারি, মাছ সমান সমান ভাগ করেন। এই অর্ধেকে না হবে আমার, না হবে ঝর। কিন্তু এ ছাড়া আর করার কিছু নেই। এবাড়ির দক্ষ রাঁধুনি যখন পাঁচজনের জন্য রাঁধেন, তখন পাঁচজনের জায়গায় ছ সাতজনও খেতে পারে, কিন্তু বাড়তি খাবার কি করে এ ঘরে পাচার করবেন ঝ! কোনও উপায় নেই। অন্তত ঝ কোনও উপায় দেখছেন না। পাচার করলে জানাজানি হবেই। হলে বাড়ির সকলের সন্দেহ হবে যে ওপরতলায় কোনও প্রাণী নিশ্চয়ই বাস করছে। প্রাণীটি কে, তা জানার জন্য তারা কৌতূহলী হবে। এটি ঝর বাড়ি হলেও, কাজের মানুষগুলো ঝর প্রতিটি আদেশ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও ঝ এখন কাউকে বলতে পারছেন না যে এ বাড়িতে তাঁর একজন অতিথি আছে। অতিথির জন্য ঝর এ বাড়িতে যা ইচ্ছে তা করার অধিকার থাকলেও আমার জন্য একটি আলাদা থালায় ভাত বেড়ে আনতে পারেন না তিনি, ঝকে হাত গুটিয়ে রাখতে হয়। হাতের পায়ে পায়ে আশঙ্কা, কেউ জেনে যেতে পারে অতিথির পরিচয় এবং জানিয়ে দিতে পারে আশেপাশের কাউকে। তারপর এক কান থেকে একশ কান। এইসব ঝামেলার চেয়ে ঝ মনে করেন তাঁর নিজের খাবার থেকে আমাকে ভাগ দেওয়াটাই নিরাপদ। ঝর জন্য কষ্ট হয়। আপিস করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আধপেট খাচ্ছেন। নিজের ভাগে আমি কৌশলে কম খাবার নিতে চেষ্টা করি।

খেয়ে ঝ একটি সিগারেট ধরান। মেঝেতেই আধশোয়া হয়ে সিগারেট ফোঁকেন। গলা চেপে, প্রায় শব্দহীন স্বরে বললেন যে আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি বিশাল এক মিছিল দেখেছেন মোল্লাদের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হরতাল যদি করে ফেলতে পারে মোল্লারা তবে সব্বনাশ হয়ে যাবে। এটা এখন বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য। মোল্লারা ডাকলেই যে হরতাল হয় না এ দেশে, তা আমাদের প্রমাণ করতেই হবে।

ঝর হাতে তাঁর তারহীন ফোনটি। তার কণ্ঠস্বর যদি কারও কানে যায়, ভেবে নেবে বুঝি ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। ঝর কাছে সরে এসে ঘরের বাইরে শব্দ না যায়, এমন স্বরে বলি,আপনার কি মনে হয় হরতাল বন্ধ করা সম্ভব হবে?
ডডএখনও বুঝতে পাচ্ছি না। মোল্লাদের মিছিল তো বিশাল হচ্ছে। ওরা অরগানাইজড। আমাদের গুলোই অরগানাইজড না। এর এটা ভাল লাগে তো ওর ওটা ভাল লাগে না। হাসিনা কি করছে এ সময়? কিচ্ছু না।

ঝ একটি সিগারেট আমার দিকে ছুঁড়ে দেন। সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে একটি টান দিতেই কাশি শুরু হয়। দু হাতে মুখ চেপে কাশি থামাই। সিগারেটটি আমার আঙুল থেকে আলগোছে নিয়ে ঝ সেটি ফুঁকতে থাকেন।

ঝ এখানে বেশি ক্ষণ বসে থাকতে পারেন না। তাঁকে খোঁজা শুরু হলে মুশকিল। তিনি চলে যান। আমি কাতর অনুরোধ করি আজকের পত্রিকাগুলো দিতে। ঘন্টা পার হলে দরজার তল দিয়ে কিছু পত্রিকা ঢুকে যায় এ ঘরে। যেন সারাদিন উপোস থাকার পর এই মাত্র কিছু খাবার জুটেছে, গোগ্রাসে খাবার গেলার মত করে গোগ্রাসে খবর গিলি।

দেশে এখন এটিই সবচেয়ে বড় সংবাদ। হরতাল এবং হরতাল প্রতিরোধ। এমনই অবস্থা এখন যে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি প্রতিরোধ জাতীয় কমিটিকে ঘোষণা দিতে হয়েছে, যে আমরাই কোরআনের পক্ষ শক্তি। ৩০ জুনের হরতালের সপক্ষে স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিসমূহ পবিত্র কোরআন শরীফকে রক্ষার জন্য হরতাল বলে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভাঁওতাবাজি। কারণ এটা বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে মওদুদী কোরআনের অপব্যাখ্যা করেছে এবং তারই সংগঠন জামাতে ইসলামী কোরআনকে বিকৃত করে অপব্যবহার করে ধর্ম ব্যবসা চালাচ্ছে। এরা আসলে ধর্মের নামে ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যবসায়ী স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চায়। তাদের এবারের টার্গেট হচ্ছে প্রগতিশীল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা। অতএব ৩০ জুনের হরতালের সপক্ষে তাদের দাবি সর্বৈব মিথ্যা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল। একাত্তরের হত্যাকারী ভণ্ড মওলানারা কি করে কোরআন ও ইসলাম রক্ষা করতে পারে? বরং এরা কোরআনের কথা বলে মওদুদীবাদকে রক্ষা করার হীন চক্রান্ত করছে। এদেরকেপ্রতিরোধের মাধ্যমেই পবিত্র কোরআনকে রক্ষা করা যাবে এবং এই কমিটি পবিত্র কোরআনকে রক্ষা করার জন্যই এ হরতাল প্রতিরোধের আহবান জানাচ্ছে। প্রকৃত ইসলামের ক্ষতি করার সাধ্য এ ধরনের মওলানা ও স্বার্থান্বেষী ধর্ম ব্যবসায়ীদের নেই। সাধারণত হরতাল ডাকা হয় অধিকার আদায়ের জন্য, অথচ ঐ অপশক্তিরা সংবাদপত্রসহ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য এই হরতাল ডেকেছে। সভায় সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করা হয়, আমরাই কোরআনের পক্ষ শক্তি।

শামসুর রাহমান যে কমিটির সভাপতি, যে কমিটির অনেকে নাস্তিক, অনেকে কোরআন কোনওদিন পড়ে দেখেনি, ছুঁয়ে দেখেনি, সেই কমিটিকে বলতে হয়, দাবি করতে হয়, *আমরা কোরআনের পক্ষ শক্তি।* এটিই বুঝিয়ে দেয় যে মৌলবাদ বিরোধী শক্তি এখন প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে মৌলবাদীদের বাধা দিতে। এখন যদি কোরআনকে ব্যবহার করলে বাধার কাজটি ভাল হয়, তবে এটিকে ব্যবহার করতেও আপত্তি নেই। এই প্রতিরোধ কমিটি একটি ভুল করছে, আমার মনে হয়। কেবল জামাতে ইসলামীকে মওদুদীবাদী বলে দোষ দিয়ে নিজেদের কোরআনের পক্ষ

শক্তি বলে লাভ হবে না কিছু। কারণ জামাতে ইসলামী এই আন্দোলনে কেবল যোগ দিয়েছে, আন্দোলন জামাতে ইসলামী দ্বারা শুরু হয়নি, হরতালের ডাকও জামাত দেয়নি। সুতরাং প্রতিরোধ কমিটি জামাতে ইসলামীকে কোণঠাসা করতে চাইলে অন্য মৌলবাদী শক্তিদের কিছু যায় আসে না। তারা মওদুদীবাদীও নয়, তারা জামাতের নয়, কিন্তু তাদের শক্তি অনেক বড়, জামাতকে সঙ্গে না নিলেও তাদের চলবে। আসলে জামাতে ইসলামীকে ওরা সঙ্গে নেয়নি। জামাতই গিয়ে ভিড়েছে বড় মৌলবাদী আন্দোলনে।

নতুন এক নিয়ম শুরু হয়েছে। মত বিনিময় সভা। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট মতবিনিময় সভা করবে পরশুদিন।

এদিকে মোর্চার বক্তারা যে কোনও ত্যাগের বিনিময়ে আগামী ৩০ জুন আহূত হরতাল সফল করে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। আগামী ৩০ জুনের হরতাল জাতিকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করেছে। ঐদিন প্রমাণ হবে কারা কোরআন হাদিসের পক্ষে, এবং কোন দল বিপক্ষে। তসলিমা, আহমদ শরীফের দালালরা হরতাল প্রতিহত করার ডাক দিয়েছে। তাদের সেই স্বপ্ন কোনওদিন বাস্তবায়িত হবে না।

খেলাফত মজলিস, প্রতিরোধ আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, তাহাফফুজে হারমাইন, ঈমান বাঁচাও দেশ বাঁচাও, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, জমিয়াতুস সাহাবা, মসজিদ পরিষদ বাংলাদেশ, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, পোস্তগোলা ট্রাক মালিক সমিতি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস, অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ কমাণ্ড, অনুপম সাহিত্য সংসদ এরকম কয়েক হাজার ইসলামপন্থীদের সংগঠন সভা সমাবেশ করে হরতালের পক্ষে সমর্থন জানাচ্ছে। জামাতে ইসলামী পবিত্র আশুরা উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। অন্য কোনও বছর আশুরা কোনও ঘটনা নয়, এ বছর একটি ঘটনা বটে। মতিউর রহমান নিজামী এই অনুষ্ঠানে এজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেনের আপোসহীন সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামের নেতৃত্ব নির্বাচনের মৌলিক পদ্ধতিকে বিকৃত করে রাজতন্ত্র কায়েম করা হয়েছিল। ইসলামী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আস্থা ও সমর্থনই হল ইসলামে নেতা নির্বাচনের স্বীকৃত পদ্ধতি। নবী করিম ওরফে হযরত মোহাম্মদ ওরফে আল্লাহর পেয়ারা বান্দা ওরফে আললাহর রসুলের পর চার জন খলিফা একই সঙ্গে মসজিদের ইমামতি ও রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দান করেছেন। নিজামী সেই খলিফার আমলের সুন্দর ব্যবস্থার কথা স্মরণ করেন এবং তেমন ব্যবস্থা এখন এ দেশে চান সৃষ্টি করতে। নিজামী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য হয়ে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কী অবলীলায় বলে গেলেন, বর্তমানে যেসব মুসলিম দেশে শরিয়তি আইন কানুন চালু রয়েছে সেগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না কারণ সেখানে ইসলামী পদ্ধতিতে নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই। তিনি কোনও রাজতন্ত্র চান না, গণতন্ত্র চান না, তিনি সত্যিকার ইসলামতন্ত্র চান এ দেশে।

তসলিমা এবং ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের সম্পর্কে বললেন, কারবালার শহীদদের মত আপোসহীনভাবে জীবনপণ সংগ্রাম চালাতে পারলে আমাদের বিজয় সূর্যের মত

নিশ্চিত। নাফরমানের জীবন যাপনের চেয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রামরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ অধিকতর শ্রেয়। নিজামী তো বলেছেনই, বাকি নেতারাও জেহাদে মৃত্যুবরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহররমের মাস। ইমাম হোসেন মুহম্মদের মেয়ের ঘরের নাতি কারবালায় এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। তাই আজ সেই উদাহরণ টেনে এনে জামাতে ইসলামীর নেতারা বলছেন, ইমাম হোসেনের শাহাদাত অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ হিসেবে সর্বকালব্যাপী প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে শাহাদাত বরণ করা শ্রেয়, আজকের দিনে এই শিক্ষার বড় প্রয়োজন। ১৪শ বছর আগে ইমাম হোসেন যে আদর্শের জন্য জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবন দান করেছিলেন আজ সেই আদর্শ ইসলাম, আল কুরআন ও আল্লাহকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের নজরানা পেশ করতে পারলে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

কী ভয়ংকর আহবান। নেতারা শাগরেদদের বলেই দিলেন, প্রয়োজনে মৃত্যু হোক তোমাদের, এই মৃত্যু পবিত্র, এই মৃত্যু হলে শহীদ হবে, এই মৃত্যু বেহেস্ত নিশ্চিত করবে। নেতারা আসলেই কয়েকটি মৃত্যু কামনা করছেন। মৃত্যু হলে এদেশীয় ঢংএর রাজনীতি শুরু করতে পারবেন তাঁরা। হরতালকারী এবং হরতালপ্রতিরোধকারীর মধ্যে কোনও সংঘর্ষে যদি হরতালকারীদের কেউ নিহত হয়, তবে মহানন্দে হরতালকারীরা লাশের রাজনীতি শুরু করবে। লাশ দেখলে আবেগ উথলে ওঠে জনতার, ইসলাম যে সত্যিই খুন হচ্ছে, তা অনুভব করে সাধারণের ধর্মীয় অনুভূতি শত গুণ বৃদ্ধি পাবে, সরকার বিপাকে পড়ে শেষ পর্যন্ত ব্লাসফেমি আইন চালু করতে বাধ্য হবে, সরকারের মধ্যে যে মৌলবাদী একটি দল আছে, সেই দলটিই চাপ দিয়ে আইনটি করাবে। এর মধ্যে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে হরতাল নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এক দল হরতালের পক্ষে, আরেকদল বিপক্ষে। পক্ষের দলটি শক্তিশালী।

জামাতে ইসলামীর পত্রিকায় সাম্প্রতিক কলামে মখফির লিখেছেন, 'রাজধানীর রাজপথ থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত এখন এক কথা, দেশের সীমান্ত মুছে ফেলার দাবিদার মুরতাদ তসলিমা ও তার সহগামী দালালদের বিচার করো। স্বাধীনতার মেকী দরদী সেজে যারা দেশকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যারা অন্নদাশংকরের কবিতা ছেপে শিশু কিশোরদের বাংলাদেশের বর্তমান সীমানা তুলে দেবার পরোক্ষ উস্কানি দেয়, যেসব পত্রিকা বিদেশী এনজিওর অর্থ খেয়ে তাদের দালালি করে এবং কুরআনের আয়াত নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে ও মহানবীর (সঃ) কুৎসা রচনাকারী মুরতাদ বিরোধী গণআন্দোলন ও প্রতিবাদ দিবসকে বানচাল করতে চায়, তাদের স্বরূপ দেশের কোটি কোটি তওহিদী জনতার কাছে এবার নগ্ন ভাবে ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে জরায়ুর স্বাধীনতাকামিনী মুরতাদ তসলিমার সমর্থক এ দেশে কারা? যারা এখানকার মানুষের ধর্মীয় পরিচয়, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে সুকৌশলে ধ্বংস করে বাংলাদেশের মুসলিম জাতিসত্তাকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্কৃতিতে বিলীন করে দিতে চায়, তারা এখন আত্মপরিচিত। চিহ্নিত তাদের প্রচার বাহনগুলো।

দেশের স্বাধীনতা ও জাতির কলঙ্ক এসব ধর্মদ্রোহী গাদ্দার শ্রেণীর আসল চেহারা ধরা পড়েছে ফতোয়াবাজ আখ্যা দিয়ে পাইকারি ভাবে ধর্মের প্রকৃত সেবক দেশের আলেম সমাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা। এ যাবত তারা সমাজে বিশেষ সম্মানিত কয়েকজন ইসলামী

ব্যক্তিত্বের ও কোনও কোনও ইসলামী সংগঠন ও তার নেতাদের বিরুদ্ধেই নানা মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আসছিল। তাদের চরম মিথ্যা আশ্রিত প্রচারণার ধরন দেখেই মনে হয়েছিল যে, আসলে লক্ষ্য বিশেষ কোনও ইসলামী সংগঠন, ব্যক্তিত্ব নয় বরং ইসলামকে এ দেশ থেকে উৎখাত করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা ও ধর্মদ্রোহী এ মহলটি ইসলাম বিরোধী এনজিওর অর্থে প্রকাশিত কয়টি পত্রিকা হাতে পেয়েই তাদের মূল পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ ইসলামের মূল প্রচারক, সেবক, আলেম, ওলামাকে সমাজে হেয় করার কাজ শুরু করে। ওলামা মাশায়েখকে তারা সমাজের উন্নতি অগ্রগতির দুশমন রূপে চিহ্নিত করার জন্য মিথ্যা প্রচারণা চালায়। তাদের চরিত্র হনন করে বিভিন্ন প্রচার মিডিয়ায় কর্মরত নিজেদের সঙ্গীদের দিয়ে তারা আলেম সমাজের জন্যে অপমানকর কাহিনী তৈরি করে। বিশেষ করে টিভি নাটকের খল চরিত্রে অভিনয়কারীদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওলামা মাশায়েখের পোশাক আশাক, টুপি, জামা, রুমাল, তসবিহ পরিয়ে দর্শক চিত্তে তাদের ভাব মর্যাদাকে ধ্বংস করার অভিযানে লিপ্ত হয়। তারা জানে না, এ পথ কত ভয়াবহ। তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নানা কারণে সমাজের ওলামা একেরাম এ দেশের রাজনীতিতে ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে অংশ না নিলেও তারা এই উপমহাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতিতে আগাগোড়া বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। হিমালিয়ান উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিল? ১৮৫৭ সালেও সিপাহী বিপ্লবের সূচনা কারা করেছিল? মূলত আজ বাংলাদেশে যে সমস্ত ওলামা এখানকার কুখ্যাত মুরতাদ ও নবী বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে জানের বাজি রেখে আন্দোলনে নেমেছেন, তারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের সে সকল সংগ্রামী বীর মুজাহিদদেরই উত্তরসূরী। সাইয়েদ আহমেদ শহীদ, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, হযরত শাহ জালাল, হাজী শরিয়তুল্লাহ ও শহীদ হাজী নেসার আলী তিতুমীর প্রমুখ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও ইসলামী আন্দোলনের পূর্বসুরীরা হিন্দু এবং একশ্রেণীর সুবিধাভোগী মুসলমানের ন্যায় ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের আখের গুছাতে পারতেন, কিন্তু গোছাননি।

এ সকল সংগ্রামী পূর্বসূরীদের উত্তরাধিকারী ওলামা মাশায়েখ এবং দেশের কোটি কোটি তওহিদী জনতাই আজ ইসলামের জন্য রাস্তায় নেমেছেন। জনতার এই আবেগ বিবেচনাবোধ ও পদক্ষেপকে ক্ষমতাসীন সরকারের আর অবহেলা করা উচিত নয়। অতি সত্বর তাদের দাবি মেনে নেয়া, অপরাধীদের শাস্তিদান এবং দেশে ব্লাসফেমি আইন চালু করা সরকারের কর্তব্য। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম সীমান্ত রক্ষা করা যেমন সরকারের জন্য ফরয, তেমনি ফরয জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে রক্ষা করা, যা দেশ ও জাতীয় অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

একটি ধর্মবিদ্বেষী গোষ্ঠী ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকে মিশন হিসেবে নিয়েছে।
অপসংস্কৃতির ধারক বাহকরা মুরতাদ তসলিমা-শরীফ গংদের পক্ষ নিয়েছে।
৩০ জুন হরতাল বিরোধীদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই প্রতিরোধ করা হবে।
ডডএসব কথা ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৩ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শিবিরে বলা হয়েছে। জামাতে ইসলামীর সন্ত্রাসী সংগঠন এই শিবির ঠাণ্ডা মাথায় মানুষের গলা কেটে নিতে, হাত পায়ের রগ কেটে ফেলতে অভ্যস্ত। শিবিরের লোক যখন কোনও কাজে নামে, তখন কাজ তারা করে ছাড়ে যে করেই হোক।

আবছা আলোয় পড়ছিলাম। পত্রিকা থেকে চোখ তুলে দেখি অন্ধকার ঘর। ঘরে কোনও আলো নেই। বাইরে অনেকক্ষণ সন্ধে নেমে এসেছে। চোখ টন টন করে। পত্রিকাগুলো সরিয়ে রেখে অন্ধকারের কোলে মাথা রেখে বসে থাকি। সারারাত।

সারারাত আমার পাশে বড় বড় চোখ করে আমাকে ভয় দেখাতে থাকে গোলাম আযম।

তেইশ জুন, বৃহস্পতিবার

সকাল এগারোটার দিকে দরজার তল দিয়ে দুটো পত্রিকা আর একটি থালা চলে এল। থালায় দুটি রুটি আর একটি ডিমভাজা। বুঝি যে ঝ বাড়ির সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজের নাস্তার অবশিষ্ট আমাকে দিতে পেরেছেন কিন্তু এ ঘরে ঢোকার সুযোগ করতে পারেননি। কিন্তু ঝ র তো আপিসে যাওয়ার কথা, তিনি কি আপিসে যাননি! আমার জানা হয় না কিছু। রুটি ডিম খেতে খেতে পত্রিকা পড়ি। আজও সেই একই খবর। হরতাল সফল আর প্রতিরোধ করার আহবান। হরতাল সফল করার জন্য সভা সমাবেশ আর মিছিল হচ্ছে। হরতালের বিপক্ষে কেবল বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। হরতাল প্রতিরোধের আহবান জানিয়ে ১০৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবৃতি দিয়েছেন। ধর্মের নামে লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের ওপর মৌলবাদী চক্র যাতে আর কোনও ফ্যাসিবাদী হামলা চালাতে না পারে, সেজন্য দেশের সচেতন মানুষকে গ্রাম শহর পাড়া মহল্লাসহ সর্বস্তরে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানানো হচ্ছে। সই করেছেন সমাজের মান্যগণ্য লোকেরা, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ, ডঃ হায়াৎ মামুদ, মুনতাসির মামুন, মোহাম্মদ রফিক, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, হরিপদ ভট্টাচার্য, আবুল হাসানাত, ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এরকম অনেকে। একটি বিবৃতি অন্যরকম। এটি মৌলবীদের দেওয়া বিবৃতি, বিবৃতিটি মৌলবাদীদের বিপক্ষে। এর হোতার সঙ্গে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আছে। সে কথা পরে বলছি। খবরটি এরকম, <u>৩০ জুনের হরতালের সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কোনও সম্পর্ক নেই।</u> বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি এবং দৈনিক জনকণ্ঠ নিষিদ্ধের দাবিতে আগামী ৩০ জুনের হরতালের সঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্রে নিষ্পেষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কোনও সম্পর্ক নেই। ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের মহাসচিব হাফেজ জিয়াউল হাসান বলেন, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোরান ও ইসলামী শিক্ষাকে অপমান করলে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী। কিন্তু এই অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করার অধিকার কিংবা দায়িত্ব আল্লাহ কোনও মানুষকে দেননি। কারণ এ অপরাধ এতই বিরাট ও জঘন্য যে মানুষ এর প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখে না। তাই আল্লাহ এ কাজটি নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন। ইসলাম যুক্তি ও সৌহার্দের ধর্ম, উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করার ধর্ম। কোরানের বিধান অনুসারে সঠিক যুক্তি ও উত্তর প্রদান না করে কথায় কথায় হত্যা ও ফাঁসির ফতোয়া ছড়ানো ন্যায়সঙ্গত নয়। তাছাড়া হুমকি দিয়ে সস্তা আন্দোলনের নেতা হওয়া যায়, কিন্তু ইসলামের খাঁটি সেবক হওয়া যায় না। প্রকৃত আলেমের দায়িত্ব হচ্ছে দেশবাসীর সামনে কোরানের সুন্দর শিক্ষাকে ভালভাবে তুলে ধরা। কিন্তু তা না করে কেউ কেউ ইসলামের নামে অনৈসলামিক ফাঁসির ফতোয়া দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ

শিকার করতে চায়। ইসলামের জন্য মায়াকান্নাকারী এসব লোক ৭১ সালে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে হত্যা ও দুই লাখ মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী মওদুদীবাদী জামাত শিবির চক্রের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে। বরং এরা বর্তমানে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমকে রক্ষা করার জন্য তসলিমার ফাঁসি ও জনকণ্ঠ নিষিদ্ধের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলনে এমন অনেক নেতা আছেন তাঁরা যে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সেখানে আমাদের জাতীয় পতাকা ওঠানো হয় না, জাতীয় সঙ্গীতও পাঠ করা হয় না, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননাকারী এবং অনৈসলামিক ফতোয়া দিয়ে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্টকারী ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

জিয়াউল হাসান বলেছেন। জিয়াউল হাসানের সঙ্গে আমার আলাপ না থাকলে ধরে নিতাম মৌলবী সেজে এটি হয়ত অমৌলবী, অমৌলবাদী কারও কাজ; এ সময় দেশকে বাঁচাতে যে কেউ যে কোনও কিছুই সাজতে পারে। নাস্তিকদেরই যদি বলতে হয়, আমরা কোরআনের পক্ষ শক্তি, তখন আধা নাস্তিকরাই মৌলবী হয়ে মৌলবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু ঘটনা তা নয়। জিয়াউল হাসান লোকটি আসলেই জোব্বা পরা, টুপি দাড়িঅলা, আপাদমস্তক মৌলবী। তান্ডবের সময়ে লোকটি আমার সঙ্গে বহু চেষ্টা করেছেন দেখা করতে। আমি রাজি হইনি। কিন্তু আহমদ শরীফের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত জিয়াউল হাসানকে ঘরে ঢুকতে দিই, বসতে দিই, কথা বলতে দিই। যথা সম্ভব দূরত্ব রেখে বসেছিলাম। মিলনকে, মোতালেবকে, কায়সারকে পাশে বসিয়ে তবে বসেছিলাম। জিয়াউল হাসান যা বলতে চান তা শোনাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। লোকটি আমার চেয়েও কম বয়সী, এর মধ্যে কোরানের হাফেজ হয়েছেন, কোরান পুরোটাই মুখস্ত বলতে পারেন। আমার ঘরে বসে এই হাফেজ মৌলবী দম নিয়ে নিয়ে বলে গেলেন যে তিনি মৌলবাদী নন। মৌলবাদীদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই। কারও মাথার মূল্য ঘোষণা করা ইসলামে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে, দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর তিনি আবদার করলেন, আমি যদি তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করি তবে তিনি আমার পক্ষে লিফলেট ছাপবেন। আমি সোজা না বলে দিই। নিজের পক্ষে টাকা দিয়ে আমি লিফলেট ছাপাবো না এই আমার বক্তব্য। জিয়াউল হাসান যদি সত্যিই মনে করেন যে আমার পক্ষে তিনি কথা বলবেন তবে তিনি সে আয়োজন নিজেই করে নিতে পারেন। মন খারাপ করে হাফেজ মৌলনা চলে গেলেন। আমি আমার আদর্শে স্থির থেকেছি। আসলে সত্যি কথা, জিয়াউল হাসান অনেক ভাল ভাল কথা বললেও তাঁকে আমার বিশ্বাস হয়নি যে সত্যি তিনি কোনও প্রগতিশীল মানুষ। কোনও মৌলবী প্রগতিশীল হতে পারে বলে আমার কখনও বিশ্বাস হয় না। তিনি বলেছেন যে ইসলাম কোনও অবিশ্বাসীকে হত্যা করার কথা বলে না। না, এ কথা আমি মানি না, কারণ আমি জানি যে কোরানেই ইসলামে অবিশ্বাসী লোকদের হত্যা করার পরামর্শ দেওয়া আছে।

আজ জিয়াউল হাসান সাংবাদিক সম্মেলন করে ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে মৌলবাদীদের বিপক্ষে কথা বলছেন। স্পীকারের কাছে লেখা আমার চিঠিটি পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর জিয়াউল হাসানের দল একটি বিবৃতি দিয়েছিল, সেটিও

মৌলবাদীদের কবল থেকে আমাকে বাঁচানোর উদ্দেশে। ৩১ জন আলেমের দেওয়া বিবৃতিটি এরকম ছিল, *তসলিমার নমনীয় মনোভাব শুভ লক্ষণ*।মাননীয় স্পীকারের কাছে লেখা চিঠিতে তসলিমা যে নমনীয়তা ও ক্ষমা প্রার্থনাসুলভ বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য লেখিকাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমি কখনও পবিত্র কোরান শরীফ পরিবর্তনের কথা লিখি নি বলে তিনি যে স্বীকারোক্তি করেছেন, তা শুভ লক্ষণ। তবে, তার এই বক্তব্য নতুন কোনও চালাকি কি না, আমরা তা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি। কোরান শরীফ নিয়ে কোনও অবান্তর কথাবার্তা ও চালাকির সুযোগ নেই। এর রক্ষক স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তসলিমা নাসরিন যদি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং ইসলামের নিয়ম নীতি ও শরিয়া অনুসরণ করে জীবন যাপন করেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই এই নাদান লেখিকাকে ক্ষমা করবেন।

নাদান লেখিকাকে আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করছেন না। নাদান লেখিকা বসে আছে একটি আলো বাতাসহীন বন্ধ ঘরে। নাদান লেখিকার পেচ্ছাব পেয়েছে, পেচ্ছাব কি করে নিঃশব্দে করা যায়, নাদান লেখিকা তার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। পেচ্ছাব পায়খানার পর ফ্লাশ করলে শব্দ হয় বলে ফ্লাশ তিনি করছেন না, যদি শব্দ চলে যায় নিচে। নাদান লেখিকা নিজের শ্বাসের শব্দটিকেও ভয় পায়। এ শব্দও যদি কেউ শুনে ফেলে! ছোট্ট ঘরটিতে শ্বাস মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে আসে নাদান লেখিকার। কিন্তু বন্ধ হয়েও পুরোপুরি বন্ধ হয় না। পুরোপুরি বন্ধ হয় না বলে নাদান লেখিকা বেঁচে থাকে।

ঝ এলেন বিকেল বেলা। শব্দে আমি চকিতে উঠে বসি। ঝ ঘরে এলেন মানে একঝলক আলো এল ঘরে, প্রাণ এল ঘরে। নিজেকে মৃত বলে মনে হয়, কিন্তু ঝ এলে বুঝি যে বেঁচে আছি। ঝ র আপাদমস্তকের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার চোখ থেকে ঝরতে থাকে কৃতজ্ঞতা। ঝ একটি ক্যানভাস এনেছেন, একটি ইজেল আর একটি গান বাজানোর যন্ত্র। কোনও কথা না বলে তিনি গান ছেড়ে দিলেন জোরে। বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরই এক থালা ভাত তরকারি নিয়ে এলেন। গান বাজতে থাকলে অত গলা চেপে কথা না বললেও চলে। গানের শব্দের আড়ালে চাপা পড়ে যায় কথা বলার শব্দ। ঝ বললেন, তিনি আজ আপিসে যাননি। এভাবে আমাকে এঘরে রেখে আপিসে যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। যে কোনও মুহূর্তে বাড়ির যে কেউ জেনে যেতে পারে যে এ ঘরে কোনও প্রাণী বাস করছে, এই আশংকায় তিনি আজ আপিস কামাই দিয়েছেন কিন্তু এভাবে বেশিদিন কামাই দেওয়া চলবে না। এ ঘরে তিনি এখন ইজেল আর ক্যানভাস নিয়ে এসেছেন, এগুলো আনার মানে হল তিনি যদি এ ঘরে আসেন, বাড়ির লোকেরা জানবে যে এঘরে তিনি ছবি আঁকায় ব্যস্ত। কাজের লোকদের বলে দিয়েছেন যে তিনি এখন মন দিয়ে ছবি আঁকবেন। কেউ যেন তাঁর ছবি আঁকার কাজে বিরক্ত না করে। আজও ঝর ভাগের থেকে ভাত খেতে হয় আমাকে। আধপেট খেয়েও আমার কোনও অতৃপ্তি হয় না। যখন জীবন একটি সরু সুতোয় আটকে থাকে, সুতো ছিঁড়লেই নিচে আগুনের গর্তে পড়ে যাবে শখের জীবনটি, তখন আধপেট কি সিকিপেট খাবার জোটা তো ভাগ্যের ব্যাপার, না জুটলেই বা কী!

ঝ খেয়ে দেয়ে হাঁফাচ্ছিলেন গরমে। একটি সিগারেট ধরিয়ে সেটি না শেষ করেই আবার নিচে চলে গেলেন, একটি টেবিল ল্যাম্প আর একটি টেবিল ফ্যান নিয়ে ফিরে

এলেন। বগলের তলে জামার মোড়ক। ঝর এক আত্মীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক গোছের কিছু, তাঁর কল্যাণে ঘরে পরার লম্বা লম্বা জামা পেয়েছেন তিনি। দুটো আমার জন্য এনেছেন। একটি সাবান,একটি টুথপেস্ট, একটি দাঁতের মাজন জামার ভেতর থেকে বেরোলো। *না চাহিতে দয়াময় দিয়াছে সকল, ক্ষুধায় আহার আর পিপাসায় জল ডড* মনে মনে আওড়াতে থাকি। ঝকে দেখে বুঝিনি তিনি যে লক্ষ করেছেন আমার জামা নেই, দাঁত মাজার কিছু নেই, আমি যে গরমে কষ্ট পাচ্ছি, টেবিল ল্যাম্পের ছোট একটি আলো রাতে যখন জেগে থাকি, আমার যে প্রয়োজন হতে পারে। কাগজ কলমও দিলেন তিনি। বললেন, শুধু বসে থাকবে কেন, লিখবে।ঝ'র এই ভালবাসা আমার বুকের মধ্যে ঝরনা ঝরায়।

দেশের খবর নিয়ে যখন কথা হয়, ঝ বললেন, দেখেছো, মৌলবাদ-বিরোধী দল কি করে হেরে গেল!

ডডহেরে গেল? কি করে?

হরতাল বন্ধ করতে পারবে না তা বুঝে গেছে। এখন তাই নিজেরাই হরতালের ডাক দিয়েছে। মৌলবাদীরা সারা দেশে অর্ধদিবস হরতালের কথা বলছে। আর দেখ আমাদের ছেলেরা কী বলছে, ঝ তাঁর হাতের ভাঁজ করা কাগজ খুলে খবরের শিরোনামটি পড়লেন, গোলাম আযমসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে ৩০ জুন সকাল সন্ধ্যা হরতাল।

আমি সত্যি সত্যি মাথায় হাত দিই। বেদনার্ত কণ্ঠে বলিডডকী বলছেন? এরকম তো হওয়ার কথা না। হরতাল প্রতিরোধের কথা তো অনেকদিন থেকেই বলা হচ্ছে। এত দল মিলে এই একটা হরতাল প্রতিরোধ করতে পারবে না! এ কোনও কথা হল।

ঝ আমার দিকে ফেরেন, তসলিমা তুমি বুঝতে পারছো না কেন, হরতাল যদি হয়েই যায়, তবে প্রতিরোধঅলারা মুখ দেখাবে কি করে! তাই নিজেদের সম্মান রাখতে এই ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ঝ পত্রিকাটি চোখের সামনে তুলে ধরে বলতে থাকেন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ ও মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমাণ্ড গোলাম আযমসহ সকল যুদ্ধাপরাধী ধর্মের অপব্যবহারকারী, ফতোয়াবাজ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার অবমাননাকারী, সংবাদপত্রের ওপর হামলাকারীদের বিচার ও ফাঁসির দাবিতে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে আগামী ৩০ জুন সকাল সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে। গতকাল সকাল ১১টায় আইবিএ ভবনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের এক জরুরি বৈঠকে হরতালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৩০ জুনের হরতালকে সফল করার জন্য ২৪ জুন সকাল ১০টায় মধুর ক্যান্টিনে একটা প্রতিনিধি সম্মেলন হবে। ওতে মহানগর কমিটির সকল সদস্য, সকল থানা, কলেজ, ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদকরা থাকবে। ২৫ জুন সারাদেশে সভা সমাবেশ, ২৬ জুন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশে যোগদান, ২৮ জুন জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে যোগদান, ২৯ জুন সন্ধ্যায় মশাল মিছিল।

ডডআপনার কি মনে হয় সকাল সন্ধ্যা হরতাল হবে?

ডডহবে। কিন্তু এই হরতাল সফল হলে মূলত জয় হবে মৌলবাদীদের।

ডডকিন্তু ওরা তো সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডাকেনি।

ডডনা ডাকুক। কিন্তু হরতালের কথা তো ওরাই বলেছে আগে।

ডডদুপুরের পর তো অনেকেই গাড়ি বের করতে পারে।
ডডভয়ে বের করবে না। অর্ধদিবস হরতাল হলেও অনেকে গাড়ি টাড়ি বের করতে চায় না রাস্তায়।
ঝর চোখ পত্রিকায়। বললেন, নারী প্রগতিবিরোধীদের প্রতিরোধের আহবান।
ডডকে আহবান জানালো?
ডডতাসমিমা হোসেন।
ডডও।
ডডচেন তাসমিমাকে?
ডডচিনি। অনন্যা পত্রিকার সম্পাদক। ওখানে আমি কলাম লিখতাম।
ডডঅনন্যা পত্রিকা অফিসে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়েছে, বলেছে নারী প্রগতির বিপক্ষ শক্তির ক্রম উত্থান সমাজে এক নৈরাশ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সালমা খান বলেছেন, দেশে নারীরা বৈষম্যের শিকার, প্রচলিত আইনে নারীদের সমস্যার সমাধান না করা গেলে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা উচিত।
এটুকু পড়ে হেসে ওঠেন ঝ, বলেন, ওরা সালমা খানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেবে না? তুমি যা বলেছো, সালমা খান তো তাই বললেন।
ডডসালমা খান ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করেননি।
ডডধর্ম শব্দটি উচ্চারণ না করেও কিন্তু ধর্মের পাছায় বাঁশ ঢোকানো যায়। গাধা মোল্লাগুলো তো তা জানে না।
ঝর চোখ আবার পত্রিকায়, হঠাৎ বললেন, দেখ দেখ দেশের যত পীর আছে, সব নেমে পড়েছে এই আন্দোলনে। চরমোনাইয়ের পীর বলছে কুখ্যাত তসলিমাকে হত্যা করার দাবিতে হরতাল হবেই হবে। এই পীরের শিষ্য সংখ্যা তুমি কি আন্দাজ করতে পারো? লাখ লাখ। যে কোনও বড় পলিটিক্যাল লিডারের চেয়ে পীরদের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। চরমোনাইয়ের পীর, শর্ষিনার পীর সব নেমেছে রাস্তায়।
ঝর কথা মন দিয়ে শুনি আমি। তাঁর কপাল কুঁচকে আছে দুশ্চিন্তায়। আমি ইনকিলাবটি খুলে হাতে দিই ঝর। প্রথম পাতায় বড় বড় শিরোনাম খবরের।
৩০ জুনের হরতাল সফল করতে দেশব্যাপী গণজোয়ার সৃষ্টি। ব্যাপক সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ অব্যাহত। মোর্চার নেতারা ঢাকার বাইরে গিয়ে গিয়ে বিশাল বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন। বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্র সেনা আজ বায়তুল মোকাররমে সমাবেশ করেছে, মিছিল বের করেছে। বাংলাদেশ হকার সংগ্রাম পরিষদ(বিএইচএস) এবং দেশীয় চিকিৎসক ও ক্যানভাসার কল্যাণ সমিতিও তসলিমার ফাঁসির দাবিতে ৩০ জুনের হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। নেজামে ইসলামি পার্টি করেছে আছর নামাজের পর। কাল ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকে বাদ আছর লাঠি মিছিল বের করবে। ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিরোধ মোর্চা কালও সারাদেশে বিক্ষোভ দিবস পালন করবে। আজ তারা ঢাকার মোহাম্মদপুর টাউনহল প্রাঙ্গণে জনসভা করছে। মোর্চার কিছু নেতা ঝটিকা সফরে দেশের অন্যান্য জায়গায় জনসভায় বক্তৃতা করছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্মরণকালের বৃহত্তম সভা হয়েছে কাল, সভায় ৩৪ টি

ইশকুল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। মুফতী আমিনী ওখানে বলেছেন যে সরকার যদি ৩০ তারিখের হরতালের পর দাবি না মানে, তবে তারা বাহাত্তর ঘন্টার হরতালে যাবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লার পথে থেমে থেমে বিভিন্ন সভায় মুফতি আমিনী বক্তৃতা করেন। সে কি জনপ্রিয়তা এখন মোর্চার নেতাদের! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক সভা থেকে আরেক সভায় দৌড়োচ্ছেন। বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মসজিদে মসজিদে গভীর রাত পর্যন্ত জরুরি সভা করছে। দেশের প্রতিটি মাদ্রাসায় সভা হচ্ছে, প্রতিটি মাদ্রাসা থেকে মিছিল বের হচ্ছে। ইয়ং মুসলিম সোসাইটি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ৩০ তারিখে সমাবেশ করবে, সারাদেশেও তাদের সমর্থকদের বলা হয়েছে প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করার জন্য।

ঝ চুপ করে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। আমি বললাম, কাল তো সংসদেও দুজন সদস্য আমাকে গ্রেফতারের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলেছে।

ঝ বললেন যে তিনি পড়েছেন এই খবর।

মাওলানা আতাউর রহমান খান আর গোলাম রব্বানী সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধি অনুসারে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় হিসেবে মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ দিয়ে যখন কথা বলার সুযোগ পান, আইন মন্ত্রী আর প্রধান মন্ত্রীকে বলেন যে তসলিমার ফাঁসি এবং ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তন করতে যেন কোনও দেরি না হয়।

ঝ বললেন, আইন মন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রী তখন কী করছিলেন? নিশ্চয়ই মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন যে তাঁরা মোটেও এতে দেরি করবেন না!

আমি ম্লান হাসি।

ঝ বললেন, ইনকিলাবের বাচ্চারা এখন কি করছে দেখেছো? ভয়েস অব আমেরিকা নাকি বলেছে অস্ট্রেলিয়ার এক রেডিও সাক্ষাৎকারে তুমি বলেছো যে ইসলাম ধর্ম মেয়েদের কোনও মানবিক মর্যাদা দেয়নি। ইসলাম ধর্মে মেয়েদের সাথে ক্রীতদাসীর আচরণ করা হয়, এই খবরটি ফলাও করে ছেপেছে। এসব ছাপার এখন উদ্দেশ্যটি হল, যেন জনগণ যেন তোমার ওপর আরও ক্ষেপে যায়।

ঝ মেঝেতে দু পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি আমার মাথার বালিশটি ঝর দিকে বাড়িয়ে দিই, যেন তিনি বালিশে হেলান দিতে পারেন। ঝ লুফে নেন বালিশটি। বালিশে কনুইএর ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে বললেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর খবরটা পড়েছিলে? বিদেশের পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে তোমার ফাঁসি চাওয়া হচ্ছে, এসব মানবাধিকার লঙ্ঘন, সরকার কিছু করছে না, তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিদেশে এসব খবর ছাপা হওয়ায়। বলেছেন, এদেশের আইনে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার বিধান আছে। কিন্তু কেউ পলাতক অবস্থায় আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে আইনগত নিরপত্তার দাবি করতে পারে না।

আমি বলি, ভাবটা এমন যে আমি নিরাপত্তা চাইলে তারা এখন আমাকে নিরাপত্তা দেবেন।

ঝ হেসে বলেন, তাই বোধহয় তারা চাইছে। তুমি নিরাপত্তা চাইবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে গ্রেফতার করে জেলে ভরবে তারপর ফাঁসি দেবে। বিদেশের পত্রিকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা লেখা হলে বলে দেবে আমরা গণতান্ত্রিক সরকার, দেশের মেজরিটি জনগণ যা দাবি করেছে, আমরা তা মিটিয়েছি। এর ওপরে তো আর কথা নেই। জনগণের দাবি পূরণ করাই তো গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তব্য।

ঝ আরেকটি সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, তুমি ভয় পেও না। তোমাকে কেউই এবাড়ি থেকে ধরতে পারবে না। খুব ওয়েল প্রটেকটেড বাড়ি। দারোয়ান আছে গেইটে। কাজের মানুষগুলো থাকে নিচতলায়, নিচতলায় ড্রইংরুম, রান্নাঘর, খাবার ঘর। দোতলায় আমার শোবার ঘর। দোতলায় উঠে ঘর দোর পরিষ্কার করে তারা নিচে চলে যায়। আড়াইতলায় বা তিন তলায় দরকার না হলে ওঠে না। কিন্তু আমি বাড়িতে না থাকলে ওরা কতদূর পর্যন্ত ওঠে, তা আমার জানা নেই। সেজন্যই একটা ভয় থাকে। আমি তো এভাবে বেশিদিন আপিস কামাই দিতে পারব না। কাল তো ছুটি। পরশু থেকে আপিসে যেতেই হবে। আর শোনো, যদি এমন হয় যে বিপদের আশঙ্কা আছে, কিছু একটা হয়ে গেলে, এসেই গেল মোল্লারা এবাড়িতে, খোঁজ পেয়েই গেল, তখন কি ভেবেছি আমি, জানো?

ডডকি? উৎসুক তাকাই। বুকে কাঁপুনি।

ঘরটির লাগায়ো গোসলখানার ওপর একটি ছোট খোপ আছে, হাবিজাবি বা বাড়তি জিনিসপত্র রাখার খোপ, খোপটি বন্ধ একটি কাঠের পাল্লা দিয়ে। খোপটি দেখিয়ে ঝ বললেন, তোমাকে সোজা ওখানে তুলে দেব। সারা বাড়ি খুঁজেও তোমাকে কেউ পাবে না। যদি অবস্থা খারাপের দিকে যায়, ওই ব্যবস্থাটি রইল, কি বল!

ওপরের কবুতরের খোপের মত খোপটির দিকে তাকিয়ে আমি বলি, আমি কি ঢুকবো ওখানে?

ডডশোনো বিপদ এলে এক ফুট জায়গাতেই পাঁচ ফুটের শরীর ঢোকানো যায়। ঢোকাতে হবে। এটাই এ বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

খোপে বাস করতে হবে শুনে মানুষ মুর্ছা যায় হয়ত, কিন্তু আমার হয় স্বস্তি। ঝ যদি এখন বলেন যে যদি দেখি মোল্লারা খবর পেয়ে গেছে যে তুমি এখানে, ধেয়ে আসছে এ বাড়ির দিকে, তখন মাটিতে একটি গর্ত করে তোমাকে আমি পুঁতে রাখব, এতেও বোধহয় স্বস্তি হবে আমার। মাটিতে পোঁতা থাকলেও বাঁচার সম্ভাবনা আছে, মোল্লাদের হাতে পড়লে নেই।

ঝ উঠে গেলেন গানের যন্ত্রটির কাছে। বোতাম টিপে টিপে রেডিওতে বিবিসি ধরলেন। বিবিসিতে বাংলা খবর চলছে। জামাতে ইসলামীর উদ্দেশ্য বিধেয় খানিকটা উল্লেখ করে বলা হল, *লেখিকা তসলিমা নাসরিন এবং যেসব খবরের কাগজ তাঁর লেখা প্রকাশ করেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে জামাতের সমর্থকরা সহিংস আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।* খবরের মধ্যে কিরকিরি শব্দ হতে শুরু হল। ধুত্তুরি বলে ঝ রেডিও বন্ধ করে দেন। ওঠেন তিনি যাবার জন্য, বলেন ভেতর থেকে যেন দরজা বন্ধ করে রাখি। দরজার তালা খুলে তিনি যদি ছোট্ট একটি মৃদু টোকা দেন, তাহলে বুঝতে হবে এটি ঝ, আমি তখন ভেতরে থেকে সিটকিনি খুলে দেব।

ঝ চলে গেলে বড় খালি খালি আগে। আবার আমি একা গোলাম আযমের মুখোমুখি। মনে হতে থাকে এই জিভ বেরিয়ে আসা কাঠের গোলামটিও বুঝি আমাকে দেখে হাসছে, আমার মৃত্যু হবে শীঘ্র, এই খুশি চিকচিক করছে চোখ দুটোতে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, দুহাঁটুর মাঝখানে মাথাটি রেখে ভাবতে থাকি মৃত্যু কেমন দেখতে, মৃত্যু যখন হতে থাকে, তখন কেমন লাগে শরীরে, মনে! তখন কি আমি বুঝতে থাকবো যে আমি মরে যাচ্ছি! আমি কি বুঝতে পারব যে এই পৃথিবী থেকে চিরকালের মত আমি চলে যাচ্ছি, আর কোনওদিন আমি ফিরবো না, আর কোনওদিন কারও সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আমি বলে কেউ কোথাও আর থাকবো না! চিনচিন একটি কষ্ট আমার বুক থেকে উঠে আসে ওপরের দিকে। ওপর থেকে আবার নিচে, কষ্ট আমার সারা শরীরে মহানন্দে ভ্রমণ করে।

মধ্যরাতে আমি জেগেই ছিলাম। ঝ এলেন, এমনি এলেন। দেখতে এলেন। বাড়িতে একটি নিষিদ্ধ জিনিস থাকলে এই হয়, বার বার দেখতে ইচ্ছে হয় জিনিসটি ঠিক আছে কি না। জিনিসটি নিয়ে দুশ্চিন্তা কখনও দূর হয় না।

ঝকে বসার জন্য অনুরোধ করলাম। কাতর অনুরোধ। একা এই ছোট্ট ঘরটিতে শিরশিরে মৃত্যুভয় নিয়ে কেবল নিজের নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে জেগে থাকা ঠিক কী রকম বেঁচে থাকা তা আমি বোঝাতে পারি না তাঁকে। ঝ বললেন, বসে কেবল একটি সিগারেট খেতে পারেন। ঝ বসেন, একটি সিগারেটের জায়গায় দুটি খান। তাঁর চলে যাওয়ার পরও আমি চোখ বুজে ঝর অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করি। যেন ঝ কোথাও চলে যাননি, আছেন এঘরে, বসে আছেন আমার পাশে। কথা বলছেন না কিন্তু আছেন। আমি একা নই, কোনও ভূতুড়ে অন্ধকারে আমি একা বসে নেই, কিছু ঘটলে আজ রাতে, ঝ আমাকে ওই খোপে তুলে দেবেন। চোখ বুজে বসে থাকি এই অনুভবটি নিয়ে। চোখ খুললে যদি দেখি যে আমি একা, এই আশঙ্কায় চোখ খুলি না।

চব্বিশ জুন, শুক্রবার

গানের যন্ত্রটি পড়ে আছে হাতের নাগালে, হাতটি কতবার চলে যায় যন্ত্রের বোতামে। বোতাম থেকে বারবারই ফিরিয়ে নিয়ে আসি হাত। আমি এটি বাজাতে পারি না। কারণ যে ঘরে কেউ নেই, যে ঘরটি তালাবন্ধ, সে ঘরে হঠাৎ করে গান বাজতে পারে না। কতবার উঠে আনমনে দরজার কাছে চলে যেতে চাই, নিজেকে সামলে রাখি, শক্ত করে ধরে রাখি যেখানে আছি সেখানে। গরমে সেদ্ধ হচ্ছি, তবুও পাখাটি ছাড়তে পারি না, কিঁ কিঁ কিঁ করে একটি শব্দ হয় পাখা চলতে থাকলে, নিচতলায় না যাক, দোতলা থেকে যদি কান পাতলে শোনা যায় শব্দটি! আলোটি জ্বালতে পারি না, জ্বাললে দরজার ফাঁকে কারও চোখ পড়লে যদি বোঝা যায় যে

আলো জ্বলছে ঘরটিতে। খাওয়া দাওয়া পানি পান কম বলে পেচ্ছাব পায়খানার ঝামেলা তেমন নেই, অন্তত এই ব্যাপারটি টয়লেটে ফ্ল্যাশ করে শব্দ তৈরি করার ঝুঁকি থেকে নিস্তার দিয়েছে। এই প্রাকৃতিক কর্মগুলো আমি জমা রাখি ঝ যখন এসে এ ঘরে গানের যন্ত্রটি ছাড়বেন তখনের জন্য। শুয়ে থাকলে পাশ ফিরি সাবধানে, যেন শব্দ না হয়। পত্রিকার পাতা ওল্টাতেও সতর্কতা, যেন শব্দ না হয়। ঝ আমাকে নিজ দায়িত্বে এক নৈঃশব্দ্যের জগত তৈরি করে নিতে বলেছেন। ঝ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া বাড়ির কেউ জানে না যে এঘরে কোনও প্রাণী আছে। সুতরাং আমাকে সেভাবেই এ ঘরটিতে বাস করতে হবে। প্রাণহীনের মত। প্রাণহীনের মত বেঁচে থেকে নিজের প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখছি। আমাকে এখানে রেখে যাবার পর থেকে ক আর ঙর কোনও খবর নেই। জামিন আমার হচ্ছে কি হচ্ছে না, হলে কবে হবে, তার কিছুই জানি না। প্রতিদিন অপেক্ষা করি ক বা ঙ কোনও খবর নিয়ে আসবেন, কিন্তু কেউ আসেন না। ঝ নিজে যতটুকু পারছেন করছেন। তাঁর সাধ্য থাকলে আরও কিছু করতেন। যে মানুষটিকে হত্যা করার জন্য পুরো একটি দেশ ক্ষেপে উঠেছে, সেখানে খুব বেশি করার কিছু থাকে না।

দুপুরবেলা ঝ ভাত নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। এক থালার মধ্যে ভাত তরকারি সব। ক্ষিধে পেতে পেতে একসময় ক্ষিধে মরে যায়। ক্লান্ত একটি ঝিমুনি ধরা শরীর পড়ে থাকে। প্রতিদিন আমি এভাবেই পড়ে থাকি। থালাটি মাঝখানে রেখে ঝ আসন করে বসে গেলেন মেঝেয়। আমাকে ডাকলেন ওই থালা থেকেই খেতে। ক্লান্ত শরীরটি উঠিয়ে নিয়ে না ধোয়া হাতেই ভাত ওঠাই মুখে। মনে হয় পুরো থালার ভাত বুঝি খেয়ে উঠতে পারব, কিন্তু দুতিন মুঠো খেয়ে আর পারি না। হাঁফিয়ে উঠি। গিলতে কষ্ট হয়। হাত ধুয়ে ফেলি। পানি দু ঢোক খেয়েই আর খেতে ইচ্ছে করে না। ঝ একটি গেলাস এ ঘরে রেখে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পানি খেয়ো মাঝে মধ্যে, পানিটা দরকার। আমি নিজেও জানি পানি খাওয়া দরকার। কলের পানিতে কি রকম একটা ব্লিচিং পাউডার গন্ধ আসে। আমার শান্তিনগরের বাড়িতে সবসময় পানি ফুটিয়ে খাওয়া হয়। এখানে ফুটোনো পানি পাওয়া দুষ্কর। ঝ লুকিয়ে ভাত যে আনেন এ ঘরে, সেটিই অনেক। তাঁর কাছে ফুটোনো পানির আবদার করা বাড়াবাড়ি। ঝ সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে দেন আমার দিকে। সিগারেট ফুঁকে কাশি শুরু হলে গানের যন্ত্রটি ছেড়ে দেন। ঝর দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, ঙ কেন আসছেন না? ক কেন আসছেন না? আমার কি জামিন হবে না? ঝর কাছে এসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই।

ডডঙকে কি একটা ফোন করবেন?

ডডএত অস্থির হচ্ছ কেন? ঙ বলেছেন, কোনও খবর জানলে তিনি ফোন করবেন।

আমি চুপ হয়ে থাকি।

ডডআজকের পত্রিকাগুলো নিয়ে আসবেন? নীরবতা ভাঙি।

ঝ খাওয়া শেষ করে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলেন, কাগজ কলম যে দিয়ে গেলাম, কিছু কি লিখেছো?

ডডনা।

ডডকেন?

ডডলেখা আসে না।

ডডকেবল পত্রিকা পড়ে পড়ে টেনশান করো তুমি।

ডডকি হচ্ছে না হচ্ছে দেশে, জানতে ইচ্ছে করে।

ডডতা জেনে কী লাভ? এগুলো পড়লে খামোকাই মন খারাপ হবে। বসে বসে নিজের লেখা লেখো। আরও কাগজ লাগলে আমি কাগজ দিয়ে যাবো।

ডডকিছু কি জানেন খবর? কি হচ্ছে? জামিনের ব্যাপারে উকিল কি বলছেন, তা তো কেউ আমাকে জানাচ্ছে না। ক নিশ্চয়ই জানেন কিছু। ক কোনও খবর দিচ্ছেন না..

ঝ বললেন, বিদেশি অ্যামবেসিগুলো থেকে ৩০ জন অ্যামব্যাসাডার দেখা করেছে ফরেন সেক্রেটারি আর হোম সেক্রেটারির সাথে। তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তাঁরা।

ডডআমার সম্পর্কে?

ডডহ্যাঁ তোমার সম্পর্কে। ইউরোপ আর আমেরিকার অ্যামবাসাডাররা জানতে চেয়েছেন তোমার ব্যাপারে সরকার কি করছে, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন!

ডডকি করে জানেন?

ডডঅবজারভারে ছাপা হয়েছে।

ডডও।

ডডমিনিস্ট্রি থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তসলিমা আইনের বাইরে নয়। আইন থেকে পালিয়ে আছে সে, তাকে নিরাপত্তা দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিছু মুসলিম দেশের ডিপ্লোমেট আবার বলছে যে বাংলাদেশ সরকার যা করছে ঠিক করেছে, তসলিমার শাস্তি হওয়া উচিত।

তন্ময় হয়ে খবর শুনি ঝর মুখে।

ডডঅ্যামবাসাডাররা যখন নাক গলাচ্ছেন তোমার ব্যাপারে, তখন নিশ্চয়ই ভাল কিছু একটা হবে। ওরা যদি বলে তোমাকে জামিন দিতে, জামিন হয়েও যেতে পারে।

আমি বলি, সরকার এখন দেশ সামলাবে না বিদেশ সামলাবে? দেশ তো আগে।

ডডগরিব দেশের আবার দেশ আগে!

ডডমুসলিম দেশগুলোর কাছ থেকে তো অর্থনৈতিক সুবিধে পাচ্ছে। সৌদি আরবের কথাই ধরুন না, হাজার হাজার বাংলাদেশের লোক কাজ করে ওখানে, তার ওপর ওদের টাকায় বড় বড় এনজিও হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে। মুসলিম দেশের কথাই বা সরকার শুনবে না কেন!

ডডতাও কথা।

ঝ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। হঠাৎ উঠে যান। ঘণ্টাখানিক পর ফিরে আসেন হাতে দুটো পত্রিকা নিয়ে। একটি পত্রিকা লুফে নিই। ঝর হাতে আরেকটি।

হাজার হাজার মৌলবাদীর মিছিলের ছবি তো আছেই। আরেকটি ছবি আমাকে আমূল কাঁপিয়ে দেয়, সেটি হকার সংগ্রাম পরিষদের ছবি। গতকাল সাপ নিয়ে মিছিল করেছে হকাররা। ব্যানারে লেখা তসলিমা নাসরিন ও আহমদ শরীফসহ সকল ধর্মদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহীদের ফাঁসি/ জনকণ্ঠসহ সকল ধর্মদ্রোহী পত্রিকা নিষিদ্ধ কর

ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন কর/ ৩০ জুন দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালনের দাবিতে/ বিক্ষোভ মিছিল/ বাংলাদেশ হকার সংগ্রাম পরিষদ। সাপ নিয়ে মিছিল করা হকাররা সার্ট প্যান্ট পরা। কারও মুখে দাড়ি নেই, কারও মাথায় টুপি নেই। হকাররা বলেছে যদি তসলিমাকে ফাঁসি না দেওয়া হয়, তবে সারা শহরে তারা দশ লক্ষ বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেবে।

দেখেছেন খবরটা? ঝর দিকে বাড়িয়ে দিই কাগজ।

ঝ বলেন, আপনি আপনি করা ছাড়ো তো। তুমি বলে সম্বোধন কর। আপনি সম্বোধন আমার বিচ্ছিরি লাগে।

কি কাণ্ড! হঠাৎ করে এখন তাঁকে কি করে আমি তুমি বলি! তুমি বলার চেয়ে ভাববাচ্যে কথা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সুবিধের।

ডডন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সের মহাসচিব আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, হরতাল প্রতিহতকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। ভাবা যায়! আনোয়ার জাহিদ কি করে মৌলবাদীদের সঙ্গে মিশে গেলেন!

ঝ শুনে বললেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাগপার নেতা শফিউল আলম প্রধানও তো ভিড়েছে গিয়ে ওই দলে।

ডডকি রকম অবাক করা কাণ্ড ঘটছে দেশে!

ডডএদের কোনও চরিত্র নেই। এরা যে দিকে দেখে ঢেউ, সেদিকেই পাল তোলে।

ডডএ সময় আওয়ামী লীগ কি করছে? তারা কি আন্দোলনে নামবে না?

ডডছাত্রলীগের ছেলেপেলেরা তো ক্ষেপে আছে আওয়ামী লীগের নেতাদের দিকে। ছাত্রদের মধ্যে এখনও কিছু আদর্শ অবশিষ্ট আছে। তারা পথে নেমেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে নামার কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

ডডএরকম আগে কখনও শুনিনি। সাধারণত আওয়ামী লীগ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ছাত্রলীগ তা অনুসরণ করে।

ডডবিদঘুটে অবস্থা।

ডডআমার মনে হয় না এত বড় মৌলবাদী দলের বিরুদ্ধে কেবল ছোট ছোট দল বাসদ জাসদ, ছাত্ররা আর সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীরা পেরে উঠবে।

নিচে ফোন বাজছে। ঝ দ্রুত   উঠে চলে যান। ঝর অপেক্ষায় বসে থাকি, ফোন সেরে তিনি ফিরে আসবেন এ ঘরে, এই অপেক্ষা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ঝর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় না। ঝ কি একবার আসবেন না! একবার অন্তত! মেঝেতে শুয়ে পড়ি পত্রিকা খুলে। দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম পশ্চিম ও তসলিমারা। ক্লান্ত চোখদুটো সম্পাদকীয়টিতে। ‘মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রতি বিশ্ববাসীর সচেতনতা ক্রমশই বাড়ছে, এটা অত্যন্ত সুলক্ষণ। অন্যায়ভাবে, বেআইনীভাবে এক মানুষ আরেক মানুষের ওপর নির্যাতন করবে কিংবা এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ণ চালাবে এটা হওয়া উচিত নয় এবং তা হতে দেওয়াও উচিত নয়। এদিক থেকে যখন আমরা কাউকে কিংবা কোনও মানবাধিকার সংস্থাকে বা কোনও পত্র পত্রিকাকে মানবাধিকারের পক্ষে সোচ্চার হতে দেখি, তখন তাকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু ইদানীং

মানবাধিকার রক্ষার নামে এমনসব অবিবেচক অর্বাচীন তৎপরতা চালানো হচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকারেরই পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে এই অপতৎপরতা আজ খুব বেশী চলছে। তারা এমনসব কথা বলছে যাতে মনে হয় খুনীকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না এবং অপরাধীর গায়ে হাত দেওয়াও অন্যায় হবে। জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে তসলিমা নাসরিনের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তিনি এখন পলাতক। পুলিশ তাকে ধরার জন্য চেষ্টা করছে। পশ্চিমা দৃষ্টিতে এটা নাকি ভীষণ অন্যায়। মানবাধিকারের দারুণ খেলাফ। এটা নাকি কারও মুখ বন্ধ করার শামিল। এ ধরনের কথা লেখা হচ্ছে ওয়াশিংটন পোস্টের মত কাগজে ডবল কলাম হেডিং এ। শুধু পত্রিকায় লেখাই নয়, রীতিমত ঝড় তোলা হয়েছে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত তসলিমা নাসরিনের পক্ষে। যার জন্যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে শেষ পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে। দুর্বল দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে তসলিমা নাসরিনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করে শুধু এইটুকু বলেছে যে দেশের আইনে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত ও সমুন্নত রাখার বিধান রয়েছে। কোনও ব্যক্তি পলাতক অবস্থায় আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে অবশ্যই আইনগত নিরাপত্তা দাবি করতে পারে না। এর দ্বারা আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, তসলিমা নাসরিন আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে সকল নাগরিকের মতই আইনের সহযোগিতা ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারেন। কিন্তু তসলিমা নাসরিন তা করছেন না। কারণ অপরাধীরা আইনকে ভয় পাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিমা অপপ্রচারকারীরা এই সাদা কথাটা বোঝেন না, এটাই চরম বিস্ময়ের ব্যাপার। অথচ আমরা জানি, পশ্চিমা কোনও দেশেই, বিশেষ করে মানবাধিকারের পক্ষে সোচ্চার দেশগুলোতে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অপরাধীদেরকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হয় না। এই তো সেদিন খুনের দায়ে অভিযুক্ত সাবেক ফুটবলার ও জে সিম্পসনকে ধরার জন্য পুলিশ জল স্থল আকাশ জুড়ে কী অভিযানই না পরিচালনা করল। সব দোষই দোষ, সব অপরাধই অপরাধ। ও জে সিম্পসন দুজন মানুষকে খুন করেছেন আর তসলিমা নাসরিন খুন করেছেন কোটি কোটি হৃদয়কে। কোটি কোটি হৃদয়ের যন্ত্রণা থেকেই তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলা এবং তাকে ধরার প্রচেষ্টা। ও জে সিম্পসনের মতই সে ক্রিমিনাল। ও জে সিম্পসনকে ধরার জন্য যদি মার্কিন পুলিশ তার পিছু নিতে পারে, তাহলে তসলিমা নাসরিনকে ধরার জন্যও বাংলাদেশের পুলিশ চেষ্টা করতে পারে। এই প্রচেষ্টায় বাধ সাধার অর্থ মানবাধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করা। আমরা মনে করি, পশ্চিমারা তসলিমা নাসরিনের মত লেখকদের পক্ষে যে তৎপরতাই চালাক তার সব কিছুই মানবাধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বস্তুত পশ্চিমা কিছু দেশ এই ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণেই হোক কিংবা বিদ্বেষদুষ্ট হয়েই হোক দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করছে। তারা তাদের আইন প্রয়োগ করলে দোষ নেই, কিন্তু আমরা আমাদের আইন প্রয়োগ করতে পারব না। পশ্চিমাদের এই দ্বিমুখীতার মূলে, আমাদের মতে, বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বেশি কাজ করছে। তারা তাদের আইন ও মূল্যবোধকে যতটা বোঝেন, আমাদের আইন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ততটাই অজ্ঞ। কিন্তু তাদের অজ্ঞতা এতটা গভীর হতে পারে তা আমাদের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। আমরা একটা জাতি। আমাদের একটা ধর্ম আছে, আদর্শ আছে। সেই ধর্ম ও আদর্শ অনুসারে বিচার, সামাজিকতা ও জীবন পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে, যেগুলোকে বাদ দিলে আমরা তখন আর কোনও জাতি থাকি না। আমাদের জাতির সদস্য যারা, তারা আমাদের আদর্শ ও আইনের অধীন। তসলিমাও তাই। এই তসলিমা অপরাধ করলে তার বিচার আমাদের আদর্শ আইনের মাধ্যমেই হবে, মার্কিন কিংবা অন্য কোনও দেশের আইন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নয়। আমাদের এই জাতিগত অধিকারকে জাতিসংঘ সনদও নিশ্চিত করেছে। সুতরাং পশ্চিমা দেশগুলো যখন আমাদের অভ্যন্তরীণ

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তখন তারা শুধু জাতিগত অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনই নয়, জাতিসংঘের সনদও পদদলিত করে। আমরা এই বিষয়টির দিতে পশ্চিমের সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের তসলিমা নাসরিনদের মত ঘটনায় নাক না গলাবার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানাই।'

ভাবি নাক গলালেই বা লাভ কি! আমাকে যে কোনও দিন খুঁজে পেয়ে যাবে পুলিশ অথবা মোল্লার দল। জেলে দেবে অথবা ফাঁসি দেবে। জেলের ভেতরে অথবা বাইরে যে কোনও জায়গায় খুন হব উন্মাদ মোল্লাদের হাতে। নিজের ভবিষ্যতটি আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। পালিয়ে কতদিন বেঁচে থাকতে পারব! বিশাল বিশাল লাঠি হাতে মিছিল হচ্ছে, ওরকম একটি লাঠির একটি ঘা মাথায় খেলেই তো মরে পড়ে থাকব! জীবন আমার ফুরিয়েছে, বুঝি, যতই খোপের মধ্যে বসে থাকি না কেন! জীবনটির জন্য মায়া হতে থাকে! খামোকা ক, ঙ আর ঝ কে কষ্ট দেওয়া। তার চেয়ে নেমে পড়ি রাস্তায়। বলি যে এই আমি, আমাকে যা ইচ্ছে করার তোমাদের কর, করবেই যখন, এখনই কর। এভাবে ইঁদুরের মত বেঁচে থাকতে আর ইচ্ছে করে না, তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। একটি অদৃশ্য মৃত্যু এসে আমার পাশে শোয়। আমি মৃত্যুটিকে দেখতে থাকি। মৃত্যুর আপাদমস্তক দেখি, মৃত্যুর স্বাদ গন্ধ নিই। মৃত্যুকে খুব চেনা চেনা লাগে। এই মৃত্যু কতবার যে কাছে এসেছে আমার, কতবার যে পাশে বসে থেকেছে, পাশে শুয়েছে।

৩০ জুনের হরতাল প্রতিরোধের শক্তি কারও নেই ডড গতকাল কয়েকশ সভায় সমাবেশে এই বাক্যটি বার বার উচ্চারিত হয়েছে। মুসলমানের এই দেশে কোরানের ইজ্জত রক্ষার জন্য এই হরতাল হচ্ছে। কারও শক্তি নেই হরতাল থামায়। ধর্ম ও দেশদ্রোহিতা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে হলেও আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশ এর সদর দফতরে জরুরি সভা হচ্ছে। মুসলিম লীগ বলেছে, পবিত্র কোরান, ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষার জন্য এই হরতাল। শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলে বেড়াচ্ছেন, এই হরতালের সঙ্গে দলীয় রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই, সর্বস্তরের জনগণ এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। ছাত্র শিবির সর্বস্তরের ইসলাম বিশ্বাসী ছাত্র জনতাকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে বলছে। মাদ্রাসার ইমামরা বলছেন, হরতাল প্রতিহত করতে কোনও নাস্তিক বা ধর্মনিরপেক্ষবাদী ময়দানে এলে তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। নাস্তিকরা বাংলাদেশের সকল ধর্মের, জনগণের শত্রু। সবাইকে ধর্ম রক্ষার জন্য জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইসলামের ইজ্জত রক্ষায় আমরা শহীদ হতে চাই। সরকার এখনও কুলাঙ্গার তসলিমাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই। আমরা আইন তুলে নিতে চাই না, কিন্তু সরকার যদি তাকে গ্রেফতার না করে তবে আমাদের যুবকরা কোনও পদক্ষেপ নিলে সে জন্য সরকারকেই দায়ি থাকতে হবে। ইসলামের প্রশ্নে কোনও আপোস নেই। জাগপা বিক্ষোভ মিছিল করেছে শহরে, ঐতিহাসিক পলাশী দিবস উদযাপন করা হয়েছে, শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে এখনই নব্য মীরজাফর, উমিচাঁদ ও ঘসেটি বেগমদের আস্তানা কাশিম বাজার কুঠিতে আঘাত হানতে হবে। ২৩ বছর পর আবারও জাতীয়

পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। ৩০ তারিখের হরতাল কোনও গদি দখল বা হালুয়া রুটির হরতাল নয়। এ হরতাল ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। এটা পবিত্র কোরানের মর্যাদা রক্ষার হরতাল। ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে আজাদী পাগল জনতার হরতাল। জানবাজী রেখেও এই সংগ্রাম সফল করতে হবে। এবার হরতাল প্রতিরোধ করতে যাদের মাঠে নামানো হয়েছে দেশবাসী তাদের চেনে। ক্ষমতাসীন দিল্লী লবিকে সতর্ক করে দিয়ে প্রধান বলেছেন, 'ভারতীয় রাজাকারদের মাঠে নামিয়ে স্বাধীনচেতা ধর্মপ্রাণ মানুষের এ গণবিস্ফোরণকে দাবিয়ে দেয়া যাবে না। তসলিমাগংদের বিচার চাই। তবে যে নেপথ্য শক্তি তসলিমাদের নির্মাণ করে, যে হুকুমত ও কানুন দেশদ্রোহী ধর্মদ্রোহী শক্তিকে প্রশ্রয় দেয় ও লালন করে, দেশপ্রেমিক জনতা এবার তাদের শেকড়ও উপড়ে ফেলবে। দেশপ্রেমিকদের কর্তব্য দেশ বিক্রেতা গাদ্দার ও ধর্মদ্রোহীদের বিষদাঁত চিরতরে ভেঙে দেয়া। পলাশীর পুনরাবৃত্তি আর হতে দেয়া হবে না।' জাতীয় যুব কমাণ্ড সারা দেশে সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে, এই দলও শহরে বড় বড় সভা করে বলছে, 'যারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাজনৈতিক বেসাতিতে লিপ্ত রয়েছে, তাদেরকে দেশপ্রেমিক জনতার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে হবে। কেননা এরা দেশের প্রকাশ্য শত্রুর চেয়েও বিষাক্ত। ৩০ জুনের হরতালে যারা বাধা দেয়ার হুমকি দিচ্ছে তারাই স্বাধীনতার অপ্রকাশ্য দুষমন। তারা স্বাধীনতার স্বপক্ষের নামে সেই তসলিমাকে রক্ষা করতে চায়, যে তসলিমা বাংলাদেশকে শুয়োরের বাচ্চা বলে গালি দিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের সীমানাকে রাবার দিয়ে মুছে ফেলার কথাও ঘোষণা করেছে।'

জানি না কখন পত্রিকা আমার হাত থেকে খসে পড়ে, জানি না কখন এক শরীর অবসাদ আমাকে নিস্তেজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এ কি ঘুম নাকি অন্য কিছ ! বার বার চমকে চমকে উঠি। ঘুম বা ওই অবসাদের ঘোরের মধ্যে দেখি আমার চারদিকে কিলবিল করছে সাপ। সাপ সাপ আর সাপ। বিষধর সব সাপ। হঠাৎ শরীরে সাপ উঠে আসে, আমি লাফিয়ে উঠি, চেয়ে দেখি আমাকে ছুঁয়ে আছেন ঝ। ঝ বললেন, কি হয়েছে তোমার? কাতরাচ্ছিলে ঘুমের মধ্যে।

ডডআমি ঘুমিয়েছিলাম?

কিঁ কিঁ করা পাখার চলার মধ্যেও আমি ঘেমে ভিজে উঠেছি।

ডডকি কাণ্ড, দেখতো! ঝ সিগারেটের একটি প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখো তোমার কাছে। টেনশন হলে খাবে।

ডডরাত কত?

ডডদেড়টা বাজে। ঝ নাক কুঁচকে বললেন, এ বাড়িতে একদিনও তুমি গোসল করেছো?

ডডনা।

ডডকেন করোনি? সেই যে জামাটা পরে আছো, এটা তো পাল্টাচ্ছো না।

ডডকল ছাড়লে শব্দ হয় বলে ..

ডডঠিক আছে। আমি এখন আছি এখানে। গান ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি গোসল করে জামা পাল্টাও। তোমার গা থেকে জামা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

ঝর আদেশ মেনে আমি শরীরটি উঠিয়ে গোসলখানায় নিই। আয়নায় নিজেকে দেখে চেনা যায় না। চোখের নিচে কালি, মাথার চুলগুলো আঠা আঠা, জট বাঁধা। শরীরটিকে জলের নিচে ফেলি। ইচ্ছে করে না গোসল করতে। কী লাভ গোসল করে, গা পরিষ্কার থেকে। মরে গেলে এই শরীর দিয়ে দিয়ে কী হবে! নিজের জন্য নয়, গোসলটি আমি ঝর জন্য করি। গায়ের ঘামের গন্ধ দূর করে যখন ফিরি ঝ বললেন, চল ছাদে যাবে আমার সঙ্গে।

ডডছাদে? বল কি! কেউ যদি দেখে ফেলে!

ঝকে এত আপন মনে হয় যে বলেই ফেলি তাঁকে তুমি।

ডড্চল। এই রাতে কেউ টের পাবে না।

ঝ বারান্দার দরজা খুলে আমাকে নিয়ে ছাদে উঠলেন। ছাদে ওঠা মানে সিঁড়ি বেয়ে কোনও সত্যিকার ছাদে ওঠা নয়। টালির খাড়া ছাদে বেয়ে ওঠা। টাল সামলাতে না পারলে পড়ে গিয়ে ভর্তা হতে হবে। ঝ তরতর করে বেয়ে ওঠেন। অন্ধকারে পেছন পেছন আমি। ছাদে বসে তারা ভরা আকাশ দেখি। কতকাল আকাশ দেখি না। কতকাল তারা দেখি না। মরে গেলে, কে যেন বলেছিল, মানুষ আকাশের তারা হয়ে যায়। আমিও কি একটি ছোট্ট তারা হয়ে আমার দেশটিকে দেখব! তারা হয়ে দেখি টালির ছাদের ওপর বসে থাকা আমাকে, এক বিন্দু আমাকে। বুক ভরে শ্বাস নিই। গরমের রাতে অবকাশের ছাদে উঠে হাওয়া খেতে কি যে ভাল লাগত। আমার জীবন থেকে অবকাশ, শান্তিনগর, বাবা মা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব,সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক জগত সব হারিয়ে গেল। আমি এখন পলাতক আসামী। যে কোনও মুহূর্তে আমাকে খুন করা হবে। এই এত সুন্দর এত আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবীটিতে আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না। আমাকে বেঁচে থাকতে কেউ দেবে না। একবার মরে গেলে আমি তো আর কখনও কিছুতেই আবার ফিরে আসতে পারব না এই পৃথিবীর কোথাও। আমি মরে গেলে পৃথিবী যেমন চলছে, তেমন চলতে থাকবে। সবাই থাকবে, কেবল আমিই থাকব না। প্রতিরাতে এরকম আকাশে তারা ফুটবে, কেউ কেউ রাত জেগে তারা দেখবে এই আমি যেমন দেখছি, কেবল আমিই আর দেখব না। গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা আসবে, বৃষ্টির রিমিঝিমি শব্দ আর কোনওদিন শুনব না, মার রান্না করা ভুনা খিচুরি আর ইলিশ ভাজাও আর খাওয়া হবে না। শরতের আকাশের আশ্চর্য সুন্দর মেঘও আমার আর দেখা হবে না। শীত আসবে, চারদিকে উৎসব শুরু হবে, ভোরের শিউলি ফুলের ঘ্রাণ নেব না, ছোটবেলার মত ভাপা পিঠে আমার আর খাওয়া হবে না, বসন্তে ফুল ফুটবে, কৃষ্ণচুড়ার লালে ছেয়ে যাবে দেশ, দেখা হবে না আমার। মৃত্যু এত ভয়ংকর কেন, এত জঘন্য কেন, এত নিষ্ঠুর কেন! হঠাৎ ছাদে বসে গায়ে ঝিরিঝিরি হাওয়া পেতে পেতে আমার এত ভাল লাগে যে আমার মরতে ইচ্ছে করে না। ঝ কে বলি, আমার মরতে ইচ্ছে করছে না।

ঝ এগিয়ে এসে আমার একটি হাত স্পর্শ করেন। ঝর হাতটি আমি শক্ত করে চেপে ধরি।

পঁচিশ জুন, শনিবার

ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজরা দেশ জাতি মানবতা ও ইসলামের শত্রু এদের প্রতিহত করুন

ইসলাম শান্তি, ন্যায় ও মানবতার ধর্ম। এ ধর্ম মানুষে মানুষে হানাহানি, সংঘাত, কলহ ও দ্বন্দ্বকে সমর্থন করে না। ধর্মকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তি ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয়। যুগযুগ ধরে এদেশের মানুষ ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে। চেতনাগতভাবে তারা অসাম্প্রদায়িক এবং একে অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে চিহ্নিত একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাদের জঘন্য রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীস্বার্থে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহার করে আসছে এবং সুকৌশলে এদেশের সরলমতি মানুষকে আত্মঘাতী সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার অব্যাহত অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এই মহলটিই ১৯৭১ সালে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলাম রক্ষার অজুহাতে লক্ষ লক্ষনিরপরাধ মানুষকে হত্যা, নারী ধর্ষণ ও লুণ্ঠনসহ সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে নজিরবিহীন এক ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছিল। সেদিনের সেই বর্বরতার স্মৃতি কোনওদিন এ দেশের মানুষের মন থেকে মুছে যাবে না। বলার অপেক্ষা রাখে না এরা ইসলামের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক এবং মানবতার কলঙ্ক।

ইসলাম ও মানবতার এই চিহ্নিত দুষমনরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মনগড়া ফতোয়াবাজির মাধ্যমে একাত্তরের মতই এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে তারা আবারও একটি আত্মঘাতি সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। এই স্বঘোষিত ধর্মরক্ষক শ্রেণী তথাকথিত ধর্ম অবমাননার শাস্তির দাবিতে লেখক, সাংবাদিক, কর্মজীবী নারী, এনজিও এবং দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ জাতীয় উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, কুৎসা রটনা ও বোমাবাজি সহ নানাবিধ ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। নিরীহ নারী সমাজের ওপর যথেচ্ছ নির্যাতন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ফাঁসির দাবির পাশাপাশি যাকে ইচ্ছে তাকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে এবং মুরতাদ কাফের ফতোয়া দিয়ে জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। ধর্ম রক্ষার অজুহাতে তথাকথিত জেহাদী চেতনার ধুয়া তুলে সমাজে একটি অন্ধ উম্মাদনা ছড়িয়ে দেওয়াই এদের লক্ষ। এরা ধর্মের নামে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়াকে নেতিবাচক ধারায় ঠেলে দিতে চাচ্ছে। এরাই একদা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম গাজ্জালী, মাওলানা রুমী এবং আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামকে কাফের ফতোয়া দিয়ে কোতল করার আহবান জানিয়েছিল।

অথচ ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। কারও মতের বা ধর্মের সঙ্গে অমিল হলেই তাকে হত্যা করতে হবে এমন কথা ইসলামে নেই। বরং পবিত্র কোরান মানুষকে যে কোনও ধর্ম গ্রহণ এবং বর্জন করার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। যেমন ধর্মের ব্যাপারে কোনও প্রকার জোর জবরদস্তি নাই(সুরা বাকারা), যার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করুক (সুরা কাহাফ), উপদেশ গ্রহণ করে যে চায় সে তার প্রভুর পথে চলতে পারে(সুরা দহর), ঈমান আনার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না(সুরা ইউনুস)। এরকম আরও অজস্র দৃষ্টান্ত হাদীস শরীফে এবং মহানবীর (সাঃ) জীবনাদর্শে খুঁজে পাওয়া যাবে। পবিত্র মককা বিজয়ের পর মহানবী ইসলামের কট্টর শত্রুদেরও হত্যা কিংবা কোনওধরনের নির্যাতন করার অনুমতি দেননি। বরং তিনি সকল ধর্মের ও মতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক ঐতিহাসিক

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেদিন। আর বিদায় হজ্বের সেই মহামূল্যবান সতর্কবাণী তো সকলেরই জানা। আমাদের প্রিয় নবী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, তোমরা ধর্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করিও না। ধর্ম লইয়া বাড়াবাড়ি অনেক জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।
ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়া বা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের জন্য মহানবী (সাঃ) কখনই কোনও ব্যক্তিকে হত্যা বা অন্য কোনওরূপ শাস্তির আদেশ দেন নি। ধর্মের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কোনওরূপ জাগতিক শাস্তির বিধান থাকলে মহানবী (সাঃ) অবশ্যই তা পালন করতেন। কেননা ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি যে পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং তা রক্ষা করেছেন সে পদ্ধতি বাদ দিয়ে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী সমস্ত কার্যকলাপপ্রকৃত মুসলমানদের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইসলাম রক্ষা অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতেই করতে হবে। তা না হলে এটা ইসলামের জন্য শুধু দুর্নামই বয়ে আনবে না, বরং সমূহ ক্ষতিরও কারণ হবে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে আল্লাহর প্রবর্তিত ধর্মের, জাতির এবং মানবতার প্রধান শত্রু হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী চক্র। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে এই মৌলবাদীদের অবস্থান বহু দূরে। ইসলামের দোহাই তুলে এরা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর - যা তারা ১৯৭১ এ হাসিল করতে পারেনি। এই অপশক্তি আবারও একটি গণহত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রে মেতেছে। অতএব, এই ভণ্ড, নরঘাতক, ধর্ম ব্যবসায়ী, ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী এবং ফতোয়াবাজ চক্রকে এখনই প্রতিহত করা প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও ধর্মপ্রাণ নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি।

সচেতন লেখক, শিল্পী ও নাগরিক সমাজ।

ঝ আপিস থেকে ফিরে কয়েকটি লিফলেট দিলেন আমাকে। শহরে বিলি হচ্ছে লিফলেট, তাঁর হাতেও পড়েছে। সচেতন লেখক, শিল্পী ও নাগরিক সমাজের এই লিফলেটটি কারা ছেপেছে ঝ কিছু জানেন কি না জিজ্ঞেস করেছিলাম। ঝ জানেন না।
আরেকটি লিফলেট সর্বহারা পার্টির। দেশে একটিই আন্ডারগ্রাউন্ড দল আছে, সেটি এই সর্বহারা পার্টি। শামীম সিকদারের ভাই সিরাজ সিকদার ছিলেন সর্বহারা পার্টির নেতা, তাঁকে খুন হতে হয়েছে ৭৪ সালে। সর্বহারা পার্টির লিফলেটটি আর সব লিফলেট থেকে অন্যরকম। এখানে ধর্মের ভাল ভাল কথা ব্যবহার করে ধর্মীয় মৌলবাদীদের দমন করার কোনও চেষ্টা নেই। আন্ডারগ্রাউন্ড বলেই বোধহয় সম্ভব হয়েছে ওদের পক্ষে এই অবস্থান নেওয়া। লিফলেটটির শিরোনাম ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক! সাম্রাজ্যবাদ ও বড় বুর্জোয়া নিপাত যাক। এরপর ম্যালা কথা। ধর্মীয় ফ্যাসিস্টরা কি করছে দেশে, তার বর্ণনা। এরপর বলা হচ্ছে, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীরা কোনও বিচ্ছিন্ন শক্তি নয়, তারা এই প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসকশ্রেণীরই অংশ।
ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পরিণতি কী হতে পারে তা দেখা যায় সারা পৃথিবী জুড়ে। এই উপমহাদেশে গত ৫০ বছরে এর বলি হয়েছেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলিম সাধারণ জনগণ। ভারত, আফগানিস্তান, ইরান, বসনিয়া, প্যালেস্টাইন আজ হিন্দু মুসলিম খৃস্টান ও ইহুদি মৌলবাদীদের হিংস্র থাবায় জর্জরিত। ধর্ম যাই হোক না কেন, সবদেশের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীরা জাত ভাই। এদেশে এদের আন্দোলনের পরিণতি হবে হিন্দু মুসলিম, শিয়া সুন্নী, কাদিয়ানী সুন্নী দাঙ্গা, জনগণের উপর লুটপাট, খুন, নারীদের অধিকার হরণ, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির উপর নিপীড়ন এবং সাধারণভাবে জনগণের মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে

হরণ। এদের পূর্বসুরীরাই বিজ্ঞানী ব্রুনোকে বিজ্ঞান প্রচারের দায়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল, গ্যালিলিওকে বন্দী করেছিল, বেগম রোকেয়া, নজরুল, আরজ আলী মাতব্বরকে নির্যাতন করেছিল, অগণিত সমাজ বিপ্লবীকে নিপীড়ন হত্যা করেছিল।

তাই, এদেশের শ্রমিক, কৃষক, গরিব মানুষ ও প্রগতিশীল জনগণকে এই ধর্মান্ধ ধর্মব্যবসায়ী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে যা ধর্মীয় মৌলবাদের পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটাবে। সেটা সম্ভব শুধুমাত্র এই ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করেই - কারণ, এই রাষ্ট্রযন্ত্র, বড় ধনী শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী - সম্প্রসারণবাদীরাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামের ধর্মীয় মৌলবাদকে টিকিয়ে রাখছে। আসলে ধর্মীয় মৌলবাদীরা এদেরই অংশ।.. ধর্মীয় ফ্যাসিস্টরা ব্যাপক দাঙ্গা ও নিপীড়নের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। জনগণের ওপর সশস্ত্র হামলা তারা শুরু করে দিয়েছে। তাই, পাল্টা বল প্রয়োগে ও অস্ত্র হাতে তাদের মোকাবেলা করতে হবে।

সর্বহারা পার্টি আহবান জানাচ্ছে, এই ফ্যাসিবাদীদের উপর গেরিলা কৌশলে সশস্ত্র আক্রমণ করুন। এবং জঙ্গী গণহামলা চালান তাদের আস্তানা ও স্বার্থ কেন্দ্রগুলোর উপর। গোলাম আযম, মাওলানা মান্নান, সাইদী, নিজামী, বায়তুল মোকাররমের রাজাকার ইমামদের মত বদমাইশ পাণ্ডাদের গেরিলা কায়দায় খতম করুন। সংগ্রাম, ইনকিলাবের মত পত্রিকাগুলোর উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালান, গণহামলা করুন। পুড়িয়ে দিন তাদের অফিস আস্তানাগুলো। যেমন কুকুর তেমন মুগুর ছাড়া প্রগতিশীল জনগণের অন্য কোনও উপায় নেই।

.... .. ব্যাপক ঐক্য ও দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন। আওয়াজ তুলুন

০সকল ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ কর।

০সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন কর। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নীতি প্রতিষ্ঠা কর।

০ধর্ম প্রশ্নে যে কোনও বিশ্বাস ও মতবাদ (নাস্তিকতাসহ) প্রকাশ-প্রচারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কর।

০রাষ্ট্রধর্ম বাতিল কর।

০মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষায় পরিণত কর।

০বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক আরবি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বাতিল কর।

০মসজিদ মন্দির গির্জায় রাষ্ট্র থেকে আর্থিক অনুদান বন্ধ কর। এ অর্থ গরিব জনগণের বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণে ব্যয় কর।

০ নারী অধিকারের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি, ওয়াজ, বাধ্যতামূলক পর্দা বোরখাসহ বিবিধ নিপীড়ন নিষিদ্ধ কর।

০ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যতিত সকল সালিশ বিচার প্রশাসনে ইমাম মৌলানাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ কর।

০পীরবাদের নামে ধর্ম ব্যবসা নিষিদ্ধ কর।

০ আহমদ শরীফ, তসলিমা ও জনকণ্ঠের উপর হয়রানি নির্যাতন বন্ধ কর।

০গোলাম আযম সহ একাত্তরের রাজাকার পাণ্ডাদের কঠোর শাস্তি দাও।

এরপর আরও অনেক কথা, শ্রমিক কৃষকের কথা, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তের কথা, সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম জাগিয়ে তোলার কথা গ্রামে গ্রামে। সশস্ত্র প্রতিরোধ আর পাল্টা আক্রমণের কথা। শেষ করা হয়েছে আরও কিছু স্লোগান দিয়ে

নিপীড়িত জনগণের বিজয় অনিবার্য। বিজ্ঞানসম্মত সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

০গোপন গেরিলা স্কোয়াড গড়ে তুলুন।

০ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের ওপর সশস্ত্র আত্রমণ চালান।

০বিপ্লবের মতবাদ মার্কসবাদ - লেনিনবাদ - মাওবাদ।
০মাওবাদের আদর্শে সজ্জিত হোন। গ্রাম ভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ গড়ে তুলুন!
০শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বহারা পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হোন।

কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। জুন, ১৯৯৪

ঝকে বলেছিলাম আমার উকিলের কাছে অন্তত একটি ফোন করতে চাই আমি, জানতে চাই আমার জামিন বিষয়ে, কবে হবে জামিন, কখন হবে। ঝ বলেছেন, ক আর ঙ তাঁকে বলে গেছেন কোথাও যেন আমি ফোন না করি।

ডডডঃ কামাল হোসেনের কাছে ফোন করলে কি অসুবিধে?

ডডতোমার উকিলের ফোনে সম্ভবত আড়ি পাতা হচ্ছে, কারণ তুমি ফোন করতে পারো এই সন্দেহে। কোত্থেকে ফোন করেছো, এই খোঁজটি পেয়ে যাবে পুলিশ। তখন কী হবে একবার ভেবে দেখেছো?

ডডহয়ত আড়ি পাতা হচ্ছে না।

ডডহয়ত হচ্ছে।

ডডতবে ককে একটা ফোন করা দরকার, কেন ক আসছেন না..

ডডকর ফোন নম্বর আমি জানি না। ককে ফোন করতে তো না বলে গেছে সেদিন।

ডডতবে ঙকে ..

ডডঙ ও না বলেছেন। তারপরও আমি ফোন করব, এত যখন তোমার অস্থিরতা..

ঝ আজ কিঁ কিঁ করা পাখাটি পাল্টে অন্য একটি শব্দহীন পাখা দিয়েছেন। লিফলেট তো আছেই কিছু, পত্রিকাও দিয়েছেন পড়তে। আজকের খবরগুলো হরতালের পক্ষে সারা দেশে সভা সমাবেশ আর মিছিল হওয়ার খবর। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বিশাল লাঠি মিছিল করেছে। হাজার হাজার মুলিবাঁশ আন্দোলিত হচ্ছে মাথার ওপর। ডঃ কামাল হোসেন গণফোরামের সভায় বলছেন, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। স্বাধীনতার ২২ বছর পর গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ও স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করতে আন্দোলনে নামতে হয় এটি অকল্পনীয় ব্যাপার। পঁচাত্তরের পর সরকারগুলো রাজাকারদের দেশে এনেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি, শেষে বলেছেন, এখন মৌলবাদীদের যে করেই হোক রোধ করতে হবে, তা না হলে সর্বনাশ। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মতবিনিময় সমাবেশ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি (ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র)র ভেতর। একই মত সবার, বিনিময়ের কিছু নেই। মত হল, জামাত শিবির সহ সকল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিল পাস করতে হবে সংসদে, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে, ৩০ জুন সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন, গোলাম আযম গংদের বিশেষ ট্রাইবুন্যালে বিচার, গণআদালতের রায় কার্যকর, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে। জোটের এই সভায় কেবল যে শিল্পী সাহিত্যিক ছিলেন তা নয়, রাজনৈতিক নেতারাও ছিলেন, বিশেষ করে বামপন্থীরা। শামসুর রাহমান জোটের এই সভায় বলেছেন, আমরা আজ এক বিরাট সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। সব পেশার মানুষ আজ গভীর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যারা একাত্তর সালে তিরিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, যারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, তারা আজ মাঠে নেমেছে, আমাদের নীরবতার

সুযোগ নিয়ে তারা আজ ফণা তুলেছে। যে কোনও মূল্যে এই অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে না পারলে এই দেশে গভীর অন্ধকার নেমে আসবে।

নগর আওয়ামী লীগের সমাবেশে বলা হয়েছে একাত্তরের গণহত্যার নায়ক গোলাম আযমকে নাগরিক করার জন্য এদেশ স্বাধীন হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে জনগণ যখন সোচ্চার, ঠিক তখনই সরকার স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।নানা কথা .. নানা কথা। একজন কেবল উল্লেখ করেছেন আমার কথা, তসলিমা নাসরিনের বহু লেখার সঙ্গে গোষ্ঠীর নেতারা একমত নন। প্রমাণ সাপেক্ষে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন যে কেউ কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা শিরোচ্ছেদ ঘোষণা করে মানুষকে বোকা বানানোর অপপ্রয়াস সম্মিলিত ভাবে রোধ করা হবে। জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভায় স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট শক্তিকে নগরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে পাড়া মহল্লায় প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের জন্য আহবান জানানো হয়েছে। ২৮ জুন বিকেল চারটায় এই কমিটির সমাবেশ হবে। আজ সাড়ে চারটায় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নাগরিক সভা, গণমিছিল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় নগর সমন্বয় কমিটির যৌথ কর্মী সমাবেশ, ২৭ জুন বিকেল চারটায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের জনসভা, টিএসসিতে চারটায় মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমান্ডের সমাবেশ, ২৯ জুন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজের মশাল মিছিল, ৩০ জুন সকাল এগারোটায় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি প্রতিরোধ কমিটির সমাবেশের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানানো হয়। নতুন কর্মসূচিতে ঘোষণা করা হল, ২৯ জুন রাত আটটায় জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভা হবে আর ৩০ জুন বিকেল চারটায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউএ জনসভা হবে। ..... তাহলে হচ্ছে কিছু, হবে কিছু। .আশা নামের একটি শিশু যেন আমার দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। মনে মনে শিশুটির সঙ্গে আমি খেলা করি।

সন্ধের দিকে ঝ ঘরে ঢুকলেন জকে নিয়ে। জ পাশে বসে আমার একটি হাত তাঁর হাতের মুঠোয় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে। চোখে মায়া। ঝ মেঝেয় আসন পেতে বসে গেলেন। জ আমাকে জিজ্ঞেস করেন না কেমন আছি আমি, তিনি অনুমান করে নেন কেমন আছি। আমার মলিন মুখটিতে তিনি হাত বুলিয়ে দেন, আমার চুলে, পিঠে হাত তাঁর। আমি স্থবির বসে থেকে জর মুখে তাকিয়ে থাকি, জর চোখে জল।

জ বললেন, কি বলে তোমাকে সান্ত্বনা দেব, জানি না। আমাদের কোনও ভাষা নেই। ইচ্ছে করে জর কোলে মাথাটি রেখে শুয়ে থাকি। বসে থাকলে মাথা ঘোরে। পড়ে যাবো পড়ে যাবো লাগে। ঝ সিগারেট দেন খেতে।

ঝ বললেন, ও তো টেনশন করছে খুব। খাচ্ছে না, ঘুমাচ্ছে না। বলেছি, সিগারেট খাও, টেনশন কমবে।

জ বললেন, সিগারেট খেলে তো আরও ক্ষতি হবে। কিন্তু খাবার খাচ্ছে না কেন?

ডডখেতে নাকি ইচ্ছে করে না। আমার এমনিতে লুকিয়ে ভাত আনতে হয়। কেউ দেখে ফেললে বলি যে ওঘরে আমি ভাত নিয়ে যাচ্ছি খেতে। এটা তো সবসময় করা যায় না। আমার ভয় হয় ওদের না আবার কোনও সন্দেহ হয়।

ডডকিছু বিস্কুট টিস্কুট তো এঘরে রেখে দিলে খেতে পারে। ভাত আনতে যদি অসুবিধা হয়।

ঝ বললেন, এটা ভাল কথা বলেছেন। কাল থেকে কলা বিস্কুট এসব এনে দেব।

জ বললেন, আমি জানলে কিছু নিয়ে আসতে পারতাম।

আমি শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকি দেয়ালের দিকে। জ বললেন, শোনো, কিছু খেতে তো হবে তোমাকে। শরীর তো এ কদিনে অনেক শুকিয়ে গেছে। না খেলে চলবে কি করে? বেঁচে থাকতে হবে না!

খাওয়া দাওয়ার গল্প আমার ভাল লাগে না। জর কাছে জানতে চাই ঙর সঙ্গে তাঁর দেখা বা কথা হয়েছে কি না।

জ বললেন যে একবার শুধু ফোনে কথা হয়েছে। ঙ ব্যস্ত সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নিয়ে, আন্দোলন নিয়ে। আমাকে যে এখানে রেখে গেছেন তা জানিয়েছেন জকে। জকে বলেছেন যেন আমাকে এখানে দেখতে আসেন।

ডডঙ কি আসবেন না?

জ বললেন, নিশ্চয়ই আসবেন। হয়ত সুযোগ পাচ্ছেন না, তাই আসছেন না। কখন যে কে কার পিছু নেয়, তা বলা মুশকিল। আমিই এসেছি ভীষণ ভয়ে ভয়ে। বার বার রিক্সাথামিয়েছি, কেউ আমাকে ফলো করছে কি না দেখেছি। রিক্সা ঘুরিয়ে এনেছি, সোজা আসিনি।

আমার কণ্ঠস্বরটি, বুঝি আমি, খুব ম্লান। স্বর বেরোতে চায় না। কথা বলতে নিলে খড়খড়ে হয়ে থাকা গলাটি জ্বলতে থাকে। যেন ঘা হয়ে গেছে গলনালীতে। নিজের কাছেই অচেনা লাগে নিজের স্বর।

জ আমাকে কথা দেন যে তিনি ঙর বাড়ি গিয়ে হলেও বলে আসবেন যেন তিনি একবার আসেন আমার কাছে।

ঝ তিরিশ তারিখের হরতাল সম্পর্কে জর মত জানতে চান। জ নিজের কোনও মতের কথা না বলে বললেন, আজ আওয়ামী লীগ মিছিল বের করেছে।

ডডসত্যি!

ডডসত্যি।

ঝ মুষ্ঠিবদ্ধ দুহাত ওপরে তুলে জয়ধ্বনি করলেন।

ডডশেখ হাসিনা ছিল মিছিলে? ঝর প্রশ্ন।

জ বললেন, না, নেত্রী ছিলেন না। তবে আবদুর রাজ্জাক, আমীর হোসেন আমু এরকম কয়েকজন ছিলেন নেতা।

ডডঅগত্যা মধুসূদন! নামবিই যখন আগে নামলি না কেন!

জ বললেন, নামার তো ইচ্ছে ছিল না, ছাত্রলীগের নেতার খুব ক্ষেপে যাচ্ছিল, আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করছেন যে বুদ্ধিজীবীরা, তাঁরা তো ভীষণ রাগ করছিলেন হাসিনার ওপর। হাসিনা শেষ পর্যন্ত মনে হয় বুঝেছে যে এভাবে জামাতকে নমো নমো করে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। নিজেদের সাপোর্ট যে তারা অলরেডি হারাতে শুরু করেছে, টের পেয়েছে।

ঝ আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এ তো তোমার জন্য ভাল খবর। মোল্লাদের সাথে ফাইট করার দল চলে এসেছে।

জ ঠোঁট উল্টে বললেন, এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে। আওয়ামী লীগের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা চাইছে না পথে নামতে। এতে নাকি কিছু অসুবিধে আছে। প্রথম হল লোকে ধারণা করতে পারে যে আওয়ামী লীগ

তসলিমার পক্ষে, এর মানে নাস্তিকতার পক্ষে। মোল্লাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা মানে তসলিমার পক্ষ নেওয়া। আওয়ামী লীগের কেউ তসলিমা নামের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। আওয়ামী লীগ বহু কষ্টে তার ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্নাম ঘুচিয়ে এখন দিনরাত *আল্লাহু আকবর জয় বাংলা* বলছে। আর একটু ডোজ পড়লেই জামাতের মত বলবে *নারায়ে তকবীর আল্লাহুআকবর।* আমার মনে হয় না আওয়ামী লীগ দলীয় ভাবে নেমেছে আন্দোলনে, হয়ত হাতে গোনা কজন নেতা কেবল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রদলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।
ঝ বলতে নিচ্ছিলেন, মেইন তো হল জামাতকে সাথে নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা..
জ সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ   জামাত আর জাতীয় পার্টিকে সাথে নিয়ে সরকার পতনের আন্দোলন বেশ জমিয়ে করার ইচ্ছে। এখন জামাতের বিরুদ্ধে নামা মানে হাত থেকে জামাত ফসকে যাওয়া। এটাতে দলের অনেকে নাখোশ।

আজ ছাত্রদের জঙ্গী মিছিলের খবর দিলেন জ। গোলাম আযমের ফাঁসি কার্যকর ও ফতোয়াবাজদের উচ্ছেদ করতে ৩০ জুন দেশব্যাপী সকাল সন্ধ্যা হরতাল/ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ এই ব্যানার নিয়ে ছাত্রদের একটি মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে প্রেসক্লাবের কাছে গিয়ে মুখোমুখি হয় ইয়ং মুসলিম সোসাইটির। ইয়ং মুসলিম সোসাইটি ওখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করছিল। তখনই ছাত্ররা *ধর মৌলবাদীদের, ধররাজাকারদের* বলে ইয়ং মুসলিমদের ওপর হামলা চালায়। সমাবেশে যে চেয়ার ছিল, ওগুলো তুলে তুলে ছাত্ররা ইয়ং মুসলিমদের নেতাদের মারধোর করে, হঠাৎ করে ধাওয়া আর বেধড়ক মার খাওয়ার ফলে সোসাইটির লোকেরা প্রেসক্লাব চত্বর ছেড়ে সচিবালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারাও দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে ছাত্রদের দিকে। ছাত্ররাও পাল্টা ঢিল ছোঁড়ে। পুলিশ এসে এরপর ছাত্রদের লাঠিচার্জ করে, কিছু ছাত্রনেতাকে আহত করে, ওদিকে পুলিশের সহযোগিতায় ইয়ং মুসলিম সোসাইটির লোকেরা পালিয়ে যায়। এই সংঘর্ষের সময় ওখানে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, দোকানীরা দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেয়, পথচারীরা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে থাকে। বুধবারেও এরকম ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ চলেছিল, পুলিশ রমেন মণ্ডল নামের এক ছাত্রকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সংঘর্ষ আরেকটি প্রায় বাধে বাধে ছিল। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করেছে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের মিছিল থেকে শ্রমিকদের ওপর হামলা শুরু করতে নিলে পুলিশ দু দলের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
ঝ হঠাৎ বললেন, আজ তসলিমার শহর থেকে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির ১৮০ জন শিক্ষক তসলিমার ফাঁসি দাবি করেছেন।
ডডতসলিমার কোনও বাড়ি নেই, শহর নেই, দেশ নেই। আমি মন্তব্য করি।
জ আর ঝ দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
তিরিশ তারিখে কী হবে জ অনুমান করতে পারছেন না। একটা কি জানি কি হয় কি জানি কি হয় পরিবেশ পুরো দেশে। একাত্তরের মত মনে হয় জ র কাছে,

একাত্তরের মার্চ মাসটির মত ভয়াবহ, অনিশ্চিত। যেন সত্যি সত্যি একটা যুদ্ধ লাগছে।

ঝ সিগারেটের ধোঁয়া শূন্যে ছেড়ে দিয়ে বললেন, দুঃখ এই, এবারের যুদ্ধে বড় শক্তিটি মৌলবাদী গোষ্ঠীর, আর ছোট শক্তি প্রগতিশীলদের।

জ মাথা নাড়েন, আসলে তসলিমা ইস্যুটিই বুঝিয়ে দিল মৌলবাদীরা কত বড় শক্তি এ দেশে। বদমাশগুলো কি করে সারা দেশ কাঁপিয়ে তুলছে.. । আমরা তো ভেবেছিলাম মৌলবাদী দল নিতান্তই ছোট কিছু। পাত্তাই দিই নি কখনও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ বললেন, এই দেশ মৌলবাদীদের হাতে চলে যাচ্ছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

কে পারে বিশ্বাস করতে! এসব তো অবিশ্বাস্য ঘটনা। ঝ বলেন।

ঝ নিশ্চিন্তে অনেকক্ষণ বসতে পারেন এ ঘরে আজ রাতে। কারণ বাড়ির লোকেরা জানে তাঁর কাছে একজন অতিথি এসেছেন। ঝ আড়াইতলার ছোট ঘরটিতে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। ঝ এমনকী নিচ থেকে ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এলেন। অতিথির জন্য খাবার। কারও ভ্রূ কুঞ্চনের কিছু নেই।

জ যখন চলে যাচ্ছেন তাঁকে বড় কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করি একবার যেন তিনি শান্তিনগরে আমার বাড়িতে যান। আমার বাবা মা ভাইবোনেরা কেমন আছে, বেঁচে আছে কি না দেখে আসেন।

জ কথা দেন তিনি যাবেন। কথা দেন তিনি আবার আসবেন আমাকে দেখতে।

সাতাশ জুন, রবিবার

ডডএই মেয়ে, তুমি তো মরে যাচ্ছো!

ডডমরে যাচ্ছি, কই নাতো! এখনও তো আমার নাড়ি চলছে ভাল। শ্বাসও নিচ্ছি। মরছি বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া রোগ তো কিছু নেই যে মরব।

ডডকি রোগ জানি না। তবে শখের মরা অনেকে তো মরতে চায়, সেরকম মরছ তুমি।

ডডমরলে তো ভালই, একরকম বাঁচা। তখন আর কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না যে কেউ বুঝি আজই রামদা দিয়ে আমার গলাটা কেটে ফেলল।

ডডদুশ্চিন্তা কোরো না, বাঁচো। বাঁচার মত চমৎকার জিনিস আর নেই।

ডডআমার কাছে কিন্তু তা মনে হয় না। বাঁচাটাকে এখন আমার বড় দুঃসহ লাগে।

ডডএখন মনে হচ্ছে। কিন্তু ঝড় ঝঞ্ঝা কেটে গেলে তখন কিন্তু মনে হবে না।

ডডকাটবে কি কখনও?

ডডজানি না। কিন্তু যদি কাটে! আচ্ছা, তুমি তো আগে কখনও এমন হতাশ ছিলে না কিছুতে! সবসময়ই একটি ্আশা নিয়ে, একটি স্বপ্ন নিয়ে প্রচণ্ডভাবে বেঁচে থাকতে। চারদিকে এত শত্রুতা, এত হুমকি, তার পরও তো পরোয়া করোনি।

ডডএখনের সঙ্গে কি তখনের তুলনা চলে!
ডডহ্যাঁ তা ঠিক, এখন অন্যরকম। এখন তোমার কিছুতেই ঘর থেকে এক পা বেরোনো চলবে না। এখন বাইরের কারও জানা চলবে না, তুমি কোথায় আছো।
ডডএই জীবন আমার জঘন্য লাগছে। এই জীবন থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। এই ইঁদুরের জীবন আমি আর যাপন করতে পারছি না। ভয়ের চোটে গর্তে লুকিয়ে আছি, এ আমি ভাবতেই পারি না। আমি তো কখনও এমন ছিলাম না। কখনও তো লুকোইনি কোথাও। জীবনে তো কম বিপদ আসেনি।
ডডতোমার তো উপায় নেই আর। আগের বিপদ আর এখনকার বিপদে অনেক পার্থক্য আছে। অনেক কিছু ভাল না লাগলেও মেনে নিতে হয়। তোমাকে মেনে নিতে হবে জীবনটির জন্য। জীবনের মত মূল্যবান কিছু তো আর নেই। কষ্ট সহ্য কর। সহ্য কর আগামীর কথা ভেবে।
ডডআমার কোনও আগামী আছে বলে আমার মনে হয় না।
ডডবাজে কথা বোলো না। এখন তোমার খারাপ সময় যাচ্ছে বলে ভেবো না সবসময় সময় খারাপই যাবে। কত বড় বড় নেতারা এভাবে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। কমুনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ ছিল, তখন বড় বড় কমুনিস্ট নেতা এভাবেই লুকিয়ে থেকেছেন। এই কদিনে তুমি অতিষ্ট হয়ে গেলে চলবে কেন!
ডডআমি তো বড় কোনও রাজনৈতিক নেতা নই। আমি সাধারণ এক মানুষ। সাধারণ কিছু লেখা লিখেছি।
ডডনা, তুমি সাধারণ লেখা লেখোনি। সাধারণ কথা লিখলে দেশজুড়ে তোমার বিপক্ষে এমন আন্দোলন হত না।
ডডআমার পক্ষে কেউ নেই। এই যে এখন মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, এরা তো আমার পক্ষের কেউ নয়। কেউ আমাকে পছন্দ করে না।
ডডকে বলেছে! তোমার পক্ষে অনেক মানুষ আছে এ দেশে।
ডডবারো কোটি লোকের মধ্যে বারো জন পক্ষে থাকলে কী লাভ!
ডডলাভের কথা ভাবো কেন! আগে তো এমন করে ভাবতে না! আগে তোমার নিজের যা ইচ্ছে করত, তাই করতে। লাভ হবে বলে তো কিছু করনি। লাভ ক্ষতি নিয়ে মোটেও ভাবোনি।
ডডআগে হয়ত বোকা ছিলাম, তাই কিছু ভাবিনি।
ডডনা। এখন তুমি বোকামো করছ। এখন হিসেব করছ। কেউ যদি না ভালবাসে তোমাকে, এভাবে আশ্রয় পাচ্ছো কি করে?
ডডসে তো গুটিকয় মানুষ মাত্র..
ডডতুমি কি করে আশা কর তুমি যেসব কথা লিখেছো, তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমাকে সমর্থন করবে! তোমার ভাগ্য ভাল যে কিছু লোক এখনও তোমার বাক স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলছে। তুমি তো সংগ্রামী মেয়ে ছিলে, কখনও তো আপোস করনি, কখনও সত্য চাপা দিয়ে রাখোনি, কখনও পাছে লোকে কিছু বলবে বলে কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখোনি। এখন তুমি যদি এভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ো,

ভয়ে চুপসে থাকো, মরার আগেই যদি মরেই যাও, তবে তো বদমাশ মোল্লাদেরই জয় হবে।
ডডজয় তো ওদের হচ্ছেই।
ডডনা জয় ওদের হবে না। মানুষ আজ না হোক, কিন্তু একদিন বুঝতে পারবে যে ধর্ম এবং মৌলবাদ কি রকম ভয়ংকর জিনিস! ধর তোমাকে যদি ওরা মেরে ফেলে, তবে কি ভেবেছো ওরা জয়ী হয়ে গেল! মোটেও নয়।
ডডআমাকে যদি মেরে ফেলে তবে ওরা হারল কি জিতল সে দেখা তো আমার হবে না।
ডডনা হোক তোমার দেখা। তুমি যতদিন বাঁচবে আশা নিয়ে বাঁচবে, স্বপ্ন নিয়ে বাঁচবে, দেখবে মনে জোর পাবে, মনের জোরই মানুষকে সত্যিকার বাঁচায়।
ডডএকদিন তো ওরা আমাকে ঠিক পেয়ে যাবে, কদিন আর লুকিয়ে থাকতে পারব! পেলে আমার কল্লাটা কেটে নিয়ে চলে যাবে। বাকি শরীরটা কোথাও কোনও নর্দমায় পড়ে পচবে নয়ত শেয়াল শকুনে খাবে। ভেবেছিলাম মেডিকেল কলেজে দিয়ে যাবো শরীরটা.. কিন্তু
ডডমরে গেলে তোমার শরীর কোথায় গেল নর্দমায় গেল কি শেয়াল শকুনে খেল কি মেডিকেল নিল তা তো তুমি আর দেখছ না। তুমি তো আর আত্মায় বিশ্বাস কর না যে শরীরের ভাল কোনও সৎকার দেখলে তোমার আত্মা শান্তি পাবে। যতক্ষণ বেঁচে থাকো, ভালভাবে বাঁচো। মরে গেলে মরে যাবে, তাতে কি!
ডডকিন্তু কত যে কাজ ছিল..
ডডকাজ কি সবাই শেষ করে পরে মরে! ওই সুযোগ কটা মানুষ পায়? মৃত্যুটাতো মানুষের হঠাৎ আসে। দেখনা কত লঞ্চ, বাস, ট্রেন দুর্ঘটনা হচ্ছে। কত মানুষ মরে যাচ্ছে। তারা কি ভেবে ছিল সেদিন মরবে, তাদের কাজ বাকি ছিল না?
ডডকিন্তু এটা কি কোনও দুর্ঘটনা, আমার ফাঁসি হওয়া, বা আমাকে ওদের খুন করা..!
ডডনিশ্চয়ই দুর্ঘটনা। কত মানুষের জীবনে কত দুর্ঘটনা ঘটছে। কত কত মানুষকে মিথ্যে মামলায় ফেলে অপরাধী বানিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তুমি কেন ভাবো তোমার নিজের জীবনে কেবল সুঘটনাই আসবে!
ডডআমি তো কোনও অন্যায় করিনি!
ডডঅন্যায় করলেই কি শাস্তি হয় সবার, অন্যায় না করেও তো হয়! আর তোমার কাছে যেটি অন্যায় নয়, অন্যের কাছে সেটি হয়ত অন্যায়। সুতরাং মেনে নাও যে তোমার এই দেশের মানুষগুলোকে তুমি যা বোঝাতে চেয়েছো, বোঝাতে পারোনি, তারা ভুল বুঝেছে তোমাকে, তাই তোমাকে হত্যা করতে চাইছে। ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা আছে যেখানে অনেককে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে অকারণে। কত বড় বড় মানবতাবাদী, বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, রাজনীতিবিদদের নির্বিচারে হত্যা করাহয়েছে। তুমি তো তাঁদের তুলনায় কিছুই নও তসলিমা।
ডডতা ঠিক। মনে হয় আমি কিছু নই বলেই বোধহয় মরতে আমার ভয় হচ্ছে খুব।

ডডযুক্তিবাদী হও। ভয় কোরো না। বসে বসে সারাদিন দুশ্চিন্তা করে করে নিস্তেজ পড়ে থেকে সময় নষ্ট কোরো না। সময়টাকে কাজে লাগাও। লেখো। লেখাই তোমার বেঁচে থাকা।

ডডলিখতে আমার ইচ্ছে করে না। লেখা আমার আসেও না। লিখেই বা কি হবে! কি লাভ!

ডডআবার লাভ দেখছো!

ডডহ্যাঁ দেখছি।

ডডতাহলে কি করতে চাও?

ডডমাঝে মাঝে ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে। জীবনকে কয়েকবছর পিছিয়ে দিতে যদি পারতাম! তাহলে.. লেখালেখি করতাম না, যদি করতামই তবে প্রেমের গল্প লিখতাম, প্রকৃতি নিয়ে লিখতাম.. কেউ আমাকে খুন করতে চাইত না।

ডডতুমি একটা অপদার্থ। তোমার জন্য এই যে বিদেশে লেখকরা নারীবাদীরা মানবতাবাদীরা আন্দোলন করছে, তুমি তার যোগ্য নও। তুমি একটা ভীরু, ভীতু, স্বার্থপর মেয়েমানুষ। তোমার উচিত ছিল আত্মীয়দের পছন্দ করা পাত্রের কাছে *বিয়ে বসা।* শান্তশিষ্ট গৃহবধূর মত মন লাগিয়ে সংসার করা। বাচ্চা কাচ্চা জন্ম দেওয়া, তাদের লালন পালন করা।

ডডতাই হয়ত ভাল ছিল..

ডডকি ব্যাপার, এমন নেতিয়ে পড়ছ কেন! আবারও তো মরার মত পড়ে রইলে। যাব্বাবা, এতক্ষণ কথা বলে কোনও কাজই হল না। দিন রাত এখন এভাবেই শুয়ে থাকবে, জেগে থাকবে কিন্তু নড়বে না। চোখ বড় বড় করে সাদা দেয়ালের দিকে সারাদিন তাকিয়ে ভাববে, কী ভাবো কে জানে। এই ভাবনাগুলোও অন্তত লিখে রাখতে পারো তো।

ডডআমি একটা তুচ্ছ প্রাণী। আমি জীবনে কখন কি ভেবেছিলাম তা কার জেনে কী লাভ!

ডডতুমি আসলেই খুব তুচ্ছ মানুষ। তোমার মরে যাওয়াই ভাল। মৃত্যুটাই তুমি এখন সভয়ে এবং নির্ভয়ে চাচ্ছো। বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম তো করনি জীবনে, তাই জানো না বেঁচে থাকা কি জিনিস।

তা ঠিক এ কথা আমি জানি না। আমার খুব ইচ্ছে করে জানতে বেঁচে থাকা কেমন জিনিস।মরার মত পড়ে থাকি, ক্ষিধে পেতে পেতে একসময় দেখি আর ক্ষিধে পায় না, ঘুমও পায় না, না রাতে না দিনে। শরীরে আর মনে যে শক্তি ছিল তা কোথায় উবে গেছে, জানি না। শক্তিহীন, তেজহীন, জেদহীন, আশাহীন, স্বপ্নহীন একটি জীবন এখনও আমি ধারণ করে আছি। কেন আছি, জানি না।

অনেক রাতে ঝট করে ঢুকে ঝট করে বেরিয়ে গেলেন ঝ। একটি পত্রিকা রেখে গেলেন, পত্রিকার প্রথম পাতার খবরটি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে আমার দিকে। পত্রিকাটির দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখি কাঁপছে হাত। হাতটি পত্রিকার কাছে এসে নেতিয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে চোখ বুজে আসছে। চোখ খুলতে ভয় হচ্ছে। চোখ খুললে যেন দেখব কেউ দাঁড়িয়ে আছে সামনে আমাকে গলায় রশি বেঁধে মরা কুকুরের মত

টেনে নিয়ে যাবে মোহাম্মদ আলমের কাছে, ৫০ হাজার টাকা পেতে। সারা শরীরে অসহ্য এক যন্ত্রণা হতে থাকে আমার, যেন ইটপাথরের কর্কশ রাস্তার ঘর্ষণে আমার ত্বক ছিঁড়ে যাচ্ছে, মাংস খুলে যাচ্ছে, হাড় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আমাকে তবু টেনে নেওয়া হচ্ছে, আমার কোনও আকুতি, কোনও কান্না কারও মনে একটুও স্পর্শ করছে না, রাস্তার লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে আর হি হি করে আসছে আর হাততালি দিচ্ছে। কেউ আবার দৌড়ে এসে লাথি মারছে বুকে পেটে। আমাকে টেনে নেওয়া হচ্ছে, গলা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, মাথা কেটে বেরোচ্ছে, কেউ তবু বলছে না দড়িটানা থামাতে। আমি মরে যাচ্ছি। মরে যাচ্ছি। আমার মৃতদেহটিকে একপাল কুকুর দিয়ে খাওয়ালো ওই মোহাম্মদ আলম লোকটি। বাংলার এই পবিত্র মাটিতে আমার মত অপবিত্র মানুষের জায়গা হওয়া উচিত নয় বলে খাওয়ালো।

তসলিমাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা   পুরস্কার

বগুড়া ২৬ জুন (জেলা বার্তা পরিবেশক)ড্ড লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা বগুড়া জেলা শাখা আয়োজিত খোকন পার্কের জনসভায় আজ বিকেলে বক্তা মোহাম্মদ আলম এ ঘোষণা দিয়েছেন।

আঠাশ জুন, সোমবার।

আজ ঝ আসেনি এঘরে। সম্ভবত ভুলে গেছেন বাইরে থেকে তালা দেওয়া, হাবিজাবি জিনিসপত্র রাখার একটি ছোট্ট আলোবাতাসহীন অন্ধকার ঘরটিতে একটি প্রাণী বাস করছে। সারাদিনই পায়ের আওয়াজ পেয়েছি বারান্দায়, সিঁড়িতে, দরজার কাছে। শ্বাস প্রায় বন্ধ করে শুয়ে থেকেছি। ছোট্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থেকেছি। যেন কেউ কোনও ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিলে আমাকে না দেখে, দেখলেও মানুষ বলে যেন আমাকে মনে না হয়, যেন ঘরের কোণে পড়ে থাকা হাবিজাবি জিনিসের একটি পুঁটলি মনে হয়।

উনত্রিশ জুন, মঙ্গলবার

ঝ দুপুর বেলা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন কাল তিনি ভুলে যাননি, কাল সারাদিনই তিনি বাইরে ছিলেন, কিছু অতিথি এসেছিলেন রাতে। ঝর পক্ষে সম্ভব হয়নি এ ঘরে ঢোকা। আজ তিনি আপিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। ঙর সঙ্গে তাঁর কাল রাতে ফোনে কথা হয়েছে। ঙ বলেছেন আজ রাতে তিনি আসবেন।

ঝ দুদিনের ঘটনা বললেন। রবিবার তিনি সারাদিনই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিলেন। বিকেলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নাগরিক সমাবেশ ছিল শহীদ মিনারে। সমাবেশ শেষে সন্ধের দিকে একাত্তরের ঘাতকদের বিচার চাই স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটি প্রেসক্লাবের দিকে যায়। প্রেসক্লাবের সামনে তখন বিশাল মঞ্চে মৌলবাদী দলের সভা হচ্ছিল। মৌলবাদীদের হাতে ছিল গজারি কাঠের লাঠি। শুরু হয়ে গেল দুই দলে সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। একদল ধাওয়ায় ব্যস্ত, স্টেডিয়াম পুরানা পল্টন এলাকা পর্যন্ত এসব চলতে থাকে। আরেকদল ছাত্র মৌলবাদীদের মঞ্চ একসময় দখল করে নেয়। মঞ্চ পুড়িয়ে দেয়, ওদের ব্যানারগুলোও পুড়িয়ে দেয়, মাইক চেয়ার সব ভেঙে ফেলে। ছাত্ররা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে মৌলবাদবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ এসে হঠাৎ লাঠিচার্জ করে। অনেকে আহত হয়, এরমধ্যে ঝুনু নামের মেয়েটিও আহত হয়।

কোন ঝুনু?

রওশন আরা ঝুনু।

হ্যাঁ সেই ঝুনু। নাহিদের সঙ্গে যে মেয়েটি তসলিমা সপক্ষ গোষ্ঠী করেছিল।

লাঠিচার্জের পর ওখানেই সমাবেশ শুরু করে বক্তৃতা শুরু হয়। মোফাজ্জল হোসেন মায়া, আসাদুজ্জামান নূর বক্তৃতা করেন। এরপর সাতটার দিকে ছাত্রজনতার মিছিল যায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউএর দিকে। জিরো পয়েন্ট হয়ে স্টেডিয়ামের দিকে যেতে নিলে বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেট থেকে কয়েকশ মৌলবাদী গজারি কাঠের লাঠি নিয়ে মিছিলে হামলা করে। কয়েকজন আহত হয়। এভাবে কয়েক দফা হামলা হয়, মৌলবাদবিরোধী ছাত্র জনতা দৌড়ে পালায়, এক দল আওয়ামী লীগ অফিসের দিকে, আরেক দল জিরো পয়েন্টের দিকে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে। কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে। দু পক্ষে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। স্টেডিয়ামে খেলা চলছিল, খেলার কিছু দর্শক রাজাকার রাজাকার বলে স্লোগান দিতে দিতে হামলাকারীদের দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে, পুলিশ গিয়ে তাদেরও ধাওয়া করে।

মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ আর মৌলবাদীদের বর্বর হামলার প্রতিবাদ করেছে বাসদ, জাসদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি, ছাত্র ঐক্যফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।

কি হচ্ছে দেশে, তা ঝ সংক্ষেপে বলে গেলেন, ১.ছাত্রনেতারা বলেছে আগামীকাল বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে স্বাধীনতাবিরোধী জামাতী ফতোয়াবাজদের বিতাড়িত করা হবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতই চেষ্টা করুন পুলিশি পাহারা দিয়ে জাগ্রত জনরোষ থেকে স্বাধীনতাবিরোধীদের রক্ষা করতে পারবেন না। যে কোনও মূল্যে শহীদের রক্তমাখা বাংলার মাটিতে স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিহত করা হবে। ২.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কার্যকরী পরিষদের এই জরুরি সভায় স্বাধীনতা

বিরোধী, ফতোয়াবাজ, ধর্মব্যবসায়ী ও কিছু মৌলবাদী রাজনৈতিক দল দেশব্যাপী যে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা সৃষ্টি করেছে তা থামাতে হবে। ৩. *তসলিমা পক্ষ* মিরপুরে সভা করেছে, তারা আগামীকাল সকালে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দেবে। ৪. ইনকিলাবের বিরুদ্ধে ধর্মীয় দাঙ্গা আর অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন আদালতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র মারুফুল ইসলাম একটি মামলা দায়ের করেন।

ডডশহীদ মিনারে জোটের নাগরিক সমাবেশে কে কি বললেন?

ডডসুফিয়া কামাল বললেন, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত কোনও আন্দোলনে বাঙালি মাথা নত করেনি। এখনও করবে না। ধর্মান্ধ মোল্লারা আজ ফতোয়ার নামে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে। আল্লাহর নামে জেগে উঠুন, মৌলবাদীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করুন। শামসুর রাহমান বলেছেন, দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে, এখন আর পিছু হটার উপায় নেই। জান যায় যদি যাবে, তবু মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এখন আমাদের অগ্নি পরীক্ষার সময়, যদি জয়লাভ করতে না পারি, তবে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। আওয়ামী লীগের নেতা আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশ আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে প্রতিহত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তি আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে চায়। তাদের মোকাবিলা করে বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন থাকবে। যে কোনও মূল্যে বাংলার মাটিতে ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে।

ডডআর কি?

ডডপ্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদের উত্থান ও প্রতিকার নামে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে একটি সেমিনার হয়েছে। সেমিনারে বক্তারা মৌলবাদের উত্থানের জন্য বিএনপি সরকারকে দায়ি করেছেন। কবীর চৌধুরী বলেছেন, মৌলবাদীরা ধর্মের স্বার্থে নয়, নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করছে। বাইরের একটি শক্তি এদের অস্ত্র আর অর্থ দিচ্ছে। এরা মানুষের রগ কাটছে। সরকার জেনেও এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করছে। এভাবেই মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে এবং এরা দেশকে এক ভয়াবহ সজ্ঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেমিনার শেষে কবীর চৌধুরী, ওয়াজেদ মিয়া, মাওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহ আল চিশতি, হাফেজ জিয়াউল হক বিশেষ মোনাজাত করেন।

ডডকবীর চৌধুরী মোনাজাত করেছেন?

বিস্ময়ে আমি হাঁ হয়ে থাকি।

ডডহ্যাঁ করেছেন। ঝর নির্লিপ্ত উত্তর।

ডডনা, আমার মনে হয় না।

ডডবললাম তো করেছেন।

ডড দু হাত তুলে?

ডডহ্যাঁ দুহাত তুলে। ছবি ছাপা হয়েছে।

ডডওদিকে মোল্লারা কি করছে?

ড়মোল্লারা অনেক কিছুই করছে। শহরগুলোয় তো মিছিল হচ্ছে সভা হচ্ছে। গ্রামের অবস্থা খারাপ। এনজিওগুলোয় যে মেয়েরা কাজ করত, এখন করতে ভয় পাচ্ছে। যাচ্ছে না। এনজিওর ইশকুলগুলোয় ছাত্রী সংখ্যা কমে গেছে। গ্রামের সব মানুষকে নাকি খ্রিস্টান বানানোর মতলব করছে এনজিওগুলো। তিরিশ তারিখের হরতালের সময় আশংকা করা হচ্ছে এনজিওর ওপর হামলা হবে।

ড়আর কি?

ড়আরও অনেক কিছু। এত জানতে চেও না। মাথাটাকে একটু হালকা রাখো ভাই।

ঝ তাঁর জ্বালানো সিগারেটটি আমার দিকে বাড়িয়ে দেন।]

সিগারেট খেতে খেতে সরকারি প্রেসনোটের কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে, সরকার বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করছে যে কতিপয় ব্যক্তি ও সংগঠন প্রকাশ্যে বিভিন্ন সময়ে কোনও ব্যক্তির জীবননাশের হুমকি প্রদান এবং হত্যাকারীদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে আসছেন। এ ধরনের ঘোষণা আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকার আশা করে যে এ ধরণের বেআইনী ঘোষণা প্রদান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে বিরত থাকবেন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। অন্যথায় সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে।

সরকারের টনক কি নড়েছে! না নড়েনি, নড়লে এ পর্যন্ত যতগুলো মোল্লা আমাকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, তাদের ধরা হত। কাউকেই ধরা হয়নি। খুলনায় দাদার করা মামলার কিছু ফল পাওয়া যেত। তাও হয়নি। আইনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলার কি দরকার। আইনের ব্যবস্থাটি নিয়ে নাও না। ভবিষ্যতের ফতোয়ার জন্য অপেক্ষা করছ কেন বাবা! বর্তমানেই তো বহাল আছে ফতোয়া। প্রতিদিন মোল্লারা মিছিল মিটিংএ এই যে বলছে তসলিমার ফাঁসি যদি সরকার না দেয়, তবে তারা নিজেরাই দেবে ফাঁসি, তাদের ধরছো না কেন! সত্যিই কি ধরতে চাইছো! আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে চাইছো! না। চাইছো না।

ঙ এসেছেন রাতে। আমি অনেকগুলো প্রশ্ন করি একদমে, জামিনের খবর কি, কর খবর কি, ক আসছেন না কেন, উকিলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয়েছে কি না কারও, আমার আত্মীয়রা বেঁচে আছে কি না, হরতাল হবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। ঙ বলেন, জামিনের খবর তিনি জানেন না। ক ব্যস্ত, তাঁর চাকরি বাকরি আছে, তার ওপর মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়েছেন। কর সঙ্গে একবার তাঁর কথা হয়েছে, ক বলেছেন যে তিনি দেখা করেছিলেন আমার উকিলের সঙ্গে, উকিল বলে দিয়েছেন হাইকোর্ট থেকে জামিন হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা তিনি পাননি। ডঃ কামাল হোসেন দেশের অনেক জায়গায় গণফোরামের সভায় বক্তৃতা করছেন, মানুষকে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছেন। এখন তিনি দেশের বাইরে গেছেন একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে, তিনি না ফেরা পর্যন্ত জামিনের নতুন কোনও খবর পাওয়া যাবে না। আমার আত্মীয়দের কোনও সংবাদ ঙ পাননি। তাঁরা বেঁচে আছেন কি না এ সম্পর্কে ঙ কিছু জানেন না। হরতাল হবে বলে তিনি ধারণা করছেন, এবং দুদলের সঙ্ঘর্ষে অনেকের মৃত্যু হবে

বলেও তিনি আশঙ্কা করছেন। ক আর ঙ যদিও দুজনই ব্যস্ত। ঙ ব্যস্ত সাংস্কৃতিক জোটের কর্মসূচি নিয়ে, বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমার কথা তিনি ভুলে থাকেন না, আমাকে দেখতে আসেন না, সে আমার নিরাপত্তার কারণেই আসেন না। ক আর ঙ দুজনেই চেষ্টা করেছেন নতুন কোনও আশ্রয়ের জায়গা পেতে, দুজনই ব্যর্থ হয়েছেন। এক বাড়িতে বেশিদিন থাকা আমার উচিত নয় তাঁরা জানেন। কিন্তু নতুন কোনও আশ্রয়ের জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টা তাঁরা থামিয়ে দেননি। আজও একজনকে অনুরোধ করেছেন ঙ, কাল তার উত্তর পাওয়া যাবে। ঙ আমার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়েছেন। মনে জোর রাখতে বলেছেন। বলেছেন জামিন পাওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা আমি না চাইলেও আমাকে ভাবতে হবে। দিন দিন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক রকমের খারাপ হচ্ছে দেশে। যে কোনও সময় যে কোনও মন্দ কিছু ঘটে যেতে পারে।

তিরিশ জুন, বৃহস্পতিবার

আজ সারাদিন ঝ বাড়িতে। খুব তাঁর ইচ্ছে ছিল বাইরে মিছিলে যাবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বের হননি। সকলে বলছে দু দলের সঙ্ঘর্ষে অনেকে মরবে। সারাদিন থেকে থেকে মিছিলের স্লোগানের শব্দ শুনেছি, রাস্তা থেকে ভেসে এসেছে স্লোগানের শব্দ, *তসলিমার ফাঁসি চাই।* কেবলই মনে হয়েছে, এ বাড়িতে বুঝি ঢুকে যাচ্ছে সশস্ত্র এক দল লোক। এ ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে ওরা। ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকে গেল। গেল। সারাদিন গা কেঁপে কেঁপে উঠেছে। সারাদিন শ্বাস নিতে গিয়ে দেখি শ্বাস থেমে থেমে যাচ্ছে।

ঝ দুবার ঘরে এসেছেন খাবার নিয়ে, দুবারই দেখেছেন গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে হাতপা গুটিয়ে শুয়ে আছি। দুবারই আমাকে তুলতে চেষ্টা করেছেন খাওয়াতে। দুবারই আমি বলেছি খাবো না। সারাদিন ধরে ঝ তাঁর পরিচিতদের ফোন করে জেনেছেন হরতালের খবর। হরতাল হয়েছে সারাদেশে। কোনও গাড়িঘোড়া চলেনি, দোকানপাট খোলেনি। হরতালের প্রতিপক্ষ সারাদিনই রাস্তায় ছিল। দু দলের সঙ্ঘর্ষে আর পুলিশি আক্রমণে পাঁচশ লোক আহত হয়েছে। বেশ কিছু পুলিশও আহত। আহতরা হাসপাতালে। অনেককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিশোরগঞ্জে পুলিশের গুলিতে আরমান নামের একটি চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলে মারা গেছে, গুলি খেয়েছে অনেকে, ময়মনসিংহের হাসপাতালে ভর্তি তারা। একশ দশটি ইশকুল পুড়িয়ে দিয়েছে মৌলবাদীরা, হাসপাতাল পুড়িয়েছে। ঢাকায় প্রেসক্লাব এলাকা ছিল মৌলবাদবিরোধী ছাত্রজনতার দখলে। শহরের বাকি এলাকা ছিল মৌলবাদীদের দখলে।

মধ্যরাতে ঝ আমাকে প্রায় টেনে তুললেন। ভাত খেতে দিয়ে পাশে বসে সিগারেট ফোঁকেন আর ভয়াবহ এই হরতালের কাহিনী বর্ণনা করেন। এখানে সেখানে বোমা

ফেটেছে অনেক। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে, লাঠিচার্জ করেছে, গুলি ছুঁড়েছে, অনেকের গায়ে গুলি লেগেছে, সচিবালয়ের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। হাজার হাজার পুলিশ নেমেছে রাস্তায়। আশঙ্কা করা হয়েছিল প্রচুর লোক মারা যাবে সঙ্ঘর্ষে। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি বলে ঝ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

ডডহরতালে আসলে জয় কাদের হয়েছে? প্রশ্ন করি।

ঝ অনেকক্ষণ ভেবে বলেন, সত্যি কথা বলব?

ডডনিশ্চয়ই।

ডডযদিও এই সত্যটি শুনতে ভাল লাগবে না, তবু সত্য এই যে হরতালে জয় হয়েছে মৌলবাদীদের।

ডডকেন, মৌলবাদবিরোধীরাও তো হরতাল ডেকেছে?

ডডতোমাকে তো আগেই বলেছি একথা। ছাত্ররা তা পরে হরতাল ডেকেছে না পারতে। ওদের ঠেকাতে পারবে না বলে ডেকেছে। ওদের হরতাল সিম্পলি হাইজ্যাক করেছে ছাত্ররা। সারা দেশে হরতাল পিকেটার কারা ছিল রাস্তায়? মৌলবাদীরা। কারা বড় বড় সমাবেশ করেছে? মৌলবাদীরা। মিছিল করেছে শহরের সব রাস্তায় কারা? মৌলবাদীরা। অল্প কিছু জায়গায় মৌলবাদবিরোধীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছে শুধু। প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তাদের ডাকা হরতালে হরতাল হচ্ছে। কিন্তু জনগণ তো জানে কাদের ডাকা হরতাল এটি। একদিকে ভালই হয়েছে, বিপক্ষ দল যে প্রথম ঘোষণা দিয়েছিল যে হরতাল প্রতিরোধ করবে যে কোনও মূল্যে। আজকে তা করতে গেলে অনেককে মরতে হত।

ঘুমোতে যাবার আগে ঝ বলেন, *তসলিমা পক্ষ* সংগঠনটি থেকে কিছু ছেলে মেয়ে ব্যানার নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে এসেছিল সমাবেশে। মৌলবাদ বিরোধী ছাত্রনেতারা তসলিমা পক্ষের ব্যানার, প্ল্যাকার্ড এসব কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেছে, ছিঁড়ে ফেলেছে, বলে দিয়েছে আমরা এখানে তসলিমার পক্ষে সমাবেশ করছি না, মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে নামা মানে তসলিমার পক্ষে নামা নয়।

এক জুলাই, শুক্রবার

আজ শুক্রবার। ঝ আপিসে যাবেন না। ঝ আপিসে না গেলেই যে এ ঘরে এসে দীর্ঘক্ষণ কাটাতে পারেন, তা নয়। তবু ঝ বাড়িতে থাকলে আমার স্বস্তি হয়। স্বস্তি এই জন্য নয় যে দুবেলা খাবার জুটবে আমার। স্বস্তি এই জন্য যে বাড়িতে অচেনা আততায়ী ঢুকতে নিলে ঝ বাধা দেবেন। ঝর কাছে পিস্তল থাকে আত্মরক্ষার জন্য। ঝ আদৌ গুলি চালাতে পারবেন কি না, একদল সশস্ত্র লোক ঢুকে গেলে ঝর পক্ষে সম্ভব হবে কি না থামানো সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েও মনে হয় বাড়িটি এখন নিরাপদ।

ঝর পিস্তল যদি কাজই না করে, অন্তত ঝ তো আগেভাগে বিপদের খবর পেয়ে আমাকে ওই খোপটিতে ঢুকিয়ে রাখতে পারবেন।

মৌলবাদীরা জয়ধ্বনি করছে সারা দেশে। জনগণকে তারা অভিনন্দন জানাচ্ছে হরতাল সফল করার জন্য। হরতাল সফল। তাদের বিজয় অনিবার্য। তসলিমার ফাঁসি হবে। ব্লাসফেমি আইন হবে। নতুন কর্মসূচি দিয়ে দিয়েছে, আজ বিকেলে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামাতে ইসলামীর সমাবেশ আর বিক্ষোভ মিছিল, আজ থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত গণসংযোগ, ১৬ থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত থানায় থানায় ইমাম ওলেমা সম্মেলন, এই সময় পর্যন্ত দাবি পূরণ না হলে পরবর্তী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। জামাতে ইসলামীর সভায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কোরান ও আল্লাহ রসুলের অবমাননা সহ্য করবে না। বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তসলিমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, অথচ ১২ কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার বিষয়ে কিছুই বলেননি। শায়খুল হাদীস বলেছেন যে দাবি পুরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘরে ফিরবেন না।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজও মাসব্যাপী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচির কথা ভাবছে। আরেকটি সুখবর ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, নয়াদিল্লি থেকে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসেছেন বাংলাদেশে, আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কথা বলতে।

খবরটি দেখে ঝ বললেন, নরওয়ে শুনেছি অনেক টাকা বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়। খালেদা জিয়া উল্টো পাল্টা করলে বিপদ আছে। তার ওপর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং বিল ক্লিনটন বলেছেন তোমার নিরাপত্তা নিয়ে তিনি ভাবছেন।

ডডতাহলে কি জামিন হবে আমার? সরকার আমাকে নিরাপত্তা দেবে? মামলা তুলে নেবে? কিন্তু তা করলে তো মৌলবাদীরা সরকারকে খেয়ে ফেলবে।

খেয়ে ফেলা শব্দদুটো ঝ কে হাসায়। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকেন, হাল ছেড়ো না, দেখ কি হয়। ওয়েট এণ্ড ওয়াচ।

আজ ইনকিলাবের পুরো পাতার সবটা জুড়ে খবর।

আল কোরানের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত।

গতকাল গোটা বাংলাদেশ ছিল তৌহিদী জনতাার দখলেঃ নাস্তিক মুরতাদ ইসলাম বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি মুসলমানের রায়

গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল অভূতপূর্ব এক হরতালের দিন। গোটা বাংলাদেশ ছিল তৌহিদী জনতার দখলে। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রতিটি শহর বন্দর থেকে শুরু করে ৬৮ হাজার গ্রামে নাস্তিক মুরতাদ, ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই হরতাল পালিত হয়। কিসের জন্য এই হরতাল? ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য তথা আল কোরানের মর্যাদা সমুন্নত রাখাই ছিল এই হরতালের লক্ষ্য। হরতালের দাবি ছিলডড মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতদানকারী ও ইসলামকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে ফ্রি স্টাইল পন্থীদের দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত আক্রমণ থেকে ধর্মের ও ধর্মীয় মহাপুরুষের মর্যাদা সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তন করতে হবে। ধর্মদ্রোহী পত্রপত্রিকা বাতিল করতে হবে। সেবার নামে একশ্রেণীর এনজিওর তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। ইসলামের ইতিহাস

ঐতিহ্য এবং আল কোরানের মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশে গতকাল যা ঘটলো এমনটি আর কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন তীব্র স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল আর কখনো হয়নি। মূলত গতকাল বাংলাদেশের রাজপথ ছিল আলেম ও ইসলামপন্থী জনতার দখলে। মঙ্গলবার ঢাকায় ঘাদানিকভূক্ত এক নেতা জনসভায় বক্তৃতাকালে চিৎকার করে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ধর্মদ্রোহিতার বিচারের দাবিতে হরতাল আহবানকারীদের তারা ৩০ জুন মাঠে নামতে দিবেন না। তার ভাষায় ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা হচ্ছে রাজাকার ও পাকিস্তানের দালাল। কিন্তু গতকাল ঐ নেতা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদেরই মাঠে দেখা যায়নি। ধর্মদ্রোহিতার বিচার দাবিকারী আলেম ও ইসলামপন্থীরাই গতকাল সারাদিন রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের ময়দানে বিচার করছিলেন। শুধুমাত্র ঢাকার প্রেসক্লাবের সামনে বড়জোর শদুয়েক ঘাদানি পুলিশের ছত্রছায়ায় ছিল। এছাড়া আর কোথাও ঘাদানির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানা যায়, ভোর চারটায়, তসলিমা সমর্থক এসব ঘাদানি প্রেস ক্লাবের সামনে তোপখানা রোডে আসে এবং পুলিশকে বলে কয়ে সেখানে উপস্থিতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। নইলে নাকি মান ইজ্জত একেবারেই যায়। এদের ছাড়া ঢাকা বা সমগ্র বাংলাদেশের আর কোথাও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ধর্মদ্রোহিতার পক্ষ অবলম্বনকারী এসব ঘাদানি চক্রের টিকিটির সন্ধানও মিলেনি। এতেই প্রমাণিত হয় যে এই দেশ মুসলমানদের ডড এ দেশ পবিত্র কোরানের অনুসারিদেরডড প্রমাণ হয়েছে ডডফতোয়াবাজ সাম্প্রদায়িক রাজাকার ইত্যাদি ধুম্রজাল সৃষ্টি করে গালিগালাজ করে মূল বিষয়কে ধামাচাপা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। গতকাল ফজরের নামাজের পর থেকেই রাজপথে তৌহিদী জনতার ঢল নামে। হাজারো, লাখো কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ডড নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার, আমাদের উৎস কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমার নেতা আমার নেতাডড বিশ্ব নবী মোস্তফা। ধর্মপ্রাণ অযুত কণ্ঠের এ স্লোগানে জনপদ, রাজপথ মুখরিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ধর্মদ্রোহী ও মুরতাদ চক্রের চোরাগোপ্তা হামলায় আল্লাহর এ বান্দাদের রক্ত ঝরেছে, কিন্তু তাদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করা যায়নি। ফলে গতকালের ঘাদানি মুক্ত বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের রায় ঘোষিত হয়েছেডডএ দেশে ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। এ দেশে ধর্মদ্রোহী ও তাদের মদদদাতা ও দোসরদের স্থান নেই। তসলিমা, আহমদ শরীফ গংসহ সকল ধর্মদ্রোহীকে শাস্তি দিতে হবে। ধর্মদ্রোহিতার চিরঅবসানকল্পে অনতিবিলম্বে ব্লাসফেমি ধরনের আইন প্রবর্তন করতে হবে। দীর্ঘ ১২ ঘন্টাব্যাপী গোটা বাংলাদেশের জনতার ময়দানে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত এ ঐতিহাসিক গণরায় আগামী দিনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অবশ্যই একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে। বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বাংলাদেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের পদলেহী এই সব লোক তাদের বেতনভুক এজেন্ট ছাড়া আর কিছু নয়। তসলিমা-আহমদ শরীফ গং এবং এই গংভুক্ত এসব লোকের কুৎসিত কার্যকলাপের প্রতিবাদে ৩০ জুন হরতালের ডাক দেওয়া হলে ভারতীয় দালালরা এই হরতাল প্রতিরোধের হুমকি দিল। কিন্তু যখন তারা জানলো যে এই হরতাল প্রতিরোধ করা যাবে না তখন তারা এই ৩০ তারিখেই পাল্টা হরতাল করে কিছু একটা হাসিলের মতলব এঁটেছিল অথচ হাসিল তো দূরের কথা বেচারা ঘাদানি চক্র মাঠেই নামতে পারেনি। ওলামা সমাজ গতকাল একটি মরণ পণ করে মাঠে নেমেছিলেন। তা হল, শির দেগা, নাহি দেগা আমামা..। রাজনৈতিক মহলের মতে গতকাল বাংলাদেশে ওলামা ও ইসলামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত নজিরবিহীন এই হরতাল ইসলামী আন্দোলনের ধারায় এক নতুন পথ নির্দেশ করছে, নতুন দিগন্তের উন্মোচন করছে। এই প্রেক্ষাপটে স্মরণে থাকে জাতীয় কবি নজরুলের

বিখ্যাত কবিতার এই লাইনটি ডড বাজিছে দামামা বাঁধ রে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান, দাওয়াত এসেছে নয়া জমানার, ভাঙা কেল্লায় উড়ে নিশান।

আরও খবর। যুব কমাণ্ড ও দালাল প্রতিরোধ কমিটির সমাবেশে বক্তাবৃন্দ বলেছেনডডতসলিমা গংদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে। গতকাল দৈনিক বাংলার মোড়ে জাতীয় যুব কমাণ্ড ও ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব বি এম নাজমুল হক এবং জনাব গোলাম নাসেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুটি সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এনডিও সেক্রেটারি আনোয়ার জাহিদ বলেন, আজকের ঐতিহাসিক হরতালের মাধ্যমে জনতা যে স্বতঃস্ফূর্ত রায় দিয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সরকারকে তসলিমা গংদের শাস্তি ও জনকণ্ঠ পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর সরকার যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। .. এই ঐতিহাসিক হরতালের মাধ্যমে লড়াইএর শুরু হল। লড়াই করতে হবে জান, স্বাধীনতা ও ধর্ম বাঁচানোর জন্য। তিনি বলেন, এ দেশের মাটিতে ধর্ম পালন করতে হলে দেশকে বাঁচাতে হবে এবং নাস্তিকদের প্রতিহত করতে হবে। আজকের দিন আমাদের বিজয়ের দিন, কোরানের বিজয়ের দিন এবং স্বাধীনতার বিজয়ের দিন। আজ সময় এসেছে প্রতিটি মুসলমানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং আলেম ওলামা জাতীয়তাবাদী দলসমূহের নেতৃবৃন্দকে একই মঞ্চে সমবেত হওয়ার। এনজিওদের পয়সায় যেসব পত্রিকা চলে তারা মৌলবাদের ধোয়া তুলছে এনজিওদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে, স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলার কারণে। ইসলাম, কোরান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা মুসলমান নয়। তারা জানে এদেশ থেকে মুসলমানদের হঠাতে পারলে এদেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করা যাবে। আজকের হরতাল তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাই সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ারডড এদেশে হয় তারা থাকবে নতুবা তৌহিদী জনতা থাকবে।

মেজর বজলুল হুদা বলেছেন, আজকে যারা হরতালকে প্রতিহত করতে মাঠে নেমেছে তারা গণতন্ত্রের পিঠে ছুরিকাঘাত করেছে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় চেতনাকে রক্ষা করার জন্য আমরা বহু রক্ত দিয়েছি। এবার আর রক্ত দেব না, এখন থেকে আমরাই রক্ত নেব। আমরা ৭১এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম পিন্ডির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে একথা ঠিক কিন্তু এদেশকে দিল্লির গোলামে পরিণত করার জন্য নয়।

প্রিন্সিপাল সিরাজুল হক গোরা বলেছেন, আজকে আমাদেরকে দেশ ও ধর্মদ্রোহীদেরকে চিরদিনের জন্য নির্মূল করার শপথ নিতে হবে।

খন্দকার আবদুল মান্নান বলেছেন, সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তিকে একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে এই হরতালের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব।

আবদুল্লাহিল মাসুদের বক্তব্য, দেশদ্রোহী ঘাতক দালালদের এদেশ থেকে না তাড়ানো পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবো না।

বাকিরা একই রকম কথাই বলেছেন, দেশদ্রোহীরা বলেছিল দেশপ্রেমিকদের রাজপথে থাকতে দেবে না কিন্তু আজ প্রমাণ হয়েছে বাংলাদেশে দেশ ও ধর্মদ্রোহীদের জায়গা নেই, এই দেশে দেশপ্রেমিকরাই থাকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাওলানা নিজামী ভাষণ দিয়েছেন বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তো আর ভাষণ দেননি তিনি। রাস্তা বন্ধ করে বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়

এসব রাজনৈতিক সভার জন্য। জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারি ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত এ হরতালের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে ইসলাম ও কোরান অবমাননাকারীদের স্থান এদেশে নেই। যারা কোরান, আলেমা ওলামাদের সাথে বেয়াদবি করেছে, এ হরতালের পর তাদের তওবা করা উচিত। ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমানী তাগিদেই এই স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়েছে। এ হরতালের সময় কোনও পুলিশ নামানোর দরকার ছিল না। সরকার ঘাদানি কমিটিকে রক্ষার জন্যই গতকাল পুলিশ নামিয়েছে। গত কদিনের ঘটনা প্রমাণ করে যে ঘাদানিকএর সাথে সরকারের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। ঘাদানিকএর মত নষ্টা ভ্রষ্টা লেখিকার সাথেও সরকারের যোগাযোগ রয়েছে।

নষ্টা ভ্রষ্টা লেখিকা সম্পর্কে এরপর নিজামী বিস্তর কথা বললেন।

ইসলামী ছাত্র শিবির রাগ করেছে, বলেছে, সরকার মুরতাদদের পক্ষ অবলম্বন করেছে।

ভোরের কাগজের খবর, সারা দেশে হরতাল পালিত, সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩ শতাধিক। সিলেটে এনজিও অফিস ক্লিনিক জ্বালিয়ে দিয়েছে মৌলবাদীরা। হরতাল সম্পর্কে সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি। ঢাকার ঘটনায় ১৭ পুলিশসহ শতাধিক আহত। হরতাল চলাকালে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ, ভাঙচুর। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর আক্রোশ।

এনজিও অফিস জ্বালিয়ে দিল? হ্যাঁ জ্বালিয়ে দিল। মৌলবাদী ফতোয়াবাজরা গতকাল সিলেটের জকিগঞ্জ থানার আটগ্রামে এনজিও সংগঠন গ্রাম উন্নয়ন এফআইডিডিবি অফিস ও কোয়ালিশন মেডিকেল ক্লিনিক জ্বালিয়ে দিয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গতকাল দুপুর ১২টার দিকে কয়েকশ মারমুখী মৌলবাদী কর্মী জকিগঞ্জের আটগ্রামস্থ এফআইডিডিবি অফিসে হামলা চালায়। ব্যাপক ভাঙচুরের পর এফআইডিডিবির কর্মকর্তাকে অফিসের ভেতর আটকে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে অবস্থানকারী মাত্র সাতজন পুলিশ কোনও রকমে অফিস ঘরে আটক চারজন কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে। অফিসটি জ্বালিয়ে দেবার পর মৌলবাদীরা আটগ্রামস্থ কোয়ালিশন মেডিকেল ক্লিনিকে আগুন দেয়। আগুন নেভাতে স্থানীয় লোকজন আসতে চাইলে তারা বাধা দেয়। অফিস ও ক্লিনিক সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, তারা প্রায় এক কোটি টাকার সম্পদ পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনার সময় দুজন পুলিশ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা তিনটি মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনার পর সিলেট থেকে রিজার্ভ পুলিশসহ একজন এএসপি ও এডিএম জকিগঞ্জে গিয়েছেন। এদিকে গতকাল সকাল থেকেই কতিপয় মৌলবাদী কর্মী সিলেট শহরের হকার পয়েন্টে হামলা চালিয়ে ইনকিলাব ও সংগ্রাম ছাড়া ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজসহ অন্যান্য পত্রিকা ছিনিয়ে নেয়। তারা ইনকিলাব ও সংগ্রাম ছাড়া অন্য সব পত্রিকা বিক্রি বন্ধ রাখতে হকারদের বাধ্য করে। ফলে শতাধিক পত্রিকা-হকার মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

হরতাল সম্পর্কে চিরকাল সরকার পক্ষ যেরকম বিবৃতি দিয়ে আসছে, সেরকমই এবারের বিবৃতি। ‘বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের আহবানে হরতাল পাল্টা হরতালে ঢাকায় বাস-গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে সারা দেশে ট্রেন লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক ছিল।’ তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী কম করে হলেও কিছু আহত নিহত সংখ্যা উল্লেখ করেন। সংঘর্ষ কোথায় কোথায় ঘটলো, ককটেল কোথায় কোথায় ফাটলো, তারও খানিকটা ফিরিস্তি আছে। তবে পুলিশ কেন কিশোরগঞ্জের

একটি তরুণকে গুলি ছুঁড়ল সে সম্পর্কে বলেছেন, ‘কিশোরগঞ্জে একদল লোক ট্রেন আটক করলে পুলিশ গিয়ে ট্রেনটি উদ্ধার করে। এরপর মিছিলকারীরা পুলিশের ওপর হামলা করে এবং অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন অস্ত্র ও আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলি ছোড়ে। এতে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়। এরমধ্যে আরমান নামের একজন নিহত হয়, তার পিতার নাম আনোয়ার হোসেন। আরেকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে, তার নাম আশরাফ।’

গতকাল শুক্রবার সকাল সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ, বোমাবাজি, হামলা, পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটেছে। হরতাল আহবানকারী পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তিন শতাধিক লোকের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ....

মাওলানা নিজামী বলেছেন, এ হরতালে প্রমাণিত হল ইসলাম ও কোরান অবমাননাকারীদের স্থান এ দেশে নেই। যারা কোরান ও আলেম ওলামাদের সাথে বেয়াদবি করেছে, এ হরতালের পর তাদের তওবা করা উচিত। মাওলানা নিজামী আরও অনেক কথা বলেছেন, এত কথা আমার আর ভাল লাগে না পড়তে। আমার ভয় হয়। আমার দেশে আমার স্থান নেই, এ কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছে করে না।

দুই জুলাই, শনিবার

ইসলাম কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এই গণজাগরণ থামবে নাড্ডবলেছেন শায়খুল হাদিস। গতকাল ৩০ জুনের হরতালে পুলিশের গুলিতে কিশোরগঞ্জের শহীদ আরমানের রুহের মাগফেরাত কামনা ও নাস্তিক মুরতাদ এনজিও এজেন্টদের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে দোয়া ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। এনজিও তৎপরতা ও নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের আহবায়ক এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ অভিভাবক পরিষদের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস বলেছেন, রক্তের বিনিময়ে হলেও এ দেশে ইসলাম চাই। আজ দালাল চিহ্নিত হয়ে গেছে। এ দালাল-আসামীরা ছুটে গেলে সরকারকেই আসামী চিহ্নিত করা হবে। ন্যায়ের অগ্রাভিযান দেখে বাতিলের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তাতে কোনও ভয় নেই। সত্য তুলে ধরার জন্য ইনকিলাব সম্পাদকের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমানরা অসত্যের কাছে মাথা নত করতে জানে না।

আরমানকে নিজের দলের সদস্য দাবি করে অন্য কোনও দলই মিছিলে নামছে না। এমনিতে পুলিশের গুলিতে কেউ মারা গেলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি বাঁধে নিহতকে নিজের দলের লোক বলে দাবি করতে। এবার আওয়ামী লীগের কোনও দাবি নেই। সুতরাং এ ছেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই শায়খুল হাদিসের দলের ছেলে।

এদিকে গতকাল সিলেটে মৌলবাদীরা পাটমন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুর করেছে। পাটমন্ত্রী হান্নান শাহ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি যখন সার্কিট হাউজ থেকে লাকাতুরা গলফ ক্লাবে যাচ্ছিলেন, তখন পৌর পয়েন্টে নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের সভা থেকে ধর ধর মুক্তিযোদ্ধা ধর, চিৎকার করে মন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। গাড়ি ভেঙে যায়। মন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত পুলিশেরা সার্কিট হাউজে ফেরত গেছেন। পুলিশ আর মৌলবাদীতে একটা সংঘর্ষ হয়ে যায়, ১৫ জন আহত হয় ইট পাটকেলের আক্রমণে। মৌলবাদীদের হামলায় বিএনপিকর্মীরা ক্ষুব্ধ হওয়ায় শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর শহরে পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে, এবং মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জে আরমানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল। জানাজায় কুড়ি হাজারেরও বেশি লোক অংশ নেয়। কিশোরগঞ্জ শহরে এখনও উত্তেজনাকর থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে তাৎক্ষণিক ভাবে পুলিশ সুপার ছ জন পুলিশকে সাসপেণ্ড করেছেন। শহরে ১৪৪ ধারার মেয়াদ আরও ৪৮ ঘন্টা বাড়ানো হয়েছে।

ভোরের কাগজের একটি ছোট্ট খবর সবকিছুর আড়ালে পড়ে আছে, খবরটির শিরোনাম তসলিমার ছোট বোনকে টেলিফোনে হুমকি। তসলিমা নাসরিনের পারিবারিক সূত্রে জানা যায় গত দুদিন থেকে টেলিফোনে কে বা কারা তাদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে। তসলিমার ছোট বোন ইয়াসমিন জানায়, গত কয়েকদিন ধরে টেলিফোনে তাকে রাস্তায় বেরোলে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

আজকের কাগজের খবর, ধর্মব্যবসায়ী শিবির সন্ত্রাসীদের হাতে ব্যাংক কর্মকর্তা লাঞ্ছিত। গালিব রেজা নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা ইসলামি শিবিরের সশস্ত্র লোকদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচলেও শরীরে আটটি শেলাই ও ভাঙা হাত নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। গত বৃহস্পতিবার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ আহুত হরতাল চলাকালে গালিব রেজা হেঁটে মতিঝিলে যাচ্ছিলেন। শিবিরের ক্যাডাররা তাকে নির্মূল কমিটির লোক ভেবে পেটাতে শুরু করে। আশেপাশে সহকর্মীরা শেষ পর্যন্ত গালিবকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করান। হরতালের দিন নিরীহ পথচারীদের তো আছেই, বিভিন্ন দৈনিকের সাংবাদিকদেরও মৌলবাদীরা লাঞ্ছিত করেছে।

বাসদের নেতা খালেকুজ্জামান তোপখানা রোডে মৌলবাদীদের বোমাবাজির নিন্দা করেছেন। বলেছেন, দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে এরা আজ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। দেশের অসংখ্য মানুষ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করছেন, এর জন্য বোমার দরকার হচ্ছে না। কিন্তু মৌলবাদী শক্তির নজর পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের কাঁচা টাকার দিকে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে এরা কোটি কোটি টাকা নিচ্ছে আর দেশের সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছে। ধর্মের রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য দেশের মানুষকে সচেতন থাকার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন তিনি।

বিবিসির সঙ্গে ডঃ কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছে। কামাল হোসেন বলেছেন, মৌলবাদী শক্তিগুলো বুঝতে পেরেছে যে দেশে যদি গণতন্ত্র সুসংহত হয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তাদের রাজনীতির অবসান ঘটবে। মৌলবাদীরা তাই কখনও গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে দেবে না। তারা চায় না যে গণতন্ত্র সুংহত হোক। তারা আজকে একটা অদ্ভুত রকমের কৌশল নিয়েছে, তা হল একদিকে তারা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে, আঁতাত করেছে, পার্লামেন্টে বিএনপিকে সরকার গঠনে সহায়তা করেছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মৌলবাদীরা বিরোধী দলের

সঙ্গে আঁতাত করে পার্লামেন্ট ত্যাগ করছে লাগাতারভাবে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, তারা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করছে। পার্লামেন্টকে অকার্যকর করার ব্যাপারে তারা একটা ভূমিকা রাখছে। পার্লামেন্টের বাইরে তারা বিভিন্ন অজুহাতে একটা উত্তপ্ত অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

প্রয়োজনে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করা হবেডড এ কথাটি তাহাফফুজে হারমাইন কমিটির সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমেদ বলেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আমার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন, এ কারণেই মূলত প্রতিবাদ করতে গিয়ে সাদেক আহমেদ বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশ সরকারের তসলিমাকে গ্রেফতারের ব্যাপারে গড়িমসি রহস্যজনক এবং মার্কিন সরকারের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সঙ্গে এর যোগসূত্র রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজনে আমেরিকার দূতাবাস অবরোধ করা হবে।’

আজকের কাগজে আজ লেখা হয়েছে ডডসাদেক আহমেদের এই উস্কানিমূলক ও কূটনৈতিক রীতিনীতি বিবর্জিত বিবৃতিতে সারাজাতি আজ আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত এবং মর্মাহত। একটি দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূতাবাস হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মানিত নিরপেক্ষ এবং স্পর্শকাতর একটি এলাকা। এমনকী যুদ্ধের সময়ও পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলো দূতাবাস আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। এটাই আন্তর্জাতিক আইন। এ অবস্থায় প্রয়োজনে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করার মত হুমকি যে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কত বড় বিপর্যয়ের এবং বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে তা যে কোনও সুস্থ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশের এক শ্রেণীর উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াককা না করে হরহামেশাই উস্কানিমূলক এসব বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে যা দেশে বিদেশে আমাদের মান, সম্মান, ইজ্জতকে ধূলায় নিপতিত করছে। সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতা বিরোধী ও মৌলবাদী এই চক্রের উস্কানিমূলক বিবৃতি বক্তব্যে ঢাকার বিদেশি কূটনৈতিক মহল তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বেগাকুল হয়ে পড়ছে বলেও জানা গেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের শতকরা একশভাগ গণতান্ত্রিক সরকারের দাবিদাররা এসব উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির সকল অপতৎপরতার মত কূটনৈতিক শিষ্টাচার বিবর্জিত উদ্বেগজনক তৎপরতাকেও নীরবেই হজম করে যাচ্ছে। একটি দূতাবাস ঘেরাওএর মত বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরও সরকার একটি গণতান্ত্রিক সরকার একটি উন্নয়নমুখী সরকার কি করে নীরব থাকে, আমরা বুঝতে পারি না। ......

অনেক লম্বা লেখা। সরকারকে দোষ দিয়েই মূলত লেখাটি। মৌলবাদের উত্থানে নীরব কেন সরকার। সরকারকে আসলে যত প্রশ্নই করা হোক, সরকার কি কখনও উত্তর দেবে! না দেবে না। সরকারের যত নিন্দাই করা হোক, সরকার কি গায়ে মাখে? না মাখে না।

রাত একটায় ক এলেন। ক এসেই কথা নেই বার্তা নেই, বললেন, চলুন। কোথায় চলব, কিছু জানি না। আমার তো তৈরি হওয়ার বেশি কিছু নেই। দ্রুত শাড়িটি পরে নিলাম। ঝ কিছুক্ষণ হতভম্ব দাঁড়িয়ে থেকে ককে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় নিচ্ছেন আমাকে। ক কোনও উত্তর দিলেন না। আমিও জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর পাইনি। এ সময় ক যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। নিজের জীবনটি কর হাতে পুরোপুরিই ছেড়ে দিয়েছি। ক এখন বায়তুল মোকাররমে নিয়ে আমাকে রেখে আসতে পারেন, ক এখন

কোনও অন্ধকার গুহায় আমাকে ফেলে আসতে পারেন। আমি বাঁচব কি মরব তা কর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। একটি লাল গাড়ি বাইরে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। ঘোমটা মাথার আমি দ্রুত উঠে যাই গাড়ির ভেতর। পেছনের আসনে শুয়ে পড়ার পরামর্শ দেন ক। ক সামনের আসনে উঠে বসলেই গাড়ি চলতে শুরু করে। কোথাও গিয়ে গাড়ি থামে। কোথায় তা আমার অনুমান করার সাধ্য নেই। একটি দোতলা বাড়িতে কর পেছন পেছন উঠতে হয়। দরজা খুলে যে ব্যক্তিটি দাঁড়ান, দেখে অবাক হই। তিনি এদেশের বিখ্যাত একজন শিল্পী। ধরছি তিনি ঞ। ঞ এবং ঞর স্ত্রী আমাকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেন। ক ওই দরজা থেকেই অদৃশ্য হয়ে যান।

ঞর সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হয়নি কোনওদিন। ঞর মত শিল্পীকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই ধন্য হয়েছি আগে। কাছে গিয়ে আলাপ করব, এমন সাহস কখনও হয়নি। আমি এখন ঞর বাড়িতে। তিনি আমাকে একটি ঘর দিয়েছেন থাকতে। ঘরটি ছোট, কিন্তু সুন্দর। ঘরের জিনিসপত্র পরিপাটি, গোছানো। কাঠের খাটে বিছানা পাতা। খাটের পাশে টেবিল। টেবিলের পাশে চেয়ার। মাথার ওপর পাখা। আমি পাখা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকি বিছানায়। আশ্চর্য, একটুও ভয় লাগছে না আমার। এ বাড়িটিতে আমি নিরাপদ বোধ করছি। আসলে এ বাড়িতে আমাকে কেউ মেরে ফেললেও দুঃখ হবে না আমার। কত বড় হৃদয় থাকলে এ সময় আমাকে কেউ আশ্রয় দিতে পারে আমি ভাবতে চেষ্টা করি। শিল্পী সাহিত্যিকরা যখন আমাকে অস্বীকার করছেন, হাতে গোনা কজন মাত্র আমার পক্ষে ভয়ে ভয়ে হঠাৎ হঠাৎ মুখ খুলছেন, তখন এমন একজন শিল্পী জীবনের কত বড় ঝুঁকি নিয়ে যে আমাকে তাঁর নিজের বাড়িতে রাখার সাহস দেখালেন, তা অনুমান করা শক্ত হলেও চেষ্টা করি অনুমান করতে। আমার প্রতি ঞর সহমর্মিতা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, আমার মৃত্যুভয় কমিয়ে দেয়।

তিন জুলাই, রবিবার

এ ঘরের দরজাটিতে ঝর বাড়ির দরজার মত বাইরে থেকে তালা লাগাতে হয় না। ঘরের বাইরে যদিও আমার বেরোতে মানা, ঘরটি ভেতর থেকে বন্ধ করে বসে থাকলেই হয়। বাড়ির কাজের মানুষেরা নিচতলায় রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকে। ওপর তলায় শোবার ঘর। ওপরতলায় ঞ আর ঞর স্ত্রী সারাক্ষণই আছেন, তাঁদের নাকের ডগায় কোনও কাজের মানুষ এ ঘরে উঁকি দিয়ে কোনও নিষিদ্ধ মুখ দেখবে, সে আশঙ্কা নেই। সকালে ট্রেতে করে নাস্তা নিয়ে এলেন ঞর স্ত্রী। দুপুরেও তিনি খাবার এনে দিলেন, রাতেও। ভাল খাবার। ভাত, মাছ, শাক সবজি। চেটেপুটে খাই। জন্মের ক্ষিধে ছিল পেটে। ঞ আর ঞর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে গেছেন আমার সঙ্গে। দেশের অবস্থার কথা বলে দুজনই খুব দুঃখ করেছেন। ঞ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে বলেছেন, ‘দেশে যে মৌলবাদীরা এমন শক্তি অর্জন করেছে তলে তলে, কোনওদিন

বুঝিনি।' বলেছেন আমার জন্য তাঁর খুব ভাবনা হয়। প্রগতিশীল সকলের জন্যই এখন ভাবনা হয়। মৌলবাদ যদি ঠেকানো না যায় তবে সকলের সর্বনাশ হবে, দেশটি মৌলবাদীদের পুরো দখলে চলে যাবে। এ দেশটি তখন আর মুক্তবুদ্ধির কোনও মানুষের বাসযোগ্য দেশ হবে না।

বাসযোগ্য যে হবে না সে বুঝি। পত্রিকায় পাতায় বিশাল বিশাল মিছিলের ছবি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পত্রিকাগুলো যদিও মৌলবাদীদের বিশাল সভা মিছিলের কোনও খবর ছাপছে না, ভাব করছে যেন আন্দোলনে মৌলবাদবিরোধী শক্তিরই জয় হচ্ছে। কিন্তু মৌলবাদীদের পত্রিকা দেখলেই আঁতকে উঠতে হয়। ভয়াবহ সব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছে তারা। কেবল খবর না ছাপলেই তো মৌলবাদ মরে যায় না। আছে। তারাই এখন রাজত্ব করছে সর্বত্র। আজকের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে গতকাল লন্ডন টাইমসে ছাপা হওয়া সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম **আবার বাংলাদেশ।** বাংলাদেশে শস্য উৎপাদন বাড়ছে। খাদ্যাভাব নেই দেশটিতে। কিন্তু এই যে উন্নতি ঘটছে দেশে, তা এখন হুমকির সম্মুখীন। উগ্র মৌলবাদীদের সহিংস আন্দোলন এ দেশ বিপদ নিয়ে আসছে। অসাবধানতায় একটি অগ্নিকাণ্ড শুরু হতে পারে দেশে। বাংলাদেশ সরকারের দুর্বলতার কারণে ইসলামী উগ্রবাদীদের আন্দোলনের মুখে এ রকম একটি ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সরকার নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারের হুলিয়া জারি করে এবং দুজন সাংবাদিককে হাজতে পুরে এই দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরে দেশে পরস্পর বিরোধী হরতাল দেখা দেয়। সরকার প্রথম ভুল করে তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করে। সরকার আরও ভুল করে তসলিমা নাসরিনের শরিয়ার সংস্কার চেয়ে ধর্মদ্রোহিতা করেছেন বলে মৌলবাদীদের দাবির প্রতি নতিস্বীকার করে। এর ফলে মৌলবাদীদের আন্দোলনে ইন্ধন যোগানো হয়েছে। মৌলবাদীরা এখন ধর্মদ্রোহিতার আইন পাস এবং পত্রিকার ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করার আন্দোলন করছে এবং সাহায্য সংস্থা নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক এবং গ্রামীন অ্যাকশন কমিটি সারা বিশ্বে পথিকৃতের কাজ করছে। বেগম জিয়ার সরকারকে মৌলবাদীদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। খবরটি ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো। খবরটি এরকম, 'বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। তাদের উদ্বেগ রাজনৈতিক সংকট নিয়ে। লেখিকা তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগের শেষ নেই। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বাংলাদেশ ডেস্কের প্রধান মিসেস রবিন রাফায়েল একজন শীর্ষ পর্যায়ের কূটনীতিককে ডেকে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, বাংলাদেশে এখন যা ঘটছে তা মোটেও সুখকর নয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আমাদের কাছে প্রতিদিনই খবর আসছে নানা সূত্র থেকে। এক অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে সেখানে। মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। রাফায়েল বলেন, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত কোনও স্বার্থ নেই। দেশটা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে মানুষের জীবনমানের উন্নতি করুক এটাই যুক্তরাষ্ট্র চায়। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর শুরুটা মন্দ ছিল না। যদিও বিনিয়োগ ছিল না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ঠিক মত চলবে ডড তাই আশা করা

গিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিন্দুমাত্র সমঝোতা নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থানে বিস্তর ফারাক। এই অবস্থায় সংকট বাড়ছেই। রাফায়েল বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও জোরদার করতে চেয়েছে। ২০ জন সংসদ সদস্যকে যুক্তরাষ্ট্রে এনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। ..বর্তমান সঙ্কট নিরসনে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত বেশ তৎপর হয়েছিলেন। এখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ৫ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত ছুটিতে চলে যাচ্ছেন। লেখিকা তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে রবিন রাফায়েল স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তার লেখার স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না। তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ওয়াশিংটন থেকে সেন্সরশিপ বাই ম্যানহান্ট শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাংলাদেশের একজন কূটনীতিককে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে নিয়ে বলেন, দুনিয়ার প্রচারমাধ্যম কী লিখছে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। সরকার কেন তসলিমার নিরাপত্তা দিচ্ছে না। বাংলাদেশের কূটনীতিক বলেন, সরকার নিরাপত্তা দিচ্ছে না এটা ঠিক নয়। বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে। তসলিমা আদালতে গেলেই পারেন। এরপর সরকার তার সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেবে। তাকে বিদেশে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাসপোর্ট নিয়ে তিনি সম্প্রতি বিদেশ সফর করেও এসেছেন। সফরকালেই তিনি কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা তসলিমার সাহায্যে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছে। তসলিমার মৃত্যুদণ্ডের খবর সম্পর্কে বলছে, সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা কোনও সভ্যতার মধ্যে পড়ে না। কোনও সভ্য সরকার এটা করতে পারে না।

এদিকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির নিউইয়র্কে রয়েছেন। তিনি সেখানে টাইম, নিউজ উইক ও নিউইয়র্ক টাইমসের সাথে একাধিক বৈঠক করেছেন, তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে তসলিমার ব্যাপারে সরকার কড়া কোনও মনোভাব গ্রহণ করেনি। এতে কাজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। নিউইয়র্ক টাইমস কয়েকদিনের মধ্যে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারের মনোভাব জানিয়ে কূটনীতিকরা দীর্ঘ একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। টাইম ম্যাগাজিন তাদের ঢাকা সংবাদ দাতাকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর জন্য বার্তা পাঠিয়েছে। সেখানেও চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছে, তসলিমা সম্পর্কে সরকার কি অবস্থান নিয়েছে। নিউজ উইক বলেছে, তোমাদের লোকই রিপোর্ট পাঠিয়েছে। আমাদের কি করার ছিল! তসলিমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩শ জন প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক এক বিবৃতি দিয়েছেন। বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার মৌলবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করছে। মানবাধিকারকে হত্যা করছে। কথা বলার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক দূতাবাসে প্রতিদিন শত শত চিঠি আসছে নিন্দা আর নানা হুমকি দিয়ে। একজন কূটনীতিক বললেন, আমরা কি এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকব! দেশের জন্য আর কিছু করা যাচ্ছে না।

সর্বশেষ খবরঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকার মনে করে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার মৌলবাদীদের বিকল্প শক্তি হিসেবে কাজ করছে। স্মরণ করা যায় যে ক্লিনটন প্রশাসন মৌলবাদী কোনওরূপ তৎপরতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়।'

এই হল বাংলাবাজারের খবর।

বিদেশে আমার নামটি যদিও বারবার করে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু দেশে মৌলবাদী ছাড়া আমার নাম মুখে আনছে না কেউই। মুখে না এনে তারা মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছেন। তাও ভাল। ভাল যে লড়ছেন। ব্যাপারটি আমার ব্যক্তিগত ঝামেলা

বলে কেউ তো মাঠেই নামতে চাচ্ছিলেন না আগে। আওয়ামী লীগের সভায় জিল্লুর রহমান বলেছেন, ‘সরকারি ছত্রছায়ায় মৌলবাদী শক্তি মাঠে নেমেছে।’ ভাল যে বলেছেন কিছু। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজের সমাবেশ হয়ে গেল প্রেসক্লাবের সামনে। বক্তারা বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী জামায়ত শিবির মৌলবাদী ফতোয়াবাজচক্র দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। এ অপশক্তিকে এখনই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার চূড়ান্ত সময়। টিএসসিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মত-বিনিময় সভা হয়েছে। সভায় অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক এমপি, কাজী আরেফ আহমদ, নূরুল ইসলাম নাহিদ, পান্না কায়সার, মঈনুদ্দিন খান বাদল, অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, শাহেদ আলী, সুধাংসু চক্রবর্তী সবারই প্রায় একই বক্তব্য, ‘একাত্তরের ঘাতকরা আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে। এখনই আমাদের উপলব্ধির সময়। ওদের বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়াতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আমরা প্রাণ দেব। রাজনীতির ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে আমাদের একত্রিত করতে। যার মাধ্যমেই কেবল একাত্তরের ঘাতকদের প্রতিহত করা সম্ভব।’ মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ও মৌলবাদী একাত্তরের ঘাতকদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৪টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে আছে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে জনমত গঠনের লক্ষে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর গ্রহণ, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন বক্তব্য না দেওয়া এবং ঘাতক দালালদের প্রতিহত করতে দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐক্যের প্রতি আহবান ইত্যাদি।

বাকি খবরগুলোর শিরোনাম, হেলথ কোয়ালিশন পোড়ানোর সঙ্গে জড়িত জামাত কর্মীদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না। মানবতাবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হনডডছাত্রলীগ। মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নরসিংদীতে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। মৌলবাদী গোষ্ঠী ধর্ম নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করছে তা শুভ নয় ডড কাদের সিদ্দিকী। এ বাংলায় মৌলবাদের স্থান নেই ডড কুষ্টিয়া সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রতিরোধ কমিটি। ৩০ জুনের হরতালে ছাত্র জনতার ওপর জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে সমাবেশ মিছিল।

চার জুলাই, সোমবার

আজ ইনকিলাবের পাতা ভরে লেখা, ৩০ জুনের ঐতিহাসিক গণরায় ব্লাসফেমি আইনের বিকল্প নেই। কেন বিকল্প নেই, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাসুদ নিজামী লিখেছেন---

> ‘তসলিমা নাসরিন শেষ পর্যন্ত জানালেন যে, তিনি একজন নাস্তিক অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকর্তা বা ধর্মে বিশ্বাস করেন না। ডঃ আহমদ শরীফও নিজেকে নাস্তিক হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। একজন লোক আস্তিক নাকি নাস্তিক কিংবা আস্তিক হলেও কোন

ধর্মাবলম্বী তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কথা হচ্ছে পারস্পরিক সহাবস্থানের প্রশ্ন। প্রত্যেকে নিজ মতের সপক্ষে প্রচার করবেন, কথা বলবেন এবং লিখবেন। কিন্তু অন্যকে খোঁচা দিবেন না এবং কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারবেন না। কারণ ধর্ম পালন মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। কারো এই অধিকারের ওপর অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কেবল অবাধে নিজের মত প্রকাশের অধিকার ভোগ করা যাবে। এটিই গণতন্ত্রের রীতি এবং মানবাধিকারের বিশ্বজনীন স্বীকৃত নীতি। কিন্তু স্বেচ্ছায় নাস্তিক ঘোষণাকারী ডঃ আহমদ শরীফ এবং তসলিমা নাসরিন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেন। তারা বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এবং এ ধর্মের মহাপুরুষদের সম্পর্কে প্রকাশ্যে অনেক আপত্তিকর কথাবার্তা বলেন। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পক্ষ হতে প্রতিবাদ উচ্চারিত হল। ডঃ আহমদ শরীফ মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দানের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করলেও তিনি আর বেশিদূর না গিয়ে থেমে যান। কিন্তু থামেননি তসলিমা। কথিত নারী অধিকার আন্দোলনের ত্রাণকর্ত্রী সেজে ধর্ম ও ইসলাম সংক্রান্ত অজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ মিলিয়ে বারবার তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি নারীদেরকে উচ্ছৃঙ্খল হবার উস্কানি দিলেন। পবিত্র কোরান মানুষের লেখা এবং আধুনিক সভ্য সমাজে এই অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কোনও প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেন। এসব কারণে তসলিমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সরকারের নিকট দাবি জানাতে থাকেন। লক্ষণীয় এই যে, তসলিমার কার্যকলাপের যতই প্রতিবাদ হয় ততই তিনি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তিনি বাংলাদেশের মানচিত্র মুছে ফেলে ভারতের সাথে বাংলাদেশকে একীভূত করার সংকল্পও একাধিকবার ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ধর্মদ্রোহিতার জন্য তসলিমাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দানের জোর দাবি উঠলে ঘাদানিক লাইনে অবস্থানকারীরা তসলিমার পক্ষ অবলম্বন করে বিবৃতি বক্তৃতা দেয়া শুরু করলেন। অতীতে দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত কিছু ব্যক্তিও তসলিমাকে সমর্থন দিয়ে প্রগতিশীলতার পরিচয় দানের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ইতোমধ্যে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিদেশি কতিপয় এনজিওর সমর্থনপুষ্ট সংবাদপত্রও তসলিমার পক্ষ অবলম্বন করল। তসলিমা সমর্থক এসব গোষ্ঠী ধর্মদ্রোহিতার বিচার ও ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলনকারী পক্ষকে ফতোয়াবাজ, ধর্ম ব্যবসায়ী ও রাজাকার আখ্যায়িত করে নিজেরা কোরানের পক্ষ শক্তি হিসাবে প্রকৃত ইসলামের খাদেম হবার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। কিন্তু ঠেলায় ধাককায় পড়ে কোরানের পক্ষ শক্তি হিসাবে ইসলামের লেবাস গায়ে দেবার চেষ্টা করলেও এই ভণ্ড বকধার্মিকদের কথা জনগণ গ্রহণ করেনি। জনগণ শত অপপ্রচার সত্ত্বেও আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ কর্তৃক ধর্মদ্রোহিতার বিচার ও ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবিতে ঘোষিত ৩০ জুনের হরতাল পালন করেন। সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল এমনভাবে পালিত হল, যা এ দেশে কোনওদিন হয়নি।

বিরোধীরা প্রথম হরতাল প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়ে সুবিধা করতে না পেরে পরবর্তীতে একই দিনে পাল্টা হরতালের ঘোষণা দেন। কিন্তু হরতালের দিন তোপখানা সড়কে পুলিশের পাহারায় কয়েকজন ঘাদানিপন্থী ছাড়া আর কোথাও তাদের অস্তিত্বের সন্ধান মিলেনি। নজিরবিহীন এই হরতালে প্রমাণিত হল, এ দেশে ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। ধর্মদ্রোহী এবং তাদের মদদদাতা ও দোসরদের স্থান এ দেশে নেই। দীর্ঘ ১২ ঘন্টা ব্যাপী গোটা বাংলাদেশের জনতার ময়দানে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত

হল ঐতিহাসিক গণরায় ডড মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া চলবে না। ধর্মদ্রোহিতার বিচার করতে হবে এবং ধর্মদ্রোহিতা বন্ধের লক্ষে ব্লাসফেমী আইন প্রবর্তন করতে হবে। হরতাল চলাকালে কিশোরগঞ্জে পুলিশের গুলিতে স্কুলছাত্র আরমান শহীদ হয়। সিলেট অঞ্চলের প্রখ্যাত পীর হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ শাহ চৌধুরীর পুত্র ও নাতিসহ কয়েকজনকে পুলিশ বিতর্কিত এনজিওর নালিশের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে। অবশ্য এদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মামলা তুলে নেওয়া হয়নি। হরতালের দিনই ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদি মিডিয়া হিসাবে সমালোচিত বিবিসি সিগারেট সেবনরত তসলিমাকে দিয়ে কোরানের পাতা উল্টিয়ে আবোল তাবোল বকার দৃশ্য প্রচার করে। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে এ দৃশ্য সম্প্রচারিত হয় এবং তাও হরতালের দিনে। মুসলমানদের দগ্ধ অনুভূতিতে নুনের ছিটা দেওয়ার জন্যই যে বিবিসি তসলিমার এ সাক্ষাৎকার প্রচার করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতোমধ্যে জার্মানির ডাস স্পিগেল ম্যাগাজিন ২৭ জুন তারিখে তসলিমার একটি ধর্মদ্রোহিতামূলক সাক্ষাৎকার ছাপায়। অস্ট্রেলিয়ার দি এজ ম্যাগাজিনেও তার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। যতদূর জানা যায় তসলিমা এখন ঢাকাস্থ একটি পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূত মহাশয়ের হেফাজতে আছেন, যা আইন অনুযায়ী তারা পারেন না। ইতোমধ্যে নরওয়ে ও সুইডেনের পক্ষ হতেও তসলিমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতের আনন্দবাজার স্টেটসম্যান পত্রিকা এবং সে দেশের কতিপয় পন্ডিত আগের মত এখন আর তসলিমাকে নিয়ে মাতামাতি করেন না। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের মুসলমানরাও তসলিমার কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ। এই মুসলমানের ভোট হারানোর ভয়ে সে দেশে আপাতত তসলিমাকে নিয়ে নাচানাচি স্থগিত রয়েছে। যদিও সুযোগ পেলে আবার তালি বাজাতে ভুল হবে না।

বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে খেলার পরিণাম পশ্চিমারা চিন্তা করে না বলেই সে দেশের পত্রিকা লন্ডন টাইমস বাংলাদেশে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি আইন পাস করাতে চাওয়ার জন্য তাদের ভাষায় মৌলবাদীদের সমালোচনা করতে পারে। কিন্তু তাদের যে লোকেরা এখানে আছে, তারা জানে, এহেন স্ববিরোধিতার লুকোচুরি খেলা দ্বারা এদেশবাসীকে বোকা বানানো যাবে না। বাংলাদেশের ক্রিশ্চিয়ান পীস কনফারেন্স বলেছে, পশ্চিমা মিডিয়াগুলো দরিদ্র দেশগুলোর মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দান করে আসছে। ইসলামের বিরুদ্ধে এভাবে আঘাত হানা হলে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের ক্ষেত্রেও এমনটি হবার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মদ্রোহিতার বিচারের জন্য ব্লাসফেমী ধরনের আইন হলে লন্ডনের টাইমস পত্রিকার কি ক্ষতি হবে যে তারা এর বিরোধিতা করছে! ওদের দেশেই তো ধর্মকে রক্ষার জন্য ব্লাসফেমী আইন রয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, পশ্চিমারা নিজেদের দেশে সেকুলার হলেও মুসলমানদের বেলায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক। লন্ডন টাইমস সহ কতিপয় পশ্চিমা দেশের আচরণে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। ইউরোপের বলকান অঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়া, আমেরিকার ধর্মীয় নেতা শেখ ওমর আবদুর রহমান, ইসলামি রাষ্ট্র ইরান, আলজেরিয়ার পুনর্জাগরণ এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র লিবিয়াকে নিয়ে বিশ্ব খ্রিস্টান ইহুদি চক্র যে খেলা খেলছে, তা সবার জানা। পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম জাগরণকে খ্রিস্টান ইহুদি চক্র মৌলবাদ আখ্যায়িত করে সন্ত্রাসবাদের তালিকাভুক্ত করে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বাংলাদেশের ইসলামি জাগরণও পাশ্চাত্য ও প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলেছে। এ জন্য তারা এ দেশের ইসলামী লাইনের লোকদেরকে মৌলবাদী আখ্যায়িত করে তাদের জনসমক্ষে নিন্দিত ও ধিকৃত হিসাবে চিহ্নিত করতে চায়। পক্ষান্তরে ইসলামের শত্রুতায় কাউকে লিপ্ত হতে দেখলে

তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করে, যা তাদের এ দেশীয় সেবাদাস এবং দোসররাও করে থাকে। বাংলাদেশ মূলত আন্তর্জাতিক ও ভূমণ্ডলীয় ষড়যন্ত্রের কারণে এ পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়েছে। এটা এদেশ বাসী বোঝেন বলেই ষড়যন্ত্রকারীরা সমস্যায় পড়েছে। কারণ তাঁরা বোঝেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের সেবাদাসরা চান্স পেলেই দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরুদ্ধ লাইনে অবস্থান নেয়। ভারত কর্তৃক ফারাককা সহ ৫৪টি বাঁধ নির্মাণ, তালপট্টি ও মুহুরির চর দখলসহ অনবরত বাংলাদেশের সর্বনাশ করলেও যেসব মহল ভারতের নিন্দা করে না, যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তি সৃষ্টিকারী খুনী শান্তিবাহিনীর পক্ষ নিয়ে কথা বলে, যারা সব সময় দেশের কৃষ্টি ঐতিহ্যের বিরোধী পক্ষে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দেয়, সেসব মুখচেনা মহলগুলোই তসলিমার পক্ষে তাদের বিদেশী প্রভুদের সেবা করতে শুরু করল। যে তসলিমা পবিত্র কোরানকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যায়িত করে আধুনিক সভ্য সমাজে এরপ্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা করলেন, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে এসব লোক যখন নিজেদের কোরানের পক্ষ শক্তি হিসাবে জাহির করার চেষ্টা করেন তখন কি সচেতন দেশবাসীর চিনতে কষ্ট হয় এরা কারা এবং কি চায়? আশার কথা জনগণের এ উপলব্ধিই এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ধর্ম ও কৃষ্টি কালচারের রক্ষাকবচ। ৩০ জুন তারিখে সূচিত ঐতিহাসিক গণরায় বাস্তবায়নের দায়িত্ব এখন সরকারের ওপর বর্তিয়েছে। ধর্মদ্রোহিতার বিচার দেশকে অশান্তির বিস্তার থেকে রক্ষার স্বার্থেই করা প্রয়োজন। ব্লাসফেমী আইন হলে তা সকল ধর্মের জন্যই রক্ষাকবচ হতে পারে। সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের জন্য এ আইন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

লেখাটি পড়ে অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকি আমি। নিঃসন্দেহে এটি বুদ্ধিমান লোকের লেখা। কে এই মাসুদ নিজামী আমি জানি না। নামটি আগে কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না। এটি কারও সত্যিকারের নাম নাকি ছদ্মনাম, তাও জানি না। একটি প্রশ্ন আমার মনে বাসা বাঁধে, মৌলবাদীরা ব্লাসফেমী আইনের দাবি করছে কেন, তারা তো ইচ্ছে করলেই আল্লাহর আইনের দাবি করতে পারে, যে আইনে অবিশ্বাসীদের হত্যা করার বিধান আছে। কেন তারা মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য খ্রিস্টানদের তৈরি ব্লাসফেমী আইন চাইছে? কেন আল্লাহর আইনটির, যে আইনে অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে হয়, ডান হাত এবং বাঁ পা, বাঁ পা আর ডান হাত প্রথম ঘচাং ঘচাং করে কেটে ফেলতে হয় পেছন থেকে, তার দাবি করছে না! আল্লাহর আইনের চেয়ে খ্রিস্টানের তৈরি আইনে তাদের কেন বেশি আস্থা? কী কারণ এর পেছনে, ভেবে দেখতে গিয়ে আমার মনে হয়, ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে যুগের পর যুগ বাস করে এখনও মাথা নোয়ানো প্রভু প্রেমটি যায়নি। সাদা চামড়া দেখলেই ভক্তি ধরে এদের, আল্লাহর চেয়ে বেশি ভক্তি।

প্রচার মাধ্যমের এমনই এক গুণ যে কোনও মন্দ খবরই আগুনের মত সাঁ সাঁ করে দৌড়ে যায়, বাতাসের আগে আগে যায়। একজন কেউ যদি কোথাও একটি মিথ্যে কথা লিখে ফেলে, তাহলে সেই মিথ্যেটি এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পত্রিকায় লিখে দিল যে কোরান পড়তে পড়তে সিগারেট খেয়েছি। ব্যাস, এ কথাই এখন ধ্রুব সত্যের মত দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন লজ্জা লিখে আমি ৪৫ বা ৪৮ লক্ষ টাকা পেয়েছি বিজেপির কাছ থেকে। এটি লেখা হয়েছিল ইনকিলাবে। যে মানুষেরা

ইনকিলাবের কোনও খবর বিশ্বাস করে না, তারা কিন্তু এই টাকার খবরটি বেশ সুন্দরভাবে বিশ্বাস করে বসে আছে। আমি যে এই মিথ্যেটির প্রতিবাদ করেছি, সেটি কেউ গ্রাহ্য করছে না। লক্ষ করেছি, আমার সম্পর্কে নেতিবাচক খবরগুলো মানুষের মনে খুব ধরে। যেমন আমি কোরান সংশোধনের কথা বলেছি, আমি যে প্রতিবাদ করেছি এর, বলেছি যে না আমি এ কথা বলিনি, মানুষ শুনেও এটি শুনছে না। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় তা হল, মৌলবাদীরা বলছে যে তাদের বিপক্ষ শক্তি তসলিমার পক্ষের লোক। কিন্তু মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে আমার নামটি কিন্তু উচ্চারণ করা হয় না, তারা যে আমার পক্ষের কেউ নয়, তারা যে আমাকে মোটেও পছন্দ করে না, তা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারপরও মৌলবাদীরা অমৌলবাদীদের দোষ দেবার জন্য *তসলিমার সমর্থক* বলে গাল দিচ্ছে। তসলিমাকে সমর্থন করা এ দেশে দোষের বিষয়। তসলিমা একটি ঘৃণ্য নাম। এই নামটি একটি কালো কুচ্ছিত নাম। এই নামের কালিমা মেখে কেউ অচ্ছুত হতে চাইছে না।

আজ পোলাও মাংস খাওয়ালেন এঁর স্ত্রী। পাশে দাঁড়িয়ে পাতে তুলে দিলেন খাবার। যেন আমি এ বাড়ির সম্মানিত কোনও অতিথি। আরও খাও, আরও নাও বললেন অনেকবার। অনেকটা মার মত। জানি না মা কেমন আছেন। মা কি খাচ্ছেন দাচ্ছেন কিছু! মনে হয় না। নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছেন না মা। নিশ্চয়ই দিন রাত কাঁদছেন। মাকে সান্ত্বনা দেবার মত কেউ কি আছে পাশে! জানি না কিছুই। এঁর স্ত্রী আমাকে বলেছেন এই বাড়িটি আমার বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। এত কাছে বসে আছি, অথচ আমার সাধ্য নেই আমার বাড়িটিতে যাওয়ার। আমার বাড়ির কেউ কি জানে যে আমি কত কাছে এখন তাদের! মার চেয়ে বেশি বাবার কথা মনে হয়। বাবা কখনও কাঁদার মানুষ নন। তিনি শক্ত মানুষ। তিনি যুক্তির মানুষ। বাবাকে আমি এখন বেশ কল্পনা করতে পারি, দুশ্চিন্তায় তিনি মাথার চুল খামচে ধরে বসে আছেন, তাঁর রক্তচাপ বাড়ছে। তিনি মুড়ির মত ওষুধ খাচ্ছেন রক্তচাপ কমাতে, কিন্তু কিছুতেই কমছে না। তিনি ভাবছেন তাঁর দুর্ভাগা কন্যাটির কথা। বাবার রক্তচাপ বেড়ে বেড়ে হঠাৎ যদি হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়! তবে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ি তো আমিই হব। নিজেকে কোনওদিনই ক্ষমা করতে পারবো না আমি। বাবাকে একবার আমি দেখতে পাবো তো আমার বা তাঁর মৃত্যুর আগে! একবার কি দেখা হবে না আমাদের! ইচ্ছে করে আবার কৈশোরে ফিরে যেতে। বাবা মা ভাই বোন নিয়ে চমৎকার নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করতে ইচ্ছে করে। লেখালেখি করব না। ডাক্তারি করব। বাবা যেমন আমাকে বড় ডাক্তার বানাতে চেয়েছিলেন, তেমন বড় ডাক্তার হব। শহরে একটি ক্লিনিক দেব, দেখে তিনি ভীষণ আনন্দ পাবেন। তাঁর কোনও একটি ছেলেমেয়ে ডাক্তার হয়নি আমি ছাড়া। আমাকে দেখে তিনি নিজের জীবনকে সার্থক মনে করবেন। ডডস্বপ্নটি নিয়ে আমি শুতে যাই, রাতে ঘুম হয় আমার।

পাঁচ জুলাই, মঙ্গলবার

গতকালের পত্রিকায় ছাপা খবর ইচ্ছে করেই পড়িনি। আজ হাতে নিয়েই দেখি বিশাল মিছিলের ছবি। সন্ত্রাসী নৈরাজ্যবাদীদের গ্রেফতার ও বিচার, দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে হামলাকারীদের শাস্তি প্রদান ও ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবিতে জাতীয় যুব কমাণ্ড কেন্দ্রীয় কমিটি গতকাল রাজধানীতে যে বিশাল মিছিল করেছে, তার ছবি।

তসলিমা পালালে সরকারকে জনতার আদালতে যেতে হবে। জাতীয় যুব কমাণ্ড ঘোষণা করেছে যে তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রচারকারী ইউসিসএর প্রেস বিজ্ঞপ্তিটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা না হলে যুব কমাণ্ড বাংলাদেশের মার্কিন তথ্য কেন্দ্র ঘেরাও করবে। গতকাল দৈনিক বাংলার মোড়ে আয়োজিত এক সমাবেশে যুব কমাণ্ড নেতারা এ ঘোষণা দেন। বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে কুখ্যাত মুরতাদ তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি কার্যকর করা হবে। তারা সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকারি সংস্থাগুলোকে ফাঁকি দিয়ে তসলিমা যদি পালিয়ে যায়, তাহলে ক্ষমতাসীনদের জনতার আদালতে দাঁড় করানো হবে। বক্তারা অবিলম্বে তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতারের দাবি জানান। যুব কমাণ্ড সভাপতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের উদ্দেশে বলেন, তসলিমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকতে পারে, কিন্তু এটি আমেরিকা নয়, এটি বাংলাদেশ। ওলামা মাশায়েখের এ দেশে ইসলামের অবমাননা করা হলে জনতা চুপ করে থাকবে না। তসলিমাকে এ দেশ থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নরওয়ের কূটনীতিক কোনও ভূমিকা রাখলে বাংলাদেশ জ্বলে উঠবে।

ইনকিলাবের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো হচ্ছে গ্রামে গঞ্জে, দেশের আনাচে কানাচে তৌহিদী জনতা ফুঁসে উঠছে আমার ফাঁসির দাবিতে। গ্রাম গঞ্জে হরতাল সফল হয়েছে। হরতাল সফল হওয়া মানেই মনে প্রাণে এ দেশের জনগণ তসলিমার ফাঁসি চাইছে, ব্লাসফেমি আইন চাইছে। চারদিকে সভা হচ্ছে ধর্মপ্রাণ মানুষের। তারা একটি কথাই বার বার বলছে, ধর্মদ্রোহী তসলিমার মুক্তি নেই, সরকার যদি তসলিমার পক্ষ নেয়, তবে সরকারকেও তারা দেখে ছাড়বে। গ্রামে গঞ্জে নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হচ্ছে। ঈশ্বরগঞ্জে, যে ছোট্ট শহরটিতে আমার ছোটবেলার একটি সময় কেটেছে, যেখানে ইয়াসমিনের জন্ম হয়েছে, সে শহরের লোকেরা *তসলিমার ফাঁসি চাই* লেখা ব্যানার নিয়ে মিছিল করছে। জমিয়াতুল মোদর্রেছিনের ঈশ্বরগঞ্জ শাখা এই বিক্ষোভ মিছিলটি করেছে। বিরাট বিক্ষোভ মিছিল। ছবি দেখেই অনুমান করা যায়, কত শত লোক নেমেছিল সেই মিছিলে। সভায় মাদ্রাসার বড় বড় শিক্ষকরা বলেছেন, ইহুদি খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পদলেহী ইসলাম ও দেশদ্রোহী এক অশুভ শক্তি আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও পবিত্র কোরানের আয়াতের বিকৃত তরজমা করে তা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে। কুলাঙ্গার তসলিমা নারী স্বাধীনতার নামে পবিত্র কোরানের আমূল পরিবর্তন দাবি করছে। যার ফলে বিশ্বাসী মানুষ সারা দেশে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে এবং তসলিমাসহ সকল মুরতাদদের ফাঁসি দাবি করছে।

আমেরিকা ও বিবিসির ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড নিয়ে ইনকিলাবের প্রতিবেদন ডড ৯৯ ভাগ মানুষ নয়, এক তসলিমার পক্ষ নিয়েছে খ্রিস্টান দুনিয়া। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে তসলিমা নাসরিন চরমভাবে ধিকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তার উদ্ধার ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে আমেরিকা ও ভারতসহ খ্রিস্টান দুনিয়া। তাদের এই কাজে

প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে উৎকটভাবে মুসলিমবিরোধী, প্রবলভাবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান বিরোধী এবং নির্লজ্জভাবে ভারতপন্থী ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা বিবিসি। এই স্ব আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এসব শক্তি অনেক অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সুমহান নীতি চরমভাবে লঙ্ঘন ও পদদলিত করেছে। তসলিমা নাসরিনের ব্যাপারে রবাহুত দরদ ও একাত্মতা প্রকাশ করতে যেয়ে ভারত, আমেরিকা, পশ্চিমা বিশ্ব এবং বিবিসি মত প্রকাশের স্বাধীনতার আবরণে যে সব কথাবার্তা বলছে, তার ফলে তাদের অজ্ঞাতে তাদের ডবল স্ট্যান্ডার্ড রূপটি উৎকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে বিবৃতি গেছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশে অবস্থিত পশ্চিমা দূতাবাসগুলোর নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক আইন এবং এ দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, নিশ্চয়ই তারা তসলিমাকে অবৈধভাবে কোনও দূতাবাসে কোনও আশ্রয় দেয়নি।

ইনকিলাবের খবর, তসলিমা সম্পর্কে পশ্চিমা অনুরাগীদের বাড়াবাড়ি এক ভয়ানক বিকৃতি। বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের অনুরাগী পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও কর্তৃপক্ষের বাড়াবাড়ি এশীয় গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে এক ভয়ানক বিকৃতি বলে চিহ্নিত হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক ব্যাংকক পোস্ট এর পয়লা জুলাই সংখ্যায় *ধর্মীয় সতর্কতার ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর ঘাটতি* শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে ধর্মের সুস্থ প্রভাব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেক্যুলারিজমের নামে ধর্মকে অস্বীকার করার প্রবণতা এক ধরনের উগ্রতা। পত্রিকাটিতে বলা হয় এই উগ্রতা *সেক্যুলারিজম* শব্দটিকেই বিকৃতিতে পর্যবসিত করেছে। ভারতীয় সাংবাদিক খুশবন্ত সিংএর উদ্ধৃতি দিয়ে তসলিমা নাসরিনের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর কাল্পনিক উপন্যাস লেখিকার ব্যাপারে কিছু করাটা এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই ঝুঁকি দেখা দিয়েছে সেক্যুলার ফান্ডামেন্টালিস্ট অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থী মৌলবাদীদের তরফ থেকে। কেননা, এরা তাদের অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে দিচ্ছে যদিও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে, আসলে তা পরিণামে সকল ধর্মেরই মূলে আঘাত হানছে। রুশদি সৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক হট্টগোলের শেষে এবার যে তসলিমা অ্যাফেয়ার এর উদ্ভব ঘটেছে এতে যেন সেক্যুলারিজম উগ্র বিকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে না যায়। এখনকার পরিস্থিতিকে আর রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম বলে বিষোদগার করার উপায় নেই। বরং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মৌলবাদ শব্দটিকেই এখন নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সততার সঙ্গে ধর্মের দিকে তাকালে কারও পক্ষেই মৌলবাদ মৌলবাদ বলে চিৎকার করা সম্ভব হবে না। তসলিমা নাসরিনের লেখালেখি এবং তার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা যদি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নাও করা হয় তবু সে যে তার মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এটা মানতেই হবে।

আরও খবর; খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের এক বৈঠকে কুখ্যাত তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে সাম্প্রতিক দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলা হয়, নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে জাতির দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার জন্য সরকার একটি ভ্রষ্টা মেয়েকে নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু করেছে তার পরিণতিতে অবশেষে সরকারকেই ভুগতে হবে। সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতির আশু অবসানকল্পে অবিলম্বে তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবার জন্য সরকার কাছে জোর দাবি জানানো হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে সরকার যদি আগামী ১০ জুলাই রোববারের মধ্যে তসলিমাসহ চিহ্নিত সকল ধর্মদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের ব্যবস্থা না করে, তবে তৌহিদী দেশবাসীকে সাথে

নিয়ে আগামী ১১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর সুগন্ধা কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। সভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয় যে, সরকার যদি তসলিমাকে দেশের বাইরে যাবার সুযোগ করে দেয়, তবে অবশ্যই দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হবে।

আরমান হত্যাকে পুঁজি করেছে ইসলামী দলগুলো। মিছিল করছে আরমান কেন খুন হল তা নিয়ে। খুলনায় ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিরোধ কমিটির বিশাল সভা হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে। আবার বামঘেঁষা পত্রিকা জানাচ্ছে, বামফ্রন্টের সমাবেশ ও মিছিলও হয়েছে, মৌলবাদীদের প্রতিহত করার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়েছে। মৌলবাদী পত্রিকায় প্রতিদিনই গরম গরম খবর। সিলেটে তৌহিদী ছাত্র জনতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সিলেটে সমাবেশ হচ্ছে। ধর্মদ্রোহী মুরতাদ নাস্তিক এনজিও চক্রের বিরুদ্ধে গ্রামে গঞ্জে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন হয়েছে, এবং অমৌলবাদীদের হামলায় আহতদের হিসেব দিয়ে লেখালেখি চলছে।

দেশে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় আদালতে আমার হাজির হবার যে তারিখটি ছিল, সে তারিখটিও তুমুল তাণ্ডবে ভেসে গেল। হ্যাঁ, কাল ছিল আমার আদালতে হাজিরা দেবার দিন, কাল মুখ্য মহানগর আদালতের হাকিম আমার হাজিরার সময় আরও এক মাস বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে এঞ আমার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। এঞর জীবনের অনেক কথাই বললেন। মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সেই পাকিস্তান আমল থেকে তিনি জড়িত, সে সময় কি রকম সেই আন্দোলন ছিল বর্ণনা করলেন। কি রকম ভাবে তিনি এবং তাঁর তখনকার বন্ধুরা পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বললেন। টগবগে এক একজন স্বপ্নবান তরুণ যোদ্ধা সরকারি নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, কিন্তু নিজেদের আদর্শ বিসর্জন দেননি। তখনকার দিনের সঙ্গে তুলনা করলে মৌলবাদীদের জোর এখন অনেক বেশি। স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে এঞর। কত সংগ্রামের পর, কত সাধনার পর নিজেদের জন্য একটি দেশ পেয়েছেন, সেই দেশ কি না এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ! এত কিছুর পরও এঞর দুচোখে দুফোঁটা স্বপ্ন নক্ষত্রের মত জ্বলে। নক্ষত্র থেকে আলো এসে আমার চোখে পড়ে। আমি বুক ভরে শ্বাস নিই। হারিয়ে যাওয়া একটি শক্তি একটু একটু করে কোত্থেকে যেন ফিরে আসে আমার মধ্যে।

<u>বাংলাদেশঃ মৌলবাদের অভয়ারণ্য</u> ডড এই শিরোনামে আজ কবীর চৌধুরী আর সৈকত চৌধুরীর লেখা একটি কলাম ছাপা হয়েছে। কলামের শুরুটি এরকম, 'কেমন আছো, তসলিমা?

ভাল নেই নিশ্চয়ই। ভাল থাকার কথাও নয়। মাথার ওপর হুলিয়া নিয়ে, স্বজন ছেড়ে, সর্বোপরি লেখালেখির জগত থেকে দূরে সরে থাকা যে কোনও সৃষ্টিশীল মানুষের পক্ষেই অসম্ভব এক কষ্টকর কাজ।

ভাল আমরাও নেই তসলিমা। বাংলাদেশ ভাল নেই। সব ভালবাসা আজ নির্বাসনে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ধর্মের শাশ্বত কল্যাণের বাণী, প্রগতির উর্ধ্বমুখ সব আজ জিম্মি হয়ে আছে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ, ক্রোধান্ধ, বর্ণবাদী, মতলববাজ মানুষের হাতে। ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতা, লোভ, হিংসা, হানাহানি, ক্ষমতার রশি আঁকড়ে ধরার প্রাণপণ

প্রচেষ্টা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। গোটা জাতিকে পরমুখাপেক্ষী মেরুদণ্ডহীন প্রজাতিতে রূপান্তরিত করার হীন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে সর্বত্র। যে স্নিগ্ধ সহিষ্ণু স্নেহের আঁচলে সাজানো আমাদের গৃহকোণ, সেখানে আজ মৌলবাদের হিংস্র থাবা। এই তো সেদিন ডঃ আহমদ শরীফের বাসায় বোমা হামলা হল, তারপর হামলা এল শফিক রেহমানের ওপর। মৌলবাদী অপশক্তি তাদের শক্তি প্রদর্শন করে ক্ষমতার মহড়া দিচ্ছে প্রগতির শরীরে আগুন ধরিয়ে। ঘরে আগুন, বাইরে আগুন, বুকের ভেতরে আকণ্ঠ এক জ্বালা - এই যেন বেঁচে থাকা। আর এদিকে একত্রিশ শতাংশ ভোটারের গণতান্ত্রিক(!) সরকার গণতন্ত্র এনেছি, গণতন্ত্র দিয়েছি বলে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে। আমাদের চোখ খোলা, খোলা কানও, তবু বুকের ভেতরে মাতম ওঠে কণ্ঠ রোধের কষ্টে। সময়ের ঘড়ি ক্রমশ সামনে এগোয়, আর আমাদের দেশ ক্রমাগত পেছনে যাচ্ছে, হাজার বছরেরও পেছনে। অলিখিত কিন্তু প্রকাশ্য ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে ধর্ম সেবকেরা সকল আইন শৃঙ্খলা সভ্যতার রীতিনীতি উপেক্ষা করে। ধর্মের নামে অমানবিক ফতোয়া দিয়ে ধ্বংস করছে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, ধর্মনাশের ধুয়া তুলে নরপশুরা মাটিতে পুঁতছে সাধারণ জনগণ, সংবাদপত্র অফিসে তথা গণতন্ত্রের প্রাথমিক সৈনিকদের বাসভূমিতে বোমা ছুঁড়ছে। আজ গোটা দেশের আকাশ জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে একাত্তরের সেই পুরোনো শকুন। সময় হয়েছে তসলিমা, যুদ্ধে যাবার।

বেশ আছো তসলিমা, আপাত নিরাপদ দূরত্বে। কেমন আশায় ছিলাম দীর্ঘ অন্ধকার থেকে আলোয় এসে নব্বইএর গণঅভ্যুত্থান থেকে ফিরে পাবো একটি সেক্যুলার বাংলাদেশ। আমাদের স্বপ্ন সাধনায় চাওয়া পাওয়ায় নতুন মন্ত্রে জেগে উঠবে নতুন স্বদেশ। কেমন ভুলের বাসরে গড়েছিলাম বাংলাদেশ। আর কেনই বা ভুলের ভালবাসার এমন অন্তঃক্ষরণ এই অবেলায়। ..

তারপর অনেক কথা। শেষ করেছেন এভাবে, ‘এদিকে ধর্মান্ধ তৌহিদী পুংগবেরা ৩০ জুনে হরতাল ডেকেছিল। ভণ্ড সরকার সে হরতাল রোখেনি। আমরা স্বাধীনতার পক্ষের মানুষেরা এই হরতাল রোখার জন্য সবাইকে একত্রিত হবার ডাক দিয়েছিলাম। আমরা খুব ভাল করেই জানি যে এর ফলে আমাদের ওপরও হামলা হতে পারে। তবুও আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে, সকল ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ধর্ম উন্মাদদের এবং মৌলবাদী সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও সকল মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়ে যাবো। মৃত্যুর ভয়ে আমরা ভীত নই। আমরা সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই সরকারের হাতে শুধু ইসলাম ধর্ম এবং লেখক শিল্পী সাংবাদিকরাই বিপণ্ন নয়, একই সঙ্গে বিপর্যস্ত দেশের বারো কোটি মানুষ। ধর্মের নামে ধর্মনাশ করে চলেছে মৌলবাদীরা। আর সরকার গণতন্ত্রের নামে বলি দিচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের চেতনাকে।

তসলিমা, যৌবন যার, মনের বিশ্বাসের সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে, তার জন্য যুদ্ধে যাবার এখনই শ্রেষ্ঠ সময়।’

কলামটি পড়া শেষ করে চোখ বুজি, বোজা চোখের বাঁধ ভেঙে জল নামে, গড়িয়ে নামতে থাকে গালে। দুহাতে মুছি জল। জল আরও নামে। মুখটি বালিশে গুঁজি রাখি। বালিশ ভিজে যেতে থাকে। থাক, ভিজুক। আজ ভিজে যাক সব।

গভীর রাতে ক তাঁর বাহিনী নিয়ে ঝড়ের বেগে এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন ঞর বাড়ি থেকে টর বাড়ি। টও একজন শিল্পী, তবে ঞর মত বিখ্যাত নন, ঝর মতও বিখ্যাত নন। ক আর তাঁর গাড়িচালক বন্ধু আমাকে আজ এ বাড়ির ভেতর ঢুকিয়েই বিদেয় হননা। তাঁরাও ভেতরে ঢোকেন। টর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আমার। ট অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। ঘরগুলোর আলো নিবিয়ে বৈঠক ঘরে অল্প একটি আলো জ্বেলে রেখেছিলেন শুধু। এটি আলাদা কোনও বাড়ি নয়। অ্যাপার্টমেন্টে বিল্ডিং। ট এই অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকেন। ক, কর বন্ধু আর ট টর বৈঠক ঘরের কার্পেটে বসে অনেকক্ষণ দেশের অবস্থা নিয়ে কথা বললেন। আমি নির্বাক শ্রোতা। অত্যন্ত প্রতিভাবান যুবক এই ট। একসঙ্গে হাজারটা কাজ করেন। বহুকাল ইউরোপে ছিলেন। এখন দেশে ফিরে এসে শিল্পের জগতে নিজেকে নিবেদন করেছেন। কর অনেকদিনের বন্ধু ট। কর কারণেই সম্ভব হয়েছে টর বাড়িতে আমার আশ্রয় পাওয়া। কিন্তু এখন ঝামেলা হল, ট এবাড়িতে রাঁধেন না, বাড়েন না। তিনি সকালে বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত্তিরে। এই অবস্থায় আমার থাকাটি চলবে এখানে, কিন্তু খাওয়াটির ঠিক কি হবে কও ঠিক জানেন না। ক বলেন যে তিনি নিজে অথবা কাউকে যোগাড় করবেন খাবার নিয়ে আসার জন্য। কেবল খাবার নিয়ে আসাই নয়, আমার সঙ্গে দিনের বেলাটা কেউ যেন থাকতে পারে, সে ব্যবস্থাও করবেন। ককে আমার আগের চেয়ে বেশি প্রাণবন্ত লাগে। আগের সেই দুশ্চিন্তাটি এখন আর তাঁর মধ্যে নেই। আসলে বিপদের মধ্যে দীর্ঘদিন কাটালে বিপদকে বোধহয় আর বিপদ বলে মনে হয় না। ক এখন মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে রীতিমত একজন সাহসী যোদ্ধার ভূমিকায়। আমাকে একটি গুরুদায়িত্বও দিলেন, ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে ছড়া মত কিছু স্লোগান লিখে দিতে হবে। তিনি শিগরি একটি লিফলেট ছাপবেন। বললেন কাল এসে তিনি নিয়ে যাবেন ছড়াগুলো।

ক আর তার সুদর্শন গাড়িচালক বন্ধুটি বিদেয় হলে ট আমাকে নিয়ে অন্ধকার বারান্দাটিতে বসলেন। কালো একটি আকাশ চোখের সামনে। নিঝুম সারা পাড়া। ট বলতে থাকেন স্বপ্নময় কণ্ঠে তাঁর জীবনের টুকরো টুকরো কথা। এ বাড়িতে তিনি তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে বহুদিন থেকে সংসার করছেন। প্রেমিকাটি এখন লন্ডনে পড়াশুনা করতে গেছেন, ফিরে আসবেন মাস কয় পর। ট এবং তাঁর বান্ধবী বিয়েতে বিশ্বাসী নন, তাঁরা ভালবাসায় বিশ্বাসী। ভালবাসাই তো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে। জিজ্ঞেস করলাম বিয়ে না করে স্বামী স্ত্রীর মত বাস করার কারণে কোনও অসুবিধে হয় কি না, অর্থাৎ লোকেরা মন্দ বলে কি না।

ট চমৎকার হেসে বললেন, লোকে মন্দ বললে আমার বয়েই গেল!

ডডআপনার বান্ধবীও কি তাই? পরোয়া করেন না লোকের কথা?

ডডও তো আমার চেয়েও বেশি সাহসী।

এমন জুটি সমাজে বিরল। তারপরও ভাল লাগে ভাবতে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজেই সাহসী কিছু মানুষ নিজেদের পছন্দমত জীবন যাপন করছেন। সংস্কার অনেকেই ভেতরে ভেতরে ভাঙছে। একদিন, আমার বিশ্বাস, পুরোনো পচা নীতিরীতিগুলো ভেঙে গুড়োঁ হয়ে যাবে, মানুষ তার নিজ সত্তা নিয়ে, অধিকার নিয়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে বাস করবে একটি শিক্ষিত সুন্দর সমাজে। ট আর আমি বারান্দায় বসে রাতের অপরূপ রূপ দেখি। শীতল হাওয়া এসে এই গ্রীষ্মের আগুনে পোড়া আমাদের শরীরে শীতল শান্তির পরশ বুলিয়ে যায়। আমাদের মনেও ফুরফুরে হাওয়াটি বইতে থাকে। আমরা আর দেশের অবস্থার কথা বলে দুঃখ করি না। জীবন ও জগতের সৌন্দর্যের কথা বলি। অনেকদিন পর আমার মনে হয় জীবন খুব সুন্দর, একে হারানোর কোনও অর্থ হয় না।

রাতে ট তাঁর শোবার ঘরটি ছেড়ে দেন আমার জন্য। নিজে তিনি অন্য ঘরে ঘুমোন।

ছয় জুলাই, বুধবার

সকালে ট বাইরে থেকে পাউরুটি আর ডিম কিনে এনে রুটি গরম করে আর ডিম ভেজে আমাকে ডাকলেন খেতে। খাবার ঘরটির চারদিকে জানালা, পর্দাহীন জানালা। আমি দাঁড়াতেই এক ঝাঁক আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। অনেকদিন আলো দেখে অভ্যস্ত নই আমি। ট হঠাৎ লক্ষ করলেন জানালায় পর্দা নেই। আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ তাকালেই আমাকে দেখে ফেলতে পারে। রান্নাঘরে যাবার আমার কোনও উপায় নেই, ও ঘরের জানালাতেও কোনও পর্দা নেই। ট মুশকিলে পড়লেন। অগত্যা আমাকে নাস্তা খেতে হল বৈঠক ঘরে বসে।

আমি যে ঘরে শুয়েছি সে ঘরে বিছানার কাছে একটি টেলিফোন রাখা। টেলিফোনটি তালা দেওয়া। টকে বলেছিলাম যে আমি একটি ফোন করব, খুব জরুরি ফোন, চাবিটি যেন তিনি দেন আমাকে। ট নিরস মুখে বললেন, চাবি ছিল তার কাছে, এখন হারিয়ে গেছে। আমি ঠিক বুঝি, এটি ক'র শিখিয়ে দেওয়া। আমি যেন কোথাও কোনও ফোন করতে না পারি, সে ব্যবস্থা আমি এ বাড়িতে আসার আগেই তিনি করে রেখেছেন।

ট বেরিয়ে গেলেন। আমার কাছে দরজার চাবি দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, ক বা কর পাঠানো কেউ যদি আসে তবে যেন দরজার তল দিয়ে চাবিটি দিই তাকে। দরজায় ছিদ্র আছে বাইরে দাঁড়ানো মানুষকে দেখার। সে ছিদ্র দিয়ে আগে যেন দেখে নিই কে এসেছে।

ট অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর বাড়িটিতে একা আমি। কি রকম যেন ভয় ভয় লাগে। কেউ যদি জানে যে এ বাড়িতে আমি আছি। মিছিল করে এসে যদি মৌলবাদীর দল দরজা ভেঙে ঢোকে! দুর্ভাবনা থেকে মন ফেরাতে টর বৈঠকঘরের বইগুলো দেখতে

থাকি। সবই ইংরেজি বই। বড় বড় বিদেশী সাহিত্যিকদের লেখা বই। সালমান রুশদির দ্য স্যাটানিক ভার্সেস বইটি তুলে নিই তাক থেকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বইটির অনেকগুলো পৃষ্ঠা পড়ে ফেলি। পড়ে ফেলি, কিন্তু বুঝেছি কি! না কিছুই বুঝিনি। অনেক শব্দের অর্থই জানি না। পাশে ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধান নিয়ে না বসলে এই বই পড়ে কিছুই বোঝা আমার হবে না। বইটি রেখে দিই যেখানে ছিল,সেখানে। বাড়িটিতে কোনও দামি আসবাব নেই। কিন্তু বাড়িভর্তি দামি বই। সত্যিকার শিল্পীর বাড়ি এটি। অগোছালো, উদাসীন। দেয়ালের ছবিগুলো বড় বড় শিল্পীর। দুস্প্রাপ্য কিছু শিল্পকর্ম এখানে ওখানে। টর বান্ধবীর একটি ছবিও চোখে পড়ে। জানি না বান্ধবী কি না, তবে অনুমান করি বান্ধবীই। টর ছবিও পাশে। ট আর টর বান্ধবী দুজনই খুব সুন্দর।

দুপুরে জ আসেন খাবার নিয়ে। জকে দেখে খুশি লাগে খুব। ট গিয়ে তাঁকে আজ সকালে খবর দিয়েছেন এখানে আসার জন্য। ইঙ্গিতে কথা হয়েছে তাঁদের। জ-কে, আমি জানি না কেন, আমার খুব আপন মনে হয়। যতক্ষণ তিনি থাকেন আমার কাছে, মনে হয় নিজের বাড়িতে বুঝি আছি আমি। জর অসম্ভব ক্ষমতা আছে মানুষকে আপন করে নেওয়ার। এত সহজ সরল উদার এবং মুক্ত মনের মানুষ সংসারে খুব একটা নেই। জকে নিয়ে আমি একটি গল্প লিখেছিলাম, ছাপাও হয়েছে সে গল্প আমার একটি বইয়ে। জর চোখে জল চলে এসেছিল সে গল্পটি পড়ে। জ-কে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখতে ইচ্ছে হয় আমার। তাঁর জীবন আসলেই দীর্ঘ একটি রোমহর্ষক উপন্যাসের মত। কিন্তু লেখার সময় কোথায় পাবো আমি! আমি কি বেঁচে থাকতে পারবো! যাকে শক্ত করে আলিঙ্গন করে আছে মৃত্যু তার আবার লেখালেখির স্বপ্ন! হা স্বপ্ন।

জ চান আমি যেন বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করি। তিনিও দেশ থেকে আমার পালিয়ে যাওয়াটিকে একমাত্র বাঁচার পথ বলে মনে করছেন। জকে বলি আমার মনের কথা যে কিছুতেই আমি পালাতে চাই না। আমার মনের কথা, কিন্তু জ আমাকে ভালোবাসলেও আমার মনের কথাকে মোটেও মেনে নেন না। অনেকক্ষণ আমাকে সঙ্গ দিয়ে যাবার আগে তিনি বলেন কাল তাঁর কন্যাকে পাঠিয়ে দেবেন আমাকে সঙ্গ দিতে।

ক রাতে আসেন খাবার নিয়ে। ভাত, শাক, চিংড়ি মাছ। আমার প্রিয় খাবার। ক-র মা খ এগুলো রান্না করেছেন। খুব ভাল লাগে খেতে। খাওয়ার পর ক আমাকে তাড়া দেন ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে কটি ছড়া লিখে দিতে। ক কে বসিয়ে রেখেই লিখে দিই দ্রুত। নিয়ে ক চলে যান, বলে যান রুমানা নামের এক মেয়ে আসবে কাল দুপুরে। দুপুর দেড়টার সময় নীল শাড়ি পরা একটি মেয়ে দরজার টোকা দেবে, সেই মেয়েটিই রুমানা, যেন দরজা খুলে দিই। ক একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়েছেন আমাকে। ব্যাগের ভেতর আমার দুটি শাড়ি, দুটি ব্লাউজ, একটি তোয়ালে।

ক চলে গেলে ট বলেন, মৌলবাদ বিরোধী শক্তি এখন সত্যিই মাঠে নেমেছে। কি করছে তারা ট বলেন এক এক করে। বলার চেয়ে বলা ভাল পত্রিকা থেকে পড়ে শোনান। এলিফেন্ট রোডে গণফোরামের সভায় কাল ডঃ কামাল হোসেন বলেছেন, একাত্তরে

জামাতের ভূমিকা কোনও বিতর্কিত বিষয় নয়। অথচ আজ সুবিধাবাদী রাজনীতির ফাঁক গলে তারা আবার জায়গা করে নিচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যদি আমরা হারাই তবে জাতি হিসেবে আমাদের কিছুই থাকবে না। স্বাধীনতার চেতনাকে অর্থবহ করতে হলে দালালদের রাজনীতিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সারোয়ারী রহমান বলেছেন ফতোয়াবাজরা নারী প্রগতির অন্তরায়। ধর্মকে ব্যবহার করে কেউ নারীদের প্রতি অন্যায়, অমানবিক আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রাম জোরদার করতে জাতীয় কনভেনশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ অথবা ১৬ জুলাই এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। গণফোরাম, ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি, পিপলস পার্টিসহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সব দল ও ছাত্র, যুব, কৃষক, খেতমজুর, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, নাট্য সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিভিন্ন সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই কনভেনশনে আওয়ামী লীগের যোগ দেওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে।

টকে বলি, এখনও উদ্যোগের কথাই বলা হচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে কি? এখনও কি সময় হয়নি সব দল একত্র হওয়ার? মৌলবাদীদের মধ্যে মতের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তো তারা একসঙ্গে পথে নেমেছে! শুনেছিলাম সেদিন আওয়ামী লীগ নাকি যোগ দিয়েছে আন্দোলনে।

টর মুখটি মলিন দেখায়। তিনি মাথা নেড়ে বললেন যে আওয়ামী লীগ মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়নি।

ওদিকে মৌলবাদীরা কতদূর এগিয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, গ্রামে গঞ্জে নজিরবিহীন হরতাল পালন হয়েছে। কিশোরগঞ্জের আরমান ছাড়াও এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বেলাল নামে একটি ছেলেকে নাকি মিছিলে গুলি করে মারা হয়েছে, দুটো মৃত্যুই এখন তারা রাজনীতিতে ব্যবহার করছে। আরও জোর গলায় বলছে, বাংলার মাটিতে মুরতাদ নাস্তিক চক্রের ঠাঁই নেই।

ট তাঁর হাতের পত্রিকা থেকে মৌলবাদীদের পরবর্তী কর্মসূচী পড়ে শোনান। ২৯শে জুলাই তারিখে ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা কোরান দিবস পালন করবে। সারা দেশ থেকে মানুষ ঢাকায় লংমার্চ করে আসবে। দেশের ৪০ জন বিশিষ্ট আলেম এই লং মার্চ কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, ‘কোরানের ইজ্জত রক্ষায় এই লং মার্চ সফল করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কোরানকে নিয়ে তসলিমা ও জনকণ্ঠ গংরা যে হেলাফেলা শুরু করেছে তার প্রতিবাদে সোচ্চার না হলে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। নেমে আসবে আমাদের ওপর খোদায়ী গজব।’ হরতালের দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রেফতারকৃতদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় সারা দেশে এর প্রতিবাদে আগুন জ্বলে উঠবে। সরকারের ঘটবে পতন।

টকে আর এগোতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করি, এই একটি দলই কি লং মার্চ করছে?

ট পত্রিকাটি রেখে বললেন, আরও অনেক দল আছে সঙ্গে। জাতীয় নাস্তিক নির্মূল কমিটি..

ডডজাতীয় নাস্তিক নির্মূল কমিটি! তার মানে কেবল আস্তিকদের বাঁচার অধিকার আছে, নাস্তিকদের নেই।

ট হাসেন। ট যখন আমার দিকে তাকান হাসতে হাসতে, তাঁর চোখ থেকে টুপটুপ করে করুণা ঝরে পড়ে। এ সময় এমন একটা সময়, কেউ করুণ চোখে তাকালে নিজের ওপরই করুণা জন্মে। নিজেকে সবার চেয়ে আলাদা মনে হয়। আমি আর সবার মত নই, আমি পাপী তাপী, আমি নষ্ট ভ্রষ্ট। কেউ কি আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ভাবতে পারবে কেমন লাগছে আমার! আসলে মরতে হলে, মরছি যে তা না জেনে মরাই ভাল। হুট করে যারা মরে যায়, তারা সত্যিই ভাগ্যবান। দীর্ঘদিন যদি নিজেকে জানতে হয় বুঝতে হয় যে মরছি মরছি, এই মুহূর্তে মরছি, পর মুহূর্তে মরছি। তবে প্রতিটি মুহূর্তই এক একটি মৃত্যুর মত দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। কে চায় এত অসংখ্য মৃত্যু!

সাত জুলাই, বৃহস্পতিবার

ট তাঁর বৈঠক ঘরের দরজা বন্ধ করে কথা বলেন। একা তিনি, কথা কার সঙ্গে বলেন তবে! অনুমান করি তিনি ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন। ফোন বাজেনি, কিন্তু কথা বলছেন ফোনে। এর অর্থ চাবি দিয়ে তালাটি খুলে তিনি কথা বলছেন। ট যে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন ফোনের চাবি হারিয়ে গেছে, সেটি বলে তাঁকে লজ্জা দিতে ইচ্ছে করে না। আমি যেন শুনিনি ফোনে তিনি কথা বলছেন, যেন বুঝতে পারিনি কিছু, এমন ভাব করে থাকি যখন তিনি দরজাটি খুলে আমাকে ডাকেন ওই ঘরে, এবং আমি যাই। তিনি আমাকে বলেন, একা একা বসে থাকতে খারাপ লাগলে আমি যেন এ ঘরে এসে বই টই পড়ি। আমাকে ও ঘরে বসিয়ে তিনি কতগুলো ছবি তুললেন। ছবি তোলা তাঁর শখ। বেশ ভাল ছবি তোলেন। বড় বড় ক্যামেরা আছে তাঁর। ট মানুষটি খুব আধুনিক। ঘরে তাঁর একটি কমপিউটার আছে, ওতে তিনি ইলেকট্রনিক মেইলএর একটি ব্যবস্থা করতে চাইছেন। লন্ডনে তাঁর বান্ধবীর কাছে সেকেণ্ডের মধ্যে তিনি চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারেন। আবার পৃথিবীর যে কোনও দেশ থেকেও তাঁর কাছে এক সেকেণ্ডেই কোনও খবর বা চিঠি চলে আসতে পারে। আজকাল নাকি মানুষের মধ্যে যোগাযোগের পথ আশ্চর্য রকম সহজ হয়ে যাচ্ছে।

দুপুরে ভাত নিয়ে নীলাম্বরী রুমানা আসেন। রুমানা টর বান্ধবীর বান্ধবী, আবার করও বান্ধবী। রুমানা খুব অসংকোচে নিজের জীবনের কথা বলেন। বিয়ে করেছিলেন, স্বামী তাঁকে আরও লেখাপড়া করতে দিতে চায়নি, চাকরি করতে দিতে চায়নি। স্বামী চাইত তার আদেশমত স্ত্রী চলবে। শেষে তিনি স্বামীকে তালাক দিয়ে নিজে এখন একা থাকেন। একটি ইশকুলে পড়ান। বেশ ভাল আছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতা তাঁকে অস্থির করে, কিন্তু তবুও তো তিনি কারওর দাসী বাদি হয়ে জীবন যাপন করছেন না, এটিই অনেক বড় তৃপ্তি তাঁর। একটি জিনিস লক্ষ করেছি

আমার জীবনের কোনও গল্প শুনতে কেউ ইচ্ছে প্রকাশ করে না। সম্ভবত এ কারণেই করে না যে তারা পত্র পত্রিকায় পড়েছে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী অথবা কারও মুখে শুনেছে, সুতরাং তাদের জানার আর কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু যা পড়েছে বা শুনেছে তা সত্য কি না, তাও কেউ একবার যাচাই করতে চায় না। আমার মনে হয় চায় না এই জন্য যে মনে করে আমি অস্বস্তি বোধ করব, যেহেতু আমার জীবনে একাধিক সম্পর্কের ঘটনা আছে। অনেকে, যারা আমার পক্ষের লোক, তারাও আমার ব্যক্তিজীবন নিয়ে এমনই অস্বস্তিতে পড়ে যে তারা আমার পক্ষে তর্ক করতে গিয়ে বলে, ব্যক্তিজীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির দরকার কি, ব্যক্তিচরিত্র যেমনই হোক, এক জন লেখকের বিচার হবে কেমন সে লেখে তা দিয়ে। ব্যক্তি জীবনে, যেহেতু আমি একাধিক বিয়ে করেছি, তাই আমার চরিত্র ভাল নয়, এ ব্যাপারটি মনে মনে আমার অনেক পক্ষের লোকেরাও মানেন। চরিত্র খারাপ হলেই একটি মেয়ে একাধিক বিয়ে করে এই ধারণাটি আমাদের বড় বড় প্রগতিশীলদের মস্তিষ্কের একটি গোপন কোণে অজান্তে লুকিয়ে থাকে। যারা আমার লেখার পক্ষে অন্যের সঙ্গে তর্ক করে, কাউকেই আমার ব্যক্তিজীবনের পক্ষে, আমার পুরুষ-সম্পর্কের পক্ষে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে শুনিনি।

আজ রুমানা আমার কাছে অবলীলায় তাঁর নিজের জীবনের কথা বলেছেন এর পেছনে দুটো কারণ আছে বলে আমার মনে হয়, একটি হল আমি নির্যাতিতা মেয়েদের পক্ষে লিখি, তাই তিনি ভেবেছেন আমার সঙ্গে আধ ঘন্টার পরিচয়েই বলে ফেলা যায় তাঁর জীবনের গোপন সব কথা। আর একটি কারণ, যেহেতু আমিও তালাক দিয়েছি আমার স্বামীকে, তাই আমি তাঁর নিজের তালাকের ঘটনা শুনে জিভ কেটে বলে উঠব না, কি কাণ্ড কি কাণ্ড। তালাক ব্যাপারটিকে অতি স্বাভাবিক একটি ব্যাপার বলেই মেনে নেব। রুমানা তাঁর নিঃসঙ্গতার কথাও বলেন। নিঃসঙ্গতার কারণে তাঁর অস্থিরতার কথা। এটিকেও তিনি, আমার ধারণা, ভেবেছেন, নিঃসঙ্গতা বোধ আমারও আছে, ফলে আমি তাঁর নিঃসঙ্গতার রূপটি বুঝতে পারব। রুমানার প্রতিটি শব্দ আমি মন দিয়ে শুনি। কত কত মেয়ের কথাও তো এমন শুনেছি। আমাকে যে মেয়েরা তাদের ব্যক্তিগত কষ্টের কথা, দুঃখের কথা, যন্ত্রণার কথা, জীবনের পরাজয়ের কথা নিঃসঙ্কোচে বলে যায়, জানি তারা আমার কাছে কোনও একটি উত্তর চায়, কি করবে জীবনে, কী তাদের করা উচিত তার পরামর্শ চায়। কিন্তু আমি তো পরামর্শ দিতে পারি না। রহিমা সিদ্দিকীর সংসার সুখের ছিল না, তাঁর পাশা নামের স্বামীটি বড় বিচ্ছিরি চরিত্রের ছিল, স্বামীর যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রহিমা সিদ্দিকী যখন জিজ্ঞেস করতেন আমাকে, নাসরিন এখন বল আমি কি করব! আমি খুব বিপদে পড়তাম। জানি অন্য অনেকে এসব ক্ষেত্রে খুব চমৎকার চমৎকার পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু আমি পারি না। আমার কেবল মনে হত, রহিমা সিদ্দিকীকে আমি বলে দেবার কে তিনি কি করবেন! তিনি নিজেই বুঝবেন তিনি কি করবেন। তাঁর যা ইচ্ছে করে তাঁর তো তাই করা উচিত। অনেকে যারা সমস্যার সমাধান চাইত, বলতাম, তোমার বা আপনার যা ইচ্ছে করে তাই কর বা করুন। আমার উত্তর কাউকে খুব সুখী করেছে বলে আমার মনে হয়নি।

রুমানা আমার কাছে কোনও পরামর্শ চান না। লুকিয়ে থাকা মানুষ সাধারণত দুর্বল হয়, দুর্বল মানুষের কাছে কেউ পরামর্শ চায় না। আমি নিজেই তো পরামর্শ চেয়ে বেড়াচ্ছি এখন। যেমন ক-কে পেলেই জিজ্ঞেস করি, কি করব? ক-কে আমার খুব শক্তিমান বলে মনে হয়। ক বলেন, 'পালিয়ে যান, অথবা লুকিয়ে থাকুন। আপাতত এ দুটো ছাড়া আপনার আর করার কিছু নেই।' আমার ইচ্ছে এখন এমনই সীমিত যে আমার যা ইচ্ছে করে তা আমি করতে পারি না। আমার এখন মনে হয়, মেয়েরা যখন পরামর্শ চাইত আমার কাছে, তাদের ইচ্ছেও খুব সীমিত থাকত বোধহয়। যা ইচ্ছে তাই করতে কজন মেয়ে আর পারে।

রুমানার সঙ্গে আমার সারাদিন কেটে যায়। কাল রাতে তিনি দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সেঁটেছেন বন্ধুদের নিয়ে। ফতোয়াবাজ নিপাত যাক স্লোগান লেখা পোস্টার। রুমানার মত আমারও ইচ্ছে করে পোস্টার সাঁটতে, মিছিলে যেতে। আমারও ইচ্ছে করে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের একজন কেউ হতে। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই।

আট জুলাই, শুক্রবার

আজ দুপুরে খাবার নিয়ে জ-র কন্যা এল। দুশ্চিন্তাগুলোকে আপাতত দূরে সরিয়ে জীবনের ছোটখাটো জিনিস নিয়ে যদি মগ্ন হতে পারতাম! কিন্তু কি করে তা সম্ভব। জর কন্যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারবার আনমনা হয়ে পড়ি। মন স্থির হতে পারে না কোথাও। ভেতরে তুমুল তুফান নিয়ে বাইরে স্থবির বসে থাকতে হয়, এমনই স্থবিরতা যে একটু বাতাসও বয় না ভুল করে। জর কন্যার মুখে কুয়োকাটার গল্প শুনি, শুনতে থাকি, মন কিন্তু আমার কুয়োকাটায় নয়, মন বায়তুল মোকাররমে, মন পল্টনে, মন মিছিলে, মিটিংএ। রাতে ঙ এলেন। দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন তিনি। ভয়াবহ অবস্থাই বটে। জামাতে ইসলামীর সমাবেশ হয়েছে। ধর্মদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, নাস্তিক ও মুরতাদদের শাস্তির দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জামাত। পল্টনের বিশাল সমাবেশে মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, 'দেশ আজ দুই দলে বিভক্ত। একদল কোরানের পক্ষে, অন্যদল বিপক্ষে। কোরানের বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে বিএনপি ধর্মপ্রাণ ভোটারদের সমর্থন পাবার অধিকার হারিয়েছে। তাদের কাজের এই ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হবে। যে ক্ষুদ্রগোষ্ঠী ইসলাম ও কোরানের বিরুদ্ধে বলছে ও লিখছে তারা দেশ, জাতি ও সংবিধান বিরোধী। বাক স্বাধীনতার অজুহাত তুলে এরা ধর্মের বিরুদ্ধে বলছে। পৃথিবীর কোথাও এমন নজির নেই। বিএনপি সরকার এদের দমন করতে ব্যর্থ। তারা এক্ষেত্রে অদক্ষতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। আমি তাদের পরিস্কার ভাষায় আরেকবার সতর্ক করে বলতে চাই, এর পরিণাম ভাল হবে না। এর

জন্যে তাদের বড় ধরনের মূল্য দিতে হবে। সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫২টি এনজিওর বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সরকার এ ক্ষেত্রেও স্পষ্ট ভূমিকা রাখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তারা যদি ব্যর্থতার এই ধারা বজায় রাখে তবে তাদের পক্ষে বেশিদিন আর ক্ষমতায় টেকা সম্ভব হবে না। .. কোরান না থাকলে আমরা থাকি না। আমরা কোরানের মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছি। দেশে যারা ধর্মদ্রোহিতা করছে আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধে নই বরং তাদেরকে আন্তর্জাতিক যেসব মুরুব্বি নাচাচ্ছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধেও। .. বিএনপির মধ্যে ওৎ পেতে থাকা রাম ও বামপন্থীরা বার বার মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। সরকার এসব ট্যাকল করতে না পারলে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার।' বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মতিউর রহমান নিজামি, মাওলানা আবদুস সোবহান (দুজনই সংসদ সদস্য), মুহম্মদ কামরুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা, জসিম উদ্দিন সরকার, সাইফুল ইসলাম খান মিলন, আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ ইত্যাদি লোকজন।

ইসলাম ও কোরানের অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবিতে ১৩টি সংগঠনের সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়েছে। এই পরিষদে আছেন তাঁদের দলবলসহ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক, নারিন্দার পীর সাহেব, ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চার আহবায়ক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মহাসচিব ফজলূল হক আমিনী, এনডিওর সেক্রেটারি আনোয়ার জাহিদ, ফ্রিডম পার্টির সেক্রেটারি প্রাক্তন জেনারেল মেজর বজলুল হুদা, খেলাফত মজলিশের অধ্যাপক আখতার ফারুক, জাগপার সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মাওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দিন, মুসলিম লীগের এডভোকেট মোহাম্মদ আয়েনউদ্দিন, নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি আশরাফ আলী, পিএনপির সভাপতি শেখ শওকত হোসেন নীলু, ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি গোলাম নাসির, যুব কমাণ্ডের সদস্য সচিব আবু নাসের মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ। সংগ্রাম পরিষদ থেকে সম্মিলিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জোট ভুক্ত কোনও সংগঠন এককভাবে কোনও কর্মসূচী গ্রহণ করবে না। কিসের জন্য সংগ্রাম? সংগ্রাম হচ্ছে ইসলাম ও কোরানের অবমাননাকারীদের শাস্তি প্রদান, ব্লাসফেমী আইন প্রবর্তন, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা, ধর্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী ও একশ্রেণীর এনজিওর অপতৎপরতা প্রতিরোধ, ভারতীয় আগ্রাসন ও বিজাতীয় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ। ১৪ ও ২৯ জুলাইয়ের সম্মিলিত কর্মসূচী সফল করার জন্য মূল প্রতিনিধিদের এক জরুরি সভা আগামীকাল সন্ধে সাতটায় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। সভা ও বিক্ষোভ আগের মতই চলছে। দেশব্যাপী। খেলাফত ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় নাস্তিক নির্মূল কমিটি, মুসলিম ব্রিগেড, ইসলামিক পার্টি, বাংলাদেশ ইমাম উলামা পরিষদ, মুসলিম লীগ, ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন, সত্য সন্ধানী আন্দোলন ইত্যাদি দল এখন রীতিমত ব্যস্ত।

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের টনক নড়েছে এতদিনে। বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার সঙ্গে মৌলবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এদেশের মানুষ মৌলবাদী হতে পারে না। ধর্মান্ধতা ও ফতোয়াবাজির কারণে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে এবং এতে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এসব নিয়ে বাড়াবাড়ির পরিণাম ভাল হবে না।' সাইফুর রহমানের টনক এইজন্য নড়েছে যে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নাকি

আর টাকা বিনিয়োগ করতে চাইছে না এ দেশে। মৌলবাদীরা দেশকে যে অচল করে ফেলছে তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দিব্যি বলে দিলেন যে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এ দেশে তো ধর্ম কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। ধর্ম এখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, ধর্ম এখানে আইনের ব্যাপার।

আজকের কাগজের খবর, বাংলাদেশে মৌলবাদীদের সহিংসতার কারণে গত দু মাসে ৮টি বিদেশি কোম্পানী বিনিয়োগ না করে ফিরে গেছে। এরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে এসেছিল কিন্তু মৌলবাদী তৎপরতার কারণে তারা পরিবেশ অনুকূল নয় বলে চলে গেছে। এর মধ্যে তিনটি ছিল জাপানি প্রতিষ্ঠান। এরা বাংলাদেশে যৌথভাবে ইলেকট্রনিক শিল্পের সম্ভাবনা যাচাই করতে এসেছিল। বৃটিশ কোম্পানী ম্যাক্সওয়েলের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এসেছিলেন যৌথ উদ্যোগে গার্মেন্টস স্থাপনের চিন্তা মাথায় নিয়ে। একই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল একটি জার্মান কোম্পানী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেভিয়ার্স কোম্পানীর এক কর্তা এসেছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করতে। এ সময় বাংলাদেশে একের পর এক মৌলবাদী তৎপরতা,প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি, পত্রিকা অফিসে হামলার ঘটনায় ওঁরা বিস্মিত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের ঘটনা কি করে ঘটছে এই প্রশ্ন ওঁরা করেছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে। মার্কিন কর্তাটি এসেছিলেন ৩০ জুনের হরতালের দিন। ঐদিন সারা বেলা ওঁকে সফরসঙ্গীদের দিয়ে বিমানবন্দরে কাটাতে হয়েছে। পরে মার্কিন দূতাবাস থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পরের ফ্লাইটে তিনি চলে গেছেন। সোনার গাঁ হোটেলে তাঁর হোটেল বুকিং ছিল ১১ জুলাই তারিখ পর্যন্ত। ওটা তিনি বাতিল করে দেন। বিভিন্ন দূতাবাসগুলোতে যখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা খোঁজ নিচ্ছেন তখনই তাঁরা জানছেন বাংলাদেশের ফতোয়ার ঘটনা, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক পত্রিকা অফিসে হামলার ঘটনা, সরকার কর্তৃক এনজিও বিরোধী আইন তৈরির চেষ্টার খবর। এসব জেনে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন।

রাতে শুতে যাবার আগে কর দিয়ে যাওয়া প্লাস্টিকের ব্যাগে যে তোয়ালে ছিল, সেটি ভেজা হাত মুখ মোছার জন্য তুলতে গিয়ে দেখি ভেতর থেকে টুপ করে একটি কাগজ পড়ল পায়ের ওপর। কাগজটি একটি চিঠি। ছোট্ট চিঠি। ইয়াসমিনের লেখা। *বুবু, কোথায় আছো কেমন আছো কিছুই জানি না। যেখানেই থাকো, বেঁচে থেকো। কতটুকু ভাল থাকতে পারবে তা জানি না। এই সময়ে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি। একটা কথা মনে রেখো, আমরা সবাই সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবছি। আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালবাসি বুবু।*

রাতে শুয়ে কোনও ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করি। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। একটি গোঙানোর শব্দ আমি ভেতর থেকে বেরোতে থাকে। *বাড়ি যাবো বাড়ি যাবো* বলে ভেতর থেকে শিশুর মত একটি কান্না উথলে উঠতে থাকে। কান্নাটিকে থামাই, গোঙানোকে থামাতে পারি না। শব্দ শুনে ট এলেন আমার ঘরে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা আমার শিয়রের কাছে বসে আমার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

নয় জুলাই, শনিবার

আজ দুটো ভাল খবরের দিকে চোখ পড়ল সকালবেলাতেই। আজ থেকে বামফ্রন্টের প্রতিরোধ পক্ষ শুরু হচ্ছে। দাবিগুলো হচ্ছে, ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ, নারী অধিকার, শিক্ষাস্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী, মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মৌলবাদী ফতোয়াবাজদের আক্রমণ প্রতিরোধ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর খবরদারি বন্ধ, গ্যাট চুক্তি, কালো আইন কালো টাকার দৌরাত্ম্য বন্ধ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধ, শিল্প কৃষি রক্ষা, শ্রমিক কৃষকসহ শ্রেণী পেশার ন্যায্য দাবি আদায় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন। এক এক দিন, বামফ্রন্ট ঘোষণা দিয়েছে, এক এক জায়গায় সভা করবে। বেশ ভাল।

দ্বিতীয় খবরটি নিউইয়র্ক টাইমসএর সম্পাদকীয়। মৌলবাদীদের কাছে বাংলাদেশ সরকারের আত্মসমর্পণ লজ্জার কথা। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম মৃত্যুর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা। লেখা হয়েছে, তসলিমা নাসরিনের লজ্জা এবং সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার কথিত অবমাননাকর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি ফুঁসে ওঠে। ঐ শক্তি লেখিকার ফাঁসি দাবি করে। এমনকি একজন ধর্মীয় নেতা তাঁর খন্ডিত মুণ্ডুর জন্য আড়াই হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে। উগ্রপন্থী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তসলিমা নাসরিনের নারীবাদী মতামতকে ইসলাম ধর্মের সরাসরি অবমাননা বলে মন্তব্য করে। সরকার সাম্প্রদায়িক শক্তির দাবি অনুযায়ী তাঁর লজ্জা উপন্যাস নিষিদ্ধ করে। সম্প্রতি একটি আদালত লেখিকার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ফলে লেখিকা আত্মগোপন করেন।

আমার ঘটনার সঙ্গে সালমান রুশদির ঘটনার তুলনা করা হয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসে। সালমান রুশদির ঘটনাটি ফতোয়ার ঘটনা ছিল, একটি বই ছিল সে ঘটনার মূলে। পশ্চিমা সাংবাদিকরা এখানেও একই দৃশ্য দেখতে চাইছেন। কিন্তু দৃশ্য এক নয়। লজ্জা বইটির ঘটনা অনেক আগেই ঘটে গেছে। সরকার সে বই নিষিদ্ধ করেছে মাত্র। লজ্জার সঙ্গে আমার মাথার মূল্য ধার্য করা বা আমার ওপর ফতোয়া জারির ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। আর এখন দেশ জুড়ে যে তাণ্ডব চলছে, এর সঙ্গে লজ্জা বা ফতোয়ারও কোনও সম্পর্ক নেই। একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনা ঘটাতে ইন্ধন যুগিয়েছে বলা যায়, কিন্তু কোনও কারণ যোগায়নি। নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, ‘আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই বিশেষ মুহূর্তে মুক্ত চিন্তা চেতনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নির্বাক করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইরানের তৎকালীন ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি সে সময় ইসলামী বিপ্লবোত্তর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার অস্ত্র হিসেবে দি স্যাটানিক ভার্সেসকে ব্যবহার করেন।’ মিশরের একজন মানবাধিকার কর্মীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ‘মিশরে শিল্পী ও লেখকদের মৌলবাদীরাই শুধু নাস্তিক বলে না, সাংসদরাও এই উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সুর মেলায়।’ সম্পাদকীয়তে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে বাংলাদেশের সরকারের আত্মসমর্পণকে এক কথায় লজ্জা বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরিশেষে লেখিকার

নিরাপদ দেশত্যাগ নিশ্চিত করতে নরওয়ের উদ্যোগের প্রশংসা করে নিউইয়র্ক টাইমস।
এই হল খবর।

দুপুরে খাবার নিয়ে আজও রুমানা এলেন। ঙ এলে রুমানা গেলেন। ঙ আমার জন্য কাগজে মুড়ে প্যাকেটে ভরে একটি জিনিস এনেছেন। জিনিসটি তিনি আমার হাতে দেন না। আমাকে তিনি আয়নার সামনে নিয়ে দাঁড় করালেন। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে প্যাকেট থেকে জিনিসটি বের করে আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। পিঠ অবধি পড়ছে লম্বা কালো চুল, নকল চুল। ঙ হেসে বললেন, 'বাহ, দেখেছো, কোনও উপায় নেই তোমাকে চেনার। মুখে আরও রং লাগিয়ে দিলে আরও চেনা যাবে না।' ঙ আমার জন্য উপহার এনেছেন নকল চুল। ভয়ে আমার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে। তবে কি আমাকে পালিয়েই যেতে হবে দেশ থেকে! আর কোনও উপায় নেই বেঁচে থাকার!
ধরা গলায় বলি, কোত্থেকে পেয়েছেন এটি?
কিনেছি।
জানি, জেনেও জিজ্ঞেস করি, কেন কিনেছেন চুল?
ঙ বললেন, ইন কেইস।
আমি তো চোরের মত পালাবো না। আমি এই চুল পরব না কোনওদিন। যা হয় হবে। গলায় আমার কান্না, ক্রোধ, লজ্জা, ভয়।
ঙ কারও সঙ্গে রঙ্গ করার লোক নন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের তিনি একজন। গম্ভীর মানুষ। ভেবে চিন্তে কথা বলেন। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ রচনা করেন। ঙ একটি লম্বা চুল কিনে এনেছেন আমার সঙ্গে মজা করার জন্য নয়। চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর সুনাম এ দেশে অনেক। যারা চেনে তাঁকে, তিনি সামনে পড়লে তারা মাথা নুয়ে হাঁটে। তিনি যখন নকল চুল এনেছেন, নিশ্চয়ই ভেবে এনেছেন। কর চেয়ে অনেক বয়স্ক তিনি। অভিজ্ঞতা তাঁর অনেক। ঙর পরামর্শ ছাড়া ক এখন কোনও কাজ করেন না। ক আইন নিয়ে ভাবেন, নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন আমার উকিলের সঙ্গে। ঙ ভাবেন সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে। আমার সারা গায়ে লতিয়ে লতিয়ে একটি ভয় উঠে আসে। মাথা নুয়ে বসে থাকি। সামনে চুল।
আজ রাতে ট ফিরবেন না বাড়িতে। তাই ক তাঁর গাড়িচালক বন্ধুকে নিয়ে এখানে চলে এসেছেন। রাতে থাকবেন। ক লিফলেটটি দেখালেন, যেটি ছেপেছেন। শহরে হাজার হাজার লিফলেট ছড়িয়ে দিয়েছেন। দু পৃষ্ঠায় ছাপা এই লিফলেট। দুপৃষ্ঠাতেই স্কেচ আছে। মেয়েরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। আর একদিকে কটি টুপিদাড়িঅলা লোকের স্কেচ, তাদের প্ল্যাকার্ডে লেখা, *যে সকল বেপর্দা মহিলা কাজ করিয়া আয় করে তাহারা কাফের।* আরেকটিতে লেখা *মহিলাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া! ইসলাম অমান্য করার সাহস কার?* লিফলেটটির ওপরে লেখা *নারী পুরুষ এক হও,* নিচে লেখা *ফতোয়াবাজদের প্রতিরোধ কর/ সচেতন দেশবাসী।* ভেতরে আমার টুকরো টুকরো স্লোগানগুলো।

ফতোয়াবাজি দূর না হলে নারী মরবে ঘরে ঘরে
ফতোয়াবাজির ধ্বংস ডাকো সুস্থ সবল অন্তরে।

নারীর জন্য নিরাপত্তা, বেঁচে থাকার সমাজ চাও?
ফতোয়াবাজির কালো থাবা ভেঙে তবে গুঁড়িয়ে দাও।

মোল্লাদের মিশন কি? রগ কাটার রাজনীতি।
দেশ বানিয়ে গোরস্থান আনবে তারা পাকিস্তান।

টারগেট ওদের স্পষ্ট খুব, আজ তসলিমা, কাল আমি
রুখতে ওদের না পারলে প্রগতিবাদীর বোকামি ।

তসলিমাকে ছোবল দিচ্ছে মৌলবাদী সাপ
সময় আছে হঠাও এদের, একাত্তরের পাপ
সুযোগ বুঝে সমাজটাকে ধ্বংস করে যাবে।
মুক্তি কারো নাই,
এই সাপই কিন্তু আজ আমাকে, কাল তোমাকে খাবে।

এরা নিচ্ছে একাত্তরে পরাজয়ের শোধ
জাগো মানুষ রুখে দাঁড়াও, এদের কর রোধ।

ধর্ম নিয়ে মাতম করা অধার্মিকের ছল,
এদের এখন মুখোশ খোল,
দেশের সব বিবেকবান যুক্তিবাদী দল।

ক মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে খুবই ব্যস্ত, তা আমি অনুমান করি। বন্ধুটির সঙ্গে তিনি আরও লিফলেট পোস্টার ইত্যাদি ছাপার কথা আলোচনা করলেন। কিভাবে লিফলেট বিলি হবে, কে কখন পোস্টার সাঁটবে দেয়ালে, সব তিনি হিসেব করে নিচ্ছেন। ক র এই উদ্দীপনা আমাকে মুগ্ধ করে। আমাকে যদি আজ লুকিয়ে থাকতে না হত, আমিও হতে পারতাম আন্দোলনের একজন, লিখতে পারতাম শক্ত শক্ত কলাম।

ক কে বলি ঙর দেওয়া আনা পরচুলার কথা। ক জানেন যে ঙ আমার জন্য নকল চুল এনেছেন।

ডডকিন্তু চুল কেন, আমার কি জামিন হবে না?

ক মাথা নাড়েন, তিনি জামিনের ব্যাপারে কিছু জানেন না।

ডডডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে কি আপনার কোনও কথা হয়নি? তিনি কি কোনও আশা দেননি? তিনি তো বলেছিলেন জামিনের জন্য চেষ্টা করছেন। জামিন হবে এরকম তো আশাও দিয়েছিলেন!

ক চুপ করে শুনলেন আমার কথা। তারপর ধীরে, মাথা নেড়ে, বললেন আমাকে শান্ত হতে। বললেন যে আমার উকিল আমাকে কোনও পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন না।

সবকিছুই এখন নির্ভর করছে আমার নিজের সিদ্ধান্তের ওপর। কামাল হোসেনকে যদি আমি বলি যে যে করেই হোক আমি এখন জামিন চাইতে যাবো হাইকোর্টে, তিনি কোনও আপত্তি করবেন না। তিনি চেষ্টা করবেন হাইকোর্টে আমাকে দাঁড় করিয়ে জামিনের জন্য আবেদন করতে। কিন্তু কাজটি করা আমার উচিত হবে না। কারণ ওখানে যাওয়ার ঝুঁকিটি বোঝা না গেলেও খুব বড় ঝুঁকি। জামিনের চেয়ে জীবন বড়। এটুকু বলে কিছুক্ষণ থেমে ক আবার বললেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে হাইকোর্টে আমার উপস্থিতি নিরাপদ নয়। সুতরাং আমার উকিল যদ্দিন না নিশ্চয়তা পাচ্ছেন যে আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে জামিন দেওয়া হবে ততদিন তিনি এগোবেন না। তাঁর এগোনো উচিত নয়। জীবনের ঝুঁকি আছে এমন কাজ তিনি করবেন না। যদি আমাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, জামিনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তবেই তিনি ঝুঁকিটি নিতে পারেন। তবেই নেওয়া উচিত। এটুকু বলে, দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে ক বললেন, আপনার উকিল আপনার জামিনের চেয়ে আপনার জীবনের কথা বেশি ভাবছেন।

আমি পা গুটিয়ে হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে থাকি।

ক আর কর বন্ধু রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে ওঠেন। আলোচনায় একটু ওঁরা বিরতি দিলেই আমি জিজ্ঞেস করি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নাকি আমার কথা বলেছেন। নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি কথা বলছেন সরকারের সঙ্গে!

ক বললেন, ওগুলো তো বেশ পজিটিভ দিক। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে শুরু করে বিদেশের হেন কোনও প্রগেসিভ অরগানাইজেশন নেই যে আপনার জন্য আন্দোলন করেনি। তবে লাভ কী হয়েছে? এখন আমেরিকা আর ইউরোপ চাপ দিতে পারে বাংলাদেশকে আপনার মুক্তির ব্যাপারে। কিন্তু মুক্তিটা পাবেন কি করে? বিদেশের পত্রিকায় আপনাকে ডাকা হচ্ছে ফিমেল সালমান রুশদি বলে। কিন্তু আপনার অবস্থা তো সালমান রুশদির মত নয়। সালমান রুশদি ইরানে ছিলেন না। তিনি বৃটেনের মত দেশে ফতোয়া জারির সঙ্গে সঙ্গে হাই সিকিউরিটি পেয়ে গেছেন বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে। আপনি কোথায় বসে আছেন, জানেন? প্রতিদিন এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আপনাকে খুন করতে চাচ্ছে। আপনি বসে আছেন সবার মাঝখানে। কেবল চারইঞ্চি দেয়ালের আড়াল আপনার আর তাদের মধ্যে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি করে বাঁচাবে আপনাকে? আপনার দেখা কি করে পাবে? ইউরোপের মন্ত্রীরা আপনার খোঁজ পাবে কি করে? আপনিই বা তাদের সঙ্গে দেখা করবেন কিভাবে? বারো কোটি লোক এ দেশে বাস করে। আপনাকে কি করে উঠিয়ে নেবে কোথা থেকে? এরকম কত লোকের মুক্তির জন্য আমেরিকা ইওরোপের প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টাররা বলেছে, কিন্তু ওই বলাই সার। বলতে হয় বলে বলা। এতে তো ওদের সত্যিকার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আপনি মরে গেলে ওদের বয়েই গেল। বসনিয়ায় যা হচ্ছে, তা কি কেউ বলে কয়ে ধমক দিয়ে থামাতে পারবে? এ দেশের সরকার মৌলবাদীদের নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে এখন ফেঁসে গেছে। সরকার এখন গদি বাঁচাবে, আগামী নির্বাচনে জেতার জন্য দেশে পলিটিক্যাল ফিল্ড তৈরি করবে না কি নিজেদের নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা সব ধ্বংস করে

আমেরিকার অনুরোধ রক্ষা করবে! আমেরিকা ওরকম সুন্দর সুন্দর অনেক উপদেশ দেয়। মানবাধিকারে বিশ্বাস করে আমেরিকা, তা মানুষকে শোনানোর জন্যই শোনায়। কিন্তু সত্যিই কতটুকু বিশ্বাস করে, তা দেখার বিষয়। দাদাগিরি করতে হয়, তাই করা। যান না এখন অ্যামবেসিতে! আশ্রয় দেবে ভেবেছেন? না, দেবে না।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

ক বলেন, আপনাকে এখন সিরিয়াসলি ডিসিশান নিতে হবে কি করবেন। আরেকটা কথা ভেবে দেখবেন, লুকিয়ে থাকতে আপনি কতদিন পারবেন! নিরাপদে লুকিয়ে থাকার একটা পিরিয়ড আছে। পিরিয়ডটি খুব দীর্ঘ নয়। আপনাকে বাড়ি পাল্টাতে হচ্ছে, যত বাড়ি পাল্টানো হয় তত মানুষ ইনভলভড হয় বেশি। যত বেশি মানুষ ইনভলভড হয়, তত বেশি জানাজানি হয়। এক জায়গায় না থেকে মুভ করা নিরাপদ একদিকে, আরেকদিকে কিন্তু ঝুঁকি। সব অবস্থা আপনাকে জানালাম। আগেও জানিয়েছি। এখন আপনি ডিসিশান নেবেন।

ক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রাত হয়েছে অনেক, এবার ঘুমাতে যান বলে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আমার জন্য বরাদ্দ ঘরটিতে। বিছানায় আমি শুয়ে থাকি। অন্ধকারের দিকে বিষণ্ন তাকিয়ে থাকি। সারারাত। সারারাত ঘুমের নামগন্ধ নেই।

দশ জুলাই, রবিবার

ছাত্র ইউনিয়নের সেমিনার হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়, ফতোয়াঃ রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। কে এম সোবহান বলেছেন, সত্তর দশকে পুঁজিবাদী বিশ্ব আবিষ্কার করে সমাজতন্ত্র ঠেকানোর জন্য মৌলবাদের চেয়ে অব্যর্থ অস্ত্র আর নেই। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, বিএনপি জন্মের পর থেকেই মৌলবাদীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। এটা ছিল বিএনপির বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ। কিন্তু দুঃখ এই যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একটি দল রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের নামে জামাতের সঙ্গে বসে আলোচনা করছে। ফতোয়াবাজির উদ্ভবের পেছনে রাষ্ট্রীয় মদদ ও সরকারি রাজনীতি, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন, উপমহাদেশের সাম্প্রতিক মৌলবাদী রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা, ধর্মান্ধতা, বাম রাজনীতির ব্যর্থতা, ইংরেজদের ডিভাইড এণ্ড রুল নীতির কারণে পাকিস্তান নামের মৌলবাদী রাষ্ট্রের উত্থান প্রভৃতি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

এছাড়া গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য আজ দেশব্যাপী ফতোয়াবাজ প্রতিরোধ পালন করা ঘোষণা দিয়েছে। এ তো গেল ঘরের ঘটনা। ঘরে বসে ঘোষণা দেওয়ার ঘটনা। ঘরের বাইরে কি ঘটছে? রাস্তায় কি ঘটছে? বড় বড় মাঠে ময়দানে ঘটছে কি?

সিলেটে ২৯ জুলাইএর লং মার্চ সফল করার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রারী ময়দানে ভাষণ দেন ইসলাম ও রাষ্ট্রদোহী প্রতিরোধ মোর্চার মহাসচিব মাওলানা ফজলুল হক আমিনী। বিশাল ময়দান, বিশাল জমায়েত, বিশাল ভাষণ। সিলেট ঘুরে এসে বিবৃতি দিয়েছেন, সিলেটসহ সারা দেশে যে গণজাগরণ দেখে এসেছি তাতে প্রতীয়মান হয় যে আগামী ২৯ জুলাই পবিত্র

কোরান দিবসে ঢাকায় তৌহিদী জনতার ঢল নামবে। সারা দেশ থেকে লাখ লাখ জনতা লং মার্চ করে ঢাকায় আসার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তৌহিদী জনতার ঈমানের জোয়ারে সেদিন নাস্তিক মুরতাদ চক্রের দাফন করা হবে। ৩০ জুন সফল হরতাল পালিত হওয়ার পর প্রায় ৯ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, অথচ সরকার আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেনি। এনজিওদের পক্ষে সরকারের কোন কোন মন্ত্রীর সমর্থন এবং আলেম উলেমাদের ঢালাওভাবে ফতোয়াবাজ আখ্যা দানে জনমনে আরও পরম ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারের এহেন ভূমিকা দেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনবে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের নিয়মতান্ত্রিকতাকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল হবে।

চট্টগ্রামে নেছারিয়া আলিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে শাহাদাতে কারবালা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে আজকে এক শ্রেণীর মুরতাদ নাস্তিক ধর্মদ্রোহী দেশ হতে ঈমানী আওয়াজকে বন্ধ করার জন্য এবং দেশকে একটি নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তসলিমার মত বেহায়া, নাস্তিক মহিলাকে এ কাজে লেলিয়ে দিয়ে কোরান হাদিস এবং দ্বীনি ধ্যান ধারণার ওপর নির্লজ্জ হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শাহাদাতে কারবালার দীপ্ত শপথ নিয়ে সকল ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের প্রতিহত করার আহবান জানিয়ে বক্তারা বলেন, ১২ কোটি ইসলামপ্রিয় মানুষ দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকল ইসলামদ্রোহীদের বিষদাঁত ভেঙে দেবেই।

আরও খবর। ঢাকা ভার্সিটির ২৬৫ জন ছাত্র ছাত্রীর বিবৃতি। তসলিমা নাসরিনকে অবিলম্বে গ্রেফতার করুন। আগ্রাসন প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির ছাত্র শাখার পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৫ জন ছাত্র ছাত্রী এক বিবৃতিতে স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও জাতীয় উজ্জীবন নিশ্চিত করার জন্য দেশে বিদেশে নিন্দিত, চরম সাম্প্রদায়িক, আমাদের এই রাষ্ট্র ও তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের শত্রু, ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বিজেপি, আনন্দবাজারীদের সেবাদাসী তসলিমা নাসরিনকে ধর্ম এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন এ লেখিকা দেশে বিদেশে মুদ্রিত তার লেখায়, সাক্ষাতকারে আলাপ আলোচনায় যে আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিবৃতিতে তিন দিনের মধ্যে তসলিমাকে গ্রেফতার ও তার সমর্থক পত্রিকাগুলোকেও নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে বলা হয়, আমরা অবিলম্বে উক্ত লেখিকার সমস্ত রচনার মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ ও অনুবাদ দেশে বিদেশে নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছি। তসলিমার মত রাষ্ট্রদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, ধর্ম ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বদ্রোহীকে প্রতিহত করে স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও জাতীয় উজ্জীবন অব্যাহত রাখার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে সচেতন ও দেশপ্রেমিক সকল ছাত্রছাত্রী ভাই বোনসহ সমগ্র জাতির প্রতিও আহবান জানাচ্ছি। বিবৃতি প্রদানকারীদের মধ্যে আছেন, মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ আবদুল লতিফ, মোঃ ইউছুফ আলী, মোঃ ছফিউল্লাহ, মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোঃ সেলিম রেজা, মোঃ ফজলুর রহমান, নার্গিস আখতার প্রমুখ।

ঢাকায় যুব কমান্ডের বিশাল সভায় বলা হয়েছে, ৩০ জুনের গণরায়কে পাশ কাটানোর পদক্ষেপ দেশবাসী মানবে না। ওদিকে দিনাজপুরে মুরতাদদের ফাঁসির দাবিতে জামাতে ইসলামীর ডাকে বিক্ষোভ দিবস পালন হয়। পবিত্র কোরান অবমাননাকারী ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। সকালে প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে, পরে জেলা প্রশাসককে ৮ দফা দাবির একটি স্মারকলিপি দেয় জামাতিরা।

এ সময় কী ঘটছে আমার জীবনে, কী হচ্ছে দেশে, তা পত্রিকার সংবাদগুলোই দেখিয়ে যাচ্ছে। আমি তো সারাদিন অন্ধকার ঘরে গা ঢেকে মাথা ঢেকে বসেই আছি।

বসে থাকতে থাকতে পিঠে খিল ধরে যায়, পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে। আমার তো আর বিশেষ কোনও খবর নেই। হঠাৎ হঠাৎ আমার বসে থাকার স্থবিরতায় কেউ কেউ তরঙ্গ তুলে উদয় হন। জ উদয় হলেন দুপুরবেলা। দেশের অবস্থা সম্পর্কে জর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা হওয়ার পর যখন চুপচাপ বসে আছি দুজনই একটি হতাশার দিকে তাকিয়ে, জ চুলের কথা তোলেন। ঙই নাকি জকে দিয়ে চুল কিনিয়েছেন। চুল! এই চুলটি কিছুতেই আসলে আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। ভূত হয়ে দিনরাতই ভয় দেখাচ্ছে। গভীর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় চুলের ভয়ে। চুলের প্রসঙ্গ আমাকে এত অস্বস্তি দিতে থাকে যে আমি প্রসঙ্গ পাল্টে দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছের দিকে নজর দিই। দেশের কথা বলতে বলতেই সুফিয়া কামালের প্রসঙ্গ ওঠে। জ সুফিয়া কামালের প্রশংসা করছেন কারণ এই এত বয়স হওয়ার পরও তিনি সভায় যাচ্ছেন, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহবান জানাচ্ছেন। সুফিয়া কামালকে তিনি খালাম্মা বলে সম্বোধন করেন। শুধু জ নন, সুফিয়া কামালের বয়সে ছোট সবাই তাঁকে খালাম্মা বলে, তিনি হয়ে গেছেন জাতীয় খালাম্মা। জাহানারা ইমামকে ডাকা হয় আম্মা বলে। আম্মা আর খালাম্মা ডাক আমার মুখ দিয়ে কখনও বেরোয়নি। আমি পারি না হঠাৎ কাউকে আম্মা বলে ডাকতে। ওসব ডাকলেই যে সম্মান দেখানো হয়, না ডাকলে হয় না, তা আমি মানি না। সুফিয়া কামালকে সুফিয়া কামাল ডেকেই আমি যথেষ্ট সম্মান করতে পারি। তিনি জাতীয় সমন্বয় কমিটির এক সভায় মানুষকে বলেছেন, আল্লাহর নাম নিয়ে জেগে উঠুন, মৌলবাদীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করুন। সুফিয়া কামাল নিজে খুব ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, তিনি তাঁর বিশ্বাস থেকেই মানুষকে আল্লাহর নাম নিয়ে জেগে উঠতে বলেছেন। আল্লাহর নাম নিয়ে মৌলবাদীরা জাগে, এখন আল্লাহর নাম নিয়ে অমৌলবাদীদেরও জাগতে হবে! সাম্যবাদের নাম নিয়েও তো জাগা যায়, অসাম্প্রদায়িকতার নাম নিয়েও তো যায়, মানবতার নাম নিয়েও তো যায়। কেন আল্লাহর নাম নিয়ে জাগতে হবে! আল্লাহ কি কোনও অসাম্প্রদায়িক কথা কোনওকালে বলে গেছেন কোথাও?

জ বললেন যে সুফিয়া কামালের সঙ্গে তাঁর একদিন কথা হচ্ছিল, আমার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি, সুফিয়া কামাল, খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, তসলিমা মেয়েটি খুব বেয়াদব। ওকে আমি এত খবর দিলাম ও যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মেয়ে এল না!

অবাক হই শুনে। তিনি আমার শান্তিবাগের বাড়িতে একবার লোক পাঠিয়েছিলেন খবর দিতে তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করতে যাই। আমি গিয়েছিলাম পরদিনই। তিনি আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেছেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। জকে বলি সে কথা। জ বললেন আমার সেই দেখা করার খবর তিনি জানেন। সুফিয়া কামাল নাকি আমাকে আরেকদিন ডেকেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ডাকার খবর আমি পাইনি। খবরটি যাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সে আমার কাছে আসেনি। কিন্তু সে কথা কি জানেন সুফিয়া কামাল যে তার দূত আমাকে তাঁর কোনও খবর আদৌ পৌঁছে দেয়নি!

জ মাথা নাড়লেন, জানেন না তিনি।

সুফিয়া কামালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ছাড়াও আরেকবার আমার দেখা হয়েছিল, দেখাটি হয়েছিল পূরবী বসুর একটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে। সুফিয়া কামাল ছিলেন প্রধান অতিথি, আমি ছিলাম বিশেষ অতিথি। পূরবী বসুর বই সম্পর্কে আমাদের বক্তৃতা দেওয়ার কথা। আমি যেহেতু বক্তৃতায় পারদর্শী নই, অল্প কথায় পূরবী বসুর লেখার প্রশংসা করে বসে যাই। সুফিয়া কামাল অনেকক্ষণ ধরে বলেছিলেন। তিনি কেবল পূরবী বসুকে নিয়ে বলেননি, আমাকে নিয়েও বলেছিলেন। আমার লেখালেখি নিয়ে। তাঁর বক্তব্য শুনে আমি বিস্ময়বোধ করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন যে নারীবাদী লেখা লিখছি সে ভাল কথা, তবে তা উগ্র যেন না হয়। হ্যাঁ মেয়েরা হল মায়ের জাত, মেয়েদের সহনশীল হতে হবে, পুরুষেরা যদি ভুল করে, রাগারাগি করে তবে ঘর সামলানোর জন্য মেয়েদেরই নরম হতে হয়। পুরুষ স্বভাবতই গরম, নারীও যদি গরম হয়,তবে সংসার চলবে কি করে! মায়ের জাতের দায়িত্ব অনেক। মায়ের জাতের দায়িত্ব হল পুরুষকে আদর দিয়ে ভালবাসা দিয়ে কাছে টানা, তাদের বুঝতে শেখা, তারা ভুল করলে ক্ষমা করে দেওয়া। মায়ের জাতের দায়িত্ব সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করা। ইত্যাদি। মেয়েদের রাগ করা, চিৎকার চেঁচামেচি করা, পুরুষদের ডিঙিয়ে যেতে চাওয়া, পুরুষের বিরুদ্ধে বলা, উগ্রতা দেখানো কিছুই উচিত নয়। এতে মেয়েদের কমণীয়তা নষ্ট হয়।ডডদেশের সবচেয়ে বড় নারী সংগঠনের সভানেত্রীর মুখে এসব শুনে বড় বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ বসে থেকেছি। পরে পূরবী বসুর কানে কানে বলেছিলাম, আমি তো জানতাম না এমন অদ্ভুত চিন্তাভাবনা তাঁর!

পূরবী বসু বললেন, পুরোনো মানুষেরা ওভাবেই ভাবেন।

তা ঠিক। পুরোনো মানুষরাও হয়ত ওভাবেই ভাবেন। আমার নানিও হয়ত এভাবেই ভাবেন। নাহ, নানি কিন্তু এভাবে ভাবেন না। মনে আছে রুদ্রকে ছেড়ে আসছি ছেড়ে আসছি করছি যখন, নানি বলেছিলেন, লাত্থি দিয়া আইয়া পড়তে পারস না! অত দোনামনার কি আছে! তর আবার চিন্তা কি? নিজে ডাক্তার হইছস। ডাক্তারি করবি, আর নিজের পছন্দ মত থাকবি! ব্যাডাইনগর শয়তানি সহ্য করার কি ঠ্যাকা পড়ছে তর? তবু নানি তো নানিই, নানির কথার কি মূল্য আছে জগতে! পাড়াপড়শি আর আত্মীয়কুল ছাড়া নানিকে কেউ চেনেই না। নানি তো আর সুফিয়া কামালের মত অত লেখাপড়া করেননি, তাঁর মত শুদ্ধ ভাষায় কথাও বলতে পারেন না। সুফিয়া কামালকে সকলে চেনেন। ইশকুলের পাঠ্য বইয়ে তাঁর সাঁঝের মায়া কবিতাটি আমাদের বয়সী সকলেই পড়েছি। সেই সুফিয়া কামাল চোখের সামনে বসে আছেন। নানির মত অমন না হলেও এই বয়সেও তিনি যে সভা সমিতি করছেন, বলছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, এই তো অনেক। আমরা যখন বুড়ো হব, আমাদের অনেক কথাই হয়ত নতুন প্রজন্মের লেখকদের কাছে বড় পুরোনো ঠেকবে।

আমার তন্ময়তা ভেঙে যায় জর কণ্ঠস্বরে, একটা ব্যাপার কি তুমি বেশ অনেকদিন থেকে খেয়াল করছ তসলিমা যে তোমাকে কাউন্টার দেবার জন্য হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই বেগম রোকেয়াকে আমদানি করা হয়েছিল?

মানে? আমি অবাক তাকাই।

যখনই তুমি নারীবাদী লেখা লিখে বিখ্যাত হয়ে গেলে, অমনি একদল মানুষ ভুলে যাওয়া বেগম রোকেয়াকে কবর থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলে আনল, ১০০ বছর আগের সেই রোকেয়াকে। তিরিশ বছর আগে রোকেয়ার কথা ইশকুলের বইয়ে পড়েছিলাম, দ্যাটস অল। এতকাল রোকেয়াকে নিয়ে কোনওদিন কোনও লেখালেখি বা কোনও সভা হতে দেখিনি। শত খুঁজেও তাঁর কোনও বইও পাইনি কোনওদিন পড়ার। হঠাৎ এই দুতিন বছর ধরে শুরু হল রোকেয়া নিয়ে উৎসব। বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া! চারদিকে লেখালেখি, তসলিমার অনেক আগেই বেগম রোকেয়া লিখে গেছেন নারীবাদ নিয়ে, তসলিমা আবার কিসের নারীবাদী! নারীবাদী ছিলেন রোকেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। রোকেয়ার বই নতুন করে বেরোনো শুরু হল। যেন রোকেয়াই এখন এই সমাজে নারীমুক্তি ঘটাবে। এ সবই হল তোমাকে আড়াল করার জন্য। মৃতকে জীবিত বানিয়ে জীবিতকে কবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। হিংসে হিংসে, তোমার খ্যাতি দেখে হিংসেয় লোকে মরে।

আমি হেসে বলি, আমি নিজেই তো বেগম রোকেয়াকে নিয়ে লিখেছি।

তা লিখেছো। তোমার লেখা আর তাদের রোকেয়া-পাগলামোতে পার্থক্য আছে। তুমি শ্রদ্ধা নিয়ে লিখেছো, তারা যা করছে কুমতলব নিয়ে করছে। রোকেয়া বেঁচে নেই বলেই করতে পারছে। বেঁচে থাকলে ওঁকেও হিংসে করত।

আমি ম্লান হাসি।

জ বলেন, তোমাকেও কিন্তু কোনও এক সময় কবর থেকে তুলে আনা হবে তসলিমা!

বুক ধ্বক করে ওঠে। কবরের কথা উঠছে কেন!

কবরের কথা উঠছে এই জন্য যে, জ বললেন, মানুষ তো মরবেই, আমিও মরব একদিন, তুমিও মরবে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে যদি কোনওদিন কোনও মেয়ে প্রচন্ড নারীবাদী লেখা লিখতে শুরু করে, নারীর অধিকারের কথা খুব জোরে সোরে বলে বা লেখে, তখন তাকে অবজ্ঞা করার জন্য তোমাকে কবর থেকে তুলে আনবেই আমাদের বুদ্ধিজীবী ওরফে কুচক্রীজীবীরা। তারা চিরকালই ছিল, থাকবে।

আমার খানিকটা অস্বস্তি হয় এসব শুনে।

তোমার ফতোয়ার বিরুদ্ধে, জ বললেন, খেয়াল করেছো যে মহিলা পরিষদ কোনও রকম প্রতিবাদ করেনি! সুফিয়া কামাল জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, তোমার মামলার কথা কিছু বলেননি!

আমি মাথা নাড়ি, জানি।

জ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আমি গোপন করি।

জ বললেন, তোমাকে যারা চেনে না, তারা তোমাকে খুব ভুল বোঝে।

হেসে বলি, যারা আমাকে চেনে, তারাও কিন্তু আমাকে ভুল বোঝে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলি, হয়ত ভুল বোঝে না, ঠিকই বোঝে, আমার আচার আচরণ, স্বভাব চরিত্র, আমার চিন্তা ভাবনা তাদের ভাল লাগে না।

এগারো জুলাই, সোমবার

খবরগুলো দেখি। খবরগুলো জামাতে ইসলামীর। জামাতে ইসলামী ৪ দফা দাবির স্মারকলিপি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে যাচ্ছে।

৪ দফার প্রথম দাবি ধর্মজাতি ও রাষ্ট্রবিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান। বাকি দাবি জাতীয় সংসদে জামাতে ইসলামির আনা ধর্ম অবমাননাকারীদের শাস্তির বিধান সম্বলিত আইন প্রণয়নের বিল পাস করা, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করা, এনজিওদের জাতি, ধর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী তৎপরতা বন্ধ করা। বিশাল সমাবেশ হল হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কোম্পানীর সামনে। সেখানে মওলানা মতিউর রহমান নিজামী ভাষণ দিলেন। বললেন বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকারই নেই। কারণ এই সরকার ধর্মদ্রোহী তসলিমার এবং কাদিয়ানি ও এনজিওগুলোর জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ প্রতিহত করার দায়িত্ব মোটেও পালন করেনি। জামাতে ইসলামীর আরও নেতা বক্তৃতা করেন। তারপর মহামান্য নেতাগণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপিটি দেন। খবরগুলো দেখি, জাতীয় সংসদে আজ সোমবার তসলিমাকে নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা ওবায়দুল হক সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৬৮ ধারা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য সংসদ সচিবালয়ে নোটিশ জমা দিয়েছিলেন। খবরগুলো একসময় আর দেখতে ইচ্ছে করে না। আর আমার জানতে ইচ্ছে করে না সংসদে কি কি কথা হল আমাকে নিয়ে। আমি জানি কি কথা হবে, কেমন কথা হবে। আমি জানি আমাকে আজ কোথায় কোন অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে মানুষ। অল্প কজন মানুষ আমার যে পাশে আছেন তা ঠিক, কিন্তু দেশের বেশির ভাগ মানুষই আমার পাশে নেই। দেশের বেশির ভাগ মানুষই কায়মনোবাক্যে আমার মৃত্যু চাইছে। জানি আমি।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ক আর তার বন্ধু গভীর রাতে এসে ঘোমটা মাথার আমাকে তুলে নিলেন গাড়িতে। গাড়ি থামল ঝর বাড়িতে। ঝ অপেক্ষা করছিলেন গেটের কাছে। আমাকে নিয়ে তুললেন সেই ঘরে, সেই পুরোনো ঘরে।

বারো জুলাই, মঙ্গলবার

ঘরে বন্দি পাখির মত বসে থাকি সারাদিন। বসে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেলে শুয়ে থাকি। শুয়ে থাকতে থাকতে মাথা ধরলে উঠে বসি। বসে থাকতে থাকতে বমির উদ্রেক হলে আবার শুয়ে পড়ি। শুয়ে থাকতে থাকতে একটু বমির উদ্রেক কমলে আবার উঠে বসি। বসে থাকতে থাকতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ জ্বালা করলে আবার শুয়ে পড়ি। চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে শ্বাস কষ্ট শুরু হতে থাকলে আবার উঠে বসি। বসে থাকতে থাকতে শ্বাস কষ্ট কমে গেলে আবার শুয়ে পড়ি। শুয়ে থাকতে থাকতে ঘামে শরীর ভিজে এলে আবার উঠে বসি। বসে ঘামগুলো মুছে একটু গরম গেলে শরীর থেকে আবার শুয়ে পড়ি। শুয়ে চোখে ঘুম নেমে এলে দুঃস্বপ্ন দেখে আবার উঠে বসি। বসে থাকতে থাকতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে যে ওটা কেবলই দুঃস্বপ্ন ছিল, বাস্তব বলে কিছু ছিল না, শুয়ে পড়ি আবার। শুয়ে দুঃস্বপ্ন দেখার ভয়ে আমি দুচোখে ঘুমকে বসতে দিই না। ঘুম যদি না বসে

চোখে তবে শুয়ে থাকার অর্থ হয় না বলে আবার উঠে বসি। অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে বসে থাকার অর্থ হয় না বলে আবার শুয়ে পড়ি। সারাদিন সারারাত পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট একটি জায়গার মধ্যে আমার শোয়া বসা চলে।

তেরো জুলাই, বুধবার

কালও কোনও পত্রিকা ছিল না, আজও নেই। ঝর দেখা নেই। ঝ যখন ঢুকলেন ঘরে, তখন রাত। দুদিন পর খাবার জুটল। খাবার গিলতে গেলে গলায় যন্ত্রণা হয়।

রাত দশটার দিকে ক আর ঙ এলেন। নিঃশব্দে এলেন। ওঁরা নিঃশব্দেই আসেন। নিঃশব্দে এসে নিঃশব্দে চলে যান। কথা যখন বলেন, প্রায় নিঃশব্দেই বলেন। ওঁরা এলে ওঁদের এই জগতের কেউ বলে মনে হয় না। যেন স্বর্গ থেকে দেবদূত এলেন। স্বর্গ বলে কোথাও কিছু নেই জেনেও আমার এরকমই মনে হয়। ওঁরা জানেন সব, বোঝেন সব। আল্লাহর ওপর লোকে যেমন নিজের জীবনটির দায়িত্ব দিয়ে ভারমুক্ত হয়, আমিও তেমন ওঁদের কাছেই জীবনের দায় দায়িত্ব দিয়ে বসে আছি। নিজের ওপর আমার বিশ্বাসটুকু অনেককাল হারিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস এখন ওঁদের ওপর। ওঁরা ইচ্ছে করলে আমাকে বাঁচাতে পারেন, ইচ্ছে করলে বাঁচাতে ওঁরা নাও পারেন। ওঁরা যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ আমি নিজের কোনও অস্তিত্ব অনুভব করি না। ওঁদের মুখে দেশে ঘটতে থাকা নানারকম তাণ্ডবের গল্প শুনি। আমার কিছুতেই মনে হতে থাকে না যে যাবতীয় তাণ্ডব এই আমি মানুষটির জন্য। মনে হয় তসলিমা নামের মেয়েটি অন্য কেউ। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে তসলিমার জন্য আমিও দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কী এক ঘোরের মধ্যে থাকি যে মনে হয় না ওঁরা বসে আছেন বা কথা বলছেন বা শুনছেন। ওঁরা চলে গেলে বুঝি ওঁরা এসেছিলেন। ঙ জানালেন সরকারের সঙ্গে বিদেশি কূটনীতিকদের দীর্ঘ দীর্ঘ বৈঠক হচ্ছে। আমার উকিলের সঙ্গেও বৈঠক হচ্ছে। কিন্তু সরকার রাজি নয় আমাকে জামিন দিতে। ঙর হাতে চুল।টর বাড়িতে যে পরচুলাটি ফেলে এসেছিলাম, সেটি তিনি নিয়ে এসেছেন। চুল হাতে নিয়ে বসে থাকি। ভাবলেশহীন মুখে বসে থাকি। স্পন্দনহীন বসে থাকি।

ক আর ঙ দুজন দেশের যে সব কথা মুখে শোনালেন, হাতের পত্রিকা খুলে পড়ে শোনালেন আমাকে, তা হল, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো যে যৌক্তিক, তা বলে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। সরকারি আদেশেই বলছেন সব। যেসব পত্রিকায় আমার খবর ছাপা হচ্ছে, সবকটি পত্রিকায় চিঠি লিখে জানাচ্ছেন যে বাংলাদেশ সরকার যা করেছেন ঠিক করেছেন। ওয়াশিংটন পোস্টে আমাকে নিয়ে লেখা একটি সম্পাদকীয় নিয়ে তিনি আপত্তি করছেন। অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে আমি নাকি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ আইন অমান্য করেছি। একশ বছরের বেশি আগে ব্রিটিশ সরকার ২৯৫ ক নামক আইনটি চালু

করেন। আইনটি আমার নয় তার নয়, একেবারে খোদ ব্রিটিশের আইন। সুতরাং এই আইন সভ্য হতে বাধ্য!

একবারও কি হুমায়ুন কবীর লোকটি ভেবেছেন যে একশ বছর আগের পুরোনো জিনিস সবসময় নতুন জীবনে আর জগতে খাটে না, সময় গেলে পুরোনো মূল্যবোধ, পুরোনো আইন, পুরোনো মানসিকতার সংস্কার করতে হয়! একবার কি খবর নিয়ে দেখতে চেয়েছেন, ইংরেজরা নিজেরা এই আইনটি আর ব্যবহার করে কি না! গণতন্ত্র কাকে বলে তাও শিখিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব তসলিমার মৌলিক অপরাধের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ আর অসন্তোষের ব্যাপারে সাড়া দেওয়া।

এদিকে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ বিশাল এক সমাবেশের আয়োজন করেছে, ওতে যোগ দেওয়ার জন্য আর ২৯ জুলাইএর লং মার্চ সফল করার জন্য জনগণকে আহবান জানিয়ে বায়তুল মোকাররমের খতিব, শায়খুল হাদিস, চরমোনাইএর পীর, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, আনোয়ার জাহিদ সকলে মিলে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, বিবৃতিটি এরকম। '৩০ জুনের হরতালের অভূতপূর্ব সাফল্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের বারো কোটি মুসলমান এই রায় ঘোষণা করেছে যে বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের কোনও নাগরিকের কোরান অবমাননা ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের লিপ্ত হওয়ার কোনও অধিকার নেই। এই হরতালের মাধ্যমে কোরান অবমাননাকারী নাস্তিক মুরতাদদের শাস্তির দাবি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। বারো কোটি মানুষ এই রায় দিয়েছে যে ধর্মদ্রোহীরাই রাষ্ট্রদ্রোহী। বাংলাদেশের মানুষ এই দাবিকে সমর্থন করেছে যে ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভাল এবং জনহিতকর কাজের বিরোধী নয়, কিন্তু এনজিও নামধারী কিছু প্রতিষ্ঠান দেশের সংবিধান ও ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। আমাদের জনগণের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তারা মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করা ও ইসলাম বিরোধী এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ৩০ জুনের হরতাল পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ এই তথাকথিত এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে ক্ষমতাসীন সরকার বারো কোটি মানুষের এই রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নাস্তিক মুরতাদদের শাস্তি, এনজিওর অপতৎপরতা বন্ধ, ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের কোনও উদ্যোগই গ্রহণ করেননি। বরং আন্দোলনকারী নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন। গণধিকৃত তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলেও তাকে আজ পর্যন্ত সরকার গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ সরকারের নাকের ডগায় বসে তসলিমা নাসরিন তার ধর্মদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী অপকর্ম সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। আর সরকারের এই নতজানু নীতির সুযোগে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিরোধী ইসলামের শত্রু বৈদেশিক শক্তি আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে চলেছে। তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে মার্কিন সরকার ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ অত্যন্ত আপত্তিকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভয়েস অব আমেরিকাসহ মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তা আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে মারাত্মকভাবে বৈরীমূলক।

১৩টি ইসলামি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ তাই ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মার্কিন দূতাবাসের দিকে এক বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি

প্রদানের আয়োজন করেছে। দল মত নির্বিশেষে সকল নাগরিককে আমরা এই সমাবেশ ও মিছিল সফল করে তোলার আহবান জানাচ্ছি।'

তৌহিদী জনতা যে কোনও মূল্যে লং মার্চ সফল করবে। ঝ বললেন ইনকিলাব পত্রিকাটি হাতে নিয়ে।

লং মার্চ যদি সত্যি সত্যিই সফল হয়ে যায়!

আশঙ্কাটি আমার গা থেকে নেমে যেতে থাকে ক, ঙ, ঝর দিকে। আশঙ্কাটি ক্ষণকালের জন্য আমাদের স্তব্ধ করে রাখে।

ঝ বলে যাচ্ছেন, প্রতিরোধ মোর্চা থেকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে কোরানের ইজ্জত রক্ষার জন্য সারা দেশে যে নজিরবিহীন হরতাল পালন হয়েছে, সুতরাং আগামী ২৯ জুলাই কোরান দিবস পালন হবে, সারাদেশ থেকে ঢাকার দিকে লং মার্চ কর্মসূচীতে তার চেয়ে অনেক বেশি লোকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আলামত পাওয়া যাচ্ছে। তৌহিদী জনতার এই ঈমানী জবাবকে কোনও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্তব্ধ করা যাবে না। ইসলাম বিরোধী নাস্তিক মুরতাদরা ইসলামের পুনরুত্থান দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। শায়খুল হাদিসের দল দেখছি দেশের বিভিন্ন শহরে সফর করছে আর ভাষণ দিচ্ছে।

ঙ প্রশ্ন করলেন---*তুমি নাকি গত পরশু সাক্ষাৎকার দিয়েছো! কাল লিখল ইনকিলাব এ।*

---*'সাক্ষাৎকার! পরশু!'* অসহায় তাকাই।

---*হ্যাঁ তুমি নাকি এগারো তারিখে ইংলণ্ডের দ্য টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক ক্রিস্টোফার টমাসকে বলেছো, তুমি আদালতে যাওয়ার পথে বা জেলের ভেতর মৌলবাদীদের হাতে মরতে প্রস্তুত নও। তুমি নাকি নিরাপত্তা চেয়েছো, বলেছো দেশ ত্যাগ করবে না।*

---*তাই নাকি!* তেতো হাসি ঠোঁটে।

---এটাই নাকি কোনও সংবাদপত্রের সঙ্গে তোমার প্রথম সাক্ষাৎকার! হানটেড ফেমিনিস্ট সিকস সেইফটি, নট এসকেপ রুট, ফিচারটির শিরোনাম এই।

---*আশ্চর্য, এমন খবর কি করে দেয়! আমি বুঝি না এদের ব্যাপারগুলো। আমি আবার কথা বললাম কখন কার সাথে। আমি দেশ ছেড়ে পালাতে চাই না এটা ঠিক। কিন্তু, কি করে ওই লোকেরা জানলো তা! আমি তো কোনও সাংবাদিকের সাথে কথা বলিনি!*

ঙ বললেন--- *অনুমান করে নিয়েছে বোধহয়।*

হতে পারে।

ঙ বলেন ---*সাংবাদিকরা আজকাল অনুমানের ভিত্তিতেই অনেক কিছু লেখে। কিন্তু তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছো, তা লিখেছে। তা কি করে জানবে? আর মিথ্যে কথাই বা লিখবে কেন যে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তোমার সঙ্গে সরাসরি কোনও কথা হয়েছে নাকি কারও মাধ্যমে কথা হয়েছে! তোমার ভাই কামালের কথা লিখেছে। তোমার বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে পরিবারের লোকেরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কামাল বলেছে, তোমার বাবার বাড়িতে হামলা হয়েছে, তারা যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই তাদের পেছনে সরকারি গোয়েন্দার*

লোক পিছু নিচ্ছে। এসব অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চাইছে সবাই।

ক বললেন--- *কামালের সঙ্গে হয়ত ক্রিস্টোফারের কথা হয়েছে।*

---*সে হতেই পারে।* ঙ বললেন।

---*আসলেই এ কথা লেখা আছে যে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে! নাকি ইনকিলাবের বানানো গপ্প এটি!* আমি প্রশ্ন করি।

ক বললেন---*ইনকিলাবকেই বা বিশ্বাস করা যায় কি করে! হয়ত টাইমসে লেখা হয়েছিল হাইডিং এ আসার আগে যে কথা বলেছিলেন তসলিমা সেসব, নিশ্চয়ই এটা আগের কোনও ইন্টারভিউ।*

একটু থেমে কর দিকে তাকিয়ে বললেন--*নাকি ট!*

কর কপালে ধীরে ধীরে ভাঁজ পড়তে থাকে।

ঙ বললেন---*দ্য টাইমসে এর আগে তোমাকে নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছে,সেন্সরশিপ বাই ডেথ। আর ইনকিলাব খবরটি নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পত্রিকা দ্য অস্ট্রেলিয়ান থেকে।*

ঝ সবাইকে থামিয়ে বললেন---*এটা তো খুব ভাল খবর যে বিদেশের বড় বড় পত্রিকায় লেখালেখি চলছে এ নিয়ে।*

তা ঠিক তা ঠিক বলে ক আর ঙ দুজনই সায় দিলেন কিন্তু এও বলে দিলেন যে সাংবাদিকরা যদি আজ আমার সঙ্গে যোগাযোগের কোনও রকম পথ অবিষ্কার করতে পারে, তবে মোল্লাদের বেশিদিন লাগবে না আমাকে খুঁজে পেতে। সুতরাং সাবধান।

এই রহস্যটি নিয়ে আমি ভাবতে থাকি। যদি ইনকিলাবের খবর সত্য হয়, তবে কি করে ওই সাংবাদিক আমি দেশে কি করছি না করছি জানছে! কোনও কি গুপ্তচর আছে কোথাও! ধন্দে পড়ি।

ঝ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন যে সংসদে তোফায়েল আহমেদ, মোহাম্মদ নাসিম, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন যে সরকারি দল ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিধিবহির্ভূত বাজেট অধিবেশনের শেষ মুহূর্তে মওলানা ওবায়দুল হককে তসলিমা সম্পর্কে বলার সুযোগ করে দিয়েছে।

এ সময় ক হেসে উঠলেন, পত্রিকার একটি পাতা ঝর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন--- *গোলাম আযমের কথা উঠছে না যে! গোলাম আযম জামাতের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে।*

---*ইনডোর সভায় নিশ্চয়ই!* বলতে বলতে ঝ পত্রিকাটির পাতা তুলে নিলেন।

---*ইনডোর হবে কেন! বিশাল ময়দানে। দিনের আলোয়।*

পত্রিকার পাতার দিকে ঝুঁকে দেখি ছবিটি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাম আযমের মাথায় জিন্নাহ টুপি, মুখে শাদা দাড়ি, সামনে অগুনতি শাদা টুপির শ্রোতা।

কি কাণ্ড কি কাণ্ড! কেউ বাধা দিল না! এত সাহস পেয়ে গেছে গোলাম আযম! স্পর্ধা হল কি করে! কোথায় এখন আওয়ামী লীগ, কোথায় নির্মূল কমিটি! কেউ কিছু বলছে না?

ঙ ঠোঁট উল্টে বললেন--- *কে আর কী করতে পারবে!*

---*গোলাম আযম কাদের সাথে দেখা করেছে, সেটা পড়েন।*

কর কথায় খবরটিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে থ হয়ে যাই, সুপ্রিম কোর্ট গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে রায় দেওয়ার পর বাংলাদেশ হিন্দু সংগ্রাম কমিটির লোকেরা জামাতের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আর গোলাম তাঁদেরই উদ্দেশে বলেন, যে, ধর্মের ভিত্তিতে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, সেটিই প্রকৃত বন্ধুত্ব। এ ধরনের বন্ধুত্বই সবচেয়ে গভীর হয়। ধর্মহীন বন্ধুত্ব ক্ষণভঙ্গুর হতে বাধ্য।

আশ্চর্য! গোলাম আযম ওই হিন্দুদের বলেছেন, আপনাদের মত সত্যের সাধককে শ্রদ্ধা না করে পারছি না। কারণ আপনারা বাংলাদেশের নির্যাতিত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছেন। একজন প্রকৃত ধার্মিকের সাথে অপর ধার্মিকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবেই। একজন ধার্মিক আরেকজন অধার্মিকের চেয়ে ধার্মিককে বেশি পছন্দ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

এটুকু পড়েই আমি পত্রিকাটি কর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি---*গোলাম আযম ঠিকই বলেছেন, মিথ্যে বলেননি। তাই তো দেখি আমরা, এদেশের জামাত নেতা ভারতে গিয়ে বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করছে। কোলাকোলি করছে। দাওয়াত খাচ্ছে। দুদলে তো ভাল বন্ধুত্ব।*

ঝ পত্রিকার পাতাটি মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে বলেন---*সারা দেশে দেখছি হরতাল সফল হয়েছে বলে বিশাল জনসভা হচ্ছে, মোল্লারা মহানন্দে মিছিল করে বেড়াচ্ছে। বলছে, ৩০ জুনের সর্বাত্মক হরতাল এদেশে ইসলামি শাসন কায়েমের পথে জ্বলন্ত মাইলফলক। এসবই খবর! কোনও কি ভাল খবর নেই?*

ঙ বলেন---*বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট আর গণফোরামের একটি মতবিনিময় সভা হয়েছে। সভায় বলেছে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।*

ঝ বললেন---*আর কত বলবে এসব! শুনেছিই তো অনেক। যেতে হবে যেতে হবে বললে তো আর চলছে না। এখন গিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে গিয়েছে। যাচ্ছে না তো! গেলে কি করে গোলাম আযম সভা করতে পারে ঢাকা শহরে!*

আধো আলোয় বসে আমাদের চাপা স্বরের কথাবার্তা তখনও শেষ হয়নি, তখনও দেশের অবস্থা যেটুকু জেনেছি সেটুকুতে জানার ইচ্ছে মেটেনি আমার, ক আর ঙ উঠে পড়লেন হঠাৎ। অন্ধকারে বেড়ালের মত হেঁটে, বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন ওঁরা। ওঁদের সামনে সামনে হাঁটবেন ঝ। পথ দেখিয়ে নেবেন।

অনেক রাতে ঝ তাঁর এক শিষ্যকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বড় বিশ্বস্ত শিষ্য। শিষ্যটি একটি ছাত্রনেতা। ছাত্রনেতাটিকে ঝর ডেকে আনার কারণ হল, আমাকে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নেতাটি সাহায্য করতে পারে। পালাতে আমি চাইছি না, কিন্তু ঝ মনে করছেন না আর কোনও উপায় আমার আছে বাঁচার। প্রায়ান্ধকার ঘরটিতে বসে ছাত্রনেতা দেশের সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন রোমহর্ষক পদ্ধতির কথা বলে। আমাকে রাতের অন্ধকারে এ বাড়ি থেকে তুলে সীমান্তের কাছাকাছি কোনও জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হবে। ওখানে পাহাড়, হাওড় বা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে দৌড়োতে হবে উর্ধ্বশ্বাসে।

আমার পরনে থাকবে আপাদমস্তক বোরখা, লম্বা চুল। ঝ যোগ করলেন।

আমি মলিন কণ্ঠে বলি---*ওখানে যদি বর্ডারের বিডিআর দেখে ফেলে! যদি ধরা পড়ি!*

---*টাকা দিলে কাজ হয়।*

---*টাকা দিলে যদি কাজ না হয়। যদি মোল্লাদের হাতে পড়ি!*

ছাত্রনেতা মুখ মলিন করে বলল---*এসব ঝুঁকি তো আছেই। ঝুঁকি নিয়েই তো কত লোক যাচ্ছে।*

পালাবার কোনও পদ্ধতিই আমাকে আকর্ষণ করে না। মন খারাপ করে বসে থাকি। ঝ খুব মন দিয়ে ছাত্রনেতাটির নানা রকম পদ্ধতি প্রক্রিয়া শুনতে থাকেন।

চৌদ্দ জুলাই, বৃহস্পতিবার

আমার সকাল দুপুর বিকেল নিঃশব্দে কেটে যায়। চোখদুটো দেয়ালে। মাঝে মাঝে শুধু এ পাশ থেকে ওপাশ ফিরেছি। ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে এপাশে। সীমান্তর দিকে এক বোরখা পরা মেয়ে দৌড়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে রাইফেল আর গজারি কাঠের লাঠি আর বড় বড় পাথর হাতে নিয়ে দৌড়ে আসছে এক দঙ্গল লোক। বোরখাওয়ালী বেশিদূর দৌড়োতে পারেনি, তার আগেই ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ার পর তাকে সবাই মিলে নগ্ন করে ধর্ষণ করে গলাটি কেটে নিয়ে চলে গেল, শরীরটি পড়ে রইল জঙ্গলে, কাদায়। আমি শিউরে উঠতে থাকি। কিছুতেই দৃশ্যটি আমি দূর করতে পারি না।

ঝ আজ একটি অন্যরকম খবর শোনালেন। আজ নাকি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদন বেরিয়েছে খবরের কাগজগুলোয়। আজকের কাগজ নিউজ এণ্ড ফিচার সার্ভিসএর প্রতিবেদনটি ছেপেছে। দেশের প্রধান দুটি দলের উদাসিনতার কারণে বাংলাদেশে মৌলবাদী তৎপরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ মৌলবাদীদের ব্যাপারে নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেছে। ফলে দেশে মৌলবাদীরা বিভিন্ন ধরনের অপতৎপরতা শুরু করেছে। বাংলাদেশের সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এখন সংকট চলছে। এই সংকটের মূল কারণ হল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে সংবিধান সংশোধন করে, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করতে হবে। অন্যদিকে সরকারি দল এই দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এই দাবিতে বিরোধী দলগুলো সংসদ অধিবেশন বর্জন করছে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের দল জাতীয় পার্টি এবং মৌলবাদীদের সংগঠন জামাতে ইসলামি। রাজনৈতিক এই সংকটের সুযোগে দেশের মৌলবাদী এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠী

আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন স্থানে ফতোয়া জারি করে উন্নয়ন তৎপরতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। কয়েকটি পত্রিকা এদের বিরুদ্ধাচরণ করায় মৌলবাদীরা পত্রিকা অফিসে হামলা করেছে। কিন্তু সরকার এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে। একজন স্বনামধন্য লেখিকার বিরুদ্ধে মৌলবাদীরা মিছিল সমাবেশ করলে সরকার ঐ লেখিকার বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করে। এর ফলে মৌলবাদীরা আরও উৎসাহী হয়েছে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দলই আগামী নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের জন্য মৌলবাদীদের চটাতে নারাজ। গত নির্বাচনের পর মৌলবাদীদের প্রধান সংগঠন জামাতে ইসলামী বিএনপিকে সমর্থন দেয়, ফলে বিএনপি সরকার গঠন করে। এখন আওয়ামী লীগ মনে করছে, মৌলবাদীদের হাতে রাখলে নির্বাচনে তাদের লাভ হবে। ফলে মৌলবাদ বিরোধী কোনও কর্মসূচী আওয়ামী লীগ এখন গ্রহণ করছে না বরং জামাতের সঙ্গে সংসদে বিভিন্ন বৈঠকে অংশগ্রহণ করছে। অবশ্য আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, মৌলবাদীদের বিপক্ষে তাদের প্রকাশ্য অবস্থান অটুট রেখেছে। কিন্তু বাস্তবে এর পক্ষে তেমন কোনও কর্মসূচী নেই। মৌলবাদী গোষ্ঠী এই সুযোগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট। ফলে দেশে আরেকটি সহিংসতা এবং বড় ধরনের গোলযোগ অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে। দেশের উন্নয়ন তৎপরতাও ব্যাহত হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

ডডএটুকু পড়ে ঝ শুয়ে পড়লেন। সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটি টান দিয়ে বললেন, কি মনে হচ্ছে তোমার?

ঝর বাড়িয়ে দেওয়া সিগারেটে একটি টান দিয়ে একটি বালিশ পিঠের পেছনে নিয়ে হেলান দিয়ে বলি--- *আমেরিকার অনেক কিছু আমি পছন্দ করি না। বিশেষ করে ওদের পররাষ্ট্র নীতি। কম্যুনিস্ট খতম করার জন্য হেন কুকাজ নেই যে করেনি। লাতিন আমেরিকার কতগুলো দেশে কি জঘন্য হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। ভিয়েতনামের নিরীহ মানুষকে কয়েক বছর ধরে খুন করল। একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে। কিন্তু...*

---*কিন্তু কি?* ঝর চোখে প্রশ্ন।

---*বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে এখন যা বলল, তা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক। মুসলমান মৌলবাদীদের তারা একসময় পছন্দই করত, কারণ কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এদের ভাল লেলিয়ে দেওয়া যায় বলে। এখন আর কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কিছু নেই, তাই বোধহয় মৌলবাদীদের পালা পোষার ব্যাপারটিও বাদ দিয়েছে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে আমেরিকা যে মৌলবাদীদের আস্কারা দিয়ে বাড়িয়ে তুললে এটা তাদের জন্যও ভাল হবে না।*

ঝ বললেন--- *শোনো, আমেরিকার রাজনীতি বাদ দাও, আপাতত নিজের কথা ভাব। যদি আমেরিকার চাপে বাংলাদেশের সরকার এখন তোমার জামিন দিয়ে দেয়, আর তোমাকে সিকিউরিটি দেয়, তাহলে তো বেঁচে গেলে।*

---*এত সুন্দর করে সবকিছু ঘটে যাবে, মনে হচ্ছে না। বিএনপি তো ইনটারনাল পলিটিক্সটা দেখবে। ধার্মিকদের ক্ষেপিয়ে দিলে তার তো ভোট পাওয়া হবে না নেক্সট ইলেকশানে। ধার্মিক ক্ষেপানোর কাজটা করতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।*

আমেরিকা দিয়ে তো বিএনপির নির্বাচনে জয়ী হওয়া নিশ্চিত হবে না, দেশের বেশিরভাগ মানুষের মন ভরিয়েই তো তাকে আসতে হবে ক্ষমতায়। আর এখানে তো নীতির রাজনীতি চলে না, চলে ক্ষমতার রাজনীতি।

ঝ বললেন---*আজ সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ আমেরিকান অ্যামবেসিতে মিছিল নিয়ে যাচ্ছে।*

---*কেন?*

---*মোল্লারা ক্ষেপেছে। কারণ ক্লিনটন তোমাকে সমর্থন করেছেন। ক্লিনটন বলেছেন তিনি চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশ সরকার যেন তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।*

---*ক্লিনটন কি আসলেই বলেছেন?*

---*ভয়েজ অব আমেরিকার খবর ছিল এটি। নিশ্চয়ই বলেছেন, তা না হলে খবর হবে কেন!*

দুজন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। মানুষ যখন চুপচাপ বসে থাকে, তখন কিন্তু মাথাটি চুপচাপ বসে থাকে না, বরং ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে কয়েক লক্ষ ভাবনাকে থরে থরে সাজাতে। সাজাতে কি আর সত্যিই পারে! সবই এলোমেলো হতে থাকে। বেশি ভাবনা থাকা মানেই একসময় একটির গায়ে আরেকটির ঠেলায় ধাককায় মুখ থুবড়ে পড়ে।

---*চল ঘুরে আসি শহরটা।* ঝ বলেন হঠাৎ।

---*কি বললে?*

---*গাড়ি নিয়ে যাবো। চল।*

আমি লাফিয়ে উঠি।

---*কি হবে? কিছুই হবে না। সঙ্গে আমার পিস্তল থাকবে। কাকে আবার ভয় পাবো।* ঝ বলেন।

---*চল যাই।*

---*চল।*

ঝ *চল* বললেন ঠিকই। আবার ভেবে বলেন---*ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়। যায় না কি?*

---*নিশ্চয়ই যায়। এত রাতে কে দেখবে!* আমি তাল দিই। তাল দিয়েও মৃদু কণ্ঠে বলি---*যদি কেউ দেখে ফেলে। চিনে ফেলে!*

---*তা হবে কেন, রাস্তা পুরো খালি থাকে,চল।*

ঝ অকুতোভয়। আমার ভেতর উত্তেজনা।

ঝ উঠে দরজার কাছে গেলেন, পেছন পেছন আমি।

কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন ঝ দরজার কাছে। দরজাটির সিটকিনিতে হাত তাঁর। হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন, ধীরে ধীরে বসে পড়ে বললেন---*দরকার নেই অ্যাডভেঞ্চার করার।*

যাওয়া হয়নি। কিন্তু যাওয়ার প্রসঙ্গ যখন উঠেছিল, মুহূর্তের মধ্যে শহরটা মনে মনে বেড়িয়ে এসেছি বাইরে বেরোবার উত্তেজনায়, সেই আনন্দ আমাকে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও আপ্লুত করে রাখে।

পনেরো জুলাই, শুক্রবার

বিশাল মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে মার্কিন দূতাবাসের দিকে। বিশাল মিছিলের ছবি। হাতে ব্যানার, ফেস্টুন। বাংলাদেশের ধর্মীয় ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল।

> বিক্ষোভ মিছিলের আগে সমাবেশে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশের বিশাল মঞ্চ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, বিদেশী শক্তির আঁচলে মুখ লুকিয়ে রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহীরা কোনওদিনই রেহাই পাবে না। দেশপ্রেমিক তৌহিদী জনতা যে কোনও মূল্যে দেশের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কোরানের অবমাননাকারী ও ধর্মদ্রোহী তসলিমার পক্ষে ওকালতি করে বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন। বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার পরও মুরতাদ তসলিমার পক্ষে আমেরিকার মত একটি দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষাবলম্বন লজ্জাজনক ও ঘৃণ্যতম কাজ। সকাল সাড়ে নটা থেকে ব্যানার নিয়ে বিভিন্ন দল বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে জমা হয়। হাজার হাজার মানুষে সড়ক ফুটপাত সব ভরে যায়। মোট ১৩টি সংগঠন মিলে গড়ে উঠেছে এই সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ। বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। ঘন্টাব্যাপী গণজমায়েত শেষে বিশাল মিছিল বায়তুল মোকাররম ছেড়ে পল্টন হয়ে বিজয়নগরের দিকে যেতে নিলে পুলিশ কড়া ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের গতি রোধ করে। সংগ্রামী জনতা তখন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ক্লিনটন, তসলিমা ও মুরতাদ বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। উত্তাল জনতাকে শান্ত করতে নেতৃবৃন্দকে হিমশিম খেতে হয়। মিছিলকারী স্লোগানমুখর তৌহিদী জনতা তখন রাস্তার ওপর বসে পড়ে। বিক্ষোভরত জনতাকে শান্ত করতে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের নেতা এনডিএ সেক্রেটারি আনোয়ার জাহিদ বক্তৃতা করেন। নেতারা মিছিলকারীদের বায়তুল মোকাররমে ফিরে যাওয়ার জন্য বলেন। তারা ফিরে গিয়ে মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করেন। আনোয়ার জাহিদের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে স্মারক লিপি দিয়ে আসেন। আনোয়ার জাহিদের সঙ্গে ছিলেন জাগপার সভাপতি শফিউল আলম প্রধান আর খেলাফত মজলিসের মহাসচিব প্রিন্সিপাল মসউদ খান।

মার্কিন দূতাবাসে মোল্লাদের বিক্ষোভ মিছিল যাবে এই ঘটনা জানার পরই কাল শহরে পুলিশ নামানো হয়েছিল পল্টন আর বিজয়নগর এলাকার রাস্তায় এমন কি বাড়ির ছাদেও পুলিশ ছিল। যানবাহন চলাচল ওই এলাকায় বন্ধ থাকে। রাস্তার

দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা মিছিলকারীদের হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে থাকে। একসময় তারাও নেমে পড়ে মিছিলে। কিন্তু পুলিশ বিজয়নগরের বেশি একটুও মিছিলকে সামনে এগোতে দেয় না।

গণজমায়েতে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়কারী বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল হক বলেন, যতদিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তসলিমার পক্ষে দেওয়া বিবৃতি প্রত্যাহার না করবে, ততদিন তৌহিদী জনতার প্রতিবাদ জ্ঞাপন অব্যাহত থাকবে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ধর্মদ্রোহীদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। আমার বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মভীরু জনগণও ক্লিনটনের বিরোধিতা করবে। মুসলমান কখনও জালিমের পক্ষ নিতে পারে না। ইসলাম ধর্মকে যারা কটাক্ষ করে তাদের সঙ্গে মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণ করে যে ত্যাগ করে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

শায়খুল হাদিন বলেছেন, এক ভ্রষ্টা নারীর প্রেমে পড়ে ক্লিনটন তার পক্ষে ওকালতি করছেন। তিনি বারো কোটি মুসলমানের এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন। বাঘের লেজ দিয়ে কান চুলকানোর পরিণাম ভাল হবে না।

ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চার আহবায়ক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ গরিব হতে পারে কিন্তু তারা কারও চোখ রাঙানিকে ভয় পায় না। ২৯ জুলাই লং মার্চ আর মহাসমাবেশ করে তৌহিদী জনতা দেখিয়ে দেবে বাংলাদেশে ইসলামের দুর্গ কত মজবুত।

মোর্চার মহাসচিব ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, টুপি দাড়ির ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার শেষ জবাব দিতে সারাদেশের তৌহিদী জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। ২৯ জুলাই লং মার্চে ঢাকায় লাখো জনতার ঢল নামবে। মুসলমান কেবল আল্লাহর শক্তির কাছে মাথা নত করে, কোনও পরাশক্তির কাছে নয়।

আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি হায়াত মওত আর রিযিকের মালিক আল্লাহ। মুসলমান একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে, কোনও পরাশক্তিকে নয়। মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। বাংলাদেশের জনগণ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ভূমিকায়। তিনি ভ্রষ্টা নারী তসলিমার পক্ষে ওকালতি করেছেন। বারো কোটি মুসলমানের ঈমান ও আকিদাকে যে কুলাঙ্গার মেয়ে আঘাত করেছে ক্লিনটন তার সাফাই গেয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন গায়ে পড়ে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছেন। তসলিমা তার কবিতা ও প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে কটাক্ষ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও নাগরিক তা করলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেন। কারণ ক্লিনটন বাইবেলে হাত রেখে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মার্কিন ডলারে এখনও লেখা আছে, ইন গড উই ট্রাস্ট। অর্থাৎ আমরা আল্লায় বিশ্বাস করি। পলাতক তসলিমা বলছে কোর্টে বা জেলে গেলে মৌলবাদীরা আমাকে মেরে ফেলবে। তাই পাশ্চাত্যের কোনও দেশে আমার আশ্রয় প্রয়োজন। ইরানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাহকে যুক্তরাষ্ট্র আশ্রয় দিয়ে বাঁচাতে পারেনি। তাই তসলিমাকে আল্লাহ যেদিন নিয়ে যাবেন, কেউ বাঁচাতে পারবে না। পরাশক্তির আঁচলে মুখ লুকিয়ে রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহীরা কোনওদিন রেহাই পাবে না। তসলিমা বাংলাদেশকে শুয়োরের বাচ্চা বলে গালি দিয়েছে। বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলার কথা বলেছে। পবিত্র কোরআন সংশোধনের স্পর্ধা দেখিয়েছে। ভারতীয় পত্রপত্রিকায় তার বক্তব্য ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এরকম নষ্টা ও দেশদ্রোহী মেয়ের মানবাধিকার নিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন উদ্বিগ্ন। অথচ বসনিয়া ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরে যখন প্রতিদিন মুসলমানদের জবাই করা হচ্ছে তখন সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোনও কথা বলেন না। এদেশের জনগণ তসলিমার বিচার চেয়েছে শুধু। এর আগে একটি মহল রাস্তায় গণআদালত

বসিয়ে যখন কারও কারও বিচার করেছে, তখন মানবাধিকার নিয়ে ক্লিনটন কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। ব্রিটিশ রচিত আইনের (২৯৫ ক) মাধ্যমেই তসলিমার বিচার দাবি করা হয়েছে। ধর্মদ্রোহীতার শাস্তির বিধান দুনিয়ার সকল দেশেই আছে। তসলিমার ময়মনসিংহের বাড়িতে কেউ হামলা করেনি, নিজেরাই নিজের বাড়িতে হামলা করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চাইছে। তৌহিদী জনতা এখনও সংযম প্রকাশ করছে। নতুবা তসলিমার বাড়ির একটি ইটও এতদিন থাকত না। আজকের এই বিক্ষোভ মিছিল এদেশে তৌহিদী জনতার আন্দোলনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। বাংলাদেশের ইসলামের ওপর আজ ঘরে বাইরের শত্রুরা হামলা করছে। আঘাত যখনআসছে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। তবে এই আন্দোলন কোনও দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে নয়। এই আন্দোলন তসলিমা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে।

ফ্রীডম পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল সিরাজুল হক বলেছেন, বাংলাদেশে ইসলাম থাকবে কি থাকবে না সেই ফয়সালার জন্য আজকের আন্দোলন।

খেলাফত মজলিসের মহাসচিব প্রিন্সিপাল মসউদ খান বলেছেন, ভিয়েতনাম, ইরান, সোমালিয়া থেকে মার্কিনীরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশের মুরতাদ নাস্তিকদের পাশে দাঁড়িয়ে আমেরিকাও রেহাই পাবে না। ইসলাম রাজনীতিবর্জিত ধর্ম নয়।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারি সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মুফতী ওয়াককাস বলেন, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের দেওয়া ঈমানী চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি। বিসমিল্লাহর নামে যারা আজ বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে আছে, তারা দেশ ও ইসলাম কোনওটাই রক্ষা করতে পারছে না। পলাতক তসলিমা কি করে বিবৃতি দেয়, তা আমরা সরকারের কাছে জানতে চাই।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সহ সভাপতি মাওলানা শওকত আলী বলেছেন, ১৬ হাজার এনজিওর অধিকাংশই কোটি কোটি ডলার খরচ করছে ইসলামের বিরুদ্ধে। তথাকথিত বিসমিল্লাহর সরকার যৌনবাদী লেখিকা তসলিমাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

জাগপা সভাপতি প্রধান বলেন, ৩০ জুন সরকার দয়া করে মুরতাদ ঘাদানি চক্রকে তোপখানা রোডে আড়াইশ গজ জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন পুলিশ না বাঁচালে জনতা তাদের জন্য মাত্র আড়াই হাত জায়গা নির্ধারণ করত। জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসাবেন তসলিমা ও দিল্লির সেবাদাস চক্রকে আর রাজপথে চিৎকার করবেন ইসলামের জন্য এটা হয় না। এই সরকার ইসলাম ও স্বাধীনতা কোনওটাই রক্ষা করতে পারবে না। খালেদা জিয়ার সরকারই তসলিমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছে।

জনতাকে প্রশ্ন করেন তিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় না আল্লাহ বড়?

জনতা সমস্বরে ধ্বনি তোলে, আল্লাহ বড়।

প্রধান বলেন, ক্লিনটনের প্রজা হতে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করিনি।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করিম বলেছেন, মৌলবাদী বলে পরিচয় দিতে কোনও লজ্জা নেই। মৌলবাদ মানে মূল জিনিসে বিশ্বাস। কোরান, হাদিস, ইজমা, কিয়াম আমাদের মৌলিক ভিত্তি। মূলে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা জারজ। তসলিমার মত মেয়ে সম্পর্কে জনসভায় কথা বলাও লজ্জাজনক। এই মেয়ে কোরানের বিরোধিতা করেছে। আর ক্লিনটন তাকেই সমর্থন করছে।

মুসলিম লীগএর মহাসচিব বলেছেন, একজনের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য বারো কোটি মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত হানা যায় না। ক্লিনটন তসলিমার পক্ষে সাফাই গেয়ে বারো কোটি মুসলমানকে আঘাত করেছেন।

এরপর আরও আরও.... চলতেই থাকে..। একজনের পর আরেকজন। পড়তে পড়তে ক্লান্তি চলে আসে। আমার আর ইচ্ছে করে না জানতে কে কি বলেছেন। যথেষ্ট

হয়েছে। আমি কেবল মিছিলের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। মানুষগুলোকে মানুষের মত দেখাচ্ছে। তারা কারও বাবা, কারও কাকা, কারও ভাই, কারও ছেলে। তারা মিছিল শেষে বাড়ি ফিরে যাবে, খাবে, দাবে, ঘুমোবে, জাগবে, আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবে, কথা বলবে বাংলায়, মনে সুখ হলে দুএককলি গানও গাইবে, সেও বাংলায়। আর সব বাঙালির মতই জীবন তাদের। কিন্তু এত আলাদা কেন তারা! কেন তারা চাইছে একটি মেয়েকে, মেয়েটি তাদের বোনের মত দেখতে, মেয়েটি তাদের মেয়ের মত দেখতে, খুন করতে! মেয়েটি ভুল করেছে যদি তারা মনে করেই, তাতে কি!ভুল কি মানুষ করে না! তাই বলে মেরে ফেলতে হয় কাউকে!

পাশ ফিরে শুই। দেয়ালে কি কি সব দাগ আছে, দাগগুলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে হাতি ঘোড়া বাঘ মানুষ এসব যে কোনও আকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। হাতি ঘোড়া দেখছিলাম, এর মধ্যেই হঠাৎ আমি শোয়া থেকে চকিতে উঠে বসি। এ কী! এ আমি আগে ভাবিনি কেন! কেন ভেবেছি ওরা সব রাজাকার, সব স্বাধীনতার শত্রু! আমার শ্বাস পড়ে খুব দ্রুত। ফ্রীডম পার্টির নেতা কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশীদ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সের আনোয়ার জাহিদ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির নেতা প্রধান এরা তো সবাই মুক্তিযোদ্ধা! একাত্তরে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। তবে আজ মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকার এক মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করছে, এক দলে নাম লেখাচ্ছে! এই মুক্তিযোদ্ধারা আজ একাত্তরের সবচেয়ে বড় শত্রু গোলাম আযমের সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলছে, একাত্তরের ঘাতকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ রেখে হাঁটছে!

শরীরটি একটি মরা সীমের ডালের মত নেতিয়ে পড়ে মেঝেয়।

রাতে জ এলেন। নিজেই বললেন আজ রাতে তিনি আর বাড়ি ফিরে যাবেন না, থেকে যাবেন। আমার খুব ভাল লাগে শুনে। আমি তো ঘুমোই না রাতে, কোনও রাতেই ঘুমোই না। আজ সারা রাত শুয়ে শুয়ে জর জীবনের গল্প শুনি। কি করে একাত্তরে তাঁকে পাকিস্তানি সেনারা দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছিল, সেই ভয়ংকর, ভয়াবহ, নিষ্ঠুর, কুৎসিত দিনগুলোর কথা তিনি বর্ণনা করেন। শুনে চমকে উঠি, আঁতকে উঠি, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বুকের স্পন্দন থেমে যায়, পাথর হয়ে থাকি। ঝও এ ঘরে শুয়েছেন। অনেকক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। কেবল জ আর আমি জেগে। জ বলছেন, আমি শুনছি। জীবনের ঝুঁড়ি উপুড় করে ঢালছেন জ। জ কে আমার আর সাধারণ কোনও মানুষ বলে মনে হয় না, তাঁকে মহামানবী মনে হয়। গভীর শ্রদ্ধায় আর ভালবাসায় তাঁকে স্পর্শ করে রাখি। জকে একসময় আর মহামানবী বলে আমার মনে হয় না। মনে হতে থাকে জ বুঝি আমার মা, জ বুঝি আমি নিজেই। জর দুটো হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম নিজের হাতে। হাতদুটো আমার ইচ্ছে করে না শিথিল করতে। অন্ধকারে জর মুখটির ওপর ধীরে ধীরে আবছা একটি আলোর চুম্বন পড়ে। ওটুকু আলোতেই জকে বড় উজ্জ্বল লাগে।

জানালা খুলে ভোর দেখার সুযোগ নেই আমাদের, কিন্তু ভোরের সৌন্দর্যটুকু কল্পনা করে নিই। ভোরের সুগন্ধটিও মনে নিয়ে নিই।

ষোল জুলাই, শনিবার

বিবিসিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর অ্যানিটা টিসেন বলেছেন, মৌলবাদীরা তসলিমা নাসরিনকে হত্যার হুমকি দেওয়ার পরও সরকার তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা তসলিমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। আমরা তার নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যারা তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নে সরকারের একটা দায়দায়িত্ব রয়েছে। আমরা দেখতে চাই, মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাংলাদেশেও সমুন্নত রয়েছে। তসলিমা নাসরিন তার দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিলে এবং স্বদেশে ফিরে গেলে তার প্রাণের ভয় থাকলে আমরা তাকে জোর করে ফেরত না পাঠানোর জন্য দ্বিতীয় দেশটির কাছে আহবান জানাবো।

বিবিসি থেকে বাংলাদেশ সরকারের পূর্ত মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এ ব্যাপারে। রফিকুল ইসলাম মিয়া যা বলেন তা হল, তসলিমা আসলে কোথায় আছেন সরকার তা জানে না। কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সংসদে এ কথা বলেছেন। তসলিমা অ্যামনেস্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু সরকারের সঙ্গে কেন যোগাযোগ করছেন না! তাঁর বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলে, দেশের আইন অনুসারে তিনি নিজেকে স্বাভাবিকভাবেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সোপর্দ করবেন। এছাড়া তিনি আদালতের মাধ্যমে জামিনের আবেদন করতে পারেন। তসলিমা যদি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন, তবে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তারা তসলিমার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। তসলিমাকে কেউ হত্যার হুমকি দিয়েছে, এ খবর সরকারের জানা থাকলে নিশ্চয়ই তাকে যারা হুমকি দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেবে।

আমার ভাল লাগে ভাবতে যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মত বড় একটি সংস্থা আমার জীবন বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করছে। এতে কি কাজ হবে? ঝ বলেন, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রশ্ন, দেশে দেশে কত মানুষকেই তো অত্যাচার থেকে বাঁচাতে অ্যামনেস্টি চেষ্টা করে। অ্যামনেস্টি কি সকলকে বাঁচাতে পারে? পারে না তো। অ্যামনেস্টির আবেদন কি সব দেশের সরকারের কানে ঢোকে? ঢোকে না তো! ঢুকলে দেশে দেশে বর্বরতা জন্মের মত শেষ হত।

ঝর হাতেই দিয়েছিলাম অ্যামনেস্টির কাছে লেখা আমার চিঠিটি গত পরশুদিন। ঝ আমাকে বলছিলেন এভাবে মরার মত বসে না থেকে চেষ্টা করতে কিছু। চেষ্টা করার

আছে কি আমার! অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, লেখক সংগঠন পেন ফতোয়ার পর আমাকে চিঠিপত্র পাঠিয়েছিল। তারা যেহেতু আমাকে সাহায্য করার জন্য নিজ দায়িত্বেই এগিয়ে এসেছিল, তাদেরকেই জানানো যেতে পারে যে পারলে যেন আমাকে সাহায্য করে এবার। এখনই আমার সত্যিকার সাহায্য প্রয়োজন। ঝ ফ্যাক্স করে দিয়েছেন অ্যামনেস্টির কাছে লেখা চিঠিটি। আদৌ চিঠিটি কারও হাতে পৌঁছবে কি না, আদৌ চিঠিতে কোনও কাজ হবে কি না, তা না জেনেই শেষ চেষ্টা করার মত লিখেছিলাম চিঠি, পারলে আমাকে যেন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে, যেন আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে বলে। কিন্তু সরকার মুখে যতই কথা বলুক, কি করে বিশ্বাস করতে পারি যে এই সরকার আদৌ আমাকে কোনও নিরাপত্তা দেবে! ঝকে বলি, তাহলে আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করিই না হয়। ঝ বলেন, তোমার মাথা খারাপ হলে যাও।

---*কেন, এখন তো ঠেলায় পড়ে সরকার থেকে বলা হচ্ছেই যে আমি চাইলে আমাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।*

---*বলেছে তো ঠিক। কিন্তু আদালতে যাবেই বা কোন সাহসে? সরকার তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার আগেই যদি মোল্লারা তোমাকে খুন করে বসে!*

---*আমাকে নিরাপত্তা দিক তা হলে, আমি যাই আদালতে।*

---*তুমি আসামী। হুলিয়া জারি হওয়া আসামীকে কেউ কি নিরাপত্তা দিতে আসে নাকি! ওরা বলছে, তুমি আদালতে আত্মসমর্পণ করবে, তারপর প্রচলিত আইন অনুযায়ী তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে ওরা। কথাটি ওরা বলছে, কিন্তু মানবে যে তার গ্যারেন্টি কি?*

---*কিন্তু এ ছাড়া আর তো উপায়ও নেই। এ কাজটিই আমাকে যে করেই হোক করতে হবে।*

ঝ বললেন---*তোমার উকিলের পরামর্শ ছাড়া কিছুই করা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না।*

---*কিন্তু ক সেদিন তো আমাকেই ডিসিশন নিতে বললেন। উকিলও নাকি বলেছেন।*

---*তোমার উকিল তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বললেও তুমি তা নিতে যেও না। এই ভুলটা কোরো না। এখন উকিলকেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও। উকিলের ওপরই ছেড়ে দাও সব।*

এদিকে তসলিমাকে ফাঁসি দেওয়ার দাবিতে ২৯ জুলাই তারিখে যে লং মার্চ হবে, এবং মানিক মিয়া এভিন্যুতে যে মহাসমাবেশ, তা সফল করার জন্য দেশ ক্ষেপে উঠেছে। ৩০ জুনের হরতাল সফল হওয়ার পর প্রবল উত্তেজনায় ইসলামপন্থীরা এখন লাফাচ্ছে। সত্যিকার লাফানো যাকে বলে। দেশ জুড়ে সভা হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে। ইসলামী নেতারা এক শহর থেকে আরেক শহরে সফর করছেন বিশাল বিশাল জমায়েতে তসলিমার ফাঁসি হওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে। নেতারা সবখানেই সাদর সম্বর্ধনা পাচ্ছেন। বিস্তর হাততালি মিলছে তাঁদের। তাঁরা ঘোষণা দিচ্ছেন, সেদিন,

মানে ২৯ জুলাই তারিখের সফলতা প্রমাণ করবে যে এ দেশে কোরানের সম্মান সুরক্ষিত হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে কোরানের বিধান।

প্রতিদিন সারাদেশে সভা মিছিল হচ্ছেই, হচ্ছেই ২৯ জুলাইএর লং মার্চের জন্য। ২৯ জুলাই এর লং মার্চ সফল করার জন্য ব্যাপক আয়োজন চলছে। কোনও নগর বন্দর শহর গ্রাম বসে নেই, প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা সকলের মধ্যে। কোনও শহর নেই দেশে যে শহরে লং মার্চের জন্য সভা বা মিছিল হচ্ছে না। কোনও গ্রাম নেই দেশে, যে গ্রামে লং মার্চ সফল করার পোস্টার পড়ছে না। কোনও এলাকা নেই দেশে, যে এলাকায় মানুষেরা তসলিমাকে ফাঁসি দেবার স্বপ্ন দেখছে না।

গতকাল জুম্মার নামাজ শেষে দেশের প্রতিটি মসজিদে ২৯ জুলাইয়ের লংমার্চ সফল করার লক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। খবরটি ঝর মুখে প্রথম শুনি। পরে অবশ্য পত্রিকার পাতাতেও দেখি। বড় বড় মসজিদের দোয়া সমাবেশে লং মার্চের বড় বড় নেতা ভাষণ দেন। তসলিমার মৃত্যু কামনায় আল্লাহর দরবারে হাত ওঠানো হয়।

---*বদমাশগুলো এখন খতিবকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।* ঝ বলেন।

---*কি রকম? খতিব আবার মরলো কবে?*

---*ওই যে বলেছিল যে সংসদে কেউই মুসলমান নয়। এখন মৌলবাদ-বিরোধীরা বলছে খতিব সংসদকে অপমান করেছে। খতিবের শাস্তি হওয়া উচিত। শুনে মৌলবাদীরা বলছে, বিশেষ করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর কথা, যে, তাঁকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে আর জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।*

গান চলছে, গানের আড়ালে কথা বলছি আমরা। খেতে খেতে কথা বলছি। এক থালা থেকে ভাত তুলে খেতে খেতে কথা। ঝর থালা থেকে খেয়ে খেয়ে এখন অভ্যেস হয়েছে, আলাদা পাতে কি করে খেতে হয়, বোধহয় ভুলেই গেছি। গান চলতে থাকলেই কেবল কথা বলতে হয় আমার। এতেও এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে গান থেমে গেলে কথাও আমার থেমে যায়। বাড়ির সকলে জানে যে ঝ আজকাল এ ঘরে একা বসে তাঁর খাবার খান, সকলে জানে যে ঝ একা একা অনেক রাত পর্যন্ত গান শোনেন, জানে যে ঝর কিছু হাতে গোনা বন্ধু বান্ধবকে ওপরের এই ঘরটিতে ডেকে আনা হয়, এ ঘরে বসেই তাঁরা কথা বলেন। বাইরের বন্ধুরা চলে গেলে ঝ এই ঘরে একা একা গান শোনেন আর ছবি আঁকেন। জানে যে ঝ ছাড়া এ ঘরটিতে আর কোনও প্রাণী নেই।

---*মৌলবাদীরা ঠিক কম্যুনিস্টদের মত কাজ করছে।* আমি বলি।

ঝ জোরে হেসে উঠে বললেন---*এরা তো একজন আরেকজনের শত্রু।*

আমি বলি---*কম্যুনিস্ট পার্টি যেভাবে কাজ করত, যেরকম অরগানাইজড ছিল তারা, যেরকম কমিটেড, মৌলবাদী সংগঠনগুলো ঠিক তাই, তারা কম্যুনিস্ট পদ্ধতিটা ব্যবহার করছে।*

ঝ বললেন---*তা ঠিক। এদিকে কম্যুনিস্টরা হয়ে গেছে ফাঁকিবাজ।*

কতটুকু ফাঁকিবাজ হয়েছে অথবা আদৌ হয়েছে কি না সে নিয়ে আমাদের আলাপ বেশি এগোয় না কারণ দরজায় ঝর বাড়ির কাজের এক মেয়ে এসে দরজায় টোকা

দিয়ে বলে, বাড়ির দরজায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ঝর সঙ্গে দেখা করতে। ঝ দ্রুত উঠে যান। বাইরে থেকে এ ঘরের দরজায় তালা লাগাতে ঝ ভোলেন না।

অনাকাঙ্খিত কারও উপস্থিতি আমাদের আতঙ্কিত করে। কোনও অচেনা আগন্তুক এ বাড়ির দরজায় দাঁড়ালে অবশ্যই আশঙ্কা হওয়ার কথা। কে এসে দাঁড়িয়েছে, সে আমি জানি না। আমি কান পেতে থাকি, কোনও অশোভন শব্দ ভেসে আসে কি না। আশঙ্কায় কান পেতে থাকি। খোপের দিকে চোখ চলে যায় বারবার। দোতলার বারান্দায় কথাবার্তা হচ্ছে কোনও, শব্দ কানে আসে। কিন্তু অনুমান করতে পারি না, কি কথা। কি কথা কার সঙ্গে! ঘন্টা খানিক পর ঝ দুমিনিটের জন্য এসে বলে যান, তাঁর এক আত্মীয় এসেছিল, দুদিন থাকার ইচ্ছে নিয়ে এসেছিল আত্মীয়টি, তাকে নানা কৌশল করে বিদেয় করেছেন তিনি।

রাতে ঝ আর এ ঘরে আসবেন না। সারারাত আমাকে অন্ধকারে স্থির শুয়ে থাকতে হবে, সারারাতই আশঙ্কারা আমার চারপাশে নৃত্য করবে, এরকমই জানি। এরকমই হয় আমার একাকী রাতগুলোয়। কিন্তু রাত তখন কত জানি না, আমাকে চমকে দিয়ে ঝ দরজা খুলে ঢোকেন। হাতে তাঁর ছোট্ট একটি টর্চ। ঝর পেছনে ঙ, ঙর পেছনে যে মানুষটি, তাঁকে দেখে নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তিনি শামসুর রাহমান। ভালবাসায় আবেগে কাউকে জড়িয়ে ধরার অভ্যেস আমাদের নেই। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে শামসুর রাহমানকে জড়িয়ে ধরতে, তাঁর কাঁধে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে। শামসুর রাহমান, ঙ, ঝ সব মেঝেয় বসে গেলেন। ঘরের আবছা আলোর বাতিটি জ্বেলে দেওয়া হল। আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন শামসুর রাহমান, আমার একটি হাত তাঁর হাতে। এই হাতটি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে, এই হাতটি আমাকে নির্ভরতা দিচ্ছে, অভয় দিচ্ছে। আমরা দুজন কেউ কোনও কথা বলছি না। কেবল তাকিয়ে আছি দুজন দুজনের দিকে। আমাদের চোখে নিশ্চয়ই কোনও ভাষা আছে, যা আমরা পড়তে পারছি। আমরা তো জানি আমাদের কথা। আমরা তো জানি কি ঘটে যাচ্ছে আমাদের জীবনে। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত দুজন সৈনিক যেমন করে নিজেদের দিকে তাকায়, যে সহমর্মিতা নিয়ে, যে উৎকণ্ঠা আর আশাহীন বেদনা নিয়ে, যে কষ্ট আর যন্ত্রণা নিয়ে, তেমন করে আমরা তাকিয়ে আছি। নীরবতা ভাঙলেন ঙ।

---*যেদিন আমি শামসুর রাহমানকে বললাম তুমি কোথায় আছো তা আমি জানি, তারপর অনেকদিন তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আজ হল সুযোগ।*

শামসুর রাহমান ধীরে মৃদু কণ্ঠে বললেন---*তুমি কিছু মনে করো না সেদিনের সেই ফোন রেখে দেওয়ার জন্য। আমি খুব নার্ভাস ছিলাম।*

আমি বললাম---*রাহমান ভাই, আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। আমি খুব ভুল বুঝেছিলাম আপনাকে। আমার মাথার ঠিক ছিল না তখন!*

---*বুঝি। বুঝতে পারি সব।*

একটু থেমে, আগের সেই ভুল বোঝাটিকে মন থেকে বিদেয় করি।

---*কী হচ্ছে রাহমান ভাই এসব? এসব কী হচ্ছে দেশে?*

---*কি বলব বল। ভাষা নেই কিছু বলার।*

---*আমি কি বেঁচে থাকতে পারব রাহমান ভাই? নাকি ওরা আমাকে সত্যিই মেরে ফেলবে?*

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন শামসুর রাহমান। চোখ তাঁর ছলছল করে।

---*যদি ব্লাসফেমি আইন পাস হয়ে যায়!*

---*তাহলে আমাদের সবাইকেই মরতে হবে।*

---*এই যে মোল্লাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে এখন, এতে কি ঠেকানো যাবে না ব্লাসফেমি আইন?*

---*আন্দোলনে কতটুকু কাজ হবে জানি না। চেষ্টা তো করছি কিছু করতে। খালেদা জিয়ার সরকার দেশটাকে ধ্বংস করে দিল। মোল্লাদের পক্ষে কাজ করছে। তাই তো দেশসুদ্ধ যা ইচ্ছে তাই করছে মোল্লারা।*

দেশ নিয়ে আমাদের আরও কথা হতে থাকে। রাজনীতির আরও গভীর আলোচনা হতে থাকে। ধীরে ধীরে এমন হয় যে আমি ভুলে যাই যে আমি এখন পলাতক, আমার সামনে ফাঁসির দড়ি। ভুলে যাই যে একটি ভয়াবহ অনিশ্চিত জীবন আমার। যেন আমি আগের আমি। আগের আমি যেমন করে শামসুর রাহমানের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতাম যে কোনও বিষয়ে, দেশ সমাজ রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতি, তেমন গল্প করছি। দুচোখে স্বপ্ন আমাদের। সত্যিকার একটি গণতান্ত্রিক সেকুলার রাষ্ট্রের স্বপ্ন, বৈষম্যহীন একটি সুস্থ সমাজের স্বপ্ন। কোনও নির্যাতন নেই, অত্যাচার নেই, অন্যায় নেই, দুর্নীতি নেই, উৎপীড়ন নেই এমন জীবনের স্বপ্ন। হঠাৎ সেসব হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলো ফিরে আসতে থাকে আমার মধ্যে। নিজের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে নিজের মৃত্যুভয়টি নিয়ে বেঁচে থাকা আমি অন্যরকম হয়ে উঠি। বেশিরকম আমি হয়ে উঠি। শামসুর রাহমান আমার প্রাণটি আমার দৃঢ়তাটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যান। যান, যেতে হয় তাঁকে। যান অনেক রাতে।

সেই রাতেই ঝকে বলি, আমি ছবি আঁকব।

ঝ জিজ্ঞেস করলেন---*ছবি আঁকতে জানো তুমি।*

---*জানি না কিন্তু চেষ্টা করব।*

---*কি ছবি আঁকবে?*

---*তোমাকে।*

---*আমাকে?*

---*তোমার একটি ছবি দাও।*

ঝ একটি ক্যানভাস আর ছবি দিলেন। রঙ তুলি দিলেন। কি করে রং তুলিতে নিতে হয় শিখিয়ে দিলেন। আমি শুরু করে দিই। সারারাত আঁকি। যেন নতুন একটি জীবন আমার, এই জীবনের সঙ্গে গত প্রায় দুমাসের জীবনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। যেন ইচ্ছে করলেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও হেঁটে আসতে পারি। যেন কোথাও কেউ কখনও আমাকে মেরে ফেলার দাবি ওঠায় নি কোনওদিন।

সতেরো জুলাই, রবিবার

খবরের তো শেষ নেই। প্রতিদিনই ঘটনা, প্রতিদিনই খবর। **তসলিমা নাসরিনদের সংস্কৃতি দেশ ও সমাজকে কলুষতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে** ---- এই শিরোনামটিতে নজর পড়ে। ঘটনাটি কি? ঘটনা হল পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে মাদকবিরোধী এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু মাদকবিরোধী অনুষ্ঠানে তসলিমা-প্রসঙ্গ কি করে ওঠে? ওঠে। ওঠাতে চাইলেই ওঠে। দেশের সর্বত্র যখন এই প্রসঙ্গ যে কোনও কিছুতেই উঠছে, তবে মাদকাসক্তি থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষার জন্য যে বক্তৃতা সেখানে উঠবে না কেন! উঠছে ধর্ম প্রসঙ্গে। রফিকুল ইসলাম মিয়ার বিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ না থাকলেই লোকে মাদকদ্রব্য সেবন করে। ধর্মীয় মূল্যবোধটি নষ্ট করল কে? নষ্ট করেছে তসলিমা। তাই দেশে মাদকাসক্তি বাড়ার কারণটিও তসলিমা। দেশে খুন হত্যা সন্ত্রাস যা কিছুই ঘটবে, তার সবকিছুর কারণ তাহলে তসলিমা। কারণ তসলিমা ধর্ম মানে না। ধর্ম না মানলে যত মন্দ কাজ আছে সমাজে, সবই করে লোকে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে রফিকুল বললেন, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, এটা কোরানের কোথাও লেখা নেই, এ নিতান্তই কোরানের বিরুদ্ধে প্রচারণা, ধর্মকে আঘাত করে, ধর্মের অবমূল্যায়ন করে কেউ কিছু লিখবেন না, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবেন না, এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মের ওপর আঘাত সহ্য করে না, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করার জন্য একটা মহল তসলিমাকে নিয়ে মাতামাতি করছে, এরা সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। যে কথাটি জোর দিয়ে পূর্তমন্ত্রী বলেছেন তা হল, তসলিমা নাসরিনদের মত লেখকদের লেখার কারণে মানবসভ্যতা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের তথাকথিত সংস্কৃতি দেশ ও সমাজকে কলুষতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। *শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার* এই সব বক্তব্য সভ্যতার চিহ্ন নয়। এরা সভ্যতাকে ধ্বংস করতে চায়।

তাহফিজে হারমাইন পরিষদের সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমেদ সিদ্দিকী বিবৃতি দিয়েছেন, কোরান হাদিসের অবমাননাকারী তসলিমা ধর্মদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরও সরকার রহস্যজনক কারণে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। আজ এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে তসলিমা নাসরিন ভারতের হাতের পুতুল। সে আত্মগোপন অবস্থায় বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে যাচ্ছে, অথচ সরকার তাকে খুঁজে পাচ্ছে না ড়ড এ কথা মানা যায় না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সরকার ভারতকে অখুশী করতে চায় না।

এসব খবর আমি শুনতে চাই না, সামান্য হলেও দেখতে চাই কিছু একটা ঘটছে দেশে, দেশটি মৌলবাদীদের হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছে না, আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে, দেশটিতে এখন ইসলামী শাসন কায়েম হবে, আল্লাহর আইনে চলবে দেশ,

মেয়েদের ঘরবন্দি করা হবে, পান থেকে চুন খসলে পাথর ছুঁড়ে মারা হবে। না, আমি ভাবতে চাই না আর কি কি হবে। অন্যরকম কিছু একটা দেখতে চাই। কতটুকু সত্য তা জানি না, কিন্তু আজকের কাগজ, যে কাগজটি মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনের কথা যে করেই হোক লেখে, লিখেছে মৌলবাদী শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে দেশে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রস্তুতি চলছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রসমাজ সচিবালয় ঘেরাও করবে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মৌলবাদ বিরোধী পক্ষ পালন করবে। একাত্তরের ঘাতক বিরোধী আন্দোলনের জাতীয় কেন্দ্র জাতীয় সমন্বয় কমিটি নিয়মিত বৈঠক করছে। নারী সংগঠনগুলো ব্যাপক কর্মসূচির কথা ভাবছে। এই ভাবাভাবির পর পত্রিকার মন্তব্য, জামাত বনাম অন্যান্য ধর্মান্ধ শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের যে লড়াই লক্ষ করা যাচ্ছে, মৌলবাদী শিবিরে অনৈক্যের এই প্রধান দুর্বলতার কথা মাথায় রেখে প্রগতিশীল সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে ঐক্যের কোনও বিকল্প নেই, এই দাবি এখন দেশের সর্বত্র।

দেশের সর্বত্র কি এই দাবি? না। ঠিক নয়। এই দাবি অল্প কিছু মানুষের, যারা বুঝতে পারছে এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই দেশটিকে রক্ষা করার।

রাতে জ ঘরে ঢুকলেন তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে। জ বললেন যে বন্ধুটি প্রগতির পক্ষের লোক, যদিও সরকারি চাকরি করেন। এই বন্ধুটির ওপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলেই তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন। ঝ আপত্তি করেননি, আমি তো করিইনি। জর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তাঁকে ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। বন্ধুটি আমাকে বলেন--- *আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মোল্লারা আপনাকে কখনই মারবে না। কারণ আপনাকে মারলে তাদের রাজনীতি করার কোনও ইস্যু থাকবে না। আপনাকে আর যারাই মারুক, মোল্লারা চাইবে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে।*

যুক্তিটি খুব খারাপ দেননি তিনি। কিন্তু এতে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! মৌলবাদী নেতারা না হয় আমাকে একটি জব্বর ইস্যু ভাবছে, রাজনীতি তাদের উদ্দেশ্য, ক্ষমতা দখল করা উদ্দেশ্য কিন্তু শত শত রাজনীতিঅজ্ঞ ধর্মান্ধ লোকও দলে আছে, ধরা যাক সেসব কোনও লোক অথবা মাদ্রাসার কোনও ছেলে, যে ছেলে রাজনীতি বা ইস্যু এসব এখনও শেখেনি, যাকে তার নেতারা বার বার বলেছে যে তসলিমা ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলছে, তার মৃত্যু হওয়া উচিত, শুনে শুনে ছেলে বিশ্বাস করেছে যে আমাকে মারলে সে বেহেসতে যেতে পারবে, সে কেন আমাকে খুন করতে চাইবে না!

বন্ধুটি এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন না। সারা মুখে চিকচিক একটি আনন্দ নিয়ে বলেন---*সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ আজ সচিবালয় ঘেরাও করেছে। কোনও কোনও শহরে নাকি ডিসি অফিসও ঘেরাও করেছে। ছাত্রসমাজ কিছুতেই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আর বাড়তে দেবে না।* বললেন জর বন্ধু।

আচ্ছা, আমি উদাসীন স্বরে বলি---মৌলবাদীদের কেন আজকাল সাম্প্রদায়িক শক্তি বলা হয়?

---তারা সাম্প্রদায়িক, তাই সাম্প্রদায়িক বলা হয়।

---কিন্তু তারা কি কেবলই সাম্প্রদায়িক? আর এখন তো কোনও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি হচ্ছে না যে তাদের সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করতে হবে!

---তাহলে কি বলা উচিত তাদের? জর বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন।

---ইসলামী মৌলবাদী বা ইসলামিক বা ধার্মিক বা ধর্মীয় শক্তি এধরনের কিছু। ধর্মীয় মৌলবাদী হলেই তো সাম্প্রদায়িক হয়, প্রগতিবিরোধী হয়, নারীবিরোধী হয়। আলাদা করে তাদের তো আর সাম্প্রদায়িক বলে ডাকার প্রয়োজন হয় না।

জ বললেন---সাম্প্রদায়িকতা এ দেশে খুব ঘটে বলেই সম্ভবত ওদের সাম্প্রদায়িক বলা হয়।

আচ্ছা! খানিক থেমে আমি বলি---সাম্প্রদায়িকতা মানেটা কি? ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের ঘৃণা করা, এই তো! কিন্তু সম্প্রদায় বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে? হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তাই তো!

সকলে মাথা নাড়েন।---হ্যাঁ তাই।

---তার মানে সম্প্রদায়টা ধর্মের ভিত্তিতে আমরাই সৃষ্টি করে দিচ্ছি। তার মানে আমরা বলে দিচ্ছি গৌতম রায় আর গোলাম হোসেন দুই বন্ধু, একই সঙ্গে একই আদর্শে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারা ভিন্ন, কারণ তারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে এই যে এক একটি সম্প্রদায়ভুক্ত করে ফেলা, আলাদা করে ফেলা, এই ব্যাপারটিই, এই মানসিকতাটিই তো সাম্প্রদায়িক। ধর্ম আমাদের কাছে বড় হচ্ছে কেন?

---তাহলে তাদের কী বলে ডাকবেন, সেই মুসলমানদের, যখন তারা হিন্দুদের অত্যাচার করে?

---তারা মুসলমান বা বৌদ্ধের বিরুদ্ধে অত্যাচার করলে কি বলে ডাকা হবে? অত্যাচারী। মানবতাবিরোধী। এ-ই কি যথেষ্ট নয়?

---না। যথেষ্ট নয়। জর বন্ধু বললেন ---কারণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে যদি কাউকে ঘৃণা করা হয়, অত্যাচার করা হয়, তবে সেটি এত জঘন্য যে তাদের কেবল অত্যাচারী বললে কম বলা হয়।

---কম বলা হয় না। মানবতাবিরোধী বা মানববিরোধী শব্দটি তো সাম্প্রদায়িক শব্দের চেয়েও অনেক কুৎসিত, অনেক নিষ্ঠুর। আমার মনে হয় সম্প্রদায়ের ভাগটা ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়। হওয়া উচিত আদর্শ বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে। যেমন সেক্যুলার সম্প্রদায় আর মৌলবাদী বা ফাণ্ডামেন্টালিস্ট সম্প্রদায়।

---কিন্তু যারা এই দুই দলের কোনও দলে পড়ছে না। তাদের কি করবেন? যারা সেক্যুলারও নয়, ফাণ্ডামেন্টালিস্টও নয়? জর বন্ধু জিজ্ঞেস করেন।

---বিরোধ তো আসলে দুটো দলেই। সেক্যুলার আর ফাণ্ডামেন্টালিস্টের মধ্যে কনফ্লিক্ট হচ্ছে। এখন না সেক্যুলার না ফাণ্ডামেন্টালিস্ট লোকেরা হয় দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখবে, নয়ত কোনও একটি পক্ষ নেবে।

ঝ, জ, জর বন্ধু একে অপরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করেন।
হঠাৎ কোনও প্রসঙ্গ ছাড়াই আমি একটি প্রশ্ন করি--- *শব্দের কথাই যখন হচ্ছে, বলেন তো বর্ণবাদী আর সাম্প্রদায়িক এই দুটো শব্দের মধ্যে কোনটিকে বেশি খারাপ বলে মনে হয়?*
জ বলেন --- *আমার কাছে তো সাম্প্রদায়িককেই বেশি জঘন্য মনে হয়।*
বাকি দুজনের কাছেও তাই।
আমি চুপ হয়ে যাই। নিজের বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো দুহাতে জড়ো করতে থাকি একটি বিন্দুতে।

আঠারো জুলাই, সোমবার

সারাদিন ছবি আঁকি। ঘোরের মধ্যে ছবি আঁকি। সারাদিন ঝর দেখা নেই। সারারাত দেখা নেই। রাত দশটার দিকে এক থালা ভাত নিঃশব্দে দরজার তল দিয়ে চলে আসে ঘরে। ক্ষিধে তৃষ্ণার বোধ তখন আর নেই আমার। ভাত ভাতের মত পড়ে থাকে। আমি আমার মত।
গভীর রাতে অন্ধকারের সঙ্গে কানাকানি কথা বলতে বলতে আমার শব্দ সব ফুরিয়ে যেতে থাকে। খুব আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে আমার। হঠাৎ করে আমার খুব বিশ্বাস হয় যে দরজা খুলে পরদিন বা তার পরদিন বা তার পরদিন কেউ যদি ঢোকে এ ঘরে, তবে আমার শরীরটি দেখবে পড়ে আছে শক্ত হয়ে, শরীর আছে শরীরের ভেতর শুধু প্রাণটি নেই।

উনিশ জুলাই, মঙ্গলবার

আমেরিকা রাগ করেছে। আমেরিকার দূতাবাস ঘেরাও অভিযানের খবর পেয়ে রাগ। আমেরিকার দূতাবাস মোল্লারা বলেছিল বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, তাই রাগ। রেগে মেগে বলেছে, দেখ বাপু আমরা তোমাদের দাতাদেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, সুতরাং বুঝে সুঝে চল। আমরা যে বটমলেস বাস্কেটকে সাহায্য দিয়ে যাবো প্রতিবছর, তার তো কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো আবারও বলছি, মন দিয়ে শোন। ১. সাহায্য গ্রহীতা দেশে মার্কিন বিরোধী প্রচারণা চলবে না। ২. সাহায্য গ্রহীতা দেশে মার্কিন জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে হবে। ৩. বাংলাদেশের মানবাধিকার সংরক্ষণ, জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

এসব যদি না মেনে চলে বাংলাদেশ, তবে, আমেরিকা বলেনি যে এ দেশকে পারমাণবিক বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, বলেছে অসন্তুষ্ট হবে। পৃথিবীর একনম্বর পরাশক্তিকে নাখোশ করার ইচ্ছে হলেও সাহস অনেক দেশের নেই। না হোক, কিন্তু মৌলবাদীরা আজকাল কাউকে পরোয়া করছে না। তারা লং মার্চের সমর্থনে সভা সমাবেশের আয়োজন করেই চলেছে।

এবার বলছে, ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সব মতের অনুসারীদের রুখে দাঁড়াতে হবে। বলছে, ধর্মদ্রোহী বা নাস্তিকরা যা করছে, তা শুধু ইসলামের বিরুদ্ধেই নয়, ওরা বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী সকল মানুষের অন্তরেই আঘাত হানে। এসব ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক সকল ধর্মেরই শত্রু। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে সকল ধর্মমতের অনুসারীদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থেই ব্লাসফেমী আইন এবং ধর্মদ্রোহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা আগামী ২৯ জুলাইয়ের লং মার্চ ও মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে লং মার্চ প্রচার সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সময় সারাদেশে জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ, গণসংযোগ দেয়াল লিখন পোস্টারিং ও হ্যাণ্ড বিল বিতরণের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। ২৯ জুলাই সারা দেশ থেকে বাস ও লঞ্চে করে কাফেলা আনার জন্য এখন থেকেই জোরদার তৎপরতা চালানোর জন্য মোর্চার জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিরোধ মোর্চার পক্ষ থেকে আগামী ২২ জুলাই শুক্রবারকে দোয়া ও বিক্ষোভ দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। এ দিন ঢাকাসহ সারাদেশের মসজিদে ২৯ জুলাইয়ের লং মার্চ ও মহাসমাবেশের সফলতা কামনা করে বাদ জুমা বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। মোর্চার পক্ষ থেকে দেশের সকল মসজিদের খতিব ও ইমামদের জুমার খুৎবার আগে এই মহান কর্মসূচী সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বক্তব্য রাখার এবং বাদ জুমা মোনাজাত করার আহবান জানানো হয়। এছাড়া জুমার নামাজের পর প্রতিটি মসজিদে ও মহল্লা থেকে এর সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল বের করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ দিন বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেট থেকে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের করা হবে।

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের নেতারা সারা দেশে ছড়িয়ে গেছেন। অন্য ধর্মের মানুষদেরও সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করার ইচ্ছে ওদের। তা ঠিক, ধার্মিকে ধার্মিকে তো গোল বাঁধার কথা নয়, তাঁরা তো একই স্বার্থ নিয়ে পৃথিবীর পথে চলছেন। নরসিংদীতে মোর্চার সভাপতি বলেছেন, নাস্তিক মুরতাদরা যখন ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন কোনও ধর্মাবলম্বীরাই বাদ পড়ে না। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মের ওপরই আঘাত আসে। আসুন আমরা সকল ধর্মের অনুসারীরা নাস্তিক মুরতাদ তথা ধর্মদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে ওদের উৎখাত করি। তার পর আমরা এই মাটিতে সবাই স্বাধীনভাবে যার যার ধর্ম পালন করব। ইসলাম কারও ধর্মে আঘাত করে না। .. আল্লাহ রসুল ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী শক্তি কটূক্তি করবে আর আমরা ঘরে বসে থাকব তা হতে পারে না। শহীদ অথবা গাজি হবার অভিপ্রায় নিয়ে আলেম ওলামা ও পীর মাশায়েখরা খানকা ছেড়ে রাস্তায় নেমেছেন। বাতিল শক্তির পতন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ঘরে ফিরে যেতে পারেন না। আপনারা যে যার অবস্থান থেকে সকল বাধা অতিক্রম করে ২৯ জুলাইএর লংমার্চে যোগ

দিন, সেদিন ঢাকায় এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে যাতে নাস্তিক মুরতাদদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

দেশ আজ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি ইমানী আরেকটি কুফরি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে, এদেশে ইমানী শক্তি থাকবে না কুফরি শক্তি থাকবে। এই কথা অন্য বক্তারা বলেন। সারাদেশের বিভিন্ন মসজিদে মাওলানারা কোরান সম্পর্কে তসলিমার ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক গুরুত্বপূর্ণ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসীরা বাংলাদেশে নাস্তিক মুরতাদ ও ইসলামবিরোধী শক্তির সাম্প্রতিক ন্যাককারজনক অপতৎপরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সালমান রুশদির দোসর, সাম্রাজ্যবাদের দালালরা বাংলাদেশে যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে আমরা প্রবাসীরা তাতে উদ্বিগ্ন। কুখ্যাত তসলিমা নাসরিন আমাদের অন্যদেশী সাথীদের সামনে আমাদের মাথা নিচু করে দিয়েছে। আমরা আশা করি, সরকার অবিলম্বে তার শাস্তির ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের সুনাম রক্ষা করবেন।

ইসলামী ছাত্র পরিষদের নেতারা বলছেন, মৌলবাদ শব্দ মুসলমানদের জন্য অহংকারের বিষয়। মূল ছাড়া কোনও বস্তু বা জীব পরজীবী বা পরগাছা। এ দেশের তৌহিদী মুসলমানরা কোনও পরগাছা বা পরজীবী নন। তাদের বংশ পরিচয় আছে। তাছাড়া সৃষ্টিকর্তার সাথে রয়েছে তাদের গভীর সম্পর্ক। মানুষ হিসেবে যাদের মূল নেই তারা জারজ। তাই মৌলবাদ বলা হলে মুসলমানরা গর্ব অনুভব করে। যে মুহূর্তে কোরান হাদিস আল্লাহ রসুলএর ওপর আঘাত আসছে সে মুহূর্তে সকল আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ ও তৌহিদী জনতাকে এক মঞ্চ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামবিরোধী অপশক্তির মোকাবিলায় জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে হবে। সরকার দেশের ১১ কোটি মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নামকাওয়াস্তে তসলিমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে রেখেছে। অপরদিকে বিদেশি প্রভুদের খুশী রাখতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে বিদেশি প্রভুদের আস্তানায় তসলিমাকে হেফাজতে রেখেছে। সরকার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে তাকে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম আঁস্তাকুড়ে পতিত হতে হবে। সভায় তসলিমাকে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় তৌহিদী জনতা নিজেরাই আইনকে হাতে তুলে নেবে।

ইসলামী ছাত্রসেনা দল থেকে বলা হচ্ছে, যে, ধর্মদ্রোহীরা দেশ, জাতি, কোরান সুন্নাহ, নবী আওলিয়া ও পীর, আলেম ওলামার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতাপূর্ণ লেখা ও বক্তব্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুরতাদ তসলিমা নাসরিন ও তার সহযোগিরা আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও কোরান সুন্নাহ সম্পর্কে কটাক্ষ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে কোটি কোটি ঈমানদার মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। অথচ সরকার তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির ব্যাপারে তেমন আন্তরিক নয়। ধর্ম অবমাননা রোধ করে জাতীয় সংসদে কঠোর আইন প্রণয়ন করলে ধর্মদ্রোহীদের দুঃসাহসের অবসান ঘটবে।

কুড়ি জুলাই, বুধবার

১. তসলিমা নাসরিন চাইলে জার্মানি তাকে আশ্রয় দেবে, এই হল বিবিসির খবর। জার্মানির পররাষ্ট্র দপ্তরে গতকাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহমুদ আলীকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লাউস কিনকেল রাষ্ট্রদূতকে বলেন যে তসলিমাকে জার্মানি বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে কোনও দেশে সাদরে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তসলিমা যদি ভিসা চায়, তবে তাকে ভিসা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে জার্মানির দূতাবাসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্লাউস কিনকেল তসলিমার ব্যাপারে নিজ দেশের এবং ইউরোপীয়দের গভীর উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেন। বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যেন তসলিমাকে রক্ষা করেন এবং তিনি ইচ্ছে করলে তাঁকে দেশ ত্যাগের অনুমতি দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

২. ব্রাসেলসে ইওরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতরা তসলিমাকে সব রকম সহযোগিতা করবেন।

আমার বিশ্বাস হয় না খবরগুলো। আমি এখন ইউরোপের যে কোনও দেশেই যেতে পারব! থাকতে পারব! চাইলেই আমাকে যে কোনও দেশের ভিসা দেওয়া হবে! মাত্র দু তিন মাস আগেও ফ্রান্সের ভিসা পেতে আমার অনুরোধ কাজে লাগেনি, আমার কাছে আসা আমন্ত্রণ পত্রও কাজে লাগেনি। ফ্রান্স থেকে জিল গনজালেজকে নিজে আসতে হয়েছিল তদবির করতে। এমন যখন কঠিন পশ্চিম ইউরোপের ভিসা পাওয়া, সেখানে আমাকে সেধে দিতে চাইছে ভিসা! গরীব দেশের মানুষ বলে কাউকে পারতপক্ষে ধনী দেশগুলোয় ভ্রমণ করার জন্য ভিসা দেওয়া হয় না। মুক্ত পৃথিবী, বিশ্বায়ন ইত্যাদি কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তোলা হচ্ছে, কিন্তু সত্যিকার বিশ্বায়নের তো কিছুই হয়নি। মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণের অধিকার কজনের আছে। বিশ্বায়ন কোনও দরিদ্রের জন্য নয়। বিশ্বায়ন ব্যাপারটিই এখন ধনীদের। ধনীরা তাদের মাল সারা পৃথিবীতে অবাধে বিক্রি করে আরও অর্থ কামাতে চাইছে। পৃথিবীর দরিদ্রতম একটি দেশে যেখানে বছর বছর বন্যায় হাজার হাজার মানুষ মরে যাচ্ছে, দুর্ঘটনায়, সন্ত্রাসে শত শত মানুষ মরছে, যে দেশে আর যা কিছুর মূল্য থাক, মানুষের জীবনের মূল্য নেই, সেই দেশের এক লেখককে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে, তা নিয়ে আজ কেন এত উদ্বিগ্ন ধনী দেশগুলো! মানবাধিকার সংস্থাগুলো চেঁচাচ্ছে বলে! লেখক সংগঠনগুলো তাগাদা দিচ্ছে বলে! নাকি পশ্চিমের পত্রিকায় খবরগুলো কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে বলে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক সরকার নিজেরাই মানবাধিকার রক্ষাকারী হিসেবে নাম কামাবার জন্য আমাকে রক্ষা করার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই আমার। আমার মন চাইছে না কোনও দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে। মন চাইছে দেশে থাকতে। দেশের মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে। মন যে কত কিছু চায়। মাঝে মাঝে অভিমানে বলে উঠি একেবারে সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করব। আবার এও মনে হয় যে না, যেমন ছিলাম তেমন থাকব, মৌলবাদের শেকড় বাকড় উপড়ে ফেলে সমাজটিকে সুস্থ আর সুন্দর করব।

মনের কথা আমি কাকে বলি!
আজ প্রায় সব পত্রিকাগুলোয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের খবরটি শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন শিরোনামে, তসলিমার নিরাপত্তার জন্য জার্মানীসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের পরামর্শ। ইনকিলাব। তসলিমা নাসরিন চাইলে জার্মানী তাকে আশ্রয় দেবে। সংবাদ। তসলিমার নিরাপত্তার ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্বেগ। ইত্তেফাক। ইউরোপীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা তসলিমাকে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ভোরের কাগজ। ইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অনুরোধ, তসলিমা নাসরিনকে দেশ ত্যাগে সুযোগ দিন। আজকের কাগজ।

এই সব খবরের মধ্যে একটি অবাক করা খবর হল, শ্রীলঙ্কায় লজ্জা বইটি নিষিদ্ধ। ও দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে বলে নাকি বইটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লজ্জা পড়লে কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে তা আমার, কোনও চরম শত্রুও বলবে না। শ্রীলঙ্কায় পেঙ্গুইন ইন্ডিয়ার ইংরেজি অনুবাদটি গিয়েছে। পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া এই কদিনে নাকি ২০ হাজার লজ্জা বিক্রি করে ফেলেছে দক্ষিণ এশিয়ায়। শ্রীলঙ্কায় একশরও বেশি বই বিক্রি হওয়ার পরই এই নিষেধাজ্ঞা জারি হল।

ইনকিলাব এ দেশের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পত্রিকা। তার মানে সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা। ইনকিলাব প্রতিদিন লং মার্চ লং মার্চ জপছে। সাধারণ মানুষকে লং মার্চে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করছে। সত্যি কথা, ২৯ জুলাই লং মার্চ সফল করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে মৌলবাদীরা। রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সবাই এক মঞ্চ থেকে চিৎকার করছে। পুরো দেশটি তাদেরই হাতের মুঠোয় বলতে গেলে। মুঠো থেকে দেশ ছাড়াতে দেশের প্রথম ফতোয়াবাজ বিরোধী লেখক শিল্পী সমাবেশ হতে যাচ্ছে আগামীকাল। এই হতে যাওয়া সমাবেশ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, শামসুর রাহমান বলেছেন, লেখক শিল্পীদের এ ধরনের একটি সমাবেশের অবশ্যই সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। লেখক শিল্পীদের অনেকেই শিক্ষিত কিন্তু মৌলবাদ ফতোয়াবাজ প্রসঙ্গে তারা সচেতন নন। সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ ধরনের সমাবেশের একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। লেখালেখি, শিল্প চর্চা যাদের কাজ, তাদেরও আজকে মাঠের আন্দোলনে নামতে হচ্ছে, এটা দেশের একটি বিশেষ পরিস্থিতিকেই ফুটিয়ে তোলে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, লেখক শিল্পীদের সমাবেশের একটা সামাজিক প্রভাব আছে। মৌলবাদ ফতোয়াবাজ বিরোধী এ ধরনের সমাবেশ তো আগে কখনও হয়নি। সুতরাং তার সামাজিক প্রভাব থাকবেই। লেখালেখি শিল্পকর্ম চর্চার বাইরেও লেখক শিল্পীদের দায়িত্ব আছে। মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে জনগণও মনে করবে যে, তাদের মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রাম আরও জোরদার হচ্ছে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মন্তব্য, এই লেখক শিল্পী সমাবেশের উদ্যোগটি মহৎ। বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখক শিল্পীরা যে মৌলবাদ ফতোয়াবাজের বিরুদ্ধে, এই অনুষ্ঠান তাই প্রমাণ করবে।

মৌলবাদ ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা, প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ সময়ে তাদের অবস্থান কি, তা পরিষ্কার করবে।

সমাবেশটি সফল হোক, মনে মনে বলি।

একুশ জুলাই, বৃহস্পতিবার

ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ছাত্র সংসদের অভিষেকে শামসুর রাহমান বলেছেন, আমরা আজ চরম সংকটের মুখোমুখি। ছাত্র সমাজ সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ। আমাদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। তারা ভুল করলে জাতির বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। আওয়ামী লীগ ঐতিহ্যবাহী দল। তারা ভুল করলে বিভ্রান্তি দেখা দিলে আমাদেরকে তা শুধরাবার চেষ্টা করতে হবে। ভুলকে অনুসরণ করলে জাতির বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না। নতুন সভ্যতা, নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে, যেখানে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। জাতি এগিয়ে যাবে প্রগতির দিকে, কল্যাণের দিকে।

আজকের কাগজের সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদও আজকাল বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করছেন। নিজে তিনি আপাদমস্তক আওয়ামী-ভক্ত। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জিতেছে বলে অভিষেকের আয়োজনে আছেন তিনি। অদ্ভুত কথা বলেছেন ডড নামাজ আমরা পড়ব। ইমামতি আমরাই করব। কোরান নিজেরাই তেলাওয়াত করব। যে রকম আজকে এখানে একজন ছাত্রলীগ কর্মীকে কোরান তেলাওয়াত করতে দেখলাম। এ জন্য জামাতের দরকার নেই। ধর্মের জন্য আমাদের কোনও রাজাকার লাগবে না, দালাল লাগবে না। আমাদের দেশ বাংলাদেশ। আমরা বাঙালি। জাতির জন্মদাতা গর্ব সব কিছু বঙ্গবন্ধু। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বাঙালিত্ব, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। এ সব কিছুই আজ আমরা হারিয়েছি। এত কিছু কোনও জাতি হারায়নি। এসব অর্জন আবার ফিরে পেতে হবে। সুস্থ জাতি গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যে আজকের কাগজে আমরা কাজ করছি, লিখছি।

তা ঠিক বলেছেন কাজী শাহেদ। মাঝে মাঝে মনেই হয় না আজকের কাগজ কোনও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করছে। মৌলবাদীদের আন্দোলনের মিছিলের কোনও খবরই পত্রিকায় ছাপা হয় না। ছাপা হয় কেবল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কথা, মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের কথা। দশ হাজার মোল্লা রাস্তায় মিছিল করে এল, সেদিনই হয়ত দশজন মৌলবাদ বিরোধী লোক এক জায়গায় জমা হয়ে মোল্লাদের বিরুদ্ধে কিছু বলল। আজকের কাগজে ফলাও করে দ্বিতীয় ঘটনাটি ছাপা হবে। প্রথম ঘটনাটি কাজী শাহেদ বেমালুম উড়িয়ে দেবেন। সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ চরিত্রটি আজকাল খুব কম পত্রিকারই আছে। বেশির ভাগ পত্রিকার মালিকই কোনও না

কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য বা ভক্ত। পত্রিকাগুলো এক একটি দলের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। কোনও পত্রিকাই বলতে গেলে সত্যিকার নিরপেক্ষ নয়।
আরও অনেক খবর আজকে। আজকের পত্রিকায় খবরের শিরোনামগুলো পড়ি, ইত্তেফাক: প্রতিটি ঘরে তসলিমার সন্ধান করা হইবে। আজ মৌলবাদ বিরোধী লেখক শিল্পীদের সমাবেশ। ভোরের কাগজ: মৌলবাদীদের আস্কারা দেওয়া যায় না, ইসলামে মৌলবাদীদের স্থান নেই ডডতথ্যমন্ত্রী। আজ মৌলবাদ বিরোধী লেখক শিল্পীদের সমাবেশ। ইনকিলাব: তসলিমা নাসরিনকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবেডডব্যারিস্টার রফিক। ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণেই পশ্চিমারা তসলিমাকে সমর্থন দিচ্ছে ডড অ্যারাব নিউজ। বিভিন্ন সংগঠনের তীব্র নিন্দা, তসলিমার পক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ বরদাশত করা হবে না। দেশে সৃষ্ট গণজাগরণের মাধ্যমেই ইসলামী শাসন কায়েম হবেডডমুফতী আমিনী। ২৯ জুলাইর লং মার্চ সফল করার আহবান। লং মার্চে ইসলামী কাফেলার ঢাকা যাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। বাংলাবাজার: তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তা দিতে সরকারের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আবেদন। সংবাদ: তসলিমা সম্পর্কে ই-ইউর আবেদন সরকার পেয়েছে। মুসলিম সোসাইটির ঘোষণা, তসলিমাকে পৃথিবীর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত আরব নিউজ পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে,তসলিমা প্রসঙ্গটি পশ্চিমা দেশগুলোকে ইতিমধ্যে উত্তেজিত করেছে এবং তারা বাংলদেশের সরকারকে তসলিমার নিরাপত্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার আহবান জানিয়েছে। তসলিমা তাঁর লেখায় ইসলামী আইন পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছিল এবং ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বিদ্রূপ করেছিল। এর পরেই আন্তর্জাতিক প্রেস ফ্রীডম ও মানবাধিকারের এই স্বঘোষিত অভিভাবকরা তসলিমার উকিল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটি একটি নাটক। এই নাটক তসলিমার নিজের সৃষ্টি, যেন সে যুক্তরাষ্ট্র গমনের সুযোগ পায়। এরপর আমেরিকার সাহিত্য সভাগুলোতে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পাবে, বই প্রকাশ করবে এমনকি হিলারি ক্লিনটনেরও সাক্ষাৎ পাবে। মত প্রকাশ মানে জনগণের সেন্টিমেন্টে আঘাত করার লাইসেন্স নয়। যারা সংঘাতকে উস্কায় ও মদদ যোগায়, সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, তারা স্বাধীনতার নয়, নৈরাজ্যেরই প্রবক্তা। এদের শাস্তিই হওয়া উচিত। তসলিমা নাসরিনরা হল হাইড্রার মত মাথা বিশিষ্ট দানব। এদের একটি মাথা কাটলে দুটি মাথা গজায়। এদের গুরু সালমান রুশদি থেকে এরা শিখেছে কিভাবে দ্রুত পয়সা কামানো যায়। তৃতীয় বিশ্বে অনেক উচ্চাকাঙ্খী সাহিত্যিক সাংবাদিক রয়েছে যারা লন্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক এর আরাম আয়েশের জন্য যে কোনও কিছু করতে রাজি। এ সকল স্বপ্নিককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেখানে অনেক শীতলতা, অনেক ধূসরতা। প্রাথমিক ঔৎসুক্য নিভে যাওয়ার পর তারাও নিভে যাবে। চীনা প্রবাদ তো আছেই, আবাসত্যাগী সিংহ তো কেবল একটি কুকুর।

খবরটি বিএনপির পত্রিকা দিনকালে ছাপা হয়েছে। দিনকালের উদ্দেশ্য বিধেয়র সঙ্গে মৌলবাদী পত্রিকাগুলোর কোনও পার্থক্য নেই। ইনকিলাব আমাকে যে ভাষায় গালাগাল করে, দিনকাল ঠিক সে ভাষাতেই করে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো তসলিমা নাসরিনকে প্রয়োজনীয় সকল নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে এবং তিনি যদি দেশত্যাগে সম্মত হন তাহলে তাকে

অনুমতি প্রদানের জন্যও সুপারিশ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ ও সরকারগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আছে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি তারা তাদের পূর্ণ আস্থাও ব্যক্ত করেছেন।
তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেছেন, বর্তমান সরকার লেখার ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না। সরকার লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে লেখকের স্বাধীনতার নামে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে ব্যাপারটিকে ভেবে দেখতে হয়। অবাধ স্বাধীনতা সামগ্রিক অবস্থাকে কোথায় নিয়ে যায় তাও তলিয়ে দেখার সময় এসেছে।

ঘটনা যে কোনদিকে মোড় নিচ্ছে ঠিক বুঝতে পারি না। আমি বরং ছবি আঁকায় মন দিই। ছবি আঁকাই দেশের রাজনীতি বোঝার চেয়ে অনেক সহজ মনে হয় আমার।

রাতে আমার ছবি আঁকায় ব্যাঘাত ঘটে ঝর কারণে। ঝ এঘরে ভাত নিয়ে এলেন, ভাত খেয়ে সিগারেট ধরাবেন, পত্রিকায় চোখ বুলোবেন, কিছু কিছু খবর পড়বেন, খবর নিয়ে কথা বলবেন, আশঙ্কা বা আশায় দুলবেন, আমাকে দোলাবেন। ঝর সঙ্গে তাই হতে থাকে আমার। গরম গরম খাবার আর খবর। মুসলিম সোসাইটির ঘোষণাটি জানতে ইচ্ছে হয়। ঝর দিকে খবরটি ঠেলে দিই। গতকাল বুধবার সকালে বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটে ইয়ং মুসলিম সোসাইটি বাংলাদেশ আয়োজিত গণ সমাবেশে বলা হয়েছে, পৃথিবীর যেখানেই থাক, তসলিমা নাসরিনকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আগামী ২৯শে জুলাই ঢাকা অভিমুখে লং মার্চের আগেই তসলিমাসহ ধর্মদ্রোহীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে। অন্যথায় ঢাকার প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালিয়ে তসলিমাকে ধরা হবে।
তসলিমাসহ সকল ধর্মদ্রোহীর ফাঁসি, ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন, এনজিওদের অপতৎপরতা নিষিদ্ধসহ অন্যান্য দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল সহকারে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁস্থ কার্যালয়ে যাবার পথে পুলিশ বাধা দেয়। পরে একটি প্রতিনিধিদল সেখানে যায় এবং ১৭ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব ডঃ কামাল সিদ্দিকীর কাছে পেশ করা হয়। সমাবেশে ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চার সভাপতি মওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন, প্রতিরোধ মোর্চা এক লাখ লোকের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছে। প্রয়োজনে সোসাইটির পাঁচ হাজার কর্মী **সুইসাইড মিশনে** নাম লেখাবে। বিনা চ্যালেঞ্জে ধর্মদ্রোহীদের ছেড়ে দেওয়া হবে না। ঢাকা অভিমুখী ২৯শে জুলাইয়ের ইসলামী কাফেলার যাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আইনুদ্দিন বলেন, এখন পর্যন্ত তসলিমা ও আমরা একই সাথে বেঁচে আছি ডডএর থেকে লজ্জা আর কি হতে পারে? আজ আমাদের মা আয়শা মদিনার কবর থেকে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন, এ দেশের বিখ্যাত ৫/৬ জন বুজুর্গ রসুল(সাঃ)কে স্বপ্নে ফরিয়াদ করতে দেখেছেন। অতএব আর হাত পা গুটিয়ে দাবি জানাবো না। অন্য বক্তারা বলেন, লং মার্চের আগে তসলিমাসহ ধর্মদ্রোহীদের গ্রেফতার ও বিচার শুরু করতে হবে। ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন করতে হবে, অন্যথায় সোসাইটি কর্মীদের নিয়ে **ঢাকার প্রতিটি ঘরে তল্লাশি করে তসলিমাকে ধরা হবে।**

তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তা দিতে সরকারের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন আবেদন জানিয়েছে। বাহ! বেশ কথা। এখন নিরাপত্তা দেওয়া হোক তবে। আমি যখনই চাই আমাকে ভিসা দেওয়া হবে ইউরোপে যাওয়ার, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোনও দেশেই আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হবে। ---এই খবরটি দেখে ঝ উত্তেজিত। তিনি বারবারই বলছেন --- *তোমার তো এখন আর কোনও দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।*

---*কিন্তু..*

---*কিন্তু কি?*

---*ওরা যে বলছে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না! বলছে , একজন কুখ্যাত ও নির্লজ্জ মহিলার পক্ষে ওকালতি করে তথাকথিত সভ্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতরা ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ দেশে থেকে নির্লজ্জ মহিলাটি এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, কোরান হাদিস, নবী রাসুল ও পীর মাশায়েখগণের বিরুদ্ধে যে অশ্লীল মন্তব্য করে চলেছে, অথচ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি..*

ঝ ঝট করে কেড়ে নিয়ে আমার হাতের কাগজটি, বললেন---*বাদ দাও। ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না। ইনকিলাবের খবর তোমার পড়াই উচিত না।*

আমি বলি---*ইত্তেফাকের খবরও তো তাই। প্রতিটি ঘরে নাকি আমাকে সন্ধান করবে এখন। আমার প্রশ্ন, যদি পেয়ে যায়! পেয়ে গেলে তো..*

ঝনঝন করে ওঠেন ঝ---*আবারও ভাবছো এসব কথা!*

বড় শ্বাস ফেলে বলি ---*ভাবতে তো চাই না!*

---*তাহলে ভাবার দরকার কি? ভাবা বাদ দিয়ে দাও। ছবি কতদূর আঁকলে বল। ছবির কথা বল।*

ছবির কথা আমার বলা হয় না। বিচিত্র সব ছবি রচনা করতে থাকি কল্পনায়। মস্তিস্কে কুটকুট করে কামড়ায় কতগুলো অসভ্য শব্দ। ডডতসলিমা নাসরিনকে আশ্রয়দান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত উস্কানিমূলক এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশার বহিঃপ্রকাশ। তসলিমা নাসরিন বহিঃশক্তির ক্রীড়নক, তাহাকে আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতিই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। ইহা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের শামিল। এটুকু বলতে বা পড়তেই ইত্তেফাকটি আমার হাত থেকে নিয়ে যান ঝ।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকি দুজন। কিছুক্ষণ গানে, ধুমপানে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে মন দিয়ে আবার মন চলে যায় মুফতী আমিনীতে। কাল এক জনসভায় আমিনী বলেছেন, ইউরোপীয় গোষ্ঠী যদি তসলিমাকে রক্ষা করতে আসে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করবো। আমাদের আন্দোলনকে যারা সমর্থন দেবে, তিনি যে মতের বা ধর্মেরই হোক না কেন, তা আমরা সাদরে গ্রহণ করব। যে দাবিতে হরতাল হয়েছিল, তার একটিও সরকার মেনে নেয়নি। কোনও সরকারই তোহিদী জনতার দাবি মেনে নেয়নি। বর্তমান সরকারও মানছে না। তাই সরকারের কলম ভেঙে দিয়ে আমরা সে কলমের অধিকারী হয়েই দাবিসমূহ পূরণ করে নেব। এখন কেবল টুপিওলাদেরই নয়, টুপি ছাড়াদেরও দাবি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা।

ঝ মুফতি আমিনী নিয়ে ভাবছেন না, ভাবছেন উনত্রিশ তারিখে লং মার্চের কাফেলা নিয়ে। ঝর বিশ্বাস উনত্রিশ তারিখের আগে যদি কিছু একটা না হয়..

---*কিছু একটা না হয়? কিছু একটাটা কি?*

---*কিছু একটাটা হল তোমার যদি জামিন না হয়, তোমার যদি দেশ ছাড়া না হয়.*

---*না হলে কী হবে?*

---*না হলে অনেক কিছু হতে পারে।*

অনেক কিছু কি হবে তা ঝ আর বলেন না। বুঝি কি হবে। বুঝি যে আমার খবর যদি কোনওভাবে পেয়ে যায় ওরা, যদি হাতের কাছে পেয়ে যায়, বুঝি যে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে বা অন্য কোনও বুদ্ধি খাটিয়ে আমাকে যদি ধরে ফেলে ওরা, তবে তো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাহায্যের আর প্রয়োজন হবে না আমার জীবনে। কিছুরই আর কোনওদিনই আমার প্রয়োজন হবে না। বুঝি, ঝ নিঃশব্দে ভাবছেন এসব। তিনি আজ বা কালই, কাল না হলেও পরশু কিছু একটা ঘটুক চাইছেন। মনে মনে তিনি মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে রাখছেন মনে।

ভাবনাগুলো আমাদের আরও নিশ্চুপ করে রাখে। ঝ আর ঘুমোতে যান না দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে। এ ঘরেই শুয়ে থাকেন। সারারাত আমি ছবি আঁকি। সারারাত শুয়ে শুয়ে আমার ছবি আঁকা দেখেন ঝ। ক্যানভাসে ঝ। ঝ ক্রমশ সত্যিকার ঝর মতো দেখতে হচ্ছেন। বড় বিনয়-স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি ---*আদৌ কি কিছু হচ্ছে?*

ছবির দিকে মুগ্ধ তাকিয়ে থেকে বললেন ---*তুমি কত বড় লেখক আমি জানি না, তবে তুমি অনেক বড় শিল্পী। যদি বেঁচে থাকো..*

ঝ থেমে যান। আমি জিজ্ঞেস করি---*যদি বেঁচে থাকি, তবে কী ?*

ধীরে বলেন তিনি---*লেখালেখি যদি ছেড়ে দাও আমার কোনও আপত্তি নেই, তবে জীবনে ছবি আঁকাটা ছেড়ো না। তুমি অনেক বড় শিল্পী হতে পারবে।*

ঝর এই প্রেরণা আমাকে ব্যস্ত রাখে ছবি আঁকায়। আমাকে তিনি আরও ক্যানভাস, আরও রং, আরও তুলি এনে দেন।

বাইশ জুলাই, শুক্রবার

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন তসলিমা নাসরিনকে বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে হবে। সেটাই তার জন্য মঙ্গলজনক। আজকের কাগজের সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি টেলিফোনে তসলিমা বিষয়ে কথা বলেছেন। ইউরোপীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা লেখিকা তসলিমাকে বাংলাদেশের বাইরে যে কোনও দেশে যেতে দেবার যে আবেদন জানিয়েছে তার জবাবে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? বললেন, *আমরা এখনও এর জবাব চূড়ান্ত করিনি।* ৩০ জন মার্কিন সিনেটরসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তাঁরা অভিযোগ আনছেন যে লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে

মামলা করে সরকার মৌলবাদীদের সোচ্চার হতে সাহায্য করেছে। এর জবাবে সরকারের পক্ষ থেকে আপনি কি বলবেন? মন্ত্রী বলেছেন, ২৯৫(ক) ধারায় যে মামলাটি করা হয়েছে, সেই আইনটি বৃটিশরা অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে প্রণয়ন করে গেছেন। আজকে যদি সরকার নিজে মামলা না করত, তবে দেশের ৬৪টি জেলার কোর্ট থেকে কেউ না কেউ মামলা করে বসত। তখন মেয়েটার অবস্থা কি হত? এই আইনে তাই সরকারকেই মামলা করতে হয়েছে যাতে অন্যরা মেয়েটিকে হয়রানি করার সুযোগ না পায়। যদিও এই আইনটি নন বেইল-এবল, তবু কোর্টের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে মেয়েদের প্রতি উদার সিদ্ধান্ত নেবার। সরকার কি জামাত আর মৌলবাদীদের দাবি অনুসারে ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন করবে? আমি তো পার্লামেন্টে একবার বলেছি এই ধরনের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পার্লামেন্টই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি? সরকার এই মুহূর্তে কিছু ভাবছে না। তবে ভবিষ্যতে যে ভাববে না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। আমরা সর্বতোভাবে চাইব দেশের আইনগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবহার এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইনের সংরক্ষণ। দেশের মৌলবাদী তৎপরতায় দাতাদেশগুলোর ক্রমাগত উদ্বেগের ফলে দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে বিদেশি সাহায্য প্রবাহে কোনও অসুবিধে হবে কি? না অতটা খারাপ অবস্থা ঘটার মত দুর্ভাগ্যের কোনও কারণ দেশে ঘটেনি। দেশে মৌলবাদী শক্তিগুলো যে ক্রমাগত রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা করছে সেদিকে তাকিয়ে সরকার কি চিন্তিত? সরকারের জন্য তারা থ্রেট হয়ে উঠছে কি? তাদের এই তৎপরতা খুবই সাময়িক। সরকার বা বিএনপির জন্য তারা কোনও ফ্যাক্টর না। গোলাম আযমের ব্যাপারে আইন যেমন নিজস্ব ধারায় চলেছে, তেমনি তসলিমার ব্যাপারেও আইন নিজস্ব ধারায় চলবে। শেষ প্রশ্নটি ছিল, সরকার কি তসলিমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? মন্ত্রী এ ধরনের উদ্ভট খবরকে জোর গলায় নাকচ করেছেন।

মৌলবাদী শক্তিগুলোর তৎপরতা খুবই সাময়িক তা তিনি বলেছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে জানেন যে তা সাময়িক নয়। বিএনপির মধ্যে দুটো দল আছে, একটি নরমপন্থী আরেকটি কট্টরপন্থী। দুদলে দ্বন্দ্ব চলছে। কট্টরদের দলটিতেই বেশি লোক। নরম বলছে মৌলবাদীদের হরতাল রোধ করতে, ওদের আস্কারা না দিতে। কট্টর বলছে হরতাল হচ্ছে হোক, রোধ করার প্রয়োজন নেই। তা না হয় হল, বিএনপি কোনওকালেই এমন কোনও আদর্শবাদী দল ছিল না, দলটি জন্মের শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে গেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ চুপ করে আছে কেন এখন, প্রশ্নটি এখানেই। গতকাল প্রেসক্লাবের সামনে লেখক শিল্পীদের একটি সমাবেশে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করা হয়। সমাবেশে শামসুর রাহমান বলেছেন, ফতোয়াবাজ, মৌলবাদী ও ফ্যাসিস্ট শক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য নারী সমাজ ও মুক্তচিন্তার অধিকারী শিল্পী সাহিত্যিকরা। এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক শিল্পীকে সতর্কতার সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। ধর্মকে পুঁজি করে মৌলবাদীরা ক্ষমতায় যেতে চায়। তারা ক্ষমতায় গিয়ে দেশকে মধ্যযুগীয় অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। তারা আমাদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে। তাই লেখক শিল্পীদের আজ চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। এই লড়াইয়ে জয়ী হতেই হবে।..এই সরকার নিজেই মৌলবাদী। তাদের আচার আচরণ মৌলবাদীর মতই। যে দল স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল, আমাদের আশা সে দল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকবে এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবে। সেই দলের উদাসিনতার জন্য আজ মৌলবাদীরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে এবং মুক্তমতি লেখকদের ওপর হামলার পাঁয়তারা করছে। ফ্যাসিবাদী মৌলবাদী

অশুভ শক্তিকে স্তব্ধ না করা হলে সামনে সমূহ সর্বনাশ। এই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। ফ্যাসিবাদী-মৌলবাদী অশুভ শক্তিকে স্তব্ধ করার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সৈয়দ শামসুল হকও ছিলেন সমাবেশে। বলেছেন, সরকারি বা বিরোধী দল কেউই লেখকের চিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতার স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণকারীদের সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। যারা ক্ষমতায় যাবার এবং ক্ষমতায় থাকার রাজনীতি করছেন, তারা প্রকৃত অর্থে কাকে ক্ষমতাবান করছেন তা দেখতে হবে। সৈয়দ হাসান ইমাম বলেছেন, জামাত শিবির ফ্রীডম পার্টিসহ ধর্মব্যবসায়ীরা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নামে ফতোয়া জারি করেছে। অথচ সরকার নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় বসে আছে। ধর্মান্ধতার নামে তারা আবার রাস্তায় নেমেছে। মসজিদে মসজিদে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং ফতোয়া দিচ্ছে। আওয়ামী লীগ খুব ভুল করছে এ সময়, তাদের জামাতের সঙ্গ ছেড়ে আসতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের উৎখাত করতে হবে। সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়, ১৯৭১ সালের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি হতে হবে। প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক বীমা সহ সকল ক্ষেত্র থেকে তাদের অপসারণ করতে হবে। এদেরকে রাজনৈতিক সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। ধর্মকে রাজনীতি, সন্ত্রাস, খুন, নির্যাতন, কুৎসার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। সকল নাগরিকের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কারও ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে কটাক্ষ করা কিংবা কাউকে ধর্মদ্রোহী কাফের আখ্যা দেওয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ধর্মকে রাষ্ট্র ও রাজনীতির আওতা থেকে মুক্ত করতে হবে। সার্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অভিন্ন, বিজ্ঞানভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন শিক্ষা চালু করতে হবে। লেখক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জারিকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। লেখক শিল্পীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, সাংবাদিকতাসহ সৃজনশীল চিন্তাশীল সকল কাজের ক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। চিন্তার প্রকাশ বাধামুক্ত হলে, মতের আদান প্রদান বিতর্কের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করলেই কেবল সকলের পক্ষে সঠিক ও ভ্রান্তচিন্তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

মৌলবাদীরা কী করছে? তারা এখন ক্ষেপে আছে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লাউস কিনকেলের ওপর। জার্মানী এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পালন করবেন। ক্লাউস কিনকেল বলেছেন আমাকে যেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতগণ ভিসা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বের হওয়ায় সাহায্য করেন। মোল্লারা ক্রোধের চোটে লাফাচ্ছে এসব শুনে। মতিউর রহমান নিজামী জার্মান মন্ত্রী আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর নিন্দা করেছেন।

বলেছেন, যে মুহূর্তে এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ ধর্মদ্রোহিতার শাস্তির দাবিতে সোচ্চার এবং জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অপরাধে তসলিমার বিরুদ্ধে সরকার দেশের আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করেছে সে সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ নির্দেশ শিক্ষা, সভ্যতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। নিজামী বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব কুখ্যাত সালমান রুশদির মত তসলিমাকেও আশ্রয় দেওয়ার পায়তারা করে তাদের ইসলাম বিরোধী চরিত্র পুনর্বার প্রকাশ করেছে। নিজামী ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বাংলাদেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহবান জানান। এ দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো থেকে তাঁদের তিনি বিরত থাকতে বলেন। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিন্দা কেবল জামাতে ইসলামী থেকে নয়, সব ইসলামী দল থেকেই চলতে থাকে।

উকিল নোটিশ দেওয়া হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। মিরপুরের আমিনা খাতুনের পক্ষে একজন এডভোকেট আমাকে আটক করতে সরকারের ব্যর্থতা ও অবহেলা প্রদর্শন করায় উকিল নোটিশ জারি করেছে। তথ্যসচিব এবং বিবিসির স্থানীয় প্রতিনিধির কাছেও উকিল নোটিশ গেছে। এর অর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণায় যেন কোনও রকম দেরি না করে গ্রেফতার করে এবং বিবিসির প্রতিনিধিরা যেন ক্ষমা চায়। বিবিসির ওপর রাগ, ৩০ জুন তারিখে বিবিসি আমার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে, সেখানে নাকি আমি সিগারেট খেতে খেতে কোরানের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। কবে কোথায় আমি কোরানের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, কোন সাক্ষাৎকারে তা মনে করতে চেষ্টা করি। হ্যাঁ, একদিন তা ঘটেছে, তা বিবিসির কোনও সাক্ষাৎকারে নয়। জার্মানির টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকার ছিল সেটি। আমার বাড়িতে আসা নিরাপদ ছিল না বলে জার্মানি থেকে আসা সাংবাদিকরা আমাকে শেরাটন হোটেলে যেতে বলেছিল, সেখানেই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছে। একটি সিগারেট ধরিয়েছিলাম সাংবাদিকদের কাছ থেকে নিয়ে কথা বলার সময়। সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে যাওয়ার পর হোটেলের রুমে যে টেবিল ছিল, টেবিলের ড্রয়ারে কোরান শরীফ থাকে, সেটি বের করে আমাকে দিয়ে জার্মান সাংবাদিক বলেছিলেন, আপনি এটা পড়ছেন, এরকম একটা দৃশ্য নিতে চাই। পাতা ওল্টালাম, ক্যামেরায় বন্দী হল দৃশ্য, চলে এলাম। কোরান যখন আমার হাতে, আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি কোনও সিগারেট খাচ্ছিলাম না। বিদেশী তথ্যচিত্র থেকে আমি বুঝি, তারা কেটে কেটে জোড়া দেয় দৃশ্যগুলো, দুঘন্টার সাক্ষাৎকারকে আধঘন্টায় নিয়ে আসে। এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে লাফ দেয়। নিশ্চয়ই সিগারেট খাওয়ার দৃশ্যটির পরই কোরান খোলার দৃশ্যটি দেখিয়েছে আর মোল্লাগুলো দুটো চিত্রকে একটি চিত্র বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। এখন প্রশ্ন হল আমি কি সিগারেট খেতে খেতে কোরান পড়লে কোরানকে অসম্মান করা হয় বলে মনে করি? আমার উত্তর, না।

আমার যদি সিগারেটে অভ্যেস থাকত, তবে ঘরে বসে আমি যখন কোরানের নারী লিখছিলাম, সারাদিন কোরান খোলা পড়ে থাকত আমার কমপিউটারের পাশে, আমি পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সিগারেট খেতে খেতে, কোরানের উদ্ধৃতিগুলো লিখতাম কমপিউটারে। যেমন লিখেছি সিগারেট না খেয়ে। সেই শৈশবে আমি মায়ের আদেশে

কোরান স্পর্শ করেছি অযু করে আসার পর। কিন্তু বুদ্ধি হওয়ার পর কোরান স্পর্শের আগে অযু করার প্রয়োজন অনুভব করিনি। কোরানকে অসম্মান করার জন্য যে ইচ্ছে করেই অযু করিনি তা নয়। কোরানকে আমি মনে করিনি যে এটি পবিত্র কোনও বই, এটি ছুঁতে হলে আমাকে পাক পবিত্র হতে হবে। আর অযু করলেই যে পাক পবিত্র হওয়া যায়, তাও আমি মনে করি না। কনুই পর্যন্ত হাত, গোড়ালি পর্যন্ত পা, মুখটা, নাকটা, কানের ভেতরটা, কানের পেছনটা পানিতে ধুয়ে নিলেই কোনও মানুষ পবিত্র হয়ে যায়, এটি নিতান্তই যুক্তিহীন কথা। আমি যদি কুৎসিত চিন্তা করি, আমি যদি অন্যের অনিষ্ট করার কথা ভাবি, অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়ার ভাবনা করি, যদি অসততা করি, মিথ্যে বলি, তবেই আমি অপবিত্র হব। এগুলো মন থেকে সরিয়ে মানুষের ভালর জন্য, সুখের জন্য শান্তির জন্য, শুদ্ধ সুন্দর চিন্তা ভাবনা করলেই তবে আমি মনের অপবিত্রতা দূর করতে পারব, পবিত্র হতে পারবো, হাত পা মুখ আর কানের পেছন *ধৌত* করে পবিত্র হতে পারবো না। সোজা কথা।

আমার সোজা কথায় কার কী যায় আসে! যারা আমার মুণ্ডু চাইছে, তারা আরও বেশি চিৎকার করে আমার মুণ্ডুর দাবি করতেই থাকে।

তেইশ জুলাই, শনিবার

সারা দেশে ২৯ জুলাইএর লংমার্চ এবং মহাসমাবেশ সফল করার জন্য মিছিল হচ্ছে, সভা সমাবেশ হচ্ছে। এমনকি মসজিদগুলোয় বিশেষ মোনাজাত হচ্ছে। সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের গতকাল বায়তুল মোকাররম থেকে জুম্মার নামাজের পর মিছিল বের করে। নেতারা ঘোষণা করেছেন, *২৯ জুলাইয়ের আগে যদি সরকার তসলিমাকে ফাঁসি না দেন আর ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন না করেন, তবে ঢাকায় সেদিন মহাবিস্ফোরণ ঘটবে, ব্লাসফেমি আইন এদেশে কেউ ঠেকাতে পারবে না।* আজ বাদ জোহর, বাদ আসর কেবল ঢাকায় নয়, সংগ্রাম পরিষদের নেতারা মানিকগঞ্জে যাচ্ছেন বক্তৃতা করতে, সাভারে যাচ্ছেন।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে গতকাল মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুর রহমান খুতবা পাঠ করেন, তসলিমা সহ সকল মুরতাদের ফাঁসি চাওয়া এখন প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে গোলাম আযম এ দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এখন লোক যাচ্ছে জামাতে ইসলামির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। এসোসিয়েশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছে। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে গোলাম আযম বলেছেন, ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন সজ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে হলে যে যেখানে আছে, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

২৬ তারিখে চট্টগ্রামে গোলাম আযম জনসভা করবেন, জনসভাটি বিশাল এবং সফল করার জন্য জামাতে ইসলামী এখন চব্বিশঘন্টা ব্যস্ত। *শক্তিশালী* একটি মুল প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বারোটি সাবকমিটিও করা হয়েছে। পোস্টারিং, মাইকিং, যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, প্রচার, আপ্যায়ন, নিরাপত্তাসহ নানা রকম সাব কমিটির কর্মীদের এখন দম ফেলার সময় নেই । গোলাম আযমের সভা হবে শুনে চট্টগ্রামের ছাত্রঐক্য বলছে, যে কোনও মূল্যে এই সভা ঠেকাবে তারা, প্রয়োজনে রক্ত ঝরবে।

গতকাল জুম্মার নামাজের পর ময়মনসিংহের বড় বাজারে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের জনসভা হয়। ওতে বড় বড় নেতারা বড় বড় কথা বলেন। আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, ধর্মদ্রোহী তসলিমা নাসরিন যদি দেশ থেকে পালিয়ে যায়, তবে সরকারকে এর জন্য কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে। ভারত চায় না বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে টিকে থাকুক তাই ভারত তসলিমা গংদের লেলিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ কোরান রসুলের ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে, থাকবে।

ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, এদেশের বারো কোটি মানুষ ভারতের দালাল নয়, এরা আল্লাহর দালাল। তৌহিদী জনতার আন্দোলনের মুখে ইসলাম বিরোধীরা ভেসে যাবে। আমিনী আওয়ামী লীগ, বিএনপি আর জাতীয় পার্টিকে কোরানের পক্ষের শক্তিকে সমর্থন করার আহবান জানিয়েছেন।

প্রধানও ময়মনসিংহে। প্রধান বলেছেন, ব্লাসফেমি আইন এই সংসদে পাস করতে হবে, তা না হলে জনগণ এই সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন সংসদ গঠন করে ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন করবে।

মেজর বজলুল হুদা বলেছেন, যারা কোরানের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের ঠাঁই এই জমিনে হবে না, হতে পারে না।

বক্তাদের মধ্যে ঢাকার নেতারা তো আছেনই, মুসলিম লীগের এম এ হান্নানও ছিলেন। এম এ হান্নান ময়মনসিংহের লোক, মুসলীম লীগের নেতা। নতুন বাজারে এম এ হান্নানের বিশাল বাড়ি, তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে অনেকগুলো বাড়ি করে ভাড়া দিয়েছেন তিনি, অনেক দোকানপাট; দোকানগুলোর কিছু বাবা পজিশন কিনে আরোগ্য বিতান দিয়েছেন, ওষুধের দোকান, নিজের একটি চেম্বারও করেছেন। যদিও মালিক এখনও হান্নানই। এই হান্নান আমাকে আমার বালিকা বয়স থেকে দেখছেন, তিনি আজ আমার ফাঁসির জন্য গলা ফাটাচ্ছেন। বক্তারা সকলেই মৌলিক পাঁচ দফা দাবি তো আছেই ওগুলোর সঙ্গে আরও কিছু দাবির কথা বলেন, তা হল গত হরতালের দিনে গ্রেফতারকৃত পাঁচ জন ছাত্রের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি, কিশোরগঞ্জের শহীদ আরমানের খুনীদের বিচার,তারাকান্দায় নিরীহ জনতার বিরুদ্ধে ব্র্যাকের মামলা প্রত্যাহারের দাবি।

আমার শহর ময়মনসিংহ আজ কাঁপছে মৌলবাদীদের চিৎকারে। জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল কামরুজ্জামান জামাতে ইসলামির রুকন সম্মেলনে ময়মনসিংহের ইসলামি একাডেমিতে বলেছেন, সরকারের রহস্যময় ভূমিকা ও

দুর্বলতার কারণেই বিদেশিরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস পাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু বিদেশি হস্তক্ষেপ কখনও বরদাস্ত করবে না। এ দেশের মানুষ জীবন দিয়ে হলেও কোরান ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করবে। এই রুকন সম্মেলনেও এম এ হান্নান ছিলেন। বাবার দীর্ঘকালের বন্ধু এম এ হান্নান।

জনকণ্ঠের খবর, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা নয়, এদেশের বারো কোটি মানুষের কথা শুনতে হবে সরকারকে। কে বলেছেন? নিজামী। বলেছেন, ইউরোপীয় পত্রিকাগুলো তসলিমা নাসরিনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে এদেশে আন্দোলনের জন্য উস্কানি দিচ্ছে। বিপথগামী এক মহিলার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্ব স্ব দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের মন্ত্রণালয়গুলোকে ব্যবহার করছে। ঢাকায় জামাতে ইসলামির জনসভায় নিজামী বলেন, গোটা বিশ্বকে ইহুদি গোষ্ঠী নাচাচ্ছে। তারা জানে তাদের পথের কাঁটা একমাত্র ইসলাম। ধর্মদ্রোহীদের বিচারের জন্য বিল আনা হয়েছে সংসদে, কিন্তু খালেদা সরকার সে বিল পাস করেনি। গণতান্ত্রিক সরকারকে গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে হবে। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর কথা না শুনে এদেশের বারো কোটি মানুষের কথা শুনতে হবে।

তসলিমা সম্পর্কে নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়। নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে আমি নাকি আমার নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ ত্যাগের চিন্তাভাবনা করছি। আগামী মাসে আমি নরওয়ের লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে যাবো। জুলাইয়ের বারো তারিখে সুইডেনের এক রেডিও সাক্ষাৎকারে নরওয়ের পরারাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের একজন বলেছেন যে আমি এ মুহূর্তে কোনও দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার কথা ভাবছি না। বলেছেন আমাকে যারা আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যোগাযোগ রাখছেন নরওয়ে সরকার।

আমার প্রশ্ন হল আমি কি ভাবছি বা ভাবছি না তা নরওয়ের মন্ত্রণালয় কি করে জানে! কি করে তারা জানে যে আমি দেশ ত্যাগের চিন্তাভাবনা করছি। এরকম ভাবনা তো আমি ভাবছি না। বানিয়ে বলা! কূটনীতির ব্যাপার! নাকি সত্যিই কেউ আমার হয়ে যোগাযোগ করছে নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে নরওয়ের সরকারের! ঙর সঙ্গে! ঙ অনেকদিন আসেন না, কোনও খবরই জানি না।

আরেকটি ভাল খবর ঝ দিলেন, ডাঃ এস এ মালেক, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের কলাম আজ ছাপা হয়েছে, লেখাটির শিরোনাম ফতোয়াবাজদের চিন্তা চেতনা। ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে লেখা। আমার প্রসঙ্গ টেনেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁর মূল কথা, তসলিমা নাসরিনের লেখায় বাড়াবাড়ি থাকতে পারে কিন্তু তারপরও অস্বীকার করার উপায় নেই যে   সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে ..।

কবীর চৌধুরী আর সৈকত চৌধুরী আগের মত আমাকে চিঠি লিখছেন এমন করে কলাম লিখেছেন। মূলত আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে লেখাটি। আওয়ামী লীগ

২৭শে জুলাই পান্থপথে মহাসম্মেলন করতে যাচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে। আওয়ামী লীগের দরকার জামাতে ইসলামি আর জাতীয় পার্টিকে। এ সময় আওয়ামী লীগের ইচ্ছে নেই মৌলবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে জামাতকে হারানো। কবীর চৌধুরীরা লিখেছেন, যুগে যুগে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ শক্তি তখনই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যখন প্রগতির পক্ষের শক্তিগুলো কোনও না কোনও ছুতোয় ঐ ফ্যাসিস্ট অপশক্তির সাথে সমঝোতা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, ইতিহাসে তার অজস্র নজির দেখতে পাওয়া যায়। আওয়ামী নেতৃত্ব কেন বুঝতে পারছেন না যে জামাতিদের সঙ্গে তাদের বর্তমান নৈকট্যের ফলে ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা গাছেরও খাচ্ছে, তলারও কুড়োচ্ছে। তারা একই সাথে সরকার পরিচালনার সার্থক দাবিদার এবং বিরোধীদলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এরা সুই হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরুবে বলে। .. লেখাটির শুরু করেছেন, 'তসলিমা, সকাল গড়িয়ে অন্ধকার নামলে রাত্রির বুকে মাথা রেখে তুমিও কি আমাদের মত ঘুমোবার আয়োজন কর? নাকি ব্যথাতুর চোখে কাটিয়ে দিচ্ছ বিনিদ্র রজনী?' .. শেষ করেছেন এভাবে, 'তসলিমা তুমি ঘুমোতে যাও। আমরাও ঘুমোবার আয়োজন করি। দেখি সাময়িক মৃত্যুর পথ পেরিয়ে আবার নতুন জাগরণে কোনও স্বপ্নকে প্রোথিত করে যেতে পারি কি না।'

মনে মনে বলি কবীর চৌধুরী আর সৈকত চৌধুরীকে, আমি ঘুমোতে পারি না, অনেকদিন ঘুমোতে পারি না। তাই ঘুমোবার আয়োজনও করি না কোনও রাতে। জেগে থাকি নিশাচর পাখির মত, পাখি ইচ্ছে করলে যে কোথাও উড়াল দিতে পারে, আমি পারি না। আমার না পারাগুলো নিয়ে আমি জেগে থাকি। রাতের পর রাত জেগে থাকি। যা ঘটছে প্রতিদিন এ দেশে, তা দেখে বিস্ময় জাগে, বিস্ময় আমাকে ঘুমোতে দেয় না। একটি কালো লোমশ আতঙ্ক আমাকে ঘুমোতে দেয় না।

ভাল খবর, মন্দ খবর। খবরের শেষ নেই। সব ফেলে আমি ইজেলের দিকে যাই। সারারাত ছবি আঁকি।

চব্বিশ জুলাই, রবিবার

ভোরের কাগজ আজ কজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য ছেপেছে।

শিরোনাম। **প্রসঙ্গঃ তসলিমা**

ভূমিকা। তসলিমা নাসরিন এখন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক বিরাট ইস্যু। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এবং তিনি আত্মগোপন করে আছেন। এসব প্রসঙ্গে আমরা টেলিফোনে কথা বলেছি কজন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে। তবে এর বাইরেও আমরা যোগাযোগ করেছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে, তাঁরা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

শামসুর রাহমান, কবি

ভলতেয়ার বলেছিলেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের অধিকার আমি রক্ষা করতে চাই আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। যে কোনও লেখকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। যেমন আছে প্রতিটি নাগরিকের। সবাই এক বিষয়ে একমত হবে, এমন নয়। একমত না হলে সেটা খণ্ডন করা যাবে লেখা দিয়ে। কিন্তু তা না করে জেল বা প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া ফ্যাসিবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। আধুনিক সভ্য সমাজে এটা চলতে পারে না। এমনটা হতে পারে বর্বর সমাজে, যেমন ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ভিন্নমত প্রকাশ করার কারণে। যারা মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক, তারা সব সময়ই বাক স্বাধীনতা হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ে যাবেন। তসলিমা নাসরিন স্পীকারের কাছে চিঠিতে বলেছেন, যে উক্তির জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তা তিনি বলেননি। এরপরও তার প্রাণনাশের হুমকি আসছে। অথচ সরকার নির্বিকার। যারা প্রকাশ্যে নাগরিকদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে পত্রিকার সম্পাদক লেখকদের গ্রেপ্তার করছে। এটা নিন্দনীয়।

নাসরিন যে আত্মগোপন করেছেন তাছাড়া কি বা তাঁর করার ছিল। মৌলবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে লেগেছে। সরকার সাহায্য করছে না। তাঁর তো নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

হুমায়ুন আজাদ, কবি, অধ্যাপক

নাসরিন নামের একটি তুচ্ছ বস্তুকে বাংলাদেশের অপদার্থ সরকার, আনন্দবাজার আর হিন্দু মুসলমান মৌলবাদীরা আন্তর্জাতিক বস্তুতে পরিণত করেছে। এটা এখনকার সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার। বাংলাদেশের সরকার যে কাজটি করেছে অর্থাৎ যে জামিনবিহীন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছে, এটাকে আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ বলে মনে করি। এটা শুধু অন্যায় নয়, এটা প্রগতিশীলতার সঙ্গে একটি বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। সরকার এখন নিজের নির্বুদ্ধিতার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে আরও পড়বে।

সে যে ধরা দিচ্ছে না এতে বোঝায় যে বাংলাদেশের আইন ও বিচারের ওপর তার কোনও আস্থা নেই এবং এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বাংলাদেশের আইন ও বিচারের ওপর এখন আস্থা রাখা সত্যিই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সে সম্ভবত এখন শক্তিশালীদের আশ্রয়ে রয়েছে, যারা বাংলাদেশের সরকারের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। কাজেই সরকারের ওই পরোয়ানা সরকারকেই গিলে ফেলতে হবে। আমার মনে হয় তার ধরা না দেওয়াই ভাল। এটি একটি শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাবে। এই সময়ের একটি বেশ হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, নাসরিনের মত একটি তুচ্ছ বস্তুকে নিয়ে সারা পৃথিবীর মেতে ওঠা। পশ্চিম ইওরোপ তার জন্য দরজা খুলে দিয়েছে।

ফয়েজ আহমদ. সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

আসলে সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী করার জন্য তসলিমা ও তার রচনাকে সুকৌশলে ইস্যু করা হচ্ছে। এর সঙ্গে ভারতীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি ও পশ্চিম দেশীয় খ্রিস্টানদের একটি অংশ জড়িত রয়েছে। এবং সেই কারণে স্থানিক সাম্প্রদায়িক ও হত্যার হুমকিদানকারী অপশক্তি তাদের বল বৃদ্ধি করার সুযোগ পাচ্ছে।

কোনও ইসলামী দেশ যদি খলিফা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সেই খলিফা যদি কোনও ধর্মীয় পণ্ডিতকে মুফতী হিসেবে নিয়োগ করেন তবে কেবল সেই মুফতীরই ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান অনুযায়ী ফতোয়া জারি করার অধিকার আছে। বাংলাদেশ কোনও খলিফাশাসিত দেশ নয়। সুতরাং এখানে ফতোয়া জারি করার অবকাশ নেই। দেশের সাম্প্রদায়িক এবং

রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তি ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। যারা হুমকি দেয়, যারা যে কোনও লোককে মুরতাদ বলে ঘোষণা দেয়, রাষ্ট্রীয় আইনে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এটা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতা অবলম্বন করছে। এই মুহূর্তে তসলিমার নীতি, তার বক্তব্য এবং তার সাহিত্যনীতি নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই। শুধু তসলিমাকে নয়, একটি গণতান্ত্রিক দেশে কাউকে হত্যা করার হুমকি কেউ দিতে পারে না।

আমহদ ছফা, লেখক

তসলিমা নাসরিন ভারতের সৃষ্টি। বাবরি মসজিদ ভাঙার পর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। এখানে হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া। পৃথিবী যখন ভারতকে হিংস্র বলতে লাগল তখন তসলিমার বই তাদের হাতে গেল। ভারতের পত্রিকাগুলো তসলিমার ইমেজ গড়ার জন্য উঠেপড়ে লাগল। বিজেপি তসলিমাকে দেবীর আসনে বসালো। ভারত বোঝাতে লাগল, আমরা নই বাংলাদেশই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করেছে। তার প্রমাণ তসলিমার বই। তসলিমার ব্যাপারে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধে সব বলতে চেষ্টা করেছি। এখন সাম্প্রতিক প্রসঙ্গে আসি। তসলিমার কারণে আমরা একটা নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েছি। স্টেটসম্যান পত্রিকায় বলেছে, কোরআনের মোটা দাগের সংশোধন হওয়া উচিত। তার সেই অধিকার নেই। কোরআন তসলিমা কিংবা তার বাবা লেখেনি। মানা না মানা তার ব্যাপার। ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস করে সব সমাজে এমন মানুষ অনেক। তাদের অনুভূতিতে আঘাত করার অধিকার কারওনেই। স্টেটসম্যান পত্রিকার একটা নিরপেক্ষতার সুনাম ছিল। যে দেশে ১৫ কোটি মুসলমান বাস করে তাদের অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কথা তারা ছাপল কেন বুঝি না। তসলিমা কত কথাই বলে সব তো ছাপে না। এটা কেন? এই আমার জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশের মৌলবাদীদের ইচ্ছে করে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য পত্রিকাটি এই অপকর্ম করেছে। মৌলবাদীরা তসলিমার মস্তক দাবি করেছে। কোনও সভ্য মানুষ এটা সমর্থন করতে পারে না। বিবেকবান মানুষের এটা প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু অন্যদিক থেকে তসলিমা এবং তাকে যারা সমর্থন করে তারা মৌলবাদকে এমনভাবে উস্কে দিয়েছে, স্বাধীন চিন্তাভাবনার লোক মস্ত বিপদে পড়ে গেছেন। মৌলবাদীরা এখন ব্লাসফেমি আইন পাস করার দাবি করছে। এটা পাস হলে স্বাধীনভাবে চিন্তার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষকরা স্বাধীনভাবে শিক্ষাদান করতে পারবে না। তসলিমা এবং তার সমর্থকদের অবিবেচনার কারণে দেশের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি একটি সঙ্কটের সম্মুখে পড়েছে। এটা সঙ্কটের এক দিক। অন্যদিক হল, ভারত কূটনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে বিদেশে তসলিমার ইমেজ সৃষ্টি করে ফেলেছে। ক্লিনটন, জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেছেন। ভারতের আনন্দিত হওয়া উচিত, কারণ তাদের সব পরিকল্পনা সফল হয়েছে। এখন আমরা মৌলবাদ ঠেকাবো না কি দেশে দেশে আমাদের জাতির নামে যে কলঙ্ক লেপন হচ্ছে তার প্রতিবাদ করব? তসলিমা একটি অমঙ্গলের শক্তি। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো তসলিমাকে সমর্থন জানাচ্ছে। আমাকে যাতে কেউ ভুল না বোঝে সে জন্য বলব, তসলিমার ওপর সবরকম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বন্ধ করা হোক। তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হোক। তার বিরুদ্ধে যে হত্যার হুমকি আসছে তার মোকাবিলা করা হোক। এটা সমাজের চিন্তার স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন, নইলে এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ফরিদা রহমান, সাংসদ, বিএনপি

ঐসব আজেবাজে লেখা ছেড়ে দিয়ে তসলিমার মাফ চাওয়া উচিত। তারপর সাধারণ জীবনযাপন করা উচিত। উনি যা করেছেন তাতে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত

লেগেছে। ধর্মের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। জনগণ যদি ক্ষমা করে তারপর আমরা সাধারণ মহিলারা যেভাবে জীবনযাপন করি সেভাবে তার জীবনযাপন করতে হবে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সাংসদ, গণতন্ত্রী পার্টি
হোল ড্রামা ইজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য গভরমেন্ট।

ফরিদা রহমান আর সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার আলাপ নেই। ফরিদা রহমান বিএনপি দলের সবচেয়ে প্রগতিশীল মানুষ বলে সকলেই জানেন। যখন বিএনপির বড় বড় নেতা নেত্রীরা চুপ হয়ে আছেন মৌলবাদীদের উত্থানের পরও, ফরিদা রহমান ক্ষুব্ধ হয়ে দাবি জানিয়েছেন যে একাত্তরের ঘাতকদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার করতে হবে। তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন দাবি করছেন। আমার বিশ্বাস যাঁরা আমার প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি, তাঁরাও আমাকে হুমায়ুন আজাদের মত তুচ্ছ মনে করেন বলে চাননি মন্তব্য করতে। তাঁদের অনেককে আমি হয়ত এতকাল ভেবে বসেছিলাম যে আমাকে সমর্থন করেন, আমার যে কোনও বিপদে তাঁরা আমার পাশে থাকবেন।

ঝ এই মন্তব্যগুলো পড়ে খুব খুশি, বললেন, দেখেছো, তোমাকে কতজন সাপোর্ট করছে! তোমার আর চিন্তা কি!

এসময় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কেউ যে বলেননি যে আমার মুন্ডুটা কেটে নেওয়া উচিত সেটিই আমার সৌভাগ্য অবশ্য।

আজকের বাকি খবরগুলো হল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান বলেছেন হুলিয়া জারির পর তসলিমা আত্মগোপন করে আছে, আদালতে আত্মসমর্পণ করছে না, তার মানে সে এ দেশের আইন লঙ্ঘন করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ মন্তব্যটি ছাপা হয়েছে ফ্রান্সের ল মন্দ পত্রিকায়। আরেকটি খবর, ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক হেরাল্ড ট্রিবিউনে চিঠি লিখেছেন যে তসলিমা নাসরিন কোনও হয়রানির শিকার হননি বরং সরকার তাঁকে রক্ষার জন্য আইনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেহেতু আমাকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে বিদেশের পত্রিকায়, বলা হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বাংলাদেশের সরকার। তাই সরকারি আদেশে এখন বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর কাজ হল খবরগুলোর প্রতিবাদ করা। এদিকে তাহফুজে হারমাইন পরিষদের সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমেদ সিদ্দিকী সরকারকে সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে যে তসলিমা নরওয়ের সাহিত্যঅনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, তাকে কিছুতেই যেন দেশ ছাড়তে দেওয়া না হয়। যদি এই সরকার তসলিমাকে দেশ ছাড়তে দেয়, তবে এই সরকারের সব্বনাশ করে ছাড়বে দেশের মানুষ। ২৯ তারিখের লং মার্চের আগে যে করেই হোক তসলিমাকে গ্রেফতার করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান মাওলানা।

মৌলবাদীদের নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৩টি মৌলবাদী দল ও সংগঠনের সমন্বয়ে বায়তুল মোকাররমের খবিতের নেতৃত্বে গড়া সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ আগামী ২৯ তারিখ লং মার্চ করবে বলে বলেছে। শহরের সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা

মানিক মিয়া এভিনিউতে মহাসমাবেশ হবে, সারা দেশ থেকে লং মার্চ করে লোক আসবে এখানে। প্রথম এই লং মার্চের ঘোষণা দিয়েছিল খেলাফত মজলিশ। এখন লুফে নিচ্ছে অন্য দলগুলো।

এ কি খেলা শুরু হয়েছে দেশে! এ খেলার শেষ কোথায়! জানিনা কিছুই।

পঁচিশ জুলাই, সোমবার

মৌলবাদীরা যেদিন প্রথম ব্লাসফেমি আইনের দাবি করেছে, আমি শিউরে উঠেছিলাম। কী ভয়ংকর দাবি। দেশের কজন মানুষ জানে এই আইন এলে কি রকম সর্বনাশ হবে দেশের। বেশির ভাগই জানে না। সেদিনই মনে মনে বলেছিলাম, আমার ফাঁসি হয় হোক, তবু ব্লাসফেমি আইনটি যেন পাস না হয় এ দেশে। আমার মৃত্যু হয় হোক, তবু দেশটি বেঁচে থাক, দেশের মানুষগুলো দুর্ভোগ না পোহাক। কাগজে আঁকিবুকি করতে করতে লিখেছিলাম, সংসদ ভবন থেকে সড়সড় করে নেমে এল একটি মস্ত অজগর/নগরের বড় রাস্তায় রাজার মত চলল, ডানে গেল, বামে গেল/অলিগলি ঘুরল আর মানুষ খেল/যে মানুষ সত্য বলে, তাকে/যে মানুষ সভ্যতা চায়, তাকে/ যে মানুষ নোংরা ঘাঁটে না, তাকে।/ অজগরের ক্ষিধে মেটে না তবু, সে এক নগর থেকে/আরেক নগরে গেল, বড় শহর থেকে ছোট শহরে,/ সেখানেও তাজা মাংসের স্বাদ পেল/যে মানুষ ছবি আঁকে, /যে মানুষ কবিতা লেখে,/ যে মানুষ গান গায়।/অজগর বিষম খুশি। সে এঁকে বেঁকে নেচে নেচে/গঞ্জে গ্রামে নদী হাওড় ক্ষেত খামার পেরিয়ে আরও খাদ্য পেল/যে কৃষক পাঁচবেলা লাঙল চালায়,/যে নারী মাঠে কাজ করে/যে রাখাল বাঁশি বাজায়।/খেতে খেতে পেট যখন ভরল অজগরের/তখন আর মানুষ নেই দেশে, কিছু কেবল শ্বাপদ আছে/শ্বাপদ আর অজগরে বেশ ভাব হল, তারা দীর্ঘ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকল।

জামাতে ইসলামী ব্লাসফেমি এক্ট বিল পেশ করেছে সংসদে। এখন ভয়, দেশজুড়ে ব্লাসফেমি আইনের দাবি উঠছে, যদি সংসদে এই বিল পাস হয়েই যায়। কলাম লেখা চলছে এই আইন প্রণয়ন করার বিরুদ্ধে। আবদুল মতিন খান আজ চমৎকার একটি কলাম লিখেছেন ব্লাসফেমি আইনের ইতিহাস নিয়ে। ---'মধ্যযুগের ইওরোপের ব্লাসফেমি আইন যে কি রকম জঘন্য ছিল কি করে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হত এবং এই আইনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের ফলে গির্জার পুরোহিতদের অপকর্ম শেষ পর্যন্ত কি রকম ভাবে বন্ধ হল তা বর্ণনা করে শেষে বলেছেন, ইসলাম ধর্মে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সরাসরি। কে নেককার, কে গুনাহগার, তার বিচারের ভার আল্লাহ কারও ওপর ন্যস্ত করেননি। কে ধর্মদ্রোহী, কে নয় তার বিচার জামাতীদের আল্লাহ দেননি। কোনও সরকারকেও দেননি। ব্লাসফেমি আইন ইসলামী আদর্শের খেলাফ

একটি আইন। ইসলামে যাজকতন্ত্র নেই, চার্চ নেই এবং মধ্যযুগের পোপের মত স্বর্গের চাবিওয়ালা কেউ নেই। প্রত্যেক মুসলমানের বেহেসতের চাবি তার নিজের হাতে। অনৈসলামিক ব্লাসফেমি আইন যারা প্রস্তুত করেছে তাদের সঙ্গে আর যাই হোক ইসলামের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। থাকলে মধ্যযুগের খ্রিস্টান যাযকদের সঙ্গে আছে। মধ্যযুগীয় এ বর্বরতা এ দেশে কিছুতেই সহ্য করা হবেনা। সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক শফিউদ্দিনের দেশে কিছুতেই এ আইন পাস হতে দেয়া হবে না। এ আইন যারা জারি করবে বলে ভেবেছে গণশত্রু হিসেবে তাদের বিচারের সম্মুখিন করা হবে। মধ্যযুগের চার্চের মত মানুষের জীবনের ওপর কাউকে সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে দেয়া হবে না। হবে না। হবে না।'

বাংলাদেশ লেখক শিবির ব্লাসফেমি এক্ট প্রবর্তনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আজ একটি সমাবেশের আয়োজন করেছে। দেশের বড় বড় সব শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী সমাবেশে ছিলেন। সকলেই উদ্বিগ্ন, এই সরকার আবার না মৌলবাদীদের দাবি মেনে নেয়! ঘোষণা করা হয়, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে বৈধ ও আইনী রূপ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি কায়দায় ব্লাসফেমি এক্ট এর দাবি উঠেছে। সভায় শামসুর রাহমান বলেছেন, *মৌলবাদ হচ্ছে একটি ব্যাধি। .. স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এতসব সত্ত্বেও সরকারের নীরবতায় প্রমাণ হয় যে বর্তমান সরকার মৌলবাদীদের সরকার।*

সমাবেশে সাত দফা দাবি উত্থাপিত হয়। ৭১এর ঘাতক দালালদের বিচার, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকে শাস্তিযোগ্য করে আইন প্রণয়ন, সার্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করা, লেখক শিল্পীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার ও হয়রানি বন্ধ করা। এরপর বুদ্ধিজীবীদের বিশাল র‍্যালি রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে, র‍্যালিতে বিলি করা হয় প্রচার পত্র। একটি শামীম সিকদারের।

মধ্যযুগীয় বর্বর ব্লাসফেমি আইন প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হোন
শামীম সিকদারের আহবান

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যখন ব্লাসফেমি আইনের কবলে পড়ে বিপণ্ন হতে চলছে, যখন একজন ইমামের পাশবিক নারী নির্যাতনের কারণে ৩০ বছর দণ্ড হয়েছে ঠিক তখন জামাত সহ বাংলাদেশের কাঠ মোল্লারা তথাকথিত ধর্মদ্রোহীদের শাস্তিদানের অজুহাতে ব্লাসফেমি আইন পাস করার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে। এই কাঠমোল্লারা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কাফের আখ্যায়িত করে ফতোয়া দিয়েছিল, এরাই নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়াকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেছিল। একই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সিলেটের কমলগঞ্জ থানার ছাতকছড়া গ্রামের নুরজাহানকে হত্যা করেছে, তসলিমা নাসরিনকে হত্যা করতে চাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে জানা অজানা অনেক নারীরাই আজ ধর্ম ব্যবসায়ী অপশক্তির আক্রমণের শিকার। ব্লাসফেমি আইন পাস না করেই এরা অঘোষিত ব্লাসফেমি

আইন দিয়ে প্রগতিশীল শক্তিকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। ৭১ এর চিহ্নিত খুনী এই রাজাকার গোষ্ঠী আইন নিজের হাতে তুলে নেবার পরও সরকার রহস্যজনকভাবে নীরব।

খ্রীস্টান মৌলবাদীরা আধুনিক বিজ্ঞানপ্রযুক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে যে ব্লাসফেমি আইন পাস করেছিল, সেটাই কথিত মুসলমান মৌলবাদীরা বাংলাদেশে চালু করতেচাচ্ছে। কথায় কথায় মুসলমানিত্বের বড় বড় বুলি আওড়িয়ে থাকলেও প্রগতিশীল আধুনিক ধ্যান ধারণা প্রতিহত করতে খ্রীস্টান মৌলবাদীদের চিন্তার সাথে হাত মিলিয়েছে বাংলাদেশের কাঠমোল্লারা।

এই আইন পাস হলে কি ধরণের ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, এর একটি চিত্র তুলে ধরছি।

০ব্লাসফেমি আইনে প্রধানভাবে আক্রমণের শিকার হবে অবহেলিত নারী সমাজ, সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, জনতা, ও প্রগতিশীল শক্তি। এই আইন নারী সমাজকে আবারো অবরুদ্ধ ভোগের পণ্যে পরিণত করবে। বর্তমানে নারীরা যখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা যখন সমাজে বিভিন্ন অবদান রাখছে ঠিক তখনই নারী মুক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এই আইন পাসের চক্রান্ত চলছে।

০ব্লাসফেমি আইন পাস হলে ধর্ম বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, যেখানে নারী পুরুষ এক সাথে অধ্যয়ন করে জ্ঞান আহরণ করছে সেখানে অধ্যয়নের অধিকার থেকে নারীরা বঞ্চিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, কৃষি, চারুকলা, সমাজবিজ্ঞান ও গবেষণা সহ জ্ঞান অর্জনের সমস্ত শাখা থেকে নারীদের বিতাড়িত করা হবে। একই সাথে কর্মক্ষেত্রে যেখানে পুরুষদের সাথে নারীরা চাকুরি করছে, সেখানে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

০বাধ্যতামূলকভাবে নারীদের পরতে হবে বোরখা। নারী শ্রমিকদের বোরখার অবগুণ্ঠনে আটকিয়ে ফেলে বেকারত্বের অভিশাপের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

০বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিক এই জঘন্য ব্লাসফেমি আইন চালু হলে কথিত ধর্মীয় বিধান অবমাননার অভিযোগে চাকুরীচ্যুত হবে। ফলে অর্থনীতিতে নেমে আসবে বিপর্যয়। বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা থেকে।

০পুরুষতন্ত্রের স্বার্থরক্ষক এই আইন কথায় কথায় নারীদের পাথর মেরে হত্যা করতে ও দুররা মারতে ধর্ম ব্যবসায়ীদের উৎসাহ যোগাবে। মধ্যযুগীয় বর্বর এই আইন নারীদের জীবনে ভয়াবহ দুর্ভোগ ডেকে আনবে। স্বামীর পদতলে নারীর বেহেসত এই ফতোয়া চালু করে নারীদের মূলত পুরুষদের কাছে জিম্মি করে ফেলা হবে।

০আধুনিক প্রগতিশীল শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, চারুকলা, ভাস্কর্য সবকিছুই ব্লাসফেমি আইনের কবলে পড়ে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ এসব কিছুকেই কাঠমোল্লারা ধর্ম বিরোধী বলে দীর্ঘদিন যাবৎ চিহ্নিত করে আসছে। চারুকলা ও ভাস্কর্যকে মূর্তি পূজার সামিল হিসেবে চিহ্নিত করে এরা বার বার আক্রমণ করেছে।

০ব্লাসফেমি আইন খুব সহজে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোরআন বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে শাস্তি দিতে পারবে। বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষ যুগ যুগ ধরে সহাবস্থান করছে। কারণ ধর্ম বা যে কোনও বিশ্বাস হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার, এটা রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে যুক্ত নয়। কিন্তু ব্লাসফেমি আইন রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সংঘাত বাড়বে, সৃষ্টি হবে দাঙ্গা হানাহানি। নারী, পুরুষ, শিশুর রক্তে রঞ্জিত হবে বাংলাদেশ।

ব্লাসফেমি আইন ছাড়াই নারীদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তসলিমা নাসরিনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হচ্ছে। ডঃ আহমেদ শরীফের ফাঁসি দাবি করা হচ্ছে - এগুলো সবই হচ্ছে ধর্মের নামে।

এই যদি বর্তমান অবস্থা হয় তাহলে ব্লাসফেমি আইন পাস হলে পরিস্থিতি কতটুকু ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ব্লাসফেমি আইন প্রধানমন্ত্রী খালেদা ও শেখ হাসিনা নারী হওয়ার কারণে ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদেরকেও রাজনীতি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। বোখারি শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে কাঠমোল্লারা বলে থাকে, ঐ জাতির উন্নতি হবে না, যে জাতি তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনার ভার কোনও নারীর ওপর ন্যস্ত করিয়াছে। ধর্মের এই বিধানের অজুহাত দেখিয়ে সহজেই ধর্ম ব্যবসায়ীরা নারীদের রাজনীতি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

আজ এই ব্লাসফেমি আইন কারা চাচ্ছে? এরা হচ্ছে ৭১ এর চিহ্নিত নারী নির্যাতনকারী ও গণহত্যার নায়ক রাজাকার, আল বদর, আলশামস ও কাঠমোল্লারা। ৭৪ এর সাত খুনের আসামী এক নেতাও ব্লাসফেমি আইন প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করছে। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের ইমাম খতিব মওলানা ওবায়দুল হক সরকারি চাকুরি করেও ব্লাসফেমি আইন পাসের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, সরকার ও প্রধান বিরোধীদল এই বিষাক্ত সাপদের নিয়ে খেলছে।

নারী পুরুষ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রজনতার একজোট হয়ে এই নরঘাতকদের প্রতিহত করার সময় এসেছে। আমাদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আজ হুমকির সম্মুখীন, মানবতা বিপন্ন।

তাই আসুন ভাই বোনেরা আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই অশুভ শক্তিকে উচ্ছেদ করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করি। জনতার বিজয় অনিবার্য।

শামীম সিকদার
সহযোগী অধ্যাপক
চারুকলা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে *বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অনুভূতি* বক্তব্য নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস। বুঝলাম না বাংলা নাম বাদ দিয়ে এ দেশি সংগঠন ইংরেজি নাম দিতে গেছে কি জন্য। মজার ব্যাপার হল, অনুষ্ঠানের বক্তারা সাবেক বিচারপতি, ব্যারিস্টার, প্রফেসর, সাংবাদিক এরকম লোক। প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ডঃ এরশাদুল হক। সাবেক বিচারপতি রুহুল ইসলাম যা বলেছেন, তার সংক্ষেপ হল, কোরান না পড়ে অনেকে বিরোধিতা করেন। কারণ তারা বুঝতে পারেন না কোরানে কি লেখা আছে। কোরান শাশ্বত, চির আধুনিক। হযরত আদম থেকে ইসলামের শুরু আর এর পূর্ণতা এসেছে হযরত মুহম্মদের মাধ্যমে। ধর্ম সম্পর্কে সীমাহীন বাক স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়।

ডঃ এরশাদুল হক বলেন, আমাদের দেশে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি পর্যাপ্ত নয়। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ১৯৮৭ সালে সংশোধিত হয়, যাতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার শাস্তি করা হয় মাত্র দু বছর আর সামান্য কিছু জরিমানা। এরশাদুল হক, এই শাস্তিতে মোটেও খুশি নন। তিনি ধর্ম সম্পর্কে দায়িত্বহীন উক্তি এবং ধর্মদ্রোহিতা

কমানোর জন্য মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ বছর কারাদণ্ডের জন্য সুপারিশ করেন।

জাতীয় আইনজীবী সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুবউদ্দিন বলেছেন, আইনের অপ্রতুলতার সুযোগে,মানবাধিকারের ছদ্মাবরণে এই দেশে ঘরের শত্রু বিভীষণদের দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে আঘাত দেওয়া হচ্ছে। দণ্ডবিধি অনুযায়ী ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি পর্যাপ্ত নয়।

বাকি বক্তারা প্রাণ খুলে বাক স্বাধীনতার চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করেন। এই যদি হয় আমাদের শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত লোকদের মত, তবে আর মোল্লাদের দোষ দিই কেন!

লং মার্চের সমর্থনে সভা মিছিল সারাদেশে হচ্ছে। প্রতিরোধ মোর্চা ভীষণ ব্যস্ত এ নিয়ে, পারলে চব্বিশ ঘন্টায় চব্বিশটি সভা করে। মোর্চার লোকেরা বলে দিয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলার মাটিতে টিকতে পারবে না। সাফ কথা।

জ আসেন রাতে তাঁর সেই বন্ধুটিকে নিয়ে। জ, জর বন্ধু, ঝ আর আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘরের মেঝেয় আসন করে, পা ছড়িয়ে বসে ব্লাসফেমি আইন নিয়ে কথা বলি। প্রায় শব্দহীন স্বরে, কেউ যেন শুনতে না পায় বাইরে। আমাদের সবার মধ্যে একটি হতাশা, একটি আতঙ্ক। আমরা চেষ্টা করেও তা দূর করতে পারি না।

ছাব্বিশ জুলাই, মঙ্গলবার

কি ছিল তসলিমার লেখায়, আর কেনই বা ক্ষেপলো মৌলবাদীরা?

আজকের কাগজ এই শিরোনাম দিয়ে ভূমিকা লিখে আমার কলামগুলো ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেখে অবাক হই, যেখানে নাম উল্লেখটিই হত না, সেখানে নাম উল্লেখ তো বটেই, একেবারে কলাম ছাপার সিদ্ধান্ত। আসলে একটি কথা মনে হয়ে বুঝে গেছে যে তসলিমার নামটিই যেহেতু মৌলবাদীরা উচ্চারণ করছে, সুতরাং এই নামটি উল্লেখ না করে অন্য নাম উল্লেখ করে বেশিদিন কাজ চলে না। জনকণ্ঠের সাংবাদিকরা বহু আগেই ছাড়া পেয়ে গেছে, তাদের নাম উল্লেখ করার আর দরকার পড়ছে না। বুদ্ধিজীবীদের ফতোয়া দিচ্ছে এই অভিযোগ করে বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকাও দিতে পারছে না, অতএব, শেষ পর্যন্ত তসলিমা নামটি না চাইলেও উচ্চারণ করতেই হল। ভূমিকাটি এরকম, ‘নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন নারী স্বাধীনতা, ধর্মের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের দুর্ভোগ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময় সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, আজকের কাগজসহ প্রগতিশীল পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। তাঁর এই রচনাগুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন মৌলবাদীদের ভাল লাগেনি। তারা প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে হালকাভাবে তসলিমার লেখার প্রতিবাদ করেছিল। কয়েকটি মৌলবাদী পত্রিকার সহযোগিতায় তাদের সেই ক্ষোভ রোষ উস্কে ওঠে এবং এভাবেই বর্তমান অবস্থায় পৌঁছোয়। নারী শিক্ষা, নারী

মুক্তি, নারী প্রগতি এবং মেয়েরা যখন সমাজের বন্দী অবস্থা ছিন্ন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করছিল তখনই ধর্মান্ধ মোল্লারা শুরু করেছে নাসরিন বিরোধী প্রচারণা। আজ মৌলবাদীরা কেবল নাসরিনের বিরুদ্ধেই ফাঁসির দাবি জানাচ্ছে না, প্রকৃতপক্ষে নারীমুক্তির বিরুদ্ধেই তারা সোচ্চার হতে চাইছে। সরকারও যখন নারীদের শিক্ষা ও দারিদ্র মুক্তির কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে তখনই মৌলবাদীরা মাঠে নেমেছে কোমর বেঁধে। আমরা আজকের কাগজের পাঠকদের জন্য সেই প্রগতিবাদী কলামগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। আজ তার প্রথম অংশ প্রকাশ করা হল।'

আগেও যে কথা ভাবছিলাম যে আজকের কাগজসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্রিকা এখন মিশন হিসেবেই নিয়েছে মৌলবাদবিরোধী সব খবর প্রকাশ করার, কলাম ছাপার, সম্পাদকীয় লেখার। মৌলবাদীদের কোনও খবরই এসব পত্রিকায় ছাপা হয় না। ওদের বিশাল বিশাল মিছিলের ছবি ছাপা হয় না। একইরকম মৌলবাদীদের পত্রিকায় তাদের খবরগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কেবল একদলের পত্রিকা পড়লে দেশের প্রকৃত অবস্থা বোঝার উপায় নেই, বুঝতে হলে দুদলের পত্রিকা পড়তে হয়।

ইনকিলাব পত্রিকায় লং মার্চের জন্য বিরাট বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, সারাদেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ। লং মার্চের পর মহাসমাবেশ। বিজ্ঞাপনে তসলিমা নাসরিনের ফাঁসির দাবির কথা বলা হয়েছে, যেটি নাকি ৩০শে জুনের হরতালের গণরায়। এখন ঝর প্রশ্ন, ২৮ জুন তারিখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে বলা হল যে কোনও ব্যক্তির জীবন নাশের হুমকি প্রদান করা আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখন এই বিজ্ঞাপনকে কিভাবে নেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়? কী ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রতিদিনের মিছিলগুলোয়, সভাগুলোয় ফাঁসির জন্য চিৎকার করা মোল্লাগুলোর বিরুদ্ধে? ঝর প্রশ্নের কোনও উত্তর আমার কাছে নেই। আমার একটি প্রশ্ন, এ সময় আওয়ামী লীগ কী করছে? ঝ বললেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি আর জামাতের সঙ্গে আঁতাত করেছে, এখন আওয়ামী লীগের কাছে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করাই মূল বিষয়। জামাতের বিপক্ষে গেলে জামাত আওয়ামী লীগের দাবিকে সমর্থন জানাবে না, না জানালে আওয়ামী লীগের সম্ভব হবে না আন্দোলন জোরদার করার। সুতরাং আওয়ামী লীগ এখন মরে গেলেও জামাতের বিপক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না। যে দুচারজন বলছে জামাতের বিপক্ষে তারা নিজ দায়িত্বে বলছে, দল থেকে নয়। মূলত ছাত্ররাই যা করার করছে। তারা দলের সিদ্ধান্তের পরোয়া করছে না। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট আজ   সাম্প্রদায়িকতা, ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদ বিরোধী জাতীয় কনভেনশন করবে বলে মতবিনিময় করেছে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সঙ্গে। দলগুলো গণফোরাম, গণতন্ত্রী পার্টি, গণআজাদী লীগ, জাতীয় সমন্বয় কমিটি, পাট সুতা বস্ত্র ও চিনিকল শ্রমিক ফেডারেশন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ, আইনজীবী সমন্বয় সংগ্রাম পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, একাত্তরের

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, প্রজন্ম ৭১। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোথায়! আওয়ামী লীগের বন্ধু এখন জামাতে ইসলামি। বাম ফ্রন্টের নেতারা আওয়ামী লীগের এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে এসে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা বলছেন, আশা করছেন আওয়ামী লীগ ফিরে আসবে।

কিন্তু আসবে কি?

ঝ বললেন, ওরা না এলেই ভাল। আওয়ামী লীগের চরিত্র বুঝুক সবাই। ভেবেছে ধর্মের কথা বললে ধর্মান্ধদের ভোট পাওয়া যাবে, তা তারা জীবনেও পাবে না। এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যে মানুষগুলো আওয়ামী লীগকে সমর্থন করত, তারা আর আওয়ামী লীগকে ভোটই দেবে না। দলটি তার বাঁধা ভোটগুলো নষ্ট করছে। এত আদর্শচ্যুতি কজন সহ্য করবে!

চট্টগ্রামে গোলাম আযম যাচ্ছেন বক্তৃতা করতে! লালদীঘির ময়দানে তিনি জনসভা করবেন, ভাবা যায়! জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি আর বসে থাকছেন না। কিন্তু ছাত্রঐক্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে জামাতের জনসভা পণ্ড করে ছাত্রঐক্য সমাবেশ করবে লালদীঘি ময়দানে। সিদ্ধান্তটি সাহসী বটে, কিন্তু সংঘর্ষ ঠেকাবে কে! একটি হিম হিম ভয় আমাকে তির তির করে কাঁপায়। এর মধ্যেই গোলাম আযমের উপস্থিতির প্রতিবাদে ছাত্রঐক্যের সঙ্গে জামাত শিবির ও পুলিশের সংঘর্ষে চট্টগ্রামে গতকাল পঞ্চাশজন আহত হয়েছে। ছাত্রঐক্য আর জামাত শিবিরের মধ্যে ২০/২৫ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হয়, শতাধিক বোমা, ককটেল বিস্ফোরিত হয়। ছাত্রঐক্য মিছিল করছে, গোলাম আযমের ফাঁসি আর জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি নিয়ে। কিন্তু জামাত শিবিরের লোকেরা দখল করে নিয়েছে লালদীঘির ময়দান। পুলিশ প্রশাসনও লালদীঘির ঘাট দখল করে রেখেছে গোলাম আযমের জনসভার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। সশস্ত্র শিবিরকর্মীদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না, গ্রেফতার করছে ছাত্রঐক্যের ছেলেদের। জামাত শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিলে হামলা করেছে, লালদীঘির ময়দানের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিয়েছে পুরোপুরি।

মৌলবাদী জোটের সমাবেশ বায়তুল মোকাররমের সামনের রাস্তায়। তসলিমার ফাঁসির জন্য জনগণের সমর্থনের নিদর্শন ৩০ জুনের হরতাল যদি বড় কিছু উদাহরণ না হয়ে থাকে তবে ২৯ জুলাইএর লং মার্চ আর মহাসমাবেশ বুঝিয়ে দেবে ফাঁসির দাবি কি জিনিস। সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বললেন, ২৯ জুলাই বাধা দিলে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হবে। শুরু যে হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কারও আছে বলেও মনে হয় না। সরকার কি ফেঁসে গেল মোল্লাদের উত্তেজিত করে! বক্তারা জোর দিয়ে বলছেন রক্তের বিনিময়ে হলেও জীবনের বিনিময়ে হলেও মহাসমাবেশ সফল করতেই হবে। সরকারকে দোষ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, সরকার তসলিমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে লোককে ধোকা দেবার জন্য, এখন পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে পারছে না, এটা কোনও কথা হল! সরকার তসলিমাকে খুঁজে পায় না, আর তসলিমা সাক্ষাৎকার দিয়ে চলছে, বাহ! বাহ বটে, কিন্তু মোল্লাদের ঘটে

এইটুকু বুদ্ধি হয় না যে সাক্ষাৎকার আজ প্রচার হওয়া মানে এই নয় যে আমি আজ সাক্ষাৎকার দিয়েছি. টেলিভিশনগুলো পুরোনো সাক্ষাৎকার প্রচার করছে। বিবিসি অন্য দেশের টেলিভিশন থেকে কিনে সেই সাক্ষাৎকার প্রচার করছে।

সরকার কি একটু চিন্তায় পড়েছে! ২৯ জুলাই সার্ক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন হওয়ার কথা ঢাকায়। আর এই তারিখেই মৌলবাদীরা সারা দেশ থেকে লং মার্চ করে ঢাকায় আসছে মহাসমাবেশে যোগ দিতে। সম্মেলন পন্ড হয়ে যায় কি না কে জানে। সমাবেশ করো তবে হোটেল শেরাটন থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত রাস্তাটা বাদ দিয়ে কর। কানে কানে বলে দেওয়া হয়েছে মৌলবাদী নেতাদের।

এদিকে সরকার থেকে তসলিমা নাসরিন ইস্যু নিয়ে বিদেশে নেতিবাচক প্রচারের আচ্ছামত জবাব দেবার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সরকার থেকে তসলিমা নাসরিন ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে একটি নোট পাঠানো হয়েছে বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোয়। ঢাকায় বিদেশি সাংবাদিকদেরও সেই নোট পাঠানো হয়েছে। ২৯৫ (ক) ধারাটি কি এবং কাহাকে বলে তার ব্যাখ্যা করে দিয়েছে সরকার। ইহা যে কোনও উগ্র ইসলামি আইন নয়, ইহা যে ধর্মনিরপেক্ষ আইন, কারণ ইহা ব্রিটিশের তৈরি করা আইন, তার ব্যাখ্যা। কবে তৈরি করেছিল ব্রিটিশ আইন? ঔপনিবেশিক আমলে। প্রায় দুশ বছর আগে অথবা দেড়শ বছর আগে। ব্রিটিশ তৈরি করলেই আইন বুঝি খুব আধুনিক হয়ে যায়! ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়! সেটা কথা নয়, কথা হল, বাংলাদেশ দূতাবাস এখন মোক্ষম জবাব দিতে ব্যস্ত। ব্যস্ততার মধ্যে পাশের কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার জাহাঙ্গীর সাদাত জানিয়েছেন ভারতীয় পত্র পত্রিকায় তসলিমা ইস্যু সঠিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না। তার মানে বেঠিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বলেছেন,বাংলাদেশকে হেয় করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক ইস্যুগুলোকে যা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তা ভারতীয় পত্রপত্রিকা ফলাও করে প্রচার করছে। জাহাঙ্গীর সাদাত সরকারি আদেশে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আজকাল এসব পত্রিকায় চিঠি পাঠিয়েছেন, লিখেছেন, তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৯৫(ক) ধারায় একটি ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনে প্রকাশ্যে বিদ্বেষপূর্ণ বিবৃতি প্রদানের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়। তসলিমা আইনের প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলছেন। তিনি যদি কোনও অপরাধ করে না থাকেন তাহলে তাকে আদালতেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। বহু পশ্চিমা দেশের মত বাংলাদেশে ব্লাসফেমি আইন নেই। কিন্তু তসলিমার বিরুদ্ধে যে আইনে মামলা হয়েছে সেটি সকল ধর্মের অনুসারীদের নিরাপত্তা প্রদানকারী একটি ধর্ম নিরপেক্ষ আইন। তার প্রকাশ্য বিবৃতিসমূহ সাধারণ আইনের আওতায় তদন্তাধীন রয়েছে। এক শ্রেণীর ভারতীয় পত্রপত্রিকা এমন একটি ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করছে যে তসলিমাকে নির্যাতন করা হচ্ছে। এইসব পত্রিকা ইচ্ছাকৃতভাবে আইনগত ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক নির্যাতনের পরিষ্কার ধারণার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ভারতীয় পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা রক্ষা করছে না, এমন একটি মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার তসলিমা নাসরিনকে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিবৃতিদানের মামলায় ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আইনের নিরাপত্তা দিচ্ছে। একমাত্র আদালতই তাকে বিশাল

জনরোষ থেকে রক্ষা করতে পারে। তবে তসলিমা নিজেই আইনগত প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা গ্রহণ করেননি। বাংলাদেশ সরকার মৌলবাদী চাপের কাছে হার মানছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা মোটেও সত্য নয়। বরং সরকার দেশের ধর্মনিরপেক্ষ আইন অনুসারেই কাজ করছে। দেশের আইনের অধীনেই তসলিমার বিচার হচ্ছে। যেহেতু তসলিমা আত্মগোপন করে আছেন এবং আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাই তিনি আইনগত নিরাপত্তার দাবি করতে পারেন না। যেহেতু বাংলাদেশের আদালত স্বাধীন, মুক্ত ও নিরপেক্ষ তাই তসলিমা ন্যায় বিচার পাবেন। তসলিমার বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি বা গ্রুপের হত্যার হুমকি দেওয়ার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি না তা আদালতই সিদ্ধান্ত নেবে। বাংলাদেশ সরকার হত্যার হুমকি প্রদানের বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। বাংলাদেশে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকার বিষয়টিকে আদালতে অর্পণ করে তসলিমাকে শুধু আইনী নিরাপত্তাই দেয়নি, দেশের আইনকে সমুন্নত রাখা ও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তিকে সাফল্যজনকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই হল সরকারি জবানবন্দি। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন কেন করতে হচ্ছে সরকারকে! বিদেশে ছাপানো খবরগুলো সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলছে বুঝি!

আরেকটি জরুরি খবর।

তসলিমা নাসরিন ইস্যু কভারের উদ্দেশ্যে কোনও বিদেশি সাংবাদিককে বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে ভিসা না দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় নির্দেশ দিয়েছে।

২৯ জুলাইএর লং মার্চ সফল করার জন্য মৌলবাদী নেতারা দেশের এক শহর থেকে আরেক শহরে দৌড়োচ্ছেন, জনসভায় বক্তৃতা করছেন। আনোয়ার জাহিদ খুলনার জনসভায় বলেছেন, সত্য কথা বললে যদি মৌলবাদী হতে হয়, তবে আমি গর্ব করে বলছি আমি মৌলবাদী।

ঝ আজ আপিসে যাননি, দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছেন আমার সঙ্গে। বিভিন্ন খবর নিজে তিনি পড়ছেন, শোনাচ্ছেন।

জামাতে ইসলামী ২৯ জুলাই বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সমাবেশ করবে বলছে। প্রশ্ন মনে উদয় হয়, ঝকে জিজ্ঞেস করি, জামাতে ইসলামী সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে লং মার্চ আর মহাসমাবেশ করছে না, কারণটি কি?

ঝও ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন না। জামাত হঠাৎ আলাদা হয়ে গেল কেন? জামাত ছাড়া আর সব মৌলবাদী দল তো সব একসঙ্গে আছে। মৌলবাদী জোটে জামাত নেই কেন?

আগের একটি খবরের কথা মনে করে ঝ বললেন, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। জামাতে ইসলামী মনে করে তাদের নেতারা অন্য ইসলামী দলের চেয়ে বড় নেতা, সুতরাং জামাত হয়ত পুরো জোটের নেতৃত্ব দিতে চায়। কিন্তু ওদিকে আমিনী, শায়খুল হাদিস এরা নাম করে ফেলেছে যথেষ্ট, এরা এখন নিজামীদের ওপর নাপতানি করতে চাইছে। সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের তো গোপন মিটিংও হয়ে গেছে জামাতকে তারা দলে নেবে কি নেবে না এ নিয়ে। কেউ বলছে জামাত থাকুক, কেউ বলছে না দরকার নেই। সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ এখন জামাতের চেয়েও বেশি শক্তিশালী, জামাত এখন সঙ্গে না থাকলেও তাদের কোনও কিছু যায় আসে না।

এদের মধ্যে একটা ব্যাপার দেখেছো? আমি বলি, জামাতে ইসলামী আর ইসলামী ঐক্যজোট বা সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও তারা কিন্তু মঞ্চে উঠে এক দল আরেক দলকে গালাগাল করছে না। কিন্তু এখানে বিএনপি আর আওয়ামী লীগ হলে চুলোচুলি লেগে যেত।

এদেশে মৌলবাদীদেরই মনে হয় ভবিষ্যৎ ভাল। তাদের মধ্যে একতা আছে। আজ জামাতে ইসলামীর প্রতি থানায় পথসভা আছে ও মিছিল আছে। কাল বাদ আছর বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল বের করবে, কেবল তাই নয়, প্রতিটি থানা, ওয়ার্ড আর মহল্লা থেকে জামাতের মিছিল বেরোবে, আর ২৯শে জুলাই বিকেল ৩টায় বায়তুল মোকাররমের সামনে জনসভা। মোল্লারা ২৪ ঘন্টা ব্যস্ত। দিনে মিছিল করছে, রাতে মশাল মিছিল করছে। রাতে যে ব্যাটারা একটু ঘুমোবে তাও না, এমনই উত্তেজিত।

আমি বলি, এই যে জনসভাগুলো করছে, সবই তো রাস্তা বন্ধ করে। মঞ্চ করছে রাস্তার ওপর। সাধারণ মানুষকে কি কম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে!

ঝর কণ্ঠে নির্লিপ্তি, তাতো হচ্ছেই। তা আর কে কেয়ার করে! জনগণ নিয়ে এ দেশের কোনও রাজনৈতিক দল ভাবে না। জামাতে ইসলামী কার কাছ থেকে শিখেছে রাস্তা বন্ধ করে জনসভা করা? বিএনপি আওয়ামী লীগের কাছ থেকেই তো!

ডডএ দেশে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি,কোনওদিনই একটি সুস্থ নেতৃত্বের দেখা পাবো না, যারা সত্যিকার দেশের মানুষের মঙ্গল কামনা করে!

ডডতা তো আছেই। গণফোরাম আছে। বাম দলগুলো দুএকটা আছে। কিন্তু তাদের কোনও জনপ্রিয়তা নেই। আর ক্ষমতায় গেলে সব লোকই যখন করাপ্ট হয়ে যায়, তখন কারও ওপর আর আস্থা নেই।

ডডকামাল হোসেন আমার লইয়ার বলে বলছি না। তাঁর দলটিই মনে হয় সত্যিকার একটি দল যে দলটি ক্ষমতায় গেলে দেশের সত্যিকার উন্নতি হতে পারে।

ঝ জোরে হেসে বলেন, একই বুর্জোয়া দল। একই একই। আওয়ামী বিএনপির চেয়ে আলটিমেটলি কোনও পার্থক্য নেই। ক্যাপিটালিস্ট। তবে অনেস্ট ক্যাপিটালিস্ট। এখন যেরকম দুর্নীতি চলে, তেমন হয়তো চলবে না। কিন্তু গরিব গরিবই থেকে যাবে। যাই হোক, কারা ভোট দেবে কামাল হোসেনকে?

ঝ একটু থেমে, একটু ভেবে বলেন, দেশের কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের ভোট পেয়ে আর যাই হোক নির্বাচনে জেতা হয় না। ভোট পাওয়ার জন্য যেমন অসৎ হতে হয়, তেমন অসৎ কামাল হোসেন হতে পারবেন না, তাই তিনি ভোট পাবেন না। গণফোরাম বাংলাদেশের সংজ্ঞায় কোনও রাজনৈতিক দল না হয়ে হয়ে গেছে রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের ক্লাব। সাধারণ মানুষ গণফোরাম চিনতে চিনতে আরও কয়েক যুগ নেবে।

ঝ আর আমি মুখোমুখি আধশোয়া হয়ে এসব নিয়ে কথা বলি। একটি খবর দেখে আমি চমকে উঠি, উঠে বসি, শেষ পর্যন্ত ..

শেষ পর্যন্ত কি?

শেষ পর্যন্ত সরকারকে বলতে হল..

কি বলতে হল বলই না! ঝ টান দিয়ে কাগজটি আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। পড়ে, হেসে, তিনি বললেন, তথ্যমন্ত্রী বলেছে মৌলবাদীদের আস্কারা দেওয়া যাবে না। বলেছে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কোনও স্থান নেই।
আমি বলি, কেমন বেসুরো লাগছে শুনতে যে বিএনপি সরকার এ কথা বলছে।
ঝ বললেন, বলেছে বিদেশে এ দেশটা মৌলবাদী দেশ হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে বলে। তা না হলে মৌলবাদীরা যে দীর্ঘদিন থেকে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোনও কথাই তো আগে বলেনি। বলেনি আগে। এই সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে। তা বটে, গভরমেন্ট অব দ্য ফান্ডামেন্টালিস্টস, বাই দ্য ফান্ডামেন্টালিস্টস, ফর দ্য ফান্ডামেন্টালিস্টস হঠাৎ করে গণতন্ত্রের কথা বলছে।

ঝ যখন নিচে চলে যান কিছু জরুরি ফোন করতে, তখন পত্রিকার বড় একটি খবরে হঠাৎ চোখ পড়ে।

তসলিমা নাসরিনকে হত্যার জন্যে ইসলামী জেহাদ বিশেষ স্কোয়াড গঠন করেছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ২৯ জুলাই।

তসলিমা নাসরিনকে হত্যা করার জন্য ইসলামি জেহাদ নামে একটি সংগঠন বিশেষ স্কোয়াড গঠন করেছে। আগামি ২৯ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্কোয়াডের নাম ঘোষণা করা হবে। ইসলামী জেহাদের আহবায়ক মাওলানা বরকতউল্লাহ নিউজ এন্ড ফিচার সার্ভিসকে বলেছেন, শুধু তসলিমা নাসরিন নয়, ইসলাম এবং কোরআন বিরোধী সকল মুরতাদের বিরুদ্ধে স্কোয়াড সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, যে সব পত্রপত্রিকা কোরআনের অবমাননা করেছে, সেইসব পত্রপত্রিকার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইসলামী জেহাদ নামের এই সংগঠনটির ঠিকানা বলা হয়েছে নয়ারহাট, সাভার। তবে এর আহবায়ক জানান, বর্তমানে ঢাকার নয়াটোলা, মগবাজারে তাদের অস্থায়ী কার্যালয় রয়েছে। ২৯ জুলাই লং মার্চের প্রতি ঐ সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। সংগঠনে সহস্রাধিক সাচ্চা মুজাহিদ রয়েছে বলে মাওলানা বরকত উল্লাহ জানান। যারা ইসলাম এবং কোরআন রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। ইসলামী জেহাদ মনে করে তসলিমা নাসরিনসহ দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী মুরতাদ। তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত। তবে, এজন্যে তারা প্রথমে সরকারের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাবে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার ব্যর্থ হলে তারা নিজেরাই ইসলাম রক্ষার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে তারা জানিয়েছে। এই সংগঠনের সঙ্গে জামাতের কোনও সম্পর্ক আছে কী না এ ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বলেননি। তবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর ৭৫ পর্যন্ত বরকত উল্লাহ কারাগারে ছিলেন। এখন অবশ্য তার চলাফেরা প্রকাশ্যে। বরকত উল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে, ইসলাম ছাড়া এই দেশ চলতে পারে না।
ইসলামি দলের সূত্রে জানা গেছে জামাতের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগঠনের ব্যানারে অন্তত একশ জন সশস্ত্র ক্যাডার রয়েছে। এদের অনেকেই যুব কমান্ডের সঙ্গে

সম্পৃক্ত। এদের লক্ষ্য তথাকথিত মুরতাদদের চিহ্নিত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। দু বছর আগে যুব কমাণ্ড ভারতীয় দালাল হিসেবে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের নাম ঘোষণা করে তাদের হত্যার হুমকি দিয়েছিল। এই ঘটনার পর পর খুলনায় রতন সেন নিহত হন। ঢাকায় রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ হন। এখন ইসলামী জেহাদ ইসলাম রক্ষার নামে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিয়ে পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাবার পাঁয়তারা করছে। সংগঠনের সূত্রে জানা গেছে, ২৯ জুলাই লং মার্চের পরেই তারা স্কোয়াডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে। ইসলামী জেহাদের কর্মীরা মনে করে সরকারের মধ্যে অনেক মুরতাদ রয়েছে। যাদের কারণে তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না। সংগঠনের এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে একে একে তারা প্রত্যেক মুরতাদের বিরুদ্ধে গণআদালত গঠন করবে। যদিও সরকার বারবার বলেছে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ধরনের সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এই খবরটি পড়ে আমি অনেকক্ষণ স্থবির বসে থাকি। সাদা কাগজের ওপর পেন্সিলে আঁকতে থাকি আমার ছবি, ছবিটির গলায় দড়ি, বুকে ছুরি, মাথায় গুলি। লিখতে থাকি মৃত্যু মৃত্যু**মৃত্যু। মৃত্যু,** মৃত্যু, মৃত্যু।ছোট মৃত্যু, বড় মৃত্যু। কেমন লাগে মরে গেলে! কিছু কি বোঝা যায় যে মরে যাচ্ছি আমি। বুকে কি খুব যন্ত্রণা হয়! এমন কাউকে পাইনি যে মরেছে, এবং বর্ণনা করেছে মৃত্যু হলে কেমন লাগে। যে যায়, সে যায়। কোনওদিন ফিরে এসে কাউকে বোঝাতে পারে না মৃত্যুর রংরূপগন্ধ। আমি মরে গেলে কেউ কি কাঁদবে এই জগতে! আমার মা কাঁদবেন, বাবা কাঁদবেন, ভাই বোনেরা কাঁদবে জানি। এদের বাইরে যারা আমাকে ভালবাসে, তারা দুঃখ করবে। কিন্তু কদিন আর! কটা দিন গেলে সবাই ভুলে যাবে। আগের মত যে যার জীবন যাপন করবে। সারাদিন আমি আর মৃত্যু বসে থাকি পাশাপাশি। সাদা কাগজটিতে মৃত্যুর ছবি আঁকতে আঁকতে লিখি।

মৃত্যুর সঙ্গে এখন আমার রোজ দুবেলা দেখা হয়, আমরা পরস্পরকে গাঢ় চুম্বন করি, পাশাপাশি বসি, ধুম আড্ডা দিই। মৃত্যুর শরীরে চমৎকার সুগন্ধ, হাঁটুতে থুতনি রেখে জীবনের গল্প যখন করি, থই থই নদী, নদীতে ডুবে ভেসে কৈশোর যাপন, ধুলো খেলাড্ডযখন গল্প করি ফিতে বাঁধা বেণী উড়িয়ে গোল্লাছুট, গোলাপ পদ্ম, হাডুডু আর ভোকাট্টা ঘুড়ির পেছনে দৌড়ে দৌড়ে ভর সন্ধেয় মাঠ পেরিয়ে, খাল পেরিয়ে রাত্তিরে পুকুর পাড়ে বসে সারা গায়ে জ্যোৎস্না মাখানো.. জলের ওপর শুয়ে থাকা রুপোলি মাছ দেখে সেই মাছের দিকে হাত বাড়ালে হাতের মুঠোয় আসে মাছ নয়, টুকরো টুকরো চাঁদ। যখন গল্প করি ঘাসের বিছানা থেকে ফ্রক ভরে শিউলি তুলে পড়শির দেয়াল ডিঙিয়ে দে দৌড় দে দৌড় দিনের কথা, মৃত্যুর চোখেও তখন অল্প অল্প শিশির জমে, তারও কণ্ঠ বুজে আসে, বলে, যাই। মৃত্যুর সঙ্গে রোজ দুবেলা দেখা হয় আমার, দেখা হলে পরস্পরকে গাঢ় চুম্বন করি আর যখন গল্প করি কৈশোর পেরোতেই গহন অরণ্যে এক পাল বুনো মোষের মুখে আমাকে ছেড়ে দিল কারা যেন, কারা যেন একটি ডোবায় ঠেসে ধরল আমার মুখ, মাথা, কারা যেন আমার পায়ে হাতে শেকল পরালো, কারা যেন পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার কপাল, মাথার খুলি.... মৃত্যুর চোখেও তখন গভীর কুয়াশা নামে, বলে ড্ড যাই। মৃত্যুর সঙ্গে রোজ দুবেলা দেখা হয়

আমার। আমার চুলে পিঠে হাত বুলিয়ে সে কথা দিয়েছে আবার আসবে সে, এবার আর ঘোর অন্ধকারে আমাকে একলা বসিয়ে কোথাও যাবে না, তার বাড়ি আছে একটি আলোয় ঝলমল, ওখানে নেবেই আমাকে।

ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে কাগজটিতে। পড়ুক। পড়তে দিই। গোঙানোর শব্দ শুরু হলে বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে থাকি। শব্দটিকে সজোরে চেপে রাখি যেন কোথাও না যায় ঘরটি থেকে। হাত পা গুলো গুটোতে গুটোতে সঙ্কুচিত হতে হতে আমি এই এতটুকু হয়ে যেতে থাকি, অস্তিত্ব যদি অস্বস্তি হয়ে দাঁড়ায়, এভাবেই বুঝি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হয়। এভাবেই পড়েছিলাম যখন ঝ এলেন। ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না দরজা। ঝ ঢুকে পিঠে হাত রাখতেই চমকে পেছন ফিরি।

---*হয়েছে কি?*

---*কিছু না।*

---*কিছু তো নিশ্চয়ই।*

আমাকে টেনে তুলে বসিয়ে দেন তিনি। মুখ দেখেই বোঝেন আমি আবার ডুবেছি মৃত্যুচিন্তায়। সিগারেট বাড়িয়ে দেন। দুজন চুপচাপ বসে সিগারেট খেতে থাকি। ঝ একসময় বলেন ---*আজ তোমার ভাই আসবে।*

---*সত্যি? সত্যি আসবে? কখন আসবে?*

---*রাতে।*

---*কটায়?*

---*জানিনা কটায়।*

---*কি করে জানো যে আসবে?*

---*কথা হয়েছে।*

একটি উত্তেজনা আমার দিকে চিতার মত দৌড়ে আসতে থাকে। এতদিন পর আমি আমার ঘনিষ্ঠ কাউকে দেখব। মনে হচ্ছে কয়েক লক্ষ বছর পর বুঝি দেখা হবে! ঝকে দেখলে বোঝা যায় না যে ভেতরে ভেতরে তিনি এত নরম। নিশ্চয়ই তিনি বুঝতে পারেন কী ভীষণ চাইছি আমি আত্মীয়দের কাউকে দেখতে। হয়ত কোনওদিনই আর আমাদের দেখা হবে না ভেবে ঝ এখন এই শেষ দেখার ব্যবস্থাটি করে দিলেন।

সারাদেশে আন্দোলন হচ্ছে। প্রতিটি নগরে, বন্দরে। প্রতিটি শহরে, উপশহরে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি গঞ্জে। আমাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আমার বাবার গ্রামে, যে গ্রামে আমার বাবা জন্মেছেন, যে গ্রামের মানুষদের তিনি আজ তিরিশ বছর বিনে পয়সায় চিকিৎসা করছেন, সেই গ্রামের মানুষও আমাকে ফাঁসি দেবে। যে ইশকুলে বাবা লেখাপড়া করেছেন, সেই চণ্ডিপাশা ইশকুলের মাঠেও বিরাট জনসভা। চল্লিশ হাজার লিফলেট বিলি হয়েছে নান্দাইলে। জেহাদের ডাক পড়েছে।

জেহাদের ডাক
আল্লাহু আকবর

মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার প্রত্যয়ে
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে
ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে
আঞ্জুমান এত্তেহাদে মুসলেমীন এর উদ্যোগে
তৌহিদী জনতার ঐতিহাসিক **মহাসমাবেশ**
স্থান চন্ডিপাশা হাইস্কুল মাঠ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
তাং- ২৬ শে জুলাই, ১৯৯৪ইং, মোতাবেক ১০ই শ্রাবণ ১৮০১ সাল (বাং)
রোজ মঙ্গলবার, সময় বেলা ২ ঘটিকা।

সভাপতি-হযরত মাওলানা আমিরউদ্দিন সাহেব
আহবায়ক ড্ড আঞ্জুমানে এত্তেহাদে মুসলেমীন
প্রধান অতিথি-মাননীয় জনাব আনওয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী এম.পি
প্রধান পৃষ্ঠপোষকড্ড আঞ্জুমানে এত্তেহাদে মুসলেমীন

বক্তব্য প্রদান করিবেন ঃ

১. হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান হারুন নগরী সাহেব,
২. হযরত মাওলানা আলী হোসেন রাঘেবী সাহেব
৩. হযরত মাওলানা মজিবর রহমান খান সাহেব, অধ্যক্ষ, ঘোষপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসা
৪. হযরত মাওলানা সায়েদুর রাহমান সাহেব, নান্দাইল
৫. হযরত মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব, নাজেম, বারুই গ্রাম মাদ্রাসা
৬. হযরত মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন সাহেব, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আশরাফ চৌধুরী আলীয়া মাদ্রাসা
৭. হযরত মাওলানা মাহতাব উদ্দিন খাকী সাহেব, আচারগাঁও
৮. হযরত মাওলানা রুহুল আমিন রাজী সাহেব, ঈশ্বরগঞ্জ
৯. হযরত মাওলানা আবদুল গফুর সাহেব, শেরপুর সিনিয়র মাদ্রাসা
১০. হযরত মাওলানা আবদুল মতিন সাহেব, চকমতি আলীয়া মাদ্রাসা

আরও অন্যান্য দেশ বরেণ্য ওলামাগণ বক্তব্য রাখিবেন।
আপনারা তৌহিদের ডাকে দলে দলে যোগদান করে মুরতাদ বিরোধী জেহাদের শপথ নিন।

বেরাদারানে ইসলাম

আসসলামু আলাইকুম।

মুরতাদ, ভ্রষ্টা ও কুলাঙ্গার তসলিমা নাসরিন কোরআন পাকের জঘন্য অবমাননা করেছে। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে (নাউজুবিল্লাহ),

কোরআন পাককে মনগড়া ধোঁকাবাজির গ্রন্থ বলেছে (নাউজুবিল্লাহ)।
নারী মুক্তির নামে আমাদের নারী সমাজকে অবাধ যৌন সম্পর্ক তথা বেশ্যাবৃত্তিতে প্ররোচিত করার স্পর্ধা দেখিয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)।
মুরতাদ সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিন ও কাদিয়ানীরা কোরআন হাদিস সুন্নাতে রাসুল(দঃ), সুন্নাতে সাহাবার (রাঃ) অপব্যাখ্যা করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে হেয় এবং হাস্যাস্পদ করার স্পর্ধা দেখিয়েছে।
মুরতাদ সালমান রুশদী, মুরতাদ তসলিমা নাসরিন ও কাদিয়ানী এবং এক শ্রেণীর এনজিও রা আন্তর্জাতিক ছত্রছায়ায় ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। হাককানী ওলামা সমাজ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দকে হেয় এবং হাস্যাস্পদ করার স্পর্ধা দেখিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ইসলামী আক্বিদা, তাহজীব, তমদ্দুন ও জেহাদী চেতনাকে ধ্বংস করে সুকৌশলে অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। ভন্ড পীরদের অপতৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম জাহান এক মহা ফিৎনার সম্মুখীন হয়েছে। এই সার্বিক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য বালাকোটের বীর শহীদানদের উত্তরসূরী আঞ্জুমানে এত্তেহাদে মুসলেমীন তৌহিদী জনতার পক্ষ থেকে ইসলাম, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রকে স্তব্ধ ও নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছে। মুসলিম সমাজে জেহাদী চেতনা এবং ঈমানী চেতনাকে সম্বল করে জেহাদের ডাক দিচ্ছে।
উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ঈমানী দায়িত্ব পালনের তাগিদে উক্ত মহা সমাবেশে দলে দলে যোগদান করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করার ও কাফের মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহীদের প্রতিরোধের জেহাদকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সাহসিকতার সাথে মহা সমাবেশে যোগ দিন। নাসরু মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব (বিজয় অতি নিকটবর্তী)। আল্লাহ হাফেয।

আরজ গুজার
আঞ্জুমানে এত্তেহাদে মুসলেমীন এর পক্ষে
আলহাজ্ব মাওলানা আনিসুর রাহমান

বাবার কথা খুব মনে পড়ছে আমার। একবার যদি বাবার সঙ্গে আমার দেখা হত! মনে মনে বাবাকে বলতে থাকি, কতদিন দেখা হয় না তোমার সঙ্গে, কত দীর্ঘদিন! শেষ যখন দেখি, দেখে তোমাকে মনে হয়নি তুমি সেই আগের তুমি, আগের সেই ঋজু শরীর আর নেই, আগের সেই গমগমে কণ্ঠস্বর, আগের সেই জুতোর মচমচ শব্দ, আগের সেই....তুমি তো হেরেছো জীবনে অনেক, আমিও। তুমি তোমার গ্রামকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলে, চেয়েছিলে ধানে পাটে শাকে সবজিতে বৃক্ষে ফলে ছেয়ে যাক তোমার শখের গ্রাম, এত সবুজের স্বপ্ন তুমি কি করে লালন করতে! তোমার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে যতই ওপরে উঠি, যতই উঠি কোনও শীর্ষের নাগাল পাই না এই কৌতূহলী আমিও। বিনিময়ে ওই গ্রামের লোকেরা তোমার মাথায় কুড়ুলের কোপ বসালো। আর আমার স্বপ্নের ওপর দেশসুদ্ধ মানুষ ঢেলে দিচ্ছে মণ মণ পাথর, গজারি কাঠ, হাতবোমা, আগুন, বিষাক্ত সাপ, ফাঁসির দড়ি, কী

ভীষণ তাণ্ডব চারিদিকে, তাই না? একটি মানুষকে হত্যা করবে বলে লক্ষ লক্ষ লোক তাড়া করছে, হন্যে হয়ে খুঁজছে, তুমি কি ভয় পাচ্ছো, রক্তচাপ বাড়ছে? না বাবা ভয় পেও না, আমি ঠিক দাঁড়াবই, ওদের পাথর, বোমা, সাপ আর ফাঁসির দড়ির সামনে আমি অনড় দাঁড়িয়ে থাকব, এত অনড় দাঁড়াব যে ওরা ওদের অস্ত্র নিক্ষেপ করে আমার দেহকে নির্মূল করবে হয়ত, কিন্তু বিশ্বাস! বিশ্বাস তো মরবে না, যা আমি ছড়িয়ে দিয়ে গেছি হাজার মানুষের মধ্যে, তা মানুষ গোপনে হলেও রোপণ করবে, ওতে জল দেবে, আর চারা যদি বড় হতে হতে বৃক্ষ হয়, মহীরূহ হয়, তবে জগতে কত কুড়ুল আছে যে কোপ বসাবে ওদের গায়ে? না হয় বসাক, মরা বৃক্ষের আনাচ কানাচ থেকে আবার বুঝি অঙ্কুরোদগম হয় না? হয়। বাবা তুমি ভেঙো না, যেমন মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলে আমাকে, তেমন দাঁড়িয়ে থাকো। আমরা হেরে গেছি বটে আজ, মানুষ আজ চাবুক মারছে আমাদের পিঠে, একদিন দেখো, তোমার গ্রামও ধানে পাটে শাকে সবজিতে বৃক্ষে ফলে সমৃদ্ধ হবে, একদিন দেখো আমার স্বপ্নগুলোও ডালপালা মেলবে। বিত্ত নেই, মান নেই, আমাদের বুকের ভেতর নিষ্কলুষ স্বপ্ন ছাড়া আর আছে কি, বল!

রাত এগারোটায় ঘরে ঢোকেন ছোটদা, পেছনে বাবা, বাবার পেছনে গীতা। বাবাকে দেখে আমি ছুটে যাই তাঁর কাছে। তিনি আমাকে বুকে টেনে মাথায় পিঠে হাত বুলোতে থাকেন। কোনও শব্দ বেরোয় না তাঁর মুখ থেকে। কেউ কোনও কথা বলছে না। আমি চেপে আছি আমার কান্না আমার বুকের ভেতর, আমার কণ্ঠদেশে। ছোটদা চোখ মোছেন। আমি যদি জোরে কাঁদতে পারতাম, খুব জোরে, তবে হয়ত একটু স্বাভাবিক হতে পারতাম। বাবার হাত ধরে আমি মেঝের বিছানায় বসাই। পাশে বসি।
---*কেমন আছো মা?* বাবা জিজ্ঞেস করলেন। কণ্ঠ কাঁপছে তাঁর।
আমি কেমন আছি তা আমাকে জিজ্ঞেস করার কোনও অর্থ হয় না। মনে মনে বলি, আমি কেমন আছি তা তো তোমরা সব জানোই, কেন খামোকা জিজ্ঞেস করছ। আমি কোনও উত্তর দিই না।
--- *তোমার ভয় করে মা? ভয় কইর না। মনে সাহস রাখো।*
ঝ বলেন---*ওকে আমি অনেক বলেছি ভয় না পেতে। যা হয় হবে। মোল্লারা মেরে ফেলবে, এত সোজা নাকি! আমরা কি নেই নাকি?*
ছোটদা বলেন---*নাসরিন, বিদেশ থেইকা, ইউরোপ আমেরিকা থেইকা দিনে হাজারটা ফোন আসে তর খবর নিতে। আমরা কইয়া দিই আমরা কিছু জানি না কই আছে। কয়, হেল্প করতে চায়। ইন্ডিয়া থেইকা সানাল এডামারুকু নামে এক লোক যে কত ফোন করছে।*
বাবার বেদনার্ত মুখের দিকে তাকানো যায় না। কিন্তু কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। আমিই বা কি বলব। ছোটদাই বলেন কথা। বলেন যে পুলিশ এসে তাণ্ডব চালিয়েছে বাড়িতে। বিপদ আঁচ করে তিনি আমার কমপিউটারের হার্ডডিস্ক রাতের অন্ধকারে শফিক আহমেদের বাড়িতে রেখে এসেছেন। আর যা কিছুই হোক, লেখাগুলো বেঁচে থাকবে।
গীতার হাতে কিছু বাটি। খুলে বলল---*মা রান্না কইরা দিছে। এইগুলা খাইয়া নে।*
ছোটদা বলেন--- *হ খা। মা কইছে তরে মুখে তুইল্যা খাওয়াইয়া দিয়া যাইতে।*

বাবা আমাকে কাঁটা চামচে তুলে আম খাওয়াতে থাকেন। মা ল্যাংরা আম কেটে পাঠিয়েছেন। পছন্দের খাবারগুলো পাঠিয়েছেন। রুই মাছ ভাজা, বড় বড় গলদা চিংড়ির ঝোল, খাসির মাংস, পোলাও। ছোটদা বললেন---*আজকে কইলাম মারে যে দেখা করার একটা সম্ভাবনা আছে। মা দৌড়াদৌড়ি কইরা বাজার কইরা রাইন্দা ফেলল। মা তো সারাদিন কান্দে। খায় না। ঘুমায় না। মারে কত কই কাইন্দা কোনও লাভ নাই। মা তবুও কান্দে।*

---*চেম্বারের কি অবস্থা? অবকাশেও নাকি ..*

আমার প্রশ্ন শেষ হয় না, ছোটদা বললেন---*বাবার চেম্বার তো অর্ধেক ভাইঙ্গা ফেলছে। ভেতরে যন্ত্রপাতি রাখার আলমারি ভাঙছে, টেবিল ভাঙছে। বাবা তো এখন চেম্বারে যাইতেই পারে না। নতুন বাজার দিয়া মিছিল যায় প্রত্যেকদিন। দৌড়াইয়া লুকাইতে হয় আশেপাশের দোকানে। অবকাশের বাইরের ঘরের দরজা জানালা ভাইঙ্গা ফেলছে। বাইরের গেটে এখন তালা দেওয়া থাকে। এখন তো পুলিশ আইছে। পুলিশ থাকে বাসায়।*

বাবার হাত স্থির হয় না। হাতটি দ্রুত তিনি বুলোতে থাকেন আমার পিঠে, মাথায়।

---*পুলিশ? সরকার পুলিশ দিল?*

---*হামলার পরে ত আমরা ডঃ কামাল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করছি। উনিই বলছেন যেন পুলিশের প্রটেকশান চাই। চাওয়ার বেশ কিছুদিন পর পুলিশ আইছে। তাছাড়া এমনিতেই তো সব সময় যাইতাছি, সারা হোসেনের সাথে জামিনের ব্যাপারে কথা হইতাছে। উনারা তর জামিনের ব্যাপারে খুব চেষ্টা করতাছেন। আমারে বলছে, সব সময় রেডি থাকতে, কোর্টে যাইতে হইব এমন খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা তরে হাজির করি।*

---*তুমি ত আর জানতা না আমি কই আছি। হাজির করতা কেমনে?*

---*ক ত জানত। ক মাঝে মাঝে ডঃ কামাল হোসেনের সাথে দেখা করতে যায় জামিনের খবরাখবর নিতে। ওইখানেই দেখা হইছে কয়দিন।*

---*ময়মনসিংহে কারা মিছিল করে? আমি ময়মনসিংহের মেয়ে জাইন্যাও করে?*

---*হুহ, তর মামারাই করে।*

---*মামারা?*

গীতা বলে---*শরাফ মামা তো মিছিল করে।*

বাবা বলেন---*পীর বাড়ির সব লোকই মিছিলে যায়।*

---*নান্দাইলের মিছিলে তো কাকারাও যায়।* ছোটদা বলেন।

হঠাৎ একটি ভয় আমার মাথার ওপর বাদুরের মত ঝুপ করে পড়ে। মৃত্যুভয়। আমি কাগজ কলম টেনে নিয়ে দ্রুত লিখি আমার ব্যাংকের টাকা পয়সা যেখানে যা আছে সব কিছু এখন রেজাউল করিম কামালের তত্ত্বাবধানে থাকবে, তাঁকে টাকা তোলার সব রকম অধিকার দেওয়া হল। কাগজটি ছোটদার হাতে দিই। ছোটদা পড়ে বলেন,

---*আমারে সব অথরাইজ কইরা দিলি যে! তুই কি বাঁচবি না নাকি!*

---*কথা কইও না। কাগজটা রাখো পকেটে।* আমি বলি।

ছোটদা কাগজ পকেটে রেখে বলেন---*এত বেশি ভাবিস না তো! সব ঠিক হইয়া যাইব, দেখিস।*

বাবা হাত বুলিয়েই যাচ্ছেন আমার মাথায়, পিঠে, বাহুতে। ছোটদা বললেন, *বাবারে তো মারছে মোল্লারা। মাইরা ধাককা দিয়া ফালাইয়া দিছে ড্রেনে।*

---*কি কও?* আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি।

---*হ। মোল্লাগোর মিটিং হইতাছিল বড়বাজারে। বাবা শুনতে গেছিল।*

বাবা অপ্রস্তুত হেসে বললেন--- *না মা, তেমন কিছু না। চিন্তা কইর না। তেমন কিছু হয় নাই।*

প্রসঙ্গটি তিনি চাননা উঠুক। কিন্তু আমি শুনবই। বললেন---*ওই একটু গেছিলাম শুনতে।*

---*কেন?*

---*কী ওদের প্রোগ্রাম, কি করতাছে .. মিটিংএর ভিতরে যাই নাই। দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম।*

---*তারপর?*

---*তারপর আর কী! দুইটা লোক চিনে ফেলছে আমারে যে আমি তোমার বাবা..*

ছোটদা পেছন থেকে বললেন---*তারপর তো ধইরা দিল মাইর। ড্রেনএ পইড়া গেছিল। পরে দৌড়াইয়া একটা চেনা লোকের ফার্মেসিতে ঢুইকা পইড়া বাচছে। নাইলে কি হইত কে জানে।*

আমি চোখ বুজি। দীর্ঘ একটি শ্বাস বেরিয়ে আসে।

বাবা বলেন--- *বিদেশ থেইকা এত বলা হইতাছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো চেষ্টা করতাছে। তাতে কি বেইল হইব না!*

আমি ঠোট উল্টে বলি---*জানি না।*

বাবা বলেন---*যদি বেইলটা হইয়া যায়, তাইলে তো বাসায় ফিরতে পারবা। সরকার যদিপুলিশ প্রটেকশানের ব্যবস্থা করে তাইলে তো তোমার আর ভয়ের কিছু নাই। ঘরে বইসা বইসা লিখবা। বিদেশের মন্ত্রীরা তো বলতাছে তোমারে প্রটেকশান দিতে।*

আমি আবারও মাথা নেড়ে বলি---*যদি যদি যদি। এইটা যদি হয়, তাইলে ওইটা হইব। জানি না কি হইব। এই সরকার আর মৌলবাদীদের মধ্যে তো কোনও পার্থক্য দেখতাছি না। কী হয় শেষ পর্যন্ত কে জানে।*

ঝ ছোটদাকে ইঙ্গিত করেন ওঠার জন্য। এই ইঙ্গিতটি আমাদের বুকে তীরের মত বেঁধে। ইচ্ছে না থাকলেও ছোটদা ওঠেন। বাবাকে উঠতে বলেন।

---*আরেকটু বসুক আরেকটু।* ঝর দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে বলি।

---*না। খামাকা রিস্ক নেয়ার দরকার নেই। তোমার ফ্যামিলির লোকজন কোথায় কে যায় তার খবর রাখা হয় না মনে কর?*

ছোটদা বললেন---*উরে বাবা, সারাক্ষণই তো সবার পেছনে এসবির লোক থাকে। আমি যেইখানেই যাই সেইখানেই যায়। আজকে ত সন্ধ্যার সময় বাসা থেইকা বার হইছি, সারা ঢাকা শহর চককর দিছি, এসবির গাড়িও ফলো করল তিন ঘন্টা। এমন*

অলি গলির মধ্যে ঘুরপাক খাইলাম , একসময় ওরা হাল ছাইড়া দিছে অথবা মিস করছে। তারপরে তো এইখানে আইলাম।
বাবা ঝকে বললেন---*আপনি যে কি ঝুঁকি নিয়ে আমার মেয়েটাকে এইরকম আশ্রয় দিয়েছেন, আপনার কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ।*
ঝ বললেন---*না না না কৃতজ্ঞতা জানাবেন না। আমি যা করেছি, এটা আমার কর্তব্য মনে করেই করেছি। কেবল আমি তো না, আরও অনেকেই ওকে সাহায্য করছে।*
আমি অসহায় দাঁড়িয়ে থাকি। আধঘন্টা সময়ও কি কাটানো যেত না! আমার সাধ মেটে না। ঘুমের মধ্যে সুখের একটি স্বপ্ন যেন মুহূর্তের মধ্যে দেখা দিয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে বাবা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, সাহস রাখো মা, সাহস রাখো। সাহস হারাইও না। তুমি যেই কথা লেখছ, তাতে তুমি যদি সত্যিই বিশ্বাস কইরা থাকো, তাইলে যতদিন বাঁচো, মাথা উঁচা কইরা বাঁচো। তবে এখন সাবধানে থাকতে হবে। তোমার বন্ধুরা আছে। আমরা আছি। চিন্তা কইর না।
ছোটদা আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খান।
দরজার কাছে আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কেবল মনে হতে থাকে এ দেখাই বুঝি শেষ দেখা।
বাকি রাত ছবি আঁকি। আমার নিজের ছবি। নতুন নিউজ ইউক ম্যাগাজিনে আমার যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, সেটি দেখেই আঁকি। আমার ছবিটির চারপাশে অনেকগুলো সাপ আঁকি, সাপগুলো ফণা তুলে আছে আমার দিকে। সাপের মাথায় সাদা টুপি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। ঝ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আমার আঁকা দেখেন। একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। এঘরেই তিনি আরেকটি তোশক পেতে বিছানা করে নিয়েছেন।

সাতাশ জুলাই, বুধবার

সরকার ও বিরোধী দলকে এই দায় সুদে আসলে শুধতে হবে। আবদুল মান্নান লিখেছেন ইনকিলাবে ডড জানতে পারলাম, তসলিমা নাসরিনের লজ্জার ইংরেজি ভার্সান একদিনেই ২০,০০০ (বিশ হাজার) কপি বিক্রি হয়ে গেছে। তসলিমাকে নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতে যে ক্রেজ এর সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মনে হয়, তসলিমার বই ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হবে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই সর্বৈব মিথ্যা কথাটিই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে, বাংলাদেশ উগ্র ফতোয়াবাজ ধর্ম ব্যবসায়ীদের দেশ। বাংলাদেশের এই যে ইমেজ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, এটা কি কারও জন্যই কল্যাণকর? এই মিথ্যার প্রতিষ্ঠা থেকে কী কল্যাণলাভ করবেন প্রগতিবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা? কী কল্যাণ লাভ করবে সরকার? কী কল্যাণ লাভ করবে বিরোধী দল, বিশেষত আওয়ামী লীগ? আগামী নির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায়ও যায়, তারা কেমন করে মুছবে এই মিথ্যা ইমেজ? তাদেরও কি এর দায় বহন করতে হবে না?

অথচ দেশ ও রাজনীতির যাঁরা হর্তাকর্তা তাঁদের কারও মধ্যে কোন সুবুদ্ধি কাজ করছে বলে মনে হয় না। যে সরকার ইসলামের দোহাই পেড়েই ক্ষমতায় গেছেন, সেই সরকারও পরম নির্বিকারচিত্তে তসলিমা নাসরিনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও ঔদ্ধত্য অবলোকন করলেন এবং ওর মিশন নির্বিবাদে সম্পন্ন হওয়ার পর একটি কার্যকারিতাহীন নিরর্থক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ, বিশেষত এর নেত্রী শেখ হাসিনা ভারত গোস্বা করবে এবং এখনকার ভারতীয় এজেন্ট, ধর্মদ্রোহী বুদ্ধিজীবীগণ ও তাঁর নিজ দলীয় ব্রাহ্মণ্যবাদপন্থীরা বিগড়ে যাবে ডডএই ভয়ে টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করলেন না। মনে মনে হয়ত তিনি এই আশাও পুষেছিলেন যে, তসলিমাকে নিয়ে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হলে তাঁর ক্ষমতা দখলের পথই সুগম হবে।

প্রথমত, তসলিমা নাসরিনের লজ্জার বক্তব্যের মধ্যে কি বিন্দুমাত্রও সত্যতা আছে? বাংলাদেশে কি হিন্দুদের ওপর সত্যিই কোনও অত্যাচার হচ্ছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এই মিথ্যা প্রপাগাণ্ডাকে অজুহাত হিসাবে ধরে নিয়ে আজ সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদিবাদ-ব্রাহ্মণ্যবাদ যে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর তীব্রতর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করছে ডডএটাকে কিভাবে বিচার করা হবে! সরকার ও বিরোধী দলের যেসব নেতা নেত্রী পরমানন্দে তামশা দেখছেন, তাঁদের কতটুকু দেশপ্রেমিক বলা যাবে? বস্তুত ক্ষমতা রক্ষা ও ক্ষমতা দখলের লোভে অন্ধ উন্মত্ত যেসব ব্যক্তি-গোষ্ঠী তসলিমাকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের ইমেজ ক্ষুণ্ন করলো এবং মুসলমানদের ওপর আঘাত হানার সুযোগ সৃষ্টি করলো, জাতি ও ইতিহাস তাদের কোনওদিনই ক্ষমা করবে না। এই দায় তাদের একদিন সুদে আসলে শুধতে হবে।

দায় শোধার মধ্যেই ছিল মন। সন্ধেয় ঘরে ঢুকে ঝ আমাকে জানালেন, তিনজন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য আমার মামলা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। ব্রিটেনে ডিফেণ্ড তসলিমা নামে একটি দল গড়ে উঠেছে। সে না হয় ব্রিটেনে, কিন্তু দেশে কি ঘটছে! দূর দেশে বসে কেউ আমার পক্ষে কথা বলছে, আমাকে বাঁচাতে চাইছে, শুনে মন ভাল হয়ে যায়। কিন্তু দেশের দিকে তাকালে সেই ভাল মনটি আর ভাল থাকে না।

ঝ একটি শিউরে ওঠা খবর দিলেন আজ। গোলাম আযম চট্টগ্রামের লালদীঘির মাঠে জনসভা করেছেন। তাঁর এই সভার বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছে গোলামবিরোধী লোকদের। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য চেয়েছিল একই জায়গায় জনসভা করতে। কিন্তু পুলিশ দেয়নি। গোলাম আযম শেষ পর্যন্ত হেভি পুলিশ প্রটেকশানের মধ্যে জনসভা করেছে। গোলাম আযমের পক্ষের দলে আর বিপক্ষের দলে ভীষণ মারামারি হয়েছে। রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্র। প্রচুর গোলাগুলি। বোমা ফেটেছে। অনেক আহত। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি। সবচেয়ে দুঃখের কথা, ছ জন মানুষ মারা গেছে।

বল কি? কারা মারা গেছে? কোন দলের? চাপা আর্তনাদ আমার।

জামাত শিবিরের লোকেরা মেরেছে বিপক্ষ দলের লোকদের।

বিমর্ষ বসে থাকি। গোলাম আযম সভা করতে গিয়েছিলেন আমার ফাঁসি এবং ব্লাসফেমি আইনের দাবি নিয়ে। চট্টগ্রামে তাঁর জনপ্রিয়তা বেশি বলেই চট্টগ্রাম যাওয়া। কে দায়ি ছটি মৃত্যুর জন্য? গোলাম আযম নাকি আমি ? নিজেকে আমার দোষী মনে হতে থাকে।

---*সব আমার দোষ। তাই না?* ঝকে জিজ্ঞেস করি।
---*কেন, তোমার দোষ হবে কেন?*
---*ওই স্টেটসম্যানে যদি সাক্ষাৎকারটা না দিতাম, তবে তো এসব হত না দেশে।*
---*তা ঠিক, হয়ত হত না।*
---*কিন্তু আমি তো কোরান সংশোধনের কথা বলিনি।*
---*আসলে ওরা কিছু না কিছু নিয়ে এসব করতই।*

ঝ আমাকে সান্ত্বনা দেন বটে, কিন্তু গ্লানিবোধ দূর হয় না আমার। এত তুচ্ছ একটি মানুষ আমি। ভাল কোনও ডাক্তার নই, ভাল কোনও লেখক নই, ভাল কোনও কবি নই।অথচ ধর্ম নিয়ে বড় বড় কথা বলতে গিয়েছি। কী দরকার ছিল! অন্য মানুষেরা, যারা ধর্মকে অসার বলে মনে করে, আফিম বলে ভাবে, তারা তো বলতে যায় না আমার মত। তারা সমাজের মানুষের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে চায়, তারা আধুনিক আইনের প্রবর্তনের কথা বলে, তারা প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের উদ্বুদ্ধ করে একটি সুস্থ রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য। এভাবেই তো হবে ধীরে ধীরে দেশের অবস্থার পরিবর্তন। এভাবেই তো হতে পারে দেশের মঙ্গল। আমিও মঙ্গল চাই, কিন্তু যে পথে আমি এগোচ্ছিলাম সে পথটি নিশ্চিত ভুল পথ ছিল। এদেশের আশি ভাগ মানুষ মুসলমান, বেশির ভাগই অল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, তাদের কিনা হঠাৎ করে আমি ধর্ম না মানার কথা বলছি! আমার মাও তো ধর্ম মানেন। কিন্তু তিনি তো কোনও অসৎ মানুষ নন। তিনি তো অদরদী কেউ নন। মায়া মমতা ভালবাসায় টইটম্বুর তাঁর আদ্যোপান্ত। আমার যুক্তিবুদ্ধির বাবার চেয়ে অনেক বেশি হৃদয় ধারণ করেন তিনি। ধর্ম মেনেও তো মানুষ সৎ হতে পারে, নিষ্ঠ হতে পারে, সুস্থ একটি সমাজ গড়ার জন্য সংগ্রাম করতে পারে। তবে কেন আমি সেই মানুষগুলোর কথা ভাবিনি! আমার ওরকম না ভেবেচিন্তে বলা কথাগুলো আঁকড়ে ধরে দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে মৌলবাদীরা ডড যারা ধর্ম বেচে খায়, ধর্ম যাদের মসনদে ওঠার সিঁড়ি, ধর্ম যাদের কাছে মানুষকে বোকা বানাবার, বধির বানাবার জিনিস! আমি তো ঘাতক গোলাম আযমের হাতে সত্যিই একটি অস্ত্র তুলে দিয়েছি। ধর্ম নিয়ে কিছু না বললে আজ এই দেশে ধর্মান্ধদের এই বিশাল বিপুল আন্দোলন হত না, দেশ জুড়ে এই ধর্মীয় জাগরণ না ঘটলে গোলাম আযমের সুযোগ হত না ঘর থেকে বাইরে বেরোবার, জনসভায় বক্তৃতা করবার। গোলাম আযম বক্তৃতা করতে না গেলে ছটি মানুষকে খুন হতে হত না। ছটি মানুষের নিশ্চয়ই কত স্বপ্ন ছিল জীবনে! ওদের জীবন তো আমার জীবনের মতই মূল্যবান। নিজের জীবনটিকে বাঁচাবার জন্য কি রকম আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমি! কফিনে পড়ে থাকতেও আপত্তি নেই, নিঃশ্বাসের শব্দ যেন কেউ না শোনে, ! তাতেও আপত্তি নেই, তবু যেন বেঁচে থাকি। গোলাম আযমের জনসভার প্রতিবাদ করতে যে মানুষগুলো রাস্তায় নেমেছিল, তারা আমার চেয়েও অনেক সাহসী, সংগ্রামী। আমার চেয়েও বেশি দেশপ্রেম তাদের। আমি কেন মরে গিয়ে তবে ওদের বাঁচাচ্ছি না। কী এমন মূল্যবান জীবন আমার। কী এমন ভালটা জীবনে করে ফেলেছি যে আমাকে যে করেই হোক বাঁচতে হবে। আমি

কুঁকড়ে থাকি। অপরাধবোধের তীক্ষ্ণ ধারালো ঈগলী ঠোঁট আমার ঠুকরে খেতে থাকে।

নানা খবর আজকের পত্রিকায়। তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর খণ্ডন। ২৯ জুলাইর লং মার্চ ও মহাসমাবেশ সফল করার জন্য দেশের বরেণ্য পীর মাশায়েখদের আহবান। তসলিমাকে আশ্রয়দাতা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। ১৫ আগস্ট অর্ধদিবস হরতাল। দৈনিক সংবাদ পত্রিকাটির খবরের দিকে চোখ আমার। এই পত্রিকাটিতেই মেলে নিরপেক্ষ খবর, সৎ সাংবাদিকতা, কোনও দলের মুখপত্র নয় এটি। আজ প্রতিটি পত্রিকার প্রথম পাতা জুড়ে ছবিসহ প্রধান খবর, **চট্টগ্রামে ৫ জন নিহত।।** লালদীঘি এলাকা রণক্ষেত্র।। সংঘর্ষ গুলি বোমাবাজি।। আহত তিন শতাধিক।। প্রতিবাদে কাল হরতাল। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহবানে স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের চট্টগ্রাম আগমন প্রতিহত করার কর্মসূচী হিসেবে বিক্ষোভ-রত ছাত্রজনতার সাথে পুলিশ, বিডিআর ও জামাত শিবিরের আর্মড ক্যাডারের মিলিত বাহিনীর কয়েক দফা সংঘর্ষে ৫ জন নিহত ও তিন শতাধিক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে চাকসুর জিএস আজিম উদ্দিন আহমেদ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা পারভেজ নিটুল, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নেতা এনামুল হক চৌধুরীসহ ২০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যান্য আহতদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল, বন্দর হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিনজন ছাত্রঐক্য কর্মী ও দুজন শিবিরকর্মী বলে জানা গেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রঐক্য আগামী বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস হরতাল ডেকেছে।

গোলাম আযমের আগমনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ছাত্রঐক্যের ঘোষিত কর্মসূচীর মোকাবেলায় প্রশাসন ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পুলিশ, বিডিআর, রিজার্ভ পুলিশ, আর্মড আনসারসহ প্রায় দশ হাজার সদস্যের মিলিত বাহিনীর পাশাপাশি প্রায় সমসংখ্যক জামাত শিবিরের আর্মড ক্যাডার গতরাতেই লালদীঘি মাঠ ও আশপাশের এলাকার দখল নিয়ে নেয়। জামাত শিবির কর্মীরা মাথায় হলুদ পট্টি বেঁধে গজারি কাঠ ও গর্জন কাঠের বড় বড় লাঠি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘিমুখী সবকটি সড়কে অবস্থান নেয়। তারা পথচারীদের তল্লাশি আর জিজ্ঞাসাবাদ করে। আজ মঙ্গলবার ছাত্রঐক্য হরতাল ডেকেছিল। কিন্তু পুলিশ বিডিআর কোথাও কোনও পিকেটারকে মাঠে নামতে দেয়নি। সকাল থেকে ছাত্রঐক্য কর্মীরা কয়েক দফা মিছিল বের করার চেষ্টা করে। প্রতিবারই পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সকাল সাতটায় ও নটায় নিউমার্কেট চত্বরে ছাত্রজনতার সাথে পুলিশ বিডিআরের দুদফা সংঘর্ষ হয়। সকাল থেকেই নগরীর বিভিন্ন স্থানে বোমা ককটেল বিস্ফোরিত হতে থাকে। বেলা দুটোর পর পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। বেলা তিনটায় লালদীঘি ময়দানে হাজার হাজার পুলিশ বিডিআর ও শিবিরের আর্মড ক্যাডারের নিশ্ছিদ্র প্রহরায় জামাতের জনসভা শুরু হবার পর পর পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য কর্মীরা শহীদ মিনার চত্বরে সমাবেশ শেষে সিনেমা প্যালেসের সামনে দিয়ে লালদীঘির দিকে এগোতে চাইলে বিডিআর তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। বাধা পেয়ে ছাত্র জনতা পেছনে সরে গিয়ে দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। ছাত্র জনতা সেখানে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে শপথবাক্য পাঠ করে। এরপর প্রায় হাজার পাঁচেক ছাত্র জনতার বিরাট মিছিল কোর্ট রোডের দিকে এগোতে থাকে। বিডিআর মিছিলে কয়েক দফা বাধা দেয়, লাঠিচার্জ করে ও টিয়ারগ্যাস ছোড়ে। জিপিওর সামনে ছাত্র জনতার সাথে

বিডিআর ও শিবির কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। ছাত্র জনতা তা উপেক্ষা করে তিনটি ব্যারিকেড পর পর ভেঙে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ভবনের সামনে এলে শিবির ক্যাডারদের জায়গা করে দিয়ে বিডিআর সদস্যরা পেছনে চলে আসে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জামাতের জনসভায় বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। লোকজন ছোটাছুটি করতে থাকে। বেলা ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে শিবির কর্মীদের ছোড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ও সরকারি সিটি কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র এহসানুল হক মনি(১৮) আহত হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

নাহ, সংবাদও অনেক খবর রাখেনি। অন্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, নিহত ৬, আহত ৪ শতাধিক। নিহতদের মধ্যে মণি ছাড়াও আরও দুজন ছাত্র খায়ের(২০),আর শাহিন (১৭) আছে। আজকের কাগজের বর্ণনাটি এরপর এরকম, বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ৭১ এর নরঘাতক, নারীধর্ষণ ও অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের নায়ক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম ৪টি সশস্ত্র গাড়ি ও অস্ত্রধারী শিবির ক্যাডার পরিবেষ্টিত হয়ে লালদীঘির মাঠে উপস্থিত হয়। আন্দর কিল্লাহ শাহী জামে মসজিদস্থ ইসলামি একাডেমি থেকে সে লালদীঘির ময়দানে আসে। এ সময় ওখান থেকে ৪টি অস্ত্র বোঝাই বস্তাসহ মাইক্রোবাস নিয়ে সমাবেশস্থলে এসে বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে বক্তব্য শেষ করে ঘাতক গোলাম আযম পৌনে ছটায় সমাবেশ স্থল ত্যাগ করে। সমাবেশে শুধু অস্ত্রধারী জামাত শিবির ক্যাডাররাই উপস্থিত ছিল। ঘাতক গোলাম মাত্র কয়েক মিনিট বক্তব্য রাখে।

এরপর আরও অনেক কিছু ঘটে। কোথাও কোনও ঘটনা থেমে থাকে না। আমি ছটি মৃত্যুর সঙ্গে মৃতের মত বসে থাকি।

ডঃ কামাল হোসেন চট্টগ্রাম থেকে জামাতের তাণ্ডবলীলা স্বচক্ষে দেখে এসে প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের যারা সহযোগিতা করবে তাদেরকে জাতি ক্ষমা করবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধান আজ জামাত শিবিরের হাতে বিপন্ন হচ্ছে। এই দেশ এবং রাষ্ট্রকে তারা আরও ধ্বংস করার চক্রান্ত করবে। কামাল হোসেন গোলাম আযমের উদ্দেশে বলেন, *আপনি ৭১ এ ভুল করেছেন বলে স্বীকার করেছেন, আপনার ভুলের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ খেসারত দিয়েছে। আজ আবার যে সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছেন, এই ক্ষতি জাতি আর বহন করবে না। একজন নাগরিক হিসেবে এই সরকারকে আমি হুকুম দিচ্ছি অস্ত্রধারীদের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য। সরকার যদি তা না করে আমাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।*

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট টিএসসিতে একটি আলোচনা-অনুষ্ঠান করেছে। বিষয় হচ্ছে, *প্রস্তাবিত ব্লাসফেমি আইন নির্যাতনের নয়া হাতিয়ার।* ব্যারিস্টার সারা হোসেন মূল প্রবন্ধ পড়েছেন। সাবেক বিচারপতি কে এম সোবহান, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, কামাল লোহানী, আনিসুজ্জামান, আলী যাকের, আয়শা খানম বক্তৃতা করেছেন। সকলেই ব্লাসফেমি আইনের বিরুদ্ধে বলেছেন।

চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ হচ্ছে চারদিকে। ছাত্রসমাজ তিরিশ তারিখে সারাদেশে হরতাল ডেকেছে।

শুয়ে ছিলাম। চোখদুটো সাদা দেয়ালের দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে শুয়ে ছিল। শুয়ে ছিল একটি হাত বুকে। আরেকটি হাত মাথার পেছনে। শুয়ে ছিল পা দুটো মেঝেয়। স্তব্ধ শুয়ে ছিল। প্রাণহীন অঙ্গগুলো এভাবেই শুয়ে ছিল। মৃতের মত শুয়ে ছিল।

অনেক রাতে ঙ এলেন। কাগজ কলম নিতে বলেন। লিখতে বলেন, যা তিনি বলেন, তা। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী কার্ল বিল্টকে লিখতে হবে চিঠি। কেন লিখতে হবে? ঙ বললেন, কার্ল বিল্ট একটি ফরমাল চিঠি চাইছেন। ফরমালিটি মাথামুণ্ডু কিছুই না জেনে, ঙ যা বলেন, লিখি। লেখা শেষ হলে চিঠিটি একটি খামে ভরে নিয়ে ঙ মিষ্টি হেসে বলেন--- *মনে হচ্ছে জামিন হবে তোমার!*

---*জামিন হবে? সত্যিই হবে?* অনেকটা আনন্দ আর খানিকটা সংশয় নিয়ে তাকাই।

---*তোমার উকিল একটু আশ্বাস দিয়েছেন।*

---*কি করে হল সব?*

---*তুমি জানো না প্রতিদিন মিটিং হচ্ছে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমেটদের সঙ্গে সরকারের। সম্ভবত তাদের চাপেই সরকার বাধ্য হয়েছে বেইলের ব্যাপারে গ্রিন সিগন্যাল দিতে।*

---*হাইকোর্ট কি সরকারের কথা শুনবে? হাইকোর্ট তো ইনডিপেনডেন্ট।*

---*তা ঠিক। দুএকজন ভাল জাজ আছেন। ওদের সঙ্গেও বোধহয় মিটিং টিটিং হয়েছে।*

আনন্দ লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে আমার বুকের ভেতর। এতদিনে তবে আমার এই কফিন- জীবনের অবসান হবে! ঝ আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বলেন --- *কী , বিশ্বাস হচ্ছে এখন!*

স্তব্ধতা থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে বলি--- *সত্যি বলি তোমাকে, মনে হয় স্বপ্ন দেখছি।*

ঙ আমার হাসি-মুখে তাকিয়ে বললেন যে কেবল ইউরোপের সরকারই নয়, আমেরিকার সরকারও চাপ দিচ্ছে খুব। পনেরো জন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন। ডেমোক্র্যাটিক আর রিপাবলিকান দুদলের লোকেই এই চিঠিতে সই করেছেন। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, বলছেন তাঁরা। তোমার নিরাপত্তার জন্যই মূলত চিঠিটি।

ঝ প্রশ্ন করেন, *ওকে কি যেতে হবে কোর্টে?*

ঙ বলেন, *মনে হয় না। মনে হয় ওর অনুপস্থিতিতেই ওর জামিন হবে।*

এবার আমি উত্তেজনায় সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে যাই। বড় করে শ্বাস নিই।

আমাকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে ঙ বলেন ---*তোমার তো নরওয়েতে একটা আমন্ত্রণ আছে। কবে সেটা?*

---*বোধহয় সেপ্টেম্বরে।*

---*সুইডেনেও কি আমন্ত্রণ আছে?*

---*আছে। কবে অনুষ্ঠান সুইডেনে তা মনে নেই।*

---*জামিন হয়ে গেলে সম্ভবত তোমাকে চলে যেতে হবে দেশ ছেড়ে।*

চমকে উঠি।

---*চলে যেতে হবে! কোথায়?*

---*যে কোনও একটি দেশে।*

---*কেন?*

---*যেতে হবে।*

---*কারণটা কী?*

---*তোমার নিরাপত্তার জন্য। বাঁচতে তো চাও, নাকি চাও না?*

---*কতদিনের জন্য?*

---*অনুষ্ঠানের জন্য যতদিনই লাগে।*

---*বিদেশে আমার সাতদিনের বেশি ভালো লাগে না। প্যারিসের মত জায়গাতেও অস্থির হয়ে উঠছিলাম দেশে ফেরার জন্য।*

---*এবার অস্থির হলে চলবে না।*

---*কেন চলবে না? অনুষ্ঠান শেষে তো চলে আসব!*

---*মনে হয় না।*

---*তবে কি?*

---*এত আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। এত আমি জানি না। তবে জানি এটাই হল কনডিশান।*

---*কিসের কনডিশান?*

---*জামিনের।*

---*জামিন দেবে তারা এই শর্তে যে আমাকে চলে যেতে হবে দেশ ছেড়ে?*

ঝ সন্তর্পনে কান পেতে মন পেতে শুনছিলেন ফিসফিসিয়ে বলা কথাগুলো, এখন সিগারেটে জোরে টান দিয়ে জোরে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন---*তার মানে অ্যামবেসিগুলো সরকারকে রাজি করিয়েছে বেইল দিতে, সরকার রাজি হয়েছে একটি শর্তে যে ওকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই তো!*

ঙ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। অন্য কেউ নেই ঘরে, তারপরও এদিক ওদিক দেখে নিয়ে গলা চেপে বললেন---*নরওয়ে তো বলেছে সাহায্য বন্ধ করে দেবে বাংলাদেশকে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অনেক দেশই সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।*

---*আপনার সঙ্গে কি করে দেখা হল অ্যামবেসির লোকদের?*

---*আমি দেখা করেছি। তারপর ওঁরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন নিয়মিত।* ঙ বললেন।

---*কতদিন দেশের বাইরে থাকব?*

---*যতদিন না দেশের অবস্থা একটু ভাল হয়।*

সুখের সঙ্গে একটি দুঃখ এসে মেশে। আমাকে করুণ সুরে বাজাতে থাকে।

ঙ চলে গেলে ঝকে জিজ্ঞেস করি, কবে দেশের অবস্থা ভাল হবে বল তো!

---*তিন চার মাসেই মোল্লারা সোজা হয়ে যাবে।*

---*ঠিক বলছ?*

---*ঠিক বলছি। তুমি দেখে নিও।*

ঝ আমাকে নতুন ক্যানভাস এনে দিয়ে বলেন--- *দেশের অবস্থা নিয়ে আপাতত চিন্তা বাদ দাও। ছবি আঁকো।*

---*ধুত তোমার এত ক্যানভাস, এত রং নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আমি তো ছবি আঁকতে জানি না।*

---*তুমি আঁকতে না জানলে তোমাকে কি আমি দিতাম এগুলো? আগেই তো তোমাকে বলেছি, তুমি আঁকা চালিয়ে গেলে শিল্পী হিসেবে বেশি নাম করবে। লেখক বা কবি হিসেবে যত নাম করেছো, তার চেয়ে অনেক বেশি।*

---*আর লজ্জা দিও না তো! এমনি শখের ছবি আঁকা। জীবনে তো শিখিনি কখনও।*

---*যার প্রতিভা থাকে তার শিখতে হয় না।*

ঝর প্রেরণায় তুলি হাতে নিই। সাদা ক্যানভাসে থোক থোক রঙ বসিয়ে দিতে থাকি। একটি মেয়ে, নদীর পাড়ে মেয়েটি পড়ে আছে, গলা কাটা। শাড়ি আলুথালু, ব্লাউজ ছেঁড়া। সূর্য ডুবছে। আরেকটি ক্যানভাসে একটি মেয়ে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে। জিভ বেরিয়ে এসেছে। পায়ের তল থেকে চেয়ার সরে গেছে। রং করি আর পেছনে গিয়ে দেখি ছবি, সামনে এসে দেখি। ডানে মাথা ঘুরিয়ে দেখি, বামে ঘুরিয়ে দেখি। হঠাৎ লক্ষ্য করি, ঝ তাঁর ভিডিওতে তুলে রাখছেন ছবিতে মগ্ন হয়ে থাকা আমাকে।

ঝ তন্ময় হয়ে আমার আঁকা দেখেন। আমি ঘোরের মধ্যে আঁকতে থাকি। একটি ছবি শেষ করে আরেকটি শুরু করি। হাতে রঙ, কাপড় চোপড়ে রঙ, গালে গলায় রঙ। রাত দুটো কি আড়াইটার সময় বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝর একটি শখ হয়, শখটি হল আমাকে তাঁর বাড়িটি দেখাবেন। প্রস্তাবটি আমার বেশ লাগে। ঝর পেছন পেছন আমি বেরোই। নিচতলা, দোতলা আর তিনতলার প্রতিটি ঘর বারান্দায় ঘুমন্ত মানুষগুলো যেন কোনও শব্দে জেগে না ওঠে, এমন করে বেড়ালের মত নিঃশব্দে হাঁটি আমরা। তিনতলায় একটি বড় স্টুডিও আছে ঝর। ঝর আঁকা সব ছবি, ভাস্কর্য স্তূপ করে রাখা। স্টুডিওটি খুব বড়, বাইরের আলো আসার জন্য দেয়ালে না হয়ে ছাদে বসানো হয়েছে কাচের জানালা। বাড়িটি সাধারণ কোনও সাদামাটা বাড়ির মত নয়, পুরো বাড়িটিই আধুনিক স্থাপত্যশিল্প। নিজেই ঝ এই বাড়ির স্থপতি। ঝ র বয়স খুব বেশি নয়, এই বয়সেই তিনি যশ খ্যাতি সব অর্জন করেছেন। তাঁর জন্য আমার গর্ব হয়। গর্ব হয় একটি মেয়ে হয়ে এই বাংলাদেশের মত দেশে নিজের চেষ্টায় এই অবদি পৌঁছতে পেরেছেন বলে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। তাঁর যা হয়েছে তাঁর নিজের কারণেই হয়েছে। কেউ তাঁকে দয়া করে তাঁর খ্যাতিটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দেয়নি। কেউ তাঁকে এত উঁচুতে কোনও মই এনে তুলে দেয়নি। স্বাধীন এবং সচ্ছল একটি জীবন পেতে তিনি সংগ্রাম করেছেন। ঝর মত মান সম্মান যশ খ্যাতি কিছুই আমার নেই। তাঁর মত দৃঢ়চিত্ত-চরিত্র আমার নেই। ধন থাকলে বেশির ভাগ মানুষের মন থাকে না। কিন্তু ঝ সেই বেশির ভাগ ধনীর মত নন। ঝ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে পারেন। সৎ কিন্তু ক্ষ্যাপা, দরিদ্র কিন্তু আদর্শবাদী ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি দল গড়ে তুলেছেন তিনি। দরিদ্রদের পক্ষে থাকলে নিজে দরিদ্রের জীবন যাপন করতে হবে তা তিনি মানেন না। তিনি মনে করেন, সবার জন্যই ধন প্রয়োজন, এবং সেই সংগ্রাম

তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের নিরাপত্তার জন্য তাঁর যা প্রয়োজন, সব তিনি নিশ্চিত করেছেন। আজ তিনি যদি এই অবস্থায় না থাকতেন, তবে তিনি কিছুই করতে পারতেন না যা করছেন। সমাজ বদলের চিন্তা ধারে কাছে ভিড়ত না যদি না সামান্য অন্ন যোগাতেই দিন পার হত।

বাকি রাতটুকু পাশাপাশি শুয়ে আমরা কথা বলি। বিদেশ যাবার এই প্রস্তাবটি ঠিক কিরকম আমি তখনও বুঝতে পারছি না। ঝ বললেন যে তাঁর মনে হয় এটিই একমাত্র আমার মুক্তির পথ এবং আমার খুশি হওয়া উচিত যে একটি সহজ মুক্তির পথ আমার জন্য ঘটেছে। আজ যদি এটি না ঘটত, তবে তো মৃত্যু ছিল অবধারিত। বাকি একটি পথ ছিল সেটি অবৈধভাবে পালিয়ে যাওয়া দেশ ছেড়ে। ওভাবে পালালে আমাকে আর কখনও দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না, আমার সহায় সম্পত্তি যা আছে সব সরকার নিয়ে নেবে। এখন জামিন নিয়ে বৈধভাবে দেশ ছাড়া হবে, এটির চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। জানি এর চেয়ে আমার জন্য আর কোনও ভাল সমাধান নেই। তারপরও মন যেন কেমন করে।

আঠাশ জুলাই, বৃহস্পতিবার

মিছিলে আমার মূর্তি পোড়ানো হচ্ছে। ফেস্টুনগুলোয় আমার ছবি আঁকা, আমার ছবির গলায় ফাঁসির দড়ি। ঝকে জিজ্ঞেস করি---*আচ্ছা বল তো, ওরা তো মূর্তি গড়া আর ছবি আঁকা মানে না, তবে যে ছবি আঁকল, মূর্তি বানালো?*

---*প্রয়োজনে ওরা মসজিদে গিয়ে পেচ্ছাবও করতে পারে।* ঝ হেসে বললেন।

আমি মাথা নেড়ে বলি---*তা ঠিক, এত কোরান কোরান করে অথচ কাদিয়ানিদের মসজিদে গিয়ে হামলা করল, সব ভেঙে ফেলল, পুড়িয়ে দিল। কোরানও ছুঁড়ে ফেলেছে, পুড়িয়েছে।*

ঝ আওয়ামী লীগের মতলব নিয়ে পড়েন। কি হয়েছে এই দলটির! ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল, সেই কমিটির নেতৃত্ব নিতে তো উঠে পড়ে লেগেছিল, গণআদালত গঠন কর, গোলাম আযমের ফাঁসি দাও, এসবে এমন মেতে উঠে এখন গোলাম যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, এখন মুখ বুজে বসে আছে। নব্বইএ গণআন্দোলন করে যে জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতা থেকে নামালো, এখন সেই এরশাদের দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। ছিঃ!

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে এখন জামাতে ইসলামী কেন, কোনও মৌলবাদী দলের বিরুদ্ধেই কিছু বলছে না, একা একা চিৎকার করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে। জামাত ইসলামীর বুদ্ধি আছে ঘটে, সংসদের বাইরে আওয়ামী লীগের সঙ্গেও আছে, সংসদের ভেতর বিএনপির সঙ্গে আছে, আর আছে দেশসুদ্ধ তুঙ্গে ওঠা মৌলবাদী আন্দোলনের সঙ্গে। জামাতে ইসলামীর জন্য এমন চমৎকার সময়

আর কখনও আসনি আগে। বামফ্রন্টের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জাতীয় কনভেনশনে শামসুর রাহমান খুব মূল্যবান কথা বলেছেন যে *মৌলবাদ থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করে কোনও লাভ হবে না।* এতেও কি বোধ হবে না শেখ হাসিনার? তিনি তো মনে করছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলেই দেশের সব সমস্যা ঘুচে যাবে।

--*কচু ঘুচবে।* ঝ বলেন।

অনেক রাতে ক আর ট এলেন। ক জিজ্ঞেস করলেন আমাকে কেমন আছি আমি। কেমন আছি প্রশ্নটি করলে আমি বেকায়দায় পড়ি। অনেক সময় মুখে চিরকেলে অভ্যেসের *ভাল* শব্দটি এসে যায়। ক আমার ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন --- *এখন তো আপনার মুশকিল আসান হয়েছে। জামিন পাওয়া যাবে এমন একটা কথা হচ্ছে। খুশি হননি?*

হাসি ফোটে মুখে। খুশি হওয়ার মাথা নাড়ি।

ক পাশে বসে যা বললেন, তা হল, দেশের অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ, এসময় তাড়াতাড়ি জামিন নিয়ে আমার দেশ থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

---*জামিন তো হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিতে। আমার তো যেতে হবে না কোর্টে।*

ক ভুরু কুঁচকে বললেন ---*কে বলল আপনাকে যেতে হবে না?*

---*ঙ বলেছেন।*

---*না, আপনার অনুপস্থিতিতে জামিন হবে না।*

---*কিন্তু ঙ যে বললেন!*

---*চেষ্টা হয়েছিল। কাজ হয়নি। আপনাকে যেতে হবে কোর্টে। আজ আপনার উকিলের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে।*

ঝ বলে উঠলেন আবেগে উদ্বেগে ---*তবে কী উপায় হবে? যদি পথে বা কোর্ট এলাকায় কোনও অঘটন ঘটে!*

---*তার খুব রিস্ক আছে.. কিন্তু কি আর করা যাবে!*

ঝ জিজ্ঞেস করলেন--- *কোর্টে কবে যেতে হবে?*

---*কাল তো হবে না, পরশু অথবা তার পরদিন, যে কোনও সময়।*

ঝ ককে বললেন তাঁকে কোর্টে যাবার তারিখ এবং সময় জানাতে, কারণ তিনি যাবেন কোর্টে, তিনিই আমার নিরাপত্তা হবেন, তাঁর পকেটে পিস্তল থাকবে। ক বললেন, হয়ত পুলিশ নিরাপত্তা দেবে, এরকম একটি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঝ উড়িয়ে দেন পুলিশি নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। বললেন, পুলিশের ওপর কোনও বিশ্বাস নেই। বললেন তিনি একা যাবেন না, তাঁর দলবলকে সঙ্গে নেবেন। ঝর এই প্রতিশ্রুতি আমার দুরু দুরু বক্ষকে কিছুটা শান্ত করে। কিন্তু ঝ একটু আড়াল হলেই ক বললেন যে তিনি মনে করছেন না পিস্তল টিস্তল নিয়ে ঝর কোর্টে যাওয়া উচিত হবে। আমাকে যদি যেতে হয় কোর্টে তবে নিশ্চয়ই পুলিশের ব্যবস্থা থাকবে আমার জন্য।

আমি চুপ হয়ে শুনি। এখন ক যা বলেন, তা ই তো মাথা পেতে বরণ করতে হবে। তাঁর কাছে জানতে চাই ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আইনটি কি শেষ পর্যন্ত এ দেশ মেনে নেবে কি না।

ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন--- *আন্দোলন তো হচ্ছে। এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।*
---*যদি বিল পাসই হয়ে যায়, তবে তো সর্বনাশ হবে।*
ক বললেন---*তা তো হবেই। আজই জনকণ্ঠ পত্রিকায় লিখেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের খবর। পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইনের ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে, এরকম একটি খবর দিয়েছে অ্যামনেস্টি ।*
---*কি রকম অপব্যবহার হচ্ছে?*
---*ওখানে সংখ্যালঘু শিয়া, আহমেদিয়া গোষ্ঠী তো আছেই, খ্রিস্টান হিন্দুদের ওপরও বহু বছর ধরে ব্লাসফেমি আইনের নির্যাতন নিপীড়ন চলছে। গত তিন বছর ধরে খ্রিস্টানদের ওপর ব্লাসফেমি অভিযোগ বাড়ছে। তেরো বছর বয়সের এক খ্রিস্টান ছেলে নাকি মসজিদের দেয়ালে কি লিখেছিলো সেটি নাকি ব্লাসফেমি হয়েছে, এখন মসজিদের ইমাম ছেলেটির ফাঁসি দাবি করছে। ফারুক সাজ্জাদ নামের এক লোককে মেরে ফেলা হয়েছে। তাকে প্রথম পাথর ছোঁড়া হয়, গায়ে আগুন ধরানো হয়, তারপরও যখন মরেনি তখন মোটর সাইকেলের সঙ্গে তার শরীরটি বেঁধে নিয়ে সারা শহর ঘোরানো হয়।*
---*কী করেছিল ওই লোক?*
---*মসজিদের মাইক থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে এক খ্রিস্টান নাকি একটি কোরান আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। লোকের নাকি ধারণা হয়েছিল ওটি ওই লোক। পরে জানা গেছে ফারুক সাজ্জাদ লোকটি আদৌ খ্রিস্টান ছিল না। কোরানও সে পোড়ায়নি।*

ট, শখের ক্যামেরাম্যান ফটাফট ছবি তুলছিলেন আমার। টকে সাবধান করে দিলেন ক, আমার কোনও ছবি যেন কোনও পত্রিকায় না যায়। ট কথা দিলেন সবই তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নয়। নাহ, ছবিতে মন নেই আমার। ভাবনা অন্য কিছুতে। ভাবনা ব্লাসফেমিতে।

ফ্যাক্সে আসা একটি পত্রিকার টুকরো হাতে দিয়ে ক আমাকে বললেন, সালমান রুশদি আপনার কাছে খোলা চিঠি লিখেছে। এই চিঠি ইউরোপের বড় বড় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। শুধু রুশদি নয়, খুব বড় লেখকরা প্রতিদিন আপনাকে লিখেছেন, সেগুলো একই দিনে একই সঙ্গে ভিন্ন ভাষার পত্রিকাগুলোয় ছাপা হয়েছে। এক একেক দিনে একেকটি চিঠি ছাপা হয়েছে। লেখকদের এটা নতুন ধরনের ক্যামপেইন। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তবে সালমান রুশদি লিখেছেন এ খবর এখানে ছাপা হলে ভালর চেয়ে খারাপ হবে। আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে পাঠিয়েছে চিঠিটি। আপনাকে দিলাম পড়ার জন্য।
ক আর ট চলে গেলে চিঠিটি পড়ি আমি আর ঝ।

I am sure you have become tired of being called “the female Salman Rushdie” - what a bizarre and comical creature that would be! - when all along you thought you were the female Taslima Nasrin. I am sorry my name has been hung around your neck, but please know that there

are many people in many countries working to make sure that such sloganizing does not obscure your identity, the unique features of your situation and the importance of fighting to defend you and your rights against those who would cheerfully see you dead.

In reality it is our adversaries who seem to have things in common, who seem to believe in divine sanction for lynching and terrorism. So instead of turning you into a female me, the headline writers should be describing your opponents as "the Bangladeshi Iranians." How sad it must be to believe in a God of blood! What an Islam they have made, these apostles of death, and how important it is to have the courage to dissent from it!

Great writers have agreed to lend their weight to the campaign on your behalf: Czeslaw Milosz, Mario Vargas Llosa, Milan Kundera and more. When such campaigns were run on my behalf, I found them immensely cheering, and I know that they helped shape public opinion and government attitudes in many countries.

You have spoken out about the oppression of women under Islam, and what you said needed saying. In the West, there are too many eloquent apologists working to convince people of the fiction that women are not discriminated against in Muslim countries or that, if they are, it has nothing to do with the religion. The sexual mutilation of women, according to this argument, has no basis in Islam. This may be true in theory, but in many countries where this goes on, the mullahs wholeheartedly support it. And then there are the countless crimes of violence within the home, the inequalities of legal systems that value women's evidence below that of men, the driving of women out of the workplace in all countries where Islamists have come to, or even near to power.

You have spoken out about the attacks on Hindus in Bangladesh after the destruction of the Ayodhya mosque in India by Hindu extremists. Yet any fair-minded person would agree that a religious attack by Muslims on innocent Hindus is as bad as an attack by Hindus on innocent Muslims. Such simple fairness is the target of the bigots' rage, and it is that fairness which, in defending you, we seek to defend.

You are accused of having said that the Koran should be revised (though you have said that you were referring only to Islamic religious code). You may have seen that only last week the Turkish authorities have announced a project to revise these codes, so in that regard at least you are not alone. And even if you did say that the Koran should be revised to remove its ambiguities about the rights of women, and even if every Muslim man in the world were to disagree with you, it would remain a perfectly legitimate opinion, and no society which wishes to jail or hang you for expression it can call itself free.

Simplicity is what fundamentalists always say they are after, but in fact they are obscurantists in all things. What is simple is to agree that if one may say "God exists" then another may also say "God does not exist"; that if one may say "I loathe this book" then another may also say "But I like it very much." What is not at all simple is to be asked to believe that there is only one truth, one way of expressing that truth, and one punishment (death) for those who say this isn't so.

As you know, Taslima, Bengali culture - and I mean the culture of Bangladesh as well as the Indian Bengal - has always prided itself on its openness, its freedom to think and argue, its lack of bigotry. It is a disgrace that your Government has chosen to side with the religious

extremists against their own history, their own civilization, their own values. It is the treasure-house of the intelligence, the imagination and the word that your opponents are trying to loot.

I have seen and heard reports that you are all sorts of dreadful things - - a difficult woman, an advocate (horror of horrors) of free love. Let me assure you that those of us who are working on your behalf are well aware that character assassination is normal in such situations, and must be discounted. And simplicity again has something valuable to say on this issue: even difficult advocates of free love must be allowed to stay alive, otherwise we would be left only with those who believe that love is something for which there must be a price - perhaps a terrible price - to pay.

Taslima, I know that there must be a storm inside you now. One minute you will feel weak and helpless, another strong and defiant. Now you will feel betrayed and alone, and now you will have the sense of standing for many who are standing silently with you. Perhaps in your darkest moments you will feel you did something wrong - that those demanding your death may have a point. This of all your goblins you must exorcise first. You have done nothing wrong. The wrong is committed by others against you. You have done nothing wrong, and I am sure that one day soon you will be free.

উনত্রিশ জুলাই, শুক্রবার

আমার বিরুদ্ধে জারি করা সরকারি মামলাটির আইনজীবী সরকারি পিপি বলেছেন, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। মামলার পরবর্তী শুনানির মধ্যে যদি তসলিমা আত্মসমর্পণ না করে তাহলে আমরা আদালতে তার সম্পত্তি ক্রোকের আবেদন করব।

আর কি?

আর হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশজন শিক্ষক সাংসদদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপন করতে চাইছেন তারা। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে বলছেন। উপাসনালয়ে রাজনীতি চর্চা বন্ধ করতে বলছেন।

আর কি?

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ডাকে চট্টগ্রামে গতকাল অর্ধদিবস হরতাল পালন হয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিকে যে কোনও মূল্যে প্রতিহত করার অঙ্গীকার করেছে তারা। ছাত্রদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার আর পুলিশ কমিশনারের অপসারণ দাবি করেছে।

আর কি?

৩০ জুলাই পূর্ণ দিবস হরতালের ডাক দিয়েছে ছাত্রঐক্য।

আর কি?

তোমার ফাঁসির দাবিতে আজ লক্ষ লক্ষ লোক সারা দেশ থেকে লং মার্চ করে ঢাকায় আসছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এধরনের ঘটনা প্রথম ঘটছে। শুধু বাংলাদেশই বা বলি কেন, পৃথিবীর ইতিহাসেই ঘটছে প্রথম। আজ ঢাকা আর ঢাকার মত নয়। মোল্লারা দখল করে ফেলবে পুরো ঢাকা।

দেশের সব জায়গা থেকে আর বাসে করে, ট্রাকে করে, ট্রেনে লঞ্চে করে হাজার হাজার মানুষ আসছে ঢাকা শহরে। কাল রাতেই অনেকে এসে গেছে মানিক মিয়া এভিনিউএর মহাসমাবেশে যোগ দিতে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা আজ আমি করব না, ভেবেই নিয়েছি। যদি মেরে ফেলে আজ, মেরে ফেলুক। ভাববো না। মাথায় আর ভাবনাগুলোকে আমি জায়গা দিতে পারছি না। ঝ আজ বাড়িতে। ঝকে ঘরে বসিয়ে আজ আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গোসল করে নিই। গা থেকে অনেকদিনের ধুলি কালি চলে যাওয়ায় হালকা লাগে। বারবারই নিজেকে বলি, আজ যদি মৃত্যু হয় হোক। অন্তত এই ভেবে তুষ্ট হব যে এই দেশের মানুষ আমার মৃত্যু চেয়েছে বলেই আমার মৃত্যু হয়েছে। সক্রেটিস যদি বিষ পান করে মরে যেতে পারেন, আমি কেন পারবো না! নিজের অস্তিত্বটিকে, নিজের বেঁচে থাকাটিকেই এখন প্রায়ই আমার খুব অনাকাঙ্ক্ষিত আর অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

কাল রাতে একটি ছবি এঁকেছি, চেয়ারে বসে আছে টুপিদাড়িওয়ালা এক লোক, পরনে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। লোকটির পেছনে আপাদমস্তক কালো বোরখায় ঢাকা চার বউ। ছবিটি যখন আঁকছিলাম, থেকে থেকে ঝ হাসছিলেন। সকালে শুরু করেছি আরেকটি ছবি, ছবির নাম বেহেসত। বেহেসতের আঙুর গাছের তলে ঝরনার পাশে বসে এক দাড়িওয়ালা লোক মদ খাচ্ছে, তার হাতের গেলাসে মদ ঢেলে দিচ্ছে একটি গোলাপী নগ্ন হুরী, বাকি দশটি আয়তোলোচনা গোলাপী রঙের সুন্দরী হুরী মদ

পানরত কুৎসিত দাড়িওয়ালা লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে ঝ বলেছেন, বলে না কয়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে! তোমার স্বভাব যাবে না কোনওদিনই। তুমি যেখানেই থাকো, ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করবেই।

শুনে হাসতে হাসতে বলেছি, লোকটার মাথার ওপর আল্লাহকে এঁকে দেব নাকি? আল্লাহর আশীর্বাদেই যেহেতু মোল্লাটার এই আরাম হচ্ছে!

ঝ বললেন, আল্লাহর তো আকার নেই, আল্লাহ হচ্ছেন নূর।

ছবিটি দেখতে দেখতে পেছনে সরতে থাকি আর বলতে থাকি, তাহলে একটা নূরই এঁকে দিই। মাথার ওপর সূর্যের মত নূর, সূর্যের চেয়ে তো কয়েক লক্ষ গুণ বেশি হবে সেই নূর।

ঝ বললেন, তাহলে তো তোমার বেহেসত আর বেহেসতের মোল্লারা, হুরীরা সেই নূরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

হেসে বলি, ঠিক বলেছো। তাহলে বেচারা আল্লাহকে আর আঁকা গেল না। বেহেসতের চিত্রটিই থাকুক।

ডডআরও কয়েকটা ন্যাংটো হুরী দিয়ে দাও।

ডডজায়গা নেই তো, তা না হলে তো সত্তরটাই এঁকে দিতাম। বুকগুলো ডাশা পেয়ারার মত হয়নি? দেখ তো।

ডডজাম্বুরা করে দাও, জাম্বুরা।

ডডমোল্লাটার উরুর মাঝখানে যে কিছু দিলাম না! একটা ইরেকটেড পিনাস দিয়ে দেব নাকি?

ঝ জোরে হেসে উঠলেন।

বেহেসতের সুখ আমাদের বেশিক্ষণ সইল না। ঝ গিয়েছিলেন তাঁর স্টুডিও থেকে রং আনতে, সামান্য ক্ষণের জন্য এই যাওয়া বলে এ ঘরের দরজায় বাইরে থেকে আর তালা লাগাননি, ভেতর থেকে আমি দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম। দরজায় টোকা। ঝ এসেছে ভেবে দরজা খুলেই দেখি একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ঝর ছেলে। ভুত দেখার মত চমকে উঠে ছেলেটি দৌড়ে চলে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে ধুকপুক বুক নিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এরপর সত্যিকার যখন ঝ ঢোকেন, ঘটনা বর্ণনা করি, কমাদাড়িহীন বর্ণনা। ধপাশ করে বসে পড়েন ঝ,মাথায় হাত। কি করা যায় এখন! ঝর ছেলে এসেছিল ঝকে খুঁজতে। এখন ঝ যদি তাঁর ছেলেকে বলেন যে আমাকে যে সে দেখেছে তা যেন কাউকে না বলে, তবে ছেলের কৌতূহল আরও বাড়বে। আমি বললাম, আমাকে তো আর চেনে না সে। কাউকে যদি বলেই, তবে ক্ষতি কি!

ঝ বড় শ্বাস ফেলে বলেন, চেনার দরকার নেই। কেউ একজন দরজা বন্ধ করে বাড়িতে লুকিয়ে আছে, এই খবরটিই যথেষ্ট। ঝ চকিতে উঠে পড়েন বলতে বলতে---
বাড়ি বদলাতে হবে, খামোকা এই ঝুঁকি নেবার দরকার নেই।

ঝ ঙকে জরুরি ভিত্তিতে ফোন করলেন। সংকেতে কথা হল। ছাতাটা সেদিন ফেলে গিয়েছিলেন, আজ এসে ছাতাটা নিয়ে যাবেন কিন্তু, অবশ্য আপনার গাড়ি আনার দরকার নেই, আমিই আপনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিতে পারব।

সংকেতের কথা শুনে আমি বললাম, কি দরকার ছিল, এখন তো বোধহয় পুলিশ আর আমাকে অ্যারেস্ট করার জন্য ওত পেতে নেই।

কি করে জানো! কিছুরই বিশ্বাস নেই। কখন সরকারের মতিগতি পাল্টে যায়, তার কোনও ঠিক নেই। সাবধানে থাকা ভাল। তাছাড়া তুমি কেনই বা ভাবছো, সরকার সত্যি সত্যিই রাজি হয়েছে তোমাকে জামিন দিয়ে দেশ থেকে তাড়াতে। যতদিন না ঘটছে ব্যাপারটি, ততদিন তুমি নিশ্চিত নও।

মধ্যরাতে ঙ গম্ভীর মুখে ঢুকলেন ঘরে। ঝ আর আমি তৈরিই ছিলাম। সব আলো বন্ধ করে ঝ আমাকে নিচে নামিয়ে নিলেন। গাড়িতে উঠে আমার আর পেছনের আসনে শুতে ইচ্ছে করেনি। ঝ আর ঙর অনুরোধ আদেশ কোনওটিকেই আমি মানিনি। মুখখানা ঢাকতে হয় বলে ঢেকেছি। চোখদুটো খোলা। কতদিন শহরটি দেখি না। দুচোখ মেলে রাখি। কোনদিকে যেতে হবে না হবে ঝকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঙ। গাড়ি মানিক মিয়া এভিনিউ পার হচ্ছে যখন দেখি রাস্তায় পড়ে থাকা ভাঙা ফেস্টুন, পোস্টার, লাঠি, শত সহস্র দলামোচা কাগজ। কলা কমলার খোসা। মাইলের পর মাইল জুড়ে পড়ে আছে সব। সত্যিকার মহাসমাবেশ ঘটেছে বটে।

কত লোক হয়েছিল? ঙকে জিজ্ঞেস করি।

ঙ গম্ভীর মুখে জবাব দেন, পাঁচ লক্ষ। কেউ কেউ অবশ্য বলছে তিন লক্ষ, কেউ বলছে, চার।

এ তল্লাটে আজ আমি যদি আজ দিনের বেলায় দাঁড়াতাম এসে, কী হত ভাবি। শরীরের একটি কণাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না, এমন পিষে মারত আমাকে। একটি একতলা বাড়ির কাছে গাড়ি থামালেন ঙ। বাড়িটির ভেতরে অন্ধকার। দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলেন একজন। সেই একজনের নাম দিচ্ছি ঠ। ঠর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে ঙ চলে গেলেন। ঠ আমাকে নিয়ে ভেতরে অন্ধকার একটি ঘর পেরিয়ে একটি ছোট ঘরে ঢুকলেন। ছোট ঘরটির দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলো জ্বেলে তিনি বসলেন। একটি পুঁটলি হাতে আমার, পুঁটলির মধ্যে শাড়ি আর জামা। ঠকে দেখেই চিনি আমি, আগে কখনও পরিচয় হয়নি যদিও, কিন্তু তিনি একজন সাহিত্যিক,পত্র পত্রিকায় ছবি দেখেছি অনেক। ঠর লেখাও পড়েছি। ঘরটির সামনে বড় বড় জানালা, জানালায় ভারী ভারী পর্দা। ঘরটিতে একটি বিছানা, বিছানার পাশে ছোট ছোট টেবিল, টেবিলে ল্যাম্প। একটি চেস্ট অব ড্রয়ার, একটি লেখাপড়ার টেবিল। কটি চেয়ার। সিলিং ফ্যান। লাগোয়া একটি বাথরুম। ঠ গলা নিচু করে বললেন যে ঙ তাঁকে জানিয়েছেন আমাকে দুদিনের জন্য তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিতে হবে, এ কথা ঠ ছাড়া বাড়ির আর কোনও প্রাণী যেন না জানে। ঠ ঙকে খুব শ্রদ্ধা করেন, তাঁর কোনও অনুরোধ তিনি ফিরিয়ে দেবেন, এ তিনি ভাবতেই পারেন না। ঠ বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে দুদিন পর হলে ভাল হয় কারণ তাঁর বাড়িতে দুজন আত্মীয় এসেছে বেড়াতে, দুদিন পর ওরা চলে যাবে, কিন্তু ঙ বলেছেন, আজই। অগত্যা ঠকে ব্যবস্থা করতেই হল। তাঁর কন্যার ঘরটি আমার জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু এ ঘরটি বাড়ির কোলাহলমুখর ঘরগুলোর কাছাকাছি নয়,বৈঠক ঘরের এক কিনারে আলাদা একটি ঘর। কন্যাকে তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য ঘরে ঘুমোতে বলেছেন।

তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। তুমি শুয়ে পড়ো। কিছু লাগবে তোমার?

আমি তো রাতে ঘুমোই না। দুএকটা ভাল বই যদি দিতে পারেন, ভাল হয়। আর কিছু লাগবে না।

ঠ বই এনে দিয়ে বললেন, দরজা বন্ধ করে দিতে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ যেন থাকে সকল সময়, কেবল তিনটে টোকা পড়লে খুলে দিতে হবে, তিনটে টোকা মানে ঠ।

তিরিশ জুলাই, শনিবার

সকালে খুব মৃদু ঠক ঠক ঠক। ঠ এলেন। হাতে নাস্তার ট্রে। নাস্তা খাওয়ার চেয়ে পত্রিকা পড়ায় আগ্রহ আমার বেশি। পত্রিকা চাইলে ঠ কয়েকটি পত্রিকা এনে দেন। প্রায় ধাতব কণ্ঠে বলেন, *সকাল নটার মধ্যেই তৈরি হয়ে থেকো। ঙ আমাকে জানিয়েছেন যে নটার পর তিনি যে কোনও সময় ফোন করবেন, কোর্টে যেতে হবে।* কোর্টের নাম শুনলে বুক কাঁপে আমার।

কাঁপা বুকে নটার আগেই তৈরি হয়ে বসে থাকি। বারোটার সময় ঙর ফোন আসে। জানিয়ে দেন আজ হচ্ছে না, কাল যেন নটার সময় তৈরি থাকি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

গতকালের খবর পুরো পত্রিকা জুড়ে। মহাসমাবেশের ছবি পুরো প্রথম পাতায়। না, এবার আর কয়েক হাজার নয়, এবার লক্ষ লক্ষ টুপি। আমার মনে হয় না, আজ পর্যন্ত এ দেশের কোনও রাজনৈতিক দল এত বড় কোনও সমাবেশ করতে পেরেছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যখন সব দল এক হয়ে মাঠে নেমেছিল, তখনও এত লোক জোগাড় করতে পারেনি। অবশ্য এরা সারা দেশ থেকে এসেছে। মৌলবাদী সংগঠন খুব শক্ত সংগঠন। কেবল সংগঠনের লোকই নয়, দেশের সবগুলো মাদ্রাসার ছেলে এসেছে। কোনও দল করে না, কিন্তু ইসলাম বাঁচাতেই নিজ দায়িত্বেই অনেক ধার্মিকই চলে এসেছে। আজ যদি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কোনও লং মার্চের আয়োজন করে, সারা দেশ থেকে এত লোক ঢাকায় আসবে বলে আমার মনে হয় না। মহাসমাবেশে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব বলেছেন, *আমাদের এ সমাবেশ ভাড়াটিয়া লোকের সমাবেশ নয়। এখানে যারা সমবেত হয়েছেন, সকলে ঈমানী জজবায় নিজের পয়সা খরচ করে সমাবেশে উপস্থিত।* অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উদ্দেশে বলেন, *ভাড়াটিয়া লোক ছাড়া আপনাদের সমাবেশ হয় না। ভাড়া করা লোক দিয়ে এই সমাবেশের একশ ভাগের এক ভাগও জড়ো করতে পারেন না।* খতিব লোকটি বদ হলেও কথাটি কিন্তু ভুল বলেননি।

লং মার্চ শেষে মানিক মিয়া এভিনিউর মহাসমাবেশে বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা

আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া আর কিছু মানি না

শির দেগা, নাহি দেগা আমামা। সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদিবাদ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর ঈমানী চেতনায় তার জাল নিশ্চিহ্ন করে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের পতাকাটি সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে গতকালের মহাসমাবেশে। ঐতিহাসিক লংমার্চ আর মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হল ধর্মদ্রোহী, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গর্জে উঠেছে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ শুরু ও পুনরুত্থান শুরু হয়েছে তাতে মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশের স্বর্ণতোরণ উন্মোচিত হল। .. কোরআনের মর্যাদা রক্ষা আর স্বাধীনতা সংরক্ষণের লড়াই আজ এক ও অভিন্ন ধারায় মিলিত হয়েছে। বিজয় অবধি এ লড়াই চলবে। এ লড়াইয়ে বিজয় সুনিশ্চিত।

বক্তাদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের জনপ্রিয় পীর আছেন, বড় বড় ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা আছেন, টুপিদাড়িহীন বক্তাদের মধ্যে এনডিএর আনোয়ার জাহিদ, ফ্রীডম পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল মেজর বজলুল হুদা, জাগপার নেতা প্রধান, পিপলস ন্যাশনাল পার্টির শেষ শওকত হোসেন নীলু, কৃষক শ্রমিক পার্টির এ এস এমন সোলায়মান আছেন। বক্তারা পুরোনো কথাই বলেন, পুরোনো দাবিই তোলেন। তসলিমা সহ মুরতাদদের ফাঁসি, ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন, এনজিওগুলোর ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ইত্যাদি। ---৩০ জুনের হরতালের মধ্য দিয়ে এসব দাবির পক্ষে যে গণরায় ঘোষিত হয়েছে, সরকার আজও তা মেনে নেয়নি। যদি সরকার গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে তবে তৌহিদী জনতার এই আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হবে। যে সংসদ ব্লাসফেমি আইন পাস করতে পারে না, এদেশের জনগণ সে সংসদের প্রতি আর কোনও আস্থা রাখতে পারে না। ভারতের সাথে ২৫ সালা গোলামী চুক্তির জিঞ্জির ভাঙতে যে সরকার সাহস পায় না, সেই দুর্বল সরকারের টিকে থাকার কোনও অধিকার নেই। বক্তারা ঘোষণা দেন, বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবেই।

জুমার নামাজের পর কথা ছিল মহাসমাবেশ হবে। কিন্তু মিছিল নিয়ে জনতা আসতে শুরু করে মানিক মিয়া এভিনিউএর বিস্তৃত সুদীর্ঘ রাজপথে। মহাসমাবেশে ছিল ১শ ৫০টি মাইক। জুম্মার নামাজের আযান ভেসে আসে মাইকে। টুপি পাঞ্জারি পরা লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে যায় নামাজ পড়তে। এত বড় জামাতে নামাজ পড়া সৌভাগ্য মনে করে আশে পাশের এলাকা থেকেও এসে মানুষ নামাজে শরিক হয়। সমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচী দেওয়া হয়, ১২ আগস্ট *দোয়া দিবস* পালন হবে, এবং সংসদের আগামী অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদভবন ঘেরাও করতে হবে। ১১ দফা দাবি পেশ করা হয় মহাসমাবেশে। দাবিগুলো হচ্ছে, ১. ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত সার্বজনীন ইনসাফ, হক ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ২. আল্লাহ, আল কোরআন, রাসুলে খোদা মোহাম্মদ (সাঃ), শরীয়ত সম্পর্কে সামান্যতম অবমাননা সহ্য করা হবে না। বাংলাদেশে বসবাসরত অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. ধর্ম অবমাননাকারীদের কঠোর শাস্তির নিশ্চয়তাবিধানে ব্লাসফেমি আইন চালু করতে হবে।৪. কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। ৫. রেডিও

টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যমে অপসংস্কৃতি,অশ্লীলতা ও জাতীয় মূল্যবোধবিরোধী প্রচার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করতে হবে। ৬.এনজিওদের সকল কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। উচ্চ পর্যায়ের তদন্তসাপেক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহী ধর্মদ্রোহী এনজিওদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ৭. বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায়(ক)ভারতের সাথে সম্পাদিত ২৫ সালা গোলামী চুক্তি, সাপটা চুক্তি, নৌ ট্রানজিট চুক্তি বাতিল করতে হবে। (খ) ফারাককা, তালপট্টি, শান্তিবাহিনীসহ অপরাপর সমস্যাসমূহ জাতিসংঘ, ওআইসিসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করতে হবে। অবিলম্বে গঙ্গাবাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে। (গ) শত্রুতা ও আগ্রাসন পরিহার না করা পর্যন্ত ভারতীয় পণ্য আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। (ঘ) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফসহ যে কোনও বিদেশি ঋণ বা সাহায্য শর্তহীন হতে হবে। (ঙ) শক্তিশালী সেনা নৌবাহিনীসহ গণফৌজ গঠন করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় ভারত পাকিস্তানের মত বাংলাদেশকেও আণবিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (চ) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল স্তর থেকে চিহ্নিত রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহীদের উচ্ছেদ করতে হবে। ৮. পর্যায়ক্রমে সকল ক্ষেত্রে সুদ নামক নির্মম শোষণ নিষিদ্ধ করতে হবে। অবিলম্বে কৃষকদের সকল রকম সুদ মওকুফ করতে হবে। ইতিমধ্যে এনজিও, কৃষিব্যাংকসহ অপরাপর ব্যাংকে কৃষকদের পরিশোধিত সুদ ফেরত দিতে হবে। ৯. সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রাপ্ত সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠন বন্ধ এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বেকার ও দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে ব্যয় করতে হবে। ১০. কেবল নৈতিক ও সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি সুশৃঙ্খল জাতি রাষ্ট্র পরিচালনা ও আজাদী রক্ষায় মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। কাজেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা ও সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ১১. ৭৪ এর কুখ্যাত কালাকানুন ও ৯২ এর সন্ত্রাস দমন আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

মহাসমাবেশে এই দাবিগুলো মেনে নেবার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়। অন্যথায় উদ্ভূত যে কোনও পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ি থাকবে বলে বলা হয়। কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতি, কৃষক, শ্রমিক, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, রাজনীতিক, আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ, ও মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টানসহ সকল স্তরের দেশপ্রেমিক ও ধর্মপ্রিয় জনগণকে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের পতাকাতলে শামিল হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ইনসাফ ও মানবতার মুক্তি সংগ্রামে শরিক হওয়ার আহবান জানানো হয়।

অনেক দাবিই টুপিদাড়িহীন রাজনৈতিক নেতাদের তৈরি করা, তা বোঝা যায়। কিছু দাবি আমার মন্দ লাগে না। সংখ্যালঘুদের অধিকারের দাবি, কৃষকদের সুদ মওকুফের দাবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের শর্তহীন ঋণ বা সাহায্যের দাবি। সম্পদের সুষম বন্টনের দাবি। যে দাবিই হোক না কেন মানুষ এসেছে কোরান বাঁচাতে, তসলিমাকে ফাঁসি দিতে। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্লোগান ছিল,

নারায়ে তকবির, আল্লাহ আকবার,
কুখ্যাত তসলিমার ফাঁসি চাই দিতে হবে,
ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান,
নাস্তিকদের আস্তানা এই বাংলায় রাখবো না,
মুরতাদদে আস্তানা এই বাংলায় থাকবে না,

আমরা সবাই রসুল সেনা ভয় করি না বুলেট বোমা,
জিহাদ জিহাদ জিহাদ চাই জিহাদ করে বাঁচতে চাই।

ইনকিলাব বর্ণনা করেছে, *এসব স্লোগান আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। লাখো জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত তাকবীর ধ্বনি যেন সপ্ত আসমান ভেদ করে আরশে আজীমে গিয়ে নাড়া দিচ্ছিল।* অনুষ্ঠান শুরু হয় কোরান তেলওয়াত দিয়ে। এরপর ইসলামি সঙ্গীত, সঙ্গীতের কথাগুলো এরকম, আল্লাহর জমিনে এই বাংলার জমিনে মুরতাদ বেদ্বীনের স্থান নেই। এদেশ ইসলাম মুসলিম জনতার, এখানে ঠাঁই নেই মুরতাদ খোদাদ্রোহীতার.. . .

সমাবেশ ঘিরে চারদিকে বসেছিল ক্ষুদে হকাররা। বুট বাদাম কলা রুটি শশা এমনকি ভ্যানে করে ভ্রাম্যমান বিরানি ও তেহারির দোকানও বসেছিল। সমবেত জনতার জন্য মহাসমাবেশের উদ্যোক্তারা খাবার পানির ব্যবস্থা করেছিলেন। দুশতাধিক কাঁচা পায়খানার ব্যবস্থাও করেছিলেন। মহাসমাবেশটি এক কথায় সার্থক। তবে ৫টি বোমা ফাটার ঘটনা ঘটে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। যখন মহাসমাবেশ শেষে লোকেরা ট্রাক বাসে করে ঢাকার বাইরে যেতে থাকে, মৌলবাদ বিরোধী দল যেখানেই তাদের পেয়েছে, পেটাতে চেষ্টা করেছে, এই করে আহতের সংখ্যা সত্তর জন। একটি জিনিস একটু খটকা লাগে, জামাতে ইসলামী আলাদা ভাবে জনসমাবেশ করেছে গতকাল। জামাতে ইসলামীর নেতারা মানিক মিয়া এভিনিউএ ছিল না, গোলাম আযম চট্টগ্রাম তো চট্টগ্রাম, খোদ ঢাকা শহরের মাঝখানে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। শেখ হাসিনা ওদিকে নোয়াখালির বেগমগঞ্জে গিয়ে বক্তৃতা করছেন মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে নয়, সরকারের বিরুদ্ধে। ধর্মের গুণগান গেয়েছেন, এক পর্যায়ে গর্ব করে বললেন, *আমরা ধর্মহীনতায় বিশ্বাস করি না। কারণ বঙ্গবন্ধুই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের একজন সংসদ সদস্য মদ জুয়া বন্ধের বিল উত্থাপন করলেও বিএনপি সরকার তা পাস করেনি।*

ইত্তেফাকের খবরটি লিখেছে এভাবে, মানিক মিয়া এভিনিউর মহাসমাবেশের আহবান, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করুন। বঙ্গবন্ধু এভিনিউএ নগর আওয়ামী লীগের সমাবেশে কাল ১২ টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আহত হয়েছে ওখানেও বেশ কজন। জনকণ্ঠের খবর, জিপিও এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত, পুলিশের লাঠিচার্জে ৪০ জন ছাত্র আহত, ককটেলের আঘাতে পুলিশ জখম, অবস্থা গুরুতর। সংবাদের খবর, সংঘর্ষ ও বোমায় ছাত্র পুলিশ অধ্যাপকসহ অর্ধ শতাধিক আহত। এদিকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র সমাজ আজ সারা দেশে পূর্ণ দিবস হরতালের ডাক দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ডাক দিয়েছে অর্ধ দিবসের হরতাল। চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এই হরতাল।

ঠ দুপুরে ভাত নিয়ে এসেছেন ঘরে, রাতেও খাবার নিয়ে এসেছেন। আমার শুধু শুয়ে বসে থাকা ছাড়া বই পড়া, পত্রিকা পড়া, আর ঠ এলে কথা বলা ছাড়া আর কোনও কিছু করার নেই। কথা যা হয়, মূলত রাজনীতি নিয়েই হয়। অনেক রাতে ঠর স্বামী এলেন কথা বলতে। পুরো বাড়ির মধ্যে কেবল ঠ আর ঠর স্বামীই জানেন যে আমি এই ছোট ঘরটিতে থাকছি। ঠর স্বামীটি একসময় বামপন্থী শ্রমিক নেতা ছিলেন, বললেন তাঁকেও এরকম দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। তিনি জানেন এরকম

বেঁচে থাকা ঠিক কি রকম বেঁচে থাকা। তিনি জানেন কী ভয়াবহ তখনকার প্রতিটি মুহূর্ত, যখন রাতের অন্ধকারে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

ঠ এবং ঠর স্বামী দুজনই দেশের বর্তমান রাজনীতি নিয়ে তিতিবিরক্ত। কিন্তু তারপরও দুজনের একজনও মনে করেন না যে দেশে মৌলবাদী আন্দোলন খুব বেশিদূর এগোবে। আগামী নির্বাচনে এই সরকার ভোটে জিতবে বলেও তাঁরা মনে করেন না।

একত্রিশ জুলাই, রবিবার

আজও সকালে তৈরি হয়ে থাকি। দুপুরের পর ঙ জানিয়ে দেন যে আজ হচ্ছে না। গতকালের পত্রিকায় একটি খবরের শিরোনাম ছিল তসলিমা নাসরিন প্রসঙ্গে নরওয়ে, জার্মানি এবং ইউরোপীয় কমিশনের বক্তব্য। খবরটি এরকম, জার্মান দূতাবাসের কাউন্সিলার বলেছেন, ১৬ জাতির ইউরোপীয় কমিশনের পক্ষ থেকে তসলিমা নাসরিনকে দেশত্যাগের অনুমতি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে ফরমাল অনুরোধ জানানো হয়েছে কিন্তু এখনও কোনও জবাব তাঁরা পান নি। এদিকে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, এরকম খবর তাঁরা পত্রিকায় পড়েছেন, কিন্তু সরকারিভাবে কিছু জানেন না। ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান একজন জার্মান। জার্মান দূতাবাসে জানতে চাওয়া হয়, তসলিমাকে দেশত্যাগের অনুমতিদানের জন্য চাপ সৃষ্টি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সামিল বলে তিনি মনে করেন কি না। দূতাবাস থেকে বলা হয়, চাপ সৃষ্টির কোনও প্রশ্নই আসে না। ইউরোপীয় কমিশনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কেবল নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং তা বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হয়েছে, তা সরকারের ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি নয় এবং তা গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ সরকারের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমন অনুরোধ করে বাংলাদেশের আইনকে নিষ্ক্রিয় করতে সহায়তা করছে কি না এবং তা সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলছে কি না জানতে চাওয়া হলে দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, ইউরোপীয় কমিশনের মতামত বা অনুরোধ সরকারকে জানানো ছাড়া বিষয়টির ওপর কোনও মতামত দেওয়া তাঁর দায়িত্ব নয়। ইউরোপীয় কমিশন কেন একজন মহিলার পক্ষে এমন অবস্থান নিচ্ছে যে মহিলা দেশের আপামর জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত করেছে এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, সমগ্র বিষয়টি ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করছে এবং ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে কি ঘটছে তার ওপর নজর রেখেই দেখতে হবে। ইউরোপীয় কমিশন মানুষের বাক স্বাধীনতাকে মূল্য দেয় এবং এই বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে। ঢাকার নরওয়ের মিশন প্রধানকে বিষয়টির ওপর মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বলেন, বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্য থেকেই নরওয়ে সরকার বিষয়টি দেখছেন। মিশন প্রধান সরেজমিনে সব দেখছেন এবং নরওয়ে সরকারের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন। নরওয়ের পত্রিকায় বাংলাদেশের নারীদের ওপর নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর প্রতিদিন খবর ছাপা হচ্ছে, জনগণের বিশাল একটি অংশ তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নরওয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। নরওয়ের সরকারকে

নরওয়েবাসীদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েই কাজ করতে হয়। বাক স্বাধীনতার নামে উগ্র মতামত বলা ও ছাপানো একটি সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও অনুভূতিকে পদদলিত করা কতটুকু সমর্থনযোগ্য, এই প্রশ্নের জবাব তিনি এড়িয়ে যান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তাই বলে বাংলাদেশের মানুষকে কেন মৌলবাদী বলা হচ্ছে, জিজ্ঞেস করা হলে মিশন প্রধান বলেন যে কিছুসংখ্যক উগ্রপন্থী ছাড়া বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয় ও সহনশীল। এরপর বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব নরওয়ের মিশন প্রধান দেননি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিশন প্রধান বলেছেন, তসলিমা নাসরিনকে নরওয়ের একটি সেমিনারে যোগ দেয়ার নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে, তবে তিনি যেতে পারবেন কি না তা একমাত্র বাংলাদেশ সরকারই বলতে পারবে। বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান হচ্ছে কি না জানতে চাওয়া হলে মিশন প্রধান বলেন, তিনি কেবল পত্র পত্রিকায় যা প্রকাশ হচ্ছে সে সম্পর্কেই জানেন, বেশি জানেন না। ব্লাসফেমি আইন সম্পর্কে বলেন, বর্তমান বিশ্বে এটি অচল এবং এটি মানবাধিকারের পরিপন্থী।

কূটনীতি ব্যাপারটি অদ্ভুত। এটি আমি বুঝি কম। কী কথা বলতে হবে, কী কথা বলতে হবে না তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কূটনীতিকরা জানেন কতটুকু বলতে হয়, কোথায় থামতে হয়। কি কথার কি উত্তর দিতে হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং নরওয়ে বাংলাদেশকে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন আমাকে দেশত্যাগের অনুমতি দিতে। সরকার এটিকে চাপ হিসেবে বা সুযোগ হিসেবে নিয়েছে কি না তা জানি না। কি ঘটছে সরকারে এবং বিদেশি দূতাবাসে, তা এ বাড়ি ও বাড়ির অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থেকে আমার বোঝা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক বিদেশি সরকারগুলোর কোনও দায় পড়েনি আমাকে বিপদমুক্ত করতে, বিদেশি লেখকগোষ্ঠী আর মানবাধিকার সংস্থাগুলোই কেবল মাথা ঘামাচ্ছে, তারা যে কোনও রাজনীতির উর্ধ্বে বলেই ঘামাচ্ছে, তারা ব্যক্তি স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারে বিশ্বাস করে বলেই ঘামাচ্ছে। তারা মাথা না ঘামালে বিদেশি কোনও সরকার আজ আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসতো না, কারণ আমি তাদের কোনও স্বার্থরক্ষার কাজে লাগব না।

ঠকে যখন মনের কথা জানালাম, তিনি বললেন ---*তোমার খবরটি হোল ওয়ার্ল্ডের মিডিয়াতে গেছে। এখন ইউরোপের দেশগুলো ক্রেডিট নিতে চাইবে তোমাকে বাঁচানোর। সুতরাং বিদেশি সরকারগুলো যে করেই হোক ঝাঁপিয়ে পড়বেই তোমার জন্য কিছু করতে। বলে তো বেড়ানো যাবে যে আমরা মানবাধিকারের পক্ষে এই কাজটি করেছি। এটিই তো বড় একটি স্বার্থ।*

---*এত কিছু যখন করতেই পারে তাঁরা, কই আমার অনুপস্থিতিতে জামিনের ব্যবস্থা করতে পারে না কেন? হাইকোর্টে গেলে কী নিশ্চয়তা আছে যে আমাকে খুন করা হবে না! কে নিশ্চয়তা দেবে যে ওখানে আততায়ী ওত পেতে থাকবে না! প্রতিদিন নাকি এখন হাইকোর্টে মোল্লারা ভিড় করছে আমি যেতে পারি এই ধারণা করে। ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।*

---*হ্যাঁ ঘটতে পারে।*

---*তখন কোথায় পাবো ইউরোপের নেতাদের?*

---*'তোমাকে বাঁচাতে তো তারা এ দেশে পারবে না। এ দেশ থেকে তোমাকে উদ্ধার করেই তোমাকে বাঁচাতে পারে। সেটি ছাড়া তাদের আর করার তেমন কিছু নেই। এ বাড়িতে যদি এখন তোমাকে আক্রমণ করা হয়, রাস্তায় তোমাকে ধরে ফেলা হয় বা আদালতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, ইউরোপের বাপের ক্ষমতা নেই তোমাকে কোনওরকম সাহায্য করার।'* এটুকু বলে আচমকা শান্ত হয়ে বসে থাকেন ঠ।

আমি অনেকক্ষণ পর একসময় নরম গলায় বলি, ---*'মনে হয় পুলিশের ব্যবস্থা করা হবে।'*

---*'পুলিশই কত আহত হচ্ছে কত জায়গায়, কত মরছে। সন্ত্রাসীরা আবার পুলিশ মানে নাকি!'*

---*'পুলিশরাই বা কেন মনে করবে যে আমি তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিইনি! তাদের কেন রাগ থাকবে না আমার ওপর?'*

ঠ মাথা নাড়েন হ্যাঁ বোধক। আমি ভুল বলেছি বলে তিনি মনে করেন না। ঠ খুব তাড়াহুড়ো করে কথা সারেন আমার সঙ্গে, কারণ এ ঘরে আমার সঙ্গে বসে থাকলে তাঁর চলবে না। কারণ তাঁকে বাড়িখানা দেখতে হবে। বাড়ির মানুষগুলোকে সন্দেহমুক্ত রাখার সবরকম চেষ্টা তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। বাড়িটিতে কোনও অনাকাঙ্খিত অতিথির আগমন যেন না ঘটে, বাড়িটির দিকে বাইরের কোনও চোখ যেন না পড়ে। ঘোমটা মাথায় মুখে আঁচল টেনে বসে থাকা এক কূলবধূর মত আমি। আমাকে দেখলে আমারই ভয় হয়, ইচ্ছে হয় আমার কাছ থেকেই আমি দৌড়ে পালাই। মাঝে মাঝে আমার একটি সংশয় জাগে যে, আমি নিজে হলেও হয়ত তসলিমার এই দুঃসময়ে তাকে আশ্রয় দেবার দুঃসাহস করতাম না।

রাতে ঙ এলেন। জামিন পেতে হলে হাইকোর্টে আমাকে উপস্থিত হতেই হবে ব্যাপারটি ঙর মোটেও ভাল লাগেনি। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে কোন মানুষটির আদালতে যাওয়া উচিত! যদি জীবনটিই শেষ পর্যন্ত না রক্ষা হয়, তবে জামিন পেয়ে কী লাভ! ঙ দুশ্চিন্তামুক্ত নন। বিরাট খোলা মাঠের ওপর হাইকোর্টটি। যে কোনও মানুষেরই প্রবেশাধিকার আছে ওখানে। হাইকোর্টের মাঠে, ভেতরে করিডোরে হাজার হাজার মানুষ যদি ভিড় করে, তবে উপায় কি হবে, কি করে ঢুকব আমি, কি করে বেঁচে বেরোবো, তা ভেবে ঙরও ঘুম হচ্ছে না। এ ছাড়া, হাইকোর্টে যাওয়া ছাড়া আর তো কোনও উপায়, ঠ বললেন, নেই। কেন পর পর দুদিন আমাকে আদালতে যেতে নিষেধ করলেন ঙ, তা জানতে চাইলে বললেন যে আমার উকিল তাঁকে জানিয়েছেন যে আদালতে ভাল বিচারক বসেননি। বিচারকদের মধ্যেও খারাপ ভাল আছে। কেউ কেউ সোজা বলে দেবেন, না জামিন হবে না। বলে দেবেন, কোনও নিরাপত্তা দেওয়া হবে না। সুতরাং আমার উকিলকে চোখ কান সব সজাগ রেখে বিচারক মৌলবাদী কি অমৌলবাদী তা পরখ করতে হবে। পরখে যদি অমৌলবাদী জোটে, তবেই জামিনের জন্য দাঁড়াতে হবে, নচেৎ নয়।

ঙ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সুপ্রীম কোর্টেও যে এত বিচারক মৌলবাদের পক্ষে তা আমার আগে জানা ছিল না।

ঙর দীর্ঘশ্বাস বুকে হেঁটে এগোতে থাকে আমাদের দিকে। পা বেয়ে ওপরে ওঠে, উঠতে উঠতে বুকে এসে স্থির হয়। বুকে আমাদের সবারই এক একটি দীর্ঘশ্বাস। ঠ আর তাঁর স্বামী নিজ নিজ দীর্ঘশ্বাসগুলোকে বিদেয় করে দেন নিজ নিজ বুক থেকে। কেবল আমারটিই পড়ে থাকে বুকে। আমারটিই শত সন্তান গর্ভে নিয়ে ভারী শরীরে পড়ে থাকে, আমারটিই আমাকে একটু একটু করে দখল করে নেয়, মুঠোর ভেতরে নেয়। শত শত দীর্ঘ শ্বাস আমার শ্বাস রোধ করে রাখে।

ঙ চলে গেলে ঠ, ঠর স্বামী আর আমি তিনজন চুক চুক করে চা পান করতে করতে টুকটুক করে কথা বলতে থাকি। মাঝে মধ্যে দরজায় কারও শব্দ শুনলে বুক ধুকধুক করে।

---*হচ্ছে কি দেশে?*

---*বাম দলগুলো মাঠে নেমেছে। ঘাতক, রাজাকার উৎখাত আর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার কথা বলছে।*

---*এতে কি কাজ হবে? সত্যিই কি কোনওদিন এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে?*

---*মনে হয় না।*

---*আমারও মনে হয় না কোনওদিন হবে। বরং মৌলবাদীরা দিন দিন শক্তিশালী হবে। বিএনপি আর আওয়ামী লীগ মৌলবাদীদের আশকারা দিয়ে কত যে ভুল করল, একদিন বুঝবে।*

---*মনে হয় না কোনওদিন বুঝবে। মৌলবাদীরা এ দেশের সর্বনাশ করলে কার কী! বিএনপি আর আওয়ামী লীগের নেতাদের উদ্দেশ্য হল কিছুদিন যে করেই হোক ক্ষমতা ভোগ করা। ভোগ হয়ে গেলে সাধ মিটে যাবে, এরপর দেশটাকে কুত্তায় খাক কী জামাতিতে খাক, তাদের কিছু যায় আসে না। সমাজ নষ্ট হয়ে যাক, দেশ পচে যাক, তাদের কী!*

---*ভরসা এখন ছাত্রদের ওপর। ছাত্ররা মাসব্যাপী আন্দোলনে যাচ্ছে। আগস্টের তিরিশ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর আপিসে মিছিল নিয়ে যাবে। আগস্টের তিন তারিখে চট্টগ্রামের ছাত্র হত্যাকাণ্ডে জড়িত খুনীদের গ্রেফতার আর বিচার দাবি আর ছাত্রদের যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ হবে, আগস্টের ছয় তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন রাজাকারমুক্ত করার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ আর আগস্টের দশ তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে বড় বড় শহরগুলোয় ছাত্র জনসভা হবে।*

---*ছাত্রদের মধ্যে এখনও হয়ত সততা বলে ব্যাপারটি টিকে আছে। কিন্তু তারাও কি বেশিদিন এই সততা টিকিয়ে রাখতে পারে!*

---*এখন ধরেছে বায়তুল মোকাররমের খতিবকে। বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক সভায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলেছে ওবায়দুল হক। তার অপসারণ দাবি করা হচ্ছে। বলছে, বায়তুল মোকাররম কোনও দলীয় প্রতিষ্ঠান নয়। এটি জাতীয় মসজিদ, এবাদতের জায়গা। জামাত শিবির দেশের মসজিদগুলোকে নিজেদের গোপন মিটিং আর রাজনৈতিক কাজকারবার চালানোর জন্য ব্যবহার করছে। সরকার গোলাম*

আযমকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে যেন সরকার বিরোধী আন্দোলন না হয়। মৌলবাদীরা জাতীয় সংসদ সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলেছে। এদের গ্রেফতার করে বিচার করার দাবি জানাচ্ছে ছাত্ররা।

---*দাবি তো কতই জানানো হয়। কোন দাবি মানা হবে, কোন দাবি মানা হবে না, তা তো আমরা অনুমানই করতে পারি। এই প্রো-ফান্ডামেন্ডালিস্ট গভরমেন্ট ছাত্রদের মিছিল মিটিংগুলোয় পুলিশ ছেড়ে দিয়ে পণ্ড করে দেবে।*

---*তা হয়ত দেবে। কিন্তু প্রতিবাদ যে কিছু হচ্ছে এই তো বেশি।*

---*এই তো বেশি কেন! প্রতিবাদ তো আরও হওয়া উচিত।*

---*নাহ! কেউ কি আর মাঠে নামতে চাইছে। তসলিমার কারণে এসব হচ্ছে,সুতরাং আমাদের আর দায় কি! এসব তসলিমাই সামলাক। এরকমই তো মনোভাব ছিল সবার। এখন তো সকলে একটা জিনিসই জপছে, মৌলবাদীদের শক্তিটা বেড়েছে তসলিমার কারণে।*

---*মৌলবাদীরা যে তলে তলে কতটা শক্তিমান হয়েছে, তসলিমার কারণে তা বরং দেখার সুযোগ হল। তা না হলে তো চোখের আড়ালেই থাকত সব। দেশটা মৌলবাদীদের মুঠোর মধ্যে একেবারে চলে গেলেই টনক নড়ত। আগে ভাগেই টনক নড়া তো ভাল, যখন প্রতিরোধের সামান্যও সময় আছে বা সুযোগ আছে।*

দেশ নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা হয়। কী হবে দেশের। কী রকম যেন সব পাল্টে গেল। আমরা তিন জনই জানি এবং মানি যে হঠাৎ সবকিছু বড় পাল্টে গেছে। আমরা তিনজনই, মুখে যত আশার কথাই বলি না কেন, মনে মনে ঠিকই জানি যে দীর্ঘশ্বাসের মত দুরাশাও বুকে হেঁটে সরীসৃপের মত আসছে আমাদের দিকে।

অনেকক্ষণ আমরা গভীর রাতের স্তব্ধতাকে সঙ্গী করে স্তব্ধ বসে থাকি। আমাদের মুখের কথা ফুরিয়ে যায় তবু বসে থাকি। আমাদের মনে অনেক কথা থাকে বলেই বসে থাকি।

ঠ আর ঠর স্বামী ঘুমোতে চলে যাবার পরও দেশ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তাটি যায় না। দুশ্চিন্তাটি আমাকে কুটকুট করে কামড়াতে থাকে। সারারাত আমাকে দুশ্চিন্তাটি কামড়ায়। সারারাত আমি এক ফোঁটা ঘুমোতে পারি না। না ঘুমোতে ঘুমোতে অনেক আগেই অভ্যেস হয়ে গেছে না ঘুমোনোর।

এক আগস্ট, সোমবার

আজও তৈরি হয়ে থাকি। ঙ জানান যে আমার অনুপস্থিতে আদালত বসে যাবে এবং এটি হঠাৎ করেই বসবে, কাকপক্ষী যেন জানতে না পারে। আমার উকিল আমার পক্ষে যা বলার সব বলতে থাকবেন, কাগজ পত্র যা দেখাবার, দেখাতে

থাকবেন, এর মধ্যে সময় সুযোগ পেলে বিচারককে তিনি বলবেন যে আমার নিরাপত্তার অভাব আছে বলে আমি আদালত পর্যন্ত যেতে পারছি না, তখন যদি বিচারক গোঁ ধরেন যে আমাকে যে করেই হোক উপস্থিত হতেই হবে, না হলে জামিন হবে না তো হবেই না, তখন আমার উকিল তাঁর কোনও সহকারীকে ইঙ্গিত করবেন আদালতে আমাকে উপস্থিত করার জন্য, সেই সহকারী তখন আরেকজনকে ইঙ্গিত করবেন, সেই আরেকজন উঠে গিয়ে ফোন করে দেবেন ঙকে, ঙ জানিয়ে দেবেন ককে, ক জানাবেন ছোটদাকে, তাঁর কাছে দিয়ে দেওয়া হবে কোত্থেকে আমাকে তুলে কোথায় নিতে হবের বৃত্তান্ত, ছোটদা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দেবেন। এটি অথবা যদি আমার উকিল জানেনই যে বিচারক আমার উপস্থিতি চাইবেনই, তবে যখন তিনি আদালত কক্ষে আমার জামিনের আবেদন নিয়ে দাঁড়াবেন,ঠিক সেই মুহূর্তটি থেকে হিসেব করে ঠিক পনেরো মিনিট পর আমাকে আচমকা উপস্থিত হতে হবে, পলকের মধ্যে আমার চেহারাটি বিচারককে দেখিয়ে যেন দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারি। নিমেষে যেন হাওয়া হয়ে যেতে পারি। এসব ছক তৈরি করার কারণ, খুব কম সময়ের জন্য আমাকে যেন আদালতে কাটাতে হয়। খুব জটিল লাগে ব্যাপারটি। আমার আশংকা হয় কোথাও না আবার ভুল হয়ে যায়।

আজও নাকচ হয়ে যায় আমার যাওয়া। কেন, তা ঙ জানেন না, আমি তো জানিই না। ঠ আজ কোনও পত্রিকা দিয়ে যাননি ঘরে। চাইলে বলেছেন, *দরকার নেই ওসব পড়ার, পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়।* ঠ আজ সারাদিন সময় পাননি আমার কাছে এসে দুদণ্ড বসার। তাঁর বাড়িতে অনাহুত অতিথিরা এসেছেন, এদের ছলে বলে কৌশলে বিদেয় করতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, বুঝি কেউ জেনে গেল এ বাড়িতে যে একটি নিষিদ্ধ বস্তু আছে, সে কথা। কেবলই ভয় হচ্ছে বুঝি দেশসুদ্ধ জানাজানি হয়ে গেল যে ঠ একটি মস্ত অপরাধ করেছেন, যে অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

সারারাত আমি কান পেতে থাকি দরজায় ঠর আঙুলের মৃদু কোনও শব্দ যদি বাজে, শুনতে।

দুই আগস্ট, মঙ্গলবার

নানা রকম কথা হচ্ছে। এমন কথাও হচ্ছে যে আমি দেশে নেই। বাংলাবাজারের বড় খবর, **তসলিমা দেশে নেই।** তসলিমা দেশ থেকে কিভাবে কোথায় পালিয়ে গেছেন তা বিস্তারিত লিখেছেন স্বয়ং মতিউর রহমান চৌধুরী। দেশের নামকরা সাংবাদিক এই মতিউর রহমান চৌধুরী ওরফে মতি চৌধুরী ওরফে মইত্যা। লিখেছেন, বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন দেশ ছেড়েছেন। ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ খবরটি দিয়েছে। এ খবরটিই অনুবাদ করে তিনি তাঁর বাংলা কাগজে গরম গরম পরিবেশন

করছেন। আমি নাকি একটি পশ্চিমা দূতাবাসে ছিলাম, সেখান থেকে অন্য একটি পশ্চিমা দূতাবাসের পতাকাবাহী গাড়ি দিয়ে আমাকে কলকাতা পৌঁছোনো হয়েছে। সেখান থেকে বিমানে করে ইউরোপের একটি দেশে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মতি চৌধুরী জানাচ্ছেন যে রিভিউএর এ সংবাদটি গতকাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার পত্রপত্রিকাতেও তা ফলাও করে প্রকাশ হয়। গল্প লিখতে হয় তাই লেখা। এখানকারই কোনও অসৎ সাংবাদিক গল্পটি বানিয়েছে, তার কাছ থেকেই বিদেশের পত্রিকা লুফে নিয়েছে। সাংবাদিকদের গল্পের শিকার আমি তো আর আজ থেকে নই! ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউএর সংবাদদাতা সৈয়দ কামাল উদ্দিন নাকি বলেছেন, তিনি এই খবরটি বিশ্বস্তসূত্রে পেয়েছেন, খবরটি সত্য কি না তা তিনি জানেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে আমার কথা জিজ্ঞেস করে মতি চৌধুরী দেখেছেন যে আমার ব্যাপারে কেউ ওখানে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মন্ত্রিসভার গতকালের বৈঠক ছিল আমাকে নিয়ে, তাঁর বিশ্বাস, কোনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। একাধিক নীতিনির্ধারক কেন আমার প্রসঙ্গে হঠাৎ মুখে কুলুপ এঁটে ফেললেন, তা নিয়ে মতি চৌধুরী এখন ভাবনায় পড়েছেন। লণ্ডনের টাইমস পত্রিকার কথা বলেছেন তিনি। পত্রিকাটি নাকি খবর দিয়েছে যে আমি বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলে বাংলাদেশ সরকার খুশিই হবে। ওখানে নাকি লেখা হয়েছে যে বাংলাদেশ সরকার চুপিসারে পশ্চিমা কূটনীতিকদের বলেছেন এ কথা। এই লেখার সঙ্গে একটি সিগারেট ধরাচ্ছি আমি এমন একটি ছবি গেছে। বাঁ হাতে সিগারেট, ডান হাতে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি, মুখে ধোঁয়া। এরকম ছবিই সাধারণত চৌধুরী আমাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই ছাপেন। এখন এই সময় মতি চৌধুরী ঠিক না পারছেন বিশ্বাস করতে ফার ইস্টার্নের তসলিমা দেশে নেই সংবাদ। না পারছেন দিতে এমন কোনও খবর, যা তিনি বিশ্বাস করেন যে সত্য। অবশেষে জল্পনা কল্পনা করে কী ঘটছে আর ঘটতে যাচ্ছে তলে তলে, তার একটি চিত্র দাঁড় করিয়েছেন।

তাঁর চিত্রটি এরকম, আমি কোনও এক কম পরিচিত দেশের কোনও কূটনীতিকের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছি। ঢাকা কর্তৃপক্ষ আমি কোথায় আছি না আছি সে ব্যাপারে নিশ্চিত। তবে আমাকে গ্রেফতার করে আন্তর্জাতিক মতামতকে জাগিয়ে তুলতে চান না। আমাকে ঘিরে যা হবে তা নিতান্তই দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারই হওয়ার কথা। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বিষয়টি একটি সাংঘাতিক মূল্যবান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একটি সরকারি চাকুরে, সাধারণ চিকিৎসক। আমাকে অনেকেই হালকা মেজাজের পর্নোগ্রাফি লেখিকা বলেই নাকি মনে করতেন, অন্তত এই রক্ষণশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটিই বাড়াবাড়ি রকম অন্য দিকে মোড় নিল। পশ্চিমা কূটনীতিকদের হিসেবে একটা ভুল রয়ে গেছে, এটাই এখন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে উদ্বেগের বিষয়। এই সমস্যা দূর করতে একটা সহজ ফর্মুলা উপস্থাপন করা হয়েছে, আমি নাকি আদালতে একজন আইনজীবী পাঠাবো,তিনি আদালতকে বলবেন যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হতে পারবো না কারণ আমার সামনে হত্যার হুমকি ঝুলছে। তখন আদালত আমার অনুপস্থিতিতেই জামিন মঞ্জুর করবে। আমার কাছে রয়েছে পাসপোর্ট, চুপিসারে আমি পারবো দেশ ত্যাগ করতে।

৪ আগস্ট আমার আদালতে যাওয়ার শেষ দিন। দিনটি পার হয়ে গেলে আদালত আমাকে পলাতক ঘোষণা করে দেবে। আমাকে পলাতক ঘোষণা করা হোক, তা সরকার চায় না। এই

না চাওয়াটির সম্মান আদালত এখন রক্ষা করতেও পারে। এভাবে কূটনীতিক জটিলতা এড়ানোর চেষ্টা চলতে পারে। সরকারের মতে বল এখন আমার কোর্টে। সরকারি নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য অনুযায়ী বিদেশে চলে গেলে আমি আমার নাগরিকত্ব এবং পাসপোর্ট বহাল রাখতে পারবো, ইচ্ছে মত দেশে ফিরে আসতে পারবো। আমি বিদেশে চলে গেলে মৌলবাদীরা ক্ষুব্ধ হবে। কারণ বাংলাদেশকে বৃহত্তর ইসলামিকরণের দাবি সোচ্চার করতে তারা আমাকে একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে। অবশ্য সরকার নাকি একে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে মনে করছে না। সরকার এখন আমাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে চায় না। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া আর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব ডড এ দুটো দিক সরকারকে এই ধরনের সিদ্ধান্তে এনেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি..।

দেশে কি ঘটছে জিজ্ঞেস করলে ঠ বলেন, দেশ আর দেশ নেই। ঠ তাঁর আপিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছেন। আমি আসার পর থেকে তিনি আর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। তাঁর বড় কন্যা ঠকে আজ একটি প্রশ্ন করেছে, কেন তাকে তার নিজের ঘরটিতে একবার ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, কেন বাড়ির অতিথিটির সঙ্গে, যে অতিথি তার ঘরটিতেই থাকছে, পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে না?

ঠ বলেছিলেন, তাঁর এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, খুব অসুস্থ, এসেছে ঢাকায় চিকিৎসা করতে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, রোগীর ঘরে যেন পারতপক্ষে কেউ না ঢোকে। জীবাণুমুক্ত পরিবেশ রক্ষা করার জন্যই এই আয়োজন। তা না হলে যে কারও শরীর থেকে জীবাণু উড়ে এসে রোগীর গা জুড়ে বসবে। এসব শুনে ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নিজেকে খুব পয়পরিস্কার করে তিনিই কেবল রোগীর ঘরে ঢুকবেন। বাড়ির অন্য কারওর রোগীর ঘরে ভিড় করার কোনও দরকারই নেই।

ঠর কন্যার বয়স ষোল। তার সন্দেহ যায় না। কেন সে উঁকি দিয়েও দূরসম্পর্কের আত্মীয়টিকে একটিবার দেখার অনুমতি পাচ্ছে না, সে কারণেই সন্দেহ।

ফস করে মেয়েটি বলে, নাকি ও ঘরে তসলিমা নাসরিন আছে?

ঠ চমকে ওঠেন। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাঁর।

তসলিমা নাসরিন?

হ্যাঁ তসলিমা নাসরিন। সে তো লুকিয়ে আছে। বলা যায় না, ওঘরে হয়ত তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছো!

ঠ মিথ্যে বলেন না সাধারণত। অনেক কষ্টে আগের গল্পটি তাঁকে তৈরি করতে হয়েছিল। ছোট মেয়ে গল্পটি গিললেও বড় মেয়ে গেলেনি। তারপরও তিনি ষোলর সন্দেহ উড়িয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয়ই নেই, দেখেননি আমাকে কোনওদিন, এ জাতীয় কিছু একটা বলে আপাতত বিপদ থেকে রক্ষা করলেন নিজেকে। কিন্তু বিপদের লালচক্ষু যখন সারাক্ষণই চোখের সামনে নৃত্য করতে থাকে, তখন একসময় করতেই হয় স্বরটিকে নরম, মাথাটিকে নোয়াতেই হয় কিছুটা। ঠ সারা সকাল ছটফট করেন, সারা দুপুর করেন, সারা বিকেল করে সন্ধেয় কন্যাটির কাছে জানতে চাইলেন আমার লেখা সে পড়েছে কি না। কন্যা বলল, পড়েছে এবং তার খুব ভাল লাগে আমার লেখা। তখনই ঠ সিদ্ধান্ত নেন মেয়েকে এ ঘরে এনে একবার আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। এতে তিনি লাল চক্ষুর

বিপদ থেকেও রক্ষা পাবেন। তাঁর বিশ্বাস তাঁর মেয়ে ইশকুলের কাউকে বলবে না এ কথা।

ঠ আমার কাছে জানতে চান আমি রাজি কিনা। আমার রাজি না হওয়ার কারণ নেই। তাঁর উৎসুক কন্যাটি নিয়ে ঠ এ ঘরে আসেন। সুন্দর মেয়ে। পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়া মেয়ে। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখে। বলি, 'তোমার ঘরটা ছেড়ে যেতে হল, নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে তোমার!'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, না।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল যে তার বিশ্বাস হচ্ছে না চোখের সামনে সে আমাকে দেখছে। অপ্রতিভ একটি হাসি আমার মুখে। কেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটি আমি। আমি ঠিক বুঝতে পারি না এই বিশ্বাস না হওয়ার ব্যাপারটি প্রিয় কোনও লেখককে চোখের সামনে দেখলে যেমন বিশ্বাস হয় না তেমন নাকি এক পলাতক আসামীকে দেখার উত্তেজনা! যার ফাঁসির জন্য দেশ জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে। যাকে লক্ষ লক্ষ লোক খুঁজছে খুন করার জন্য!

রাতে ঙ এলেন। ঠ সন্তর্পণে ঙকে নিয়ে ঢোকেন আমার ঘরে। ত্রস্ত উঠে বসি। ঙ ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলেন--- *আজও হল না।* আমার কণ্ঠে থিকথিক করছে উত্তেজনা।

---*কেন হল না?*

---*জানি না কেন হল না।*

---*কী হবে তাহলে?*

---*কী হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।*

---*জামিন হচ্ছে, হবে, এমন কথাই তো বলেছিলেন।*

---*এমনই তো আমি ভেবেছিলাম।*

---*সরকার নাকি আশ্বাস দিয়েছে..*

---*তা তো জানতাম যে দিয়েছে। এখন তো কিছুই স্পষ্ট হচ্ছে না আমার কাছে। কাউকেই এখন আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।*

---*নাকি দেরি হবে জামিন হতে?*

---*আর কত দেরি হবে? কিজানি, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।*

---*তাহলে ভরসা কি কিছু নেই?*

---*ভরসা কার ওপর করব? কিছুরই হয়ত বিশ্বাস নেই।*

ঙ চুপচাপ বসে থাকেন। এক কাপ চা খেতে চেয়েও চা আর খাবেন না জানিয়ে দেন। ঙর মুখের দিকে অসহায় তাকিয়ে থাকেন ঠ। তিনিও কিছু বলছেন না। ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই ঘরে। গভীর একটি কুয়োর মধ্যে আমাকে যেন কেউ ফেলে দিল। বিছানায় বসে আছি, হাঁটু ভাঁজ, হাঁটুতে থুতনি। ধীরে ধীরে চোখ দুটো বুজে আসে। আমার হাত পা শিথিল হতে থাকে।

তিন আগস্ট, বুধবার

আজও আমাকে তৈরি থাকতে বলা হয়। বলা হয় সকাল দশটার সময় আমাকে নিতে কেউ আসবে। কেউটি কে, তা আমাকে জানানো হয় না। ঠ সকালে নাস্তা নিয়ে এসেছেন। তাঁর চোখের নিচ ফোলা ফোলা, চুল উড়োখুড়ো। রাতে তিনি ঘুমোননি। রাতে তো আমিও ঘুমোই না। একের পর এক রাত যাচ্ছে ঘুমহীন, দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে আতঙ্কে। আমি এখন আর নিজের চেহারাটির দিকে তাকাই না। নিজের মুখটি অনেক দিন আমার কাছে আর চেনা মনে হয় না। ঠ অনেকক্ষণ বসে থেকেছেন পাশে। উৎকণ্ঠায় তাঁর ফর্সা মুখটি নীল নীল দেখায়। গা ধুয়ে মুছে কাফন পরিয়ে সুরমা আতর লাগিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার মত ঠ আমাকে সাজিয়ে দেন। কেবল একটি খাটিয়ে আসার অপেক্ষা। খাটিয়া এই এল বলে। সময় পাগলা ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে। সময় আবার কচ্ছপের মতও স্থির। আমি একবার চাইছি খাটিয়া আসুক, আরেকবার চাইছি না আসুক। ঘনঘন পেচ্ছাব পায়, গা ঘামে, ঘন ঘন জিভ গলা শুকিয়ে আসে।

সকাল এগারোটায় ঙ জানিয়ে দেন আজ হচ্ছে না। আজ কেন হচ্ছে না, তার কিছুই তিনি জানেন না। কালও যেন সকালে তৈরি থাকি, হয়ত কাল হবে। আজ আমাকে আদালতে যেতে হবে না, এটি আমাকে স্বস্তি দেয় আবার দেয়ও না। দুটোই আমার গা কাঁপিয়ে দেয়। আদালতে যাওয়ার এবং না যাওয়ার খবর।

এ ঘরে তিনবেলা খাবার আনছেন ঠ। খেতে ইচ্ছে করে না আমার। মনে হয় খেলেই বুঝি বমি হয়ে বেরিয়ে যাবে সব। ঠেলে সরিয়ে দিই খাবার। ঠ আমাকে দেশের অবস্থার কথা বলেন, কিছু আমার কানে ঢোকে, কিছু ঢোকে না, কিছু শুনে হাসি পায়, কিছু শুনে রাগ হয়, কিছু শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কিছু শুনে চোখ বুজি, কিছু নিয়ে ভাবি, কিছু এড়িয়ে যাই। ঠ বলেন এখন নিশ্চিতই সরকারের শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা। একদিকে বাইরের দেশগুলো চাপ দিচ্ছে আমাকে যেন দেশ থেকে বেরোবার সুযোগ করে দেওয়া হয়, আরেক দিকে ভোটের চিন্তা, ইসলামি ভোটগুলো হারবার ভয়। বিদেশে বাংলাদেশের ইমেজ খুব খারাপ হয়ে উঠছে, অনেক দেশ সাহায্য বন্ধ করে দেবার হুমকি দিচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগও কমে যাওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে। মৌলবাদবিরোধীরা রাস্তায় আর পেরে উঠছে না, এখন মামলা করছে। মামলা করার ধুম পড়েছে। গোলাম আযমের লোকেরা চট্টগ্রামে ছজনকে খুন করে শান্ত হয়নি, ছাত্রঐক্যের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করা শুরু করেছে। আর প্রগতিশীলরা বায়তুল মোকাররমের খতিবের বিচার দাবি করেছে, মামলাও করেছে তাঁর বিরুদ্ধে, কারণ লং মার্চের মহাসমাবেশে তিনি বলেছিলেন *একদল লোক গাদ্দারি করে পাকিস্তান ভেঙেছে।* গোলাম আযমের বিরুদ্ধেও মামলা করার চেষ্টা চলবে মনে হচ্ছে। *আদম সৃষ্টির হাকীকাত* নামে গোলাম আযম একটি বই লিখেছেন, ওই বইতে

লেখা, *সুরা আল বাকারার প্রথম চারটি রুকু গোটা কোরানের প্রথমেই দেয়া উচিত ছিল।* গোলাম আযম খোদার ওপর খোদগারি করছে বলে এখন মামলা করা হবে। চরমোনাইয়ের পীর এক সভায় বলেছিলেন, *যারা নিজেদের মৌলবাদী মনে করে না, তারা জারজ মুসলমান,* এ নিয়ে বরিশালে এক লোক পীরের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, বলেছে পীরের কথায় তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।

ঠ আমাকে বলেন না, কিন্তু ঠর কণ্ঠস্বর থেকে রঙিন রঙিন অনেকগুলো কাচ বেরিয়ে আসে, কাচের মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখতে থাকিড়ডযুদ্ধ লেগেছে দু দলে। আমি মধ্যিখানে। আমার পক্ষে দুদলের কেউ নেই, আমি একা। সকলের তরবারির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত আমি, একা আমি, টুকরো টুকরো হচ্ছি আমি, একা আমি।

সারারাত আমি কিন্তু বসে থাকি। শুতে পারি না। শুলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়। সারারাত জেগে বসে থাকি। একা একা রাতভর রাতের কান্না শুনি বসে বসে।

চার আগস্ট, বৃহস্পতিবার

কাল রাতেই ঠ আমাকে জিজ্ঞেস করে গেছেন সকালে নাস্তা কি খেতে চাই। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলাম, *যা হয় তাই।* ঠ সকালে ট্রেতে করে চা তো আছেই, ঘি এ ভাজা পরোটা, মাংস, ডিম ভাজা, ফল ইত্যাদি নানা কিছু নিয়ে এলেন। আমাকে নটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে বললেন। চা ছাড়া আর কিছু আমার খেতে ইচ্ছে হয় না। একটি শাড়ি বের করে দিলেন ঠ। খেয়ে দেয়ে গোসল করে শাড়িটি পরে নিতে বললেন। আমি গোসল করে শাড়ি পরে নিই। একটি কালো চশমা দেন আমাকে পরতে। তাঁর নিজের একটি ওড়না আমার মাথায় পরিয়ে দেন। ঘড়ির দিকে তাকাই, ঘড়ির কাঁটা এত দ্রুত আগে আর চলেনি। আমার বুক কাঁপে। কাঁপনের শব্দ শুনি । ফাঁসিকাঠে ঝোলার আগে বুঝি এই হয় আসামীর। ওড়না-মাথার আমাকে কুৎসিত দেখতে লাগে। কিন্তু বোধবুদ্ধিহীন আমি মূর্তির মত নিশ্চুপ। ওড়নায় মাথা ঢাকার বিরুদ্ধে, এসব অর্থহীন পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে লিখছি আমি, মেয়েদের মনে মন্ত্র দিচ্ছি নির্যাতনের প্রতীকটিকে মাথা পেতে বরণ না করার জন্য, অথচ আজ আমিই এটিকে মাথায় তুলে নিচ্ছি, আজ আমাকেই পরতে হচ্ছে ওড়না। এবার আর লুকিয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাওয়ার জন্য নয়। নিজের পরিচয়খানি ওড়নায় আড়াল করে নয়। পর্দাবিরোধী তসলিমা আজ পর্দানশীন নারী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে যাবে, জনসমক্ষে যাবে, নিজের তসলিমা পরিচয়টি নিয়েই সে যাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বলি, তুমি কি তসলিমা? না। আমাকে আমিই চিনতে পারি না। মুখখানা এতদিনে শুকিয়ে লম্বাটে লাগছে। চোখদুটোর

তলায় কালি পড়েছে। কালো চশমায় চোখ ঢাকা পড়লে নিজেকে আরও অচেনা লাগে। অচেনা লাগে লাগুক, তবু তো জানি যে এ আমি। এ আমি বলেই আমার রাগ হয়। এ আমি কী করছি! এ কি আমি করছি! আমি কি নিজেকে লুকোচ্ছি এভাবে! না। আমি কিছুই করছি না। তসলিমা মরে গেছে। তসলিমার শরীরে এ এক শক্তিহীন সাহসহীন বোধহীন মেয়েমানুষ কেবল। এ আমি অন্য কেউ। এই অন্য কেউটিকে আমার শরীরে ধারণ করতে আমার ঘৃণা হয়। যন্ত্রণার মত একটি অনুভব আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে অস্থির করে মারে। একবার আমি আয়নার সামনে যাই, আরেকবার বিছানায় এসে বসি। দাঁড়িয়ে থাকি মাঝপথে দরজা ধরে, ঘরময় হাঁটি, শ্বাস কষ্ট অনুভব করে জানালার কাছে যাই, জানালার পর্দা সরিয়ে ইচ্ছে করে হাট করে জানালা খুলে শ্বাস নিই। কিন্তু পারি না। হাত শক্ত করে চেপে রাখি হাতে। এ হাত কি আমার হাত? না এ হাত আমার হাত নয়। এ হাত সেই অন্য কেউটির হাত।

মনে মনে আজও আমি এই তারিখটি নাকচের আশঙ্কা নয় আশা করেছিলাম, কিন্তু ঙ ফোনে জানিয়ে দিলেন এ বাড়ির দরজায় ঠিক সোয়া দশটার সময় একটি গাড়ি এসে থামবে, ছোটদা থাকবেন গাড়িতে, খুব দ্রুত গাড়ি চলবে, ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে গাড়িটিকে গিয়ে পৌঁছতে হবে হাইকোর্টে। ঠর কাছে খবরটি শুনে আমার বুক ধ্বক করে ওঠে। শরীর শীতার্ত হতে থাকে শুনে যে সত্যি সত্যি আজ ঘটতে যাচ্ছে ঘটনা। আমাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ঠ। বুঝি, তিনিও বুঝতে পারছেন আজ আমার মৃত্যু হতে পারে, আজ আমি নিহত হতে পারি পথে বা আদালতে কোনও আততায়ীর গুলিতে।অন্য কেউ এ সময় হলে আল্লাহর নাম নিত, আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম লা তা খুজুহু.., হে আল্লাহ আমাকে বালা মুসিবত থেকে রক্ষা কর এসব বলত। আমার তো নাম নেবার কোনও আল্লাহ নেই, ভগবান নেই, নিজের নামটিও অনেকটা ভুলে বসে আছি। আগের মতই আমি স্তব্ধ বসে থাকি। দশটা বাজার আগে আগে ঙ জানান, সোয়া দশটা নয়, সাড়ে এগারোটা। এরপর সাড়ে এগারো বেজে যাবার পর আরেকবার ফোন ঙর, সাড়ে এগারোয় হচ্ছে না, বারোটা চল্লিশে। বারোটা চল্লিশ অবদি ঠায় বসে থেকে মৃত্যুর নানা রং দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

ঠর বাড়ির দরজার সামনে সাদা গাড়ি এসে থামে বারোটা তেতাল্লিশে। আমাকে দরজার কাছে নিয়ে যান ঠ। দ্রুত গাড়ির দিকে এগোলেন তিনি, আমি পেছনে। মাথা ঢাকা, মুখ ঠাকা, চোখ ঢাকা আমি। তারপরও বাইরের হঠাৎ আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মনে হয় চোখ বুঝি অন্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘ দুমাস পর দিনের আলো চোখে পড়ছে আমার। চোখ পারি না খুলে রাখতে, অনেকটা অন্ধের মত, জন্মান্ধের মত আমাকে শাদা আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা শাদা গাড়ির দিকে যেতে হয়। আমাকে আড়াল করে এগোন ঠ, আশেপাশের বাড়ির জানালা থেকে কেউ এদিকে চোখ ফেললে যেন চিনতে না পারে যে এ আমি। ছোটদা চালকের আসনে, পাশে গীতা। পেছনে মিলন। পেছনের আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ছোটদার কণ্ঠস্বর শুনি, শুয়ে পড়। মুখ মাথা ঢাকা, চোখ বোজা, শুয়ে পড়ি। ব্যস্ত সড়কে গাড়ি চলতে থাকে। গাড়ি কোথায় চলছে তার কিছুই বুঝি না। গাড়ি দ্রুত চলে, গাড়ির পেছন গাড়ি চলে।

ভেঁপুর শব্দে কান ফেটে যায়। মনে হয় যেন এক্ষুনি দুর্ঘটনা ঘটবে, মনে হয় এই বুঝি কেউ গাড়িটিকে থামাবে। ছোটদা ট্রাফিকের লাল বাতি মানছেন না টের পাই একটু পর পর গীতার ভয়ার্ত স্বর শুনি, 'কামাল কি করতাছো! ধাককা লাগবো, গাড়ি আস্তে চালাও।' গাড়িটি যে কেউ থামিয়ে ফেলতে পারে, পুলিশ পারে, কোনও দাড়িটুপির দল পারে। যদি থামায় গাড়িটিকে? গাড়িটি আমার, এ গাড়ির নম্বর ছাপা হয়েছে পত্রিকায় বহুবার। কেউ নিশ্চয়ই মনে রেখেছে নম্বর! গাড়ির গা ঘেঁসে যে রিক্সাগুলো যাচ্ছে সেসবের আরোহীরা গাড়ির জানালায় চোখ ফেললেই দেখবে কুখ্যাত তসলিমা শুয়ে আছে গাড়ির পেটে। বাস থেকে, ট্রাক থেকে, জিপ থেকে অনায়াসে দেখা যায়, দেখে অনুমান করে নেওয়া যায় পেটের মানুষটিকে। মৃত্যুর নীল রংটি ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! মৃত্যু কোথায় চাও, পথে না আদালতে! মনে মনে বলি, আদালতে। অন্তত আদালতে যদি কোনও সুযোগ থাকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার।

আদালতের ভেতরে গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ কথা ছিল পেছন দিক থেকে দোতলায় আদালত কক্ষে ওঠার যে দরজা, ঠিক সেটির সামনে ছোটদা গাড়ি থামাবেন। কিন্তু পুলিশ এই গাড়িটি থামিয়ে দেওয়ায় কোনও উপায় না দেখে গাড়ি ঘুরিয়ে যেখান থেকে আদালত অবদি কম হাঁটা পথ সেখানে থামানো হল। এর চেয়ে সামনে গাড়ি যাবে না আর। ছোটদা বিড়বিড় করে বলছেন, 'কোর্টরুমে ঢোকার আগ পর্যন্ত কেউ যেন চিনতে না পারে।' এখন আমাকে বেরোতে হবে। মুখ তুলতে হবে। আমাকে হাঁটতে হবে। ছোটদা, মিলন আর গীতা দ্রুত আমাকে আড়াল করে আদালত কক্ষের দিকে যেতে থাকেন। খুব দ্রুত। এত দ্রুত আমি কখনও হাঁটিনি আগে। ওড়নার ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, দেখি আদালত প্রাঙ্গণ ভরে আছে পুলিশে, ট্রাক ট্রাক পুলিশ আর হাজার হাজার মানুষ। টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায় যেমন গিজগিজে ভিড় হয়, তেমন ভিড়। পুলিশ দেখে আমার ভয় হয় না, ভয় হয় মানুষ দেখে। শুনেছিলাম আজ আমার জামিনের আবেদন খুব গোপনে সারা হবে কিন্তু স্পষ্টতই সে লক্ষণ নেই। হাজার মানুষের ভিড় আদালতের মাঠেই। দোতলায় নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে যাওয়ার করিডোরে এত ভিড় যে হাঁটার কোনও উপায় নেই। পর্দানশীন মহিলা যাচ্ছে কোনও কক্ষে, সম্ভবত করিডোরের লোকেরা ভেবেছে যখন আমাকে নেওয়া হচ্ছিল কক্ষের দিকে। খানিকটা সরে জায়গা করে দেয়। কক্ষটিতে এক সুতো পরিমাণ জায়গা নেই। ঠেলে ধাকিকয়ে আমাকে ঢোকানো হল। কালো গাউন পরা ব্যারিস্টাররা বসে আছেন বেঞ্চে। জামিনের আবেদনে এত লোক থাকে না কোনও কক্ষে। মনে হয় এই কক্ষটি জামিনের জন্য নয়, কোনও জটিল মামলার ফাঁসির রায়ের জন্য। সারা হোসেন আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বসালেন তাঁর পাশে। কানে কানে বললেন যে তাঁর বাবা দীর্ঘক্ষণ জামিনের পক্ষে বক্তব্য দিয়ে এইমাত্র চলে গেলেন, বড় বোনের বাড়িতে গেলেন, বোন তাঁর মারা গেছেন আজ। কক্ষে আমীরুল ইসলাম আমার উকিল হয়ে কথা বলছেন। সারা হোসেনকে দেখে, ডঃ কামাল হোসেনের বাকি সব সহকারীদের মুখে চেয়ে বুকের ধুকপুক খানিকটা

থামে আমার। কক্ষের বেঞ্চগুলো সব ভরে গেছে, বেঞ্চগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকশ কালো গাউন। ক আছেন বসে বেঞ্চে। কর পরনেও কালো গাউন। চোখাচোখি হলে একটু হাসলেন। আমার পেছনের বেঞ্চটি থেকে একজন ব্যারিস্টার বললেন *আমরা আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে এসেছি, আপনার পক্ষের লোক, ভয় নেই।* এই ভয় নেই বাক্যটি আমার বুকের ধুকপুক আরও খানিক কমালো। *নাসরিন, নাসরিন,* পেছন থেকে দাদার কণ্ঠস্বর, *মাথার কাপড় ফালা, মাথার কাপড় ফালা।* পেছন ফিরে দাদাকে ভিড়ের মধ্যে এক পলক দেখি। ওই এক পলক দেখেই স্বস্তি হয় আমার, কিন্তু মাথার কাপড় আমি ফেলে দিই না। হঠাৎ জানালায় চোখ পড়তেই দেখি জানালার ওপারে শত শত অচেনা মানুষের মুখ, মুখগুলো সব আমার দিকে, চোখগুলো, নাকগুলো, ঠোঁটগুলো, সব ভীষণ-ভাবে বিকট-ভাবে আমার দিকে। লোকগুলো আদলতের কোনও বিচারক নয়, উকিল নয়। লোকগুলো বাইরের। কারা এরা, কি উদ্দেশ্যে এসেছে। এদের মধ্যে কি নেই ইসলামী ঐক্যজোটের লোক! সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের লোক! নিশ্চয়ই আছে। কদিন থেকে প্রতিদিন এইসব খুনীগুলো আদালতে ভিড় করছে আমি আসবো এই আশায়। এদের কারও পকেটে নিশ্চয় আছে কোনও পিস্তল, কারও হাতে নিশ্চয়ই কক্ষটি ধ্বংস করে দেওয়ার বোমা, যে কোনও সময় আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বে। আমীরুল ইসলাম আমাকে তাঁর পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন, *মহামান্য আদালত, আসামী হাজির।* আসামিকে মাথা নত করে আদালতকে সম্মান দেখাতে বলা হয়। আসামী সম্মান দেখাতে ভুলে যায়, আসামীর চোখ বার বার চলে যায় জানালায়, জানালার ওপাশের জটলায়, ভীষণ ভিড়ে, চিৎকারে। আগে আত্মসমর্পন করেননি কেন? প্রশ্নটি আসামির দিকে ছুঁড়ে দেন বিচারক।

এতদিন আত্মসমর্পন করিনি কেন, আমি উত্তর দেওয়ার আগে আমীরুল ইসলাম বলেন, আসামী নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছে।

আসামী নিজের মুখে বলে না কেন সে কথা?

আসামী মৃদুকণ্ঠে বলে সে কথা। কিন্তু কণ্ঠ এমনই মৃদু এমনই মৃত যে আসামীর স্বর কেবল আসামীই শুনতে পায়।

এরপর এক তাড়া কাগজ দেওয়া হল বিচারকের সামনে। ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম বলে যাচ্ছেন আমার পক্ষ থেকে, যা বলার, যা বলতে হয়। আমার চোখ বারবার বাইরের ভিড়ে, কান চিৎকারে। মনে হতে থাকে বন্ধ দরজা ভেঙে মানুষের ঢল আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এক্ষুনি। আমাকে ছিঁড়ে টুকরো করবে এরা। এ ঘরে জামিনের শুনানি অনেকক্ষণ থেকে চলছে, কেবল আমার সশরীর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল, তাও সারা। তারপরও আরও দেরি হচ্ছে, জামিনের দশ হাজার টাকার নথিপত্র নিয়েই নাকি দেরি। জানালায় ততক্ষণে যেন পুরো ঢাকা শহর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এবার মহামান্য আদালতের কাছে আবদার, আসামীকে আদালত কক্ষ থেকে তার গন্তব্য অবধি নিরাপত্তা দেওয়া হোক, এবং তার বাড়িতেও পুলিশের ব্যবস্থা করা হোক। মহামান্য আদালত নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা করার ব্যাপারে রাজি হলেন। পেছনে গুঞ্জন, সামনে গুঞ্জন। গুঞ্জন বিচারকের বিচার নিয়ে নয়। গুঞ্জন

বাইরের ভিড় নিয়ে। যা করার তাড়াতাড়ি কর। ভিড় বাড়ছে। ভয়ঙ্কর ভিড়। আততায়ীর ভিড়।

কী করে এখন আমাকে বের করা হবে আদালত কক্ষ থেকে! কেউ জানে না কি করে। সকলের কপাল ধীরে ধীরে কুঁচকে যাচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে হঠাৎ কেউ হাত ধরে কেউ সামনের দিকে টান দিল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, ভিড় কমুক। সমস্বরে অনেকে বলে উঠল, ভিড় কমবে না, ভিড় আরও বাড়বে। জলদি বেরোতে হবে। একটুও দেরি নয়। এক্ষুনি। ভিড় বাড়ছে। বাইরে অবস্থা ভাল নয়। আমাকে টেনে দরজার বাইরে বের করা হল। এক সুতো জায়গা নেই সামনে। কোথায় এগোবো! পুলিশেরা জায়গা করতে চাইছেন, পারছেন না। অনেকগুলো খাকি পোশাকের পুলিশ আমার সামনে, আমার পেছনেও। আমার বাঁদিকে আমীরুল্ল ইসলাম, ডান দিকে নীল পোশাকের পুলিশ অফিসার, দুজনেই শক্ত করে ধরে আছেন আমার দুটো বাহু। আমার দুহাত আঁকড়ে আছে দুজনকে। পেছনে দাদা, ছোটদা, গীতা, মিলন, ক। সবাই আমাকে শক্ত করে ধরে আছে। কোনও ধাককায় যেন আমি পিছলে না যাই কারও হাত থেকে। সামনে আইন সালিশ কেন্দ্রের কজন উকিল। মাঝখানে আমি। আমাকে ঘিরে বৃত্তটি ক্রমশ বড় হচ্ছে। কিন্তু আমরা কেউ সামান্যও নড়তে পারছি না। এক পা নড়তে পারছি না, এক সুতো না। হাজার মানুষের ভিড়। করিডোর উপচে পড়ছে মানুষে। মানুষের ঘাড়ের ওপর মানুষ। এই ভিড়ের মধ্যে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পুলিশ চিৎকার করছে লোক সরাতে। কোনও লোক সরছে না। জোরে ধাককা দিয়ে ভিড়ের মধ্যে অনেকে আমার চারপাশের আগল ভাঙতে চাইছে। একবার ভেঙে গেলেই হল, আমাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে আততায়ীর দল। আমাকে দুহাতে সাঁড়াশির মত করে ধরে আছেন আমীরুল্ল ইসলাম। পুলিশ অফিসার ঘামছেন। করিডোরে চিড়েচ্যাপ্টা হয়েও দাঁড়াবার জায়গা নেই বলে রেলিংএ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে মানুষ। আমার সামনের লোকগুলো সামনে জোরে ধাককা দিয়েও লোক সরাতে পারছে না এক তিলও। বিস্ফোরণের ঠিক আগের মুহূর্ত প্রতিটি মুহূর্তই। পেছনে চলে যাবো কি না চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি। পুলিশ অফিসার চেঁচিয়ে উত্তর দেন, না। কোত্থেকে যেন বিকট সব চিৎকার ভেসে আসছে। আমরা আটকা পড়ে গেছি করিডোরে। আমাদের সামনে যাওয়ার উপায় নেই, পেছনে হঠারও কোনও উপায় নেই। যে কোনও কিছুই এখন ঘটতে পারে, যে কোনও ভয়াবহ দুর্ঘটনা এখনই ঘটবে। যে কেউ আমার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে। অন্যরকম গন্ধ পাই বাতাসে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ভিড় আরও বাড়ছে, ভিড়ের মধ্যে ভিড় বাড়ছে। মানুষের মাথার ওপর মানুষ উঠছে। পুলিশ দিশেহারা। আমরা বিশ্রি রকম বন্দী।

চারদিকে বিকট বিকট শব্দ। সব শব্দ ছাপিয়ে বুকের ধুকপুক শব্দ শুধু। মৃত্যুর রং দেখছি। গাঢ় নীল রং টি ধীরে ধীরে কালো হয়ে উঠছে। বিবিসির ইংরেজ সাংবাদিক রেলিংএর ওপর থেকে তাঁর লম্বা মাইক্রোফোনটি আমার মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছেন। রেলিং এ দাঁড়ানো সাংবাদিকরা চেঁচিয়ে প্রশ্ন করছেন, জামিন হয়েছে কি

না, আমি কেমন বোধ করছি, এখন কী ভাবছি, আমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি। কাণ্ডজ্ঞানহীন সাংবাদিকরা সামান্য বুঝতে চেষ্টা করেন না যে কারও কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবার মত শারীরিক মানসিক কোনও অবস্থাই আমার নেই। সাংবাদিকদের জন্য অবশ্য সবই মজার বিষয়, এই যে আমি মৃত্যুর দুহাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি, এ নিয়ে তাঁরা কেউ কোনও দুশ্চিন্তা করছেন না, এখন যদি আমার পেটে কেউ ছুরি বসায়, তা দেখে তাঁরা অখুশি হবেন না, বরং মহা আনন্দে বর্ণনা করবেন আমার খুন হওয়ার আদি থেকে অন্ত, এর *নিউজ ভ্যালু* নিয়ে মেতে উঠবেন। হঠাৎ পলকের মধ্যে দৃশ্য পাল্টে যায়। সামনের পুলিশগুলো শক্ত শক্ত লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে। পিটিয়ে সরাচ্ছে লোক। ধাওয়া খেয়ে কেউ না কেউ সামান্য হলেও সরে যায়। এই করে আমার যাওয়ার জায়গা জোটে। নীল পুলিশটি আমাকে বললেন সামনে যেতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ভিড় কমুক। পুলিশ ধমকে উঠলেন, ভিড় কমবে না, বাড়বে আরও। আচমকা পুলিশ অফিসারটি আমাকে দৌড় দিতে বলে নিজে দৌড়োতে লাগলেন, আমাকে টেনে নিতে লাগলেন সামনের দিকে। সামনের পুলিশগুলোর কাছে ইঙ্গিতে তাই হয়ত বলা হয়েছে। পুলিশগুলো বেধড়ক লাঠি চালিয়ে সবাই মিলে ধাককা দেবে সামনের দিকে, এই করেই যদি এগোনো যায়। তাই হল। সবাই দৌড়োচ্ছে, বৃত্তের সবাই। আমীরুল ইসলাম, দাদা, ছোটদা, মিলন, ক। আইন ও সালিশ কেন্দ্র, পুলিশ। দৌড় আমাকে দিতে হয়নি। সকলের দৌড় ফুঁসে ওঠা সাগরের উত্তাল জোয়ারের মত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সামনে করিডোর শেষ হতেই সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে। যখন দাঁড়িয়েছি নিচে, খালি পা আমার, চটিজোড়া কখন ভিড়ে খসে গেছে জানি না, শাড়ি খুলে খসে পড়ছে। চিৎকার বাড়ছে চারদিকে। পুলিশের, অচেনা মানুষের, চেনা মানুষেরও। টুপিমাথার লোকগুলো পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ছুটে আসতে চাইছে এদিকে, পুলিশের চেয়ে টুপিমাথার সংখ্যা অনেক বেশি। চিৎকার চারদিকে, বিষম বিকট চিৎকার। অস্থিরতা আমার সারা শরীরে, এই বুঝি খুলি উড়ে যাবে, আর বুঝি একটি মুহূর্ত। শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে কণ্ঠদেশ। আমি কথা বলতে চাইছি, পারছি না। ফ্যাসফ্যাস একটি শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে। গলার ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছে। ছোটদা দৌড়ে গেলেন গাড়ি আনতে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এল, কিন্তু কয়েক মিনিটকে কেবল আমার নয়, আমাকে ঘিরে যাঁরাই ছিলেন, সবারই মনে হল যেন ঘন্টা পার করে গাড়ি এনেছেন। দ্রুত আমাকে ঠেলে দেওয়া হল গাড়ির ভেতরে, আমার ডানে বামে দাদা, মিলন আর ক। গাড়ি দ্রুত আদালত প্রাঙ্গণ পেরোচ্ছে যখন, পেছনে পাথর ছুঁড়ছে চিৎকার করা লোকেরা। গাড়ির লেজে ঠোককর খাচ্ছে পাথরে বাঁধা ঘৃণাগুলো। সামনে পুলিশের গাড়ি, পেছনে পুলিশের ট্রাক। কেবল বাড়িতেই নয়, একেবারে ঘর অবদি পৌঁছে দিয়ে গেল নীল পোশাকের লোক। ঘর! সেই ঘর!

আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছেন মা। সে যে কি বিষম কান্না! কে এত কাঁদতে পারে মা ছাড়া! মার এলো চুল, এলো শাড়ি, শরীর শুকিয়ে অর্ধেক, আমার আর কত, মার চোখের নিচে অনেক বেশি কালি, ফুলে ঢোল হয়ে আছে কান্না -চোখ। চোখের জল নাকের জল গড়াচ্ছে মার গাল বেয়ে চিবুক বেয়ে বুকে। মাকে বলছি,

কাঁদো কেন, আমি তো ফিইরা আসছি। মা তবু কাঁদেন। আমার ঘরে ফিরে আসার আনন্দে কাঁদেন মা, দীর্ঘকাল আমার না থাকার জন্য কাঁদেন, আমার শুকিয়ে যাওয়া শরীরটির জন্য কাঁদেন, আমার মলিন মুখটির জন্য কাঁদেন, দুমাস আমি কষ্টে থেকেছি ভয়ে থেকেছি বলে কাঁদেন। মা আমার জন্য ভয়ে নির্ভয়ে কাঁদেন। আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কাঁদেন। যেন হাজার বছর পর হারিয়ে যাওয়া কন্যাকে ফিরে পেয়েছেন মা, যেন হারিয়ে যাওয়া বড় আপন কেউ হঠাৎ ফিরেছে বাড়িতে। মার কান্না শেষ হয় না, আমার সারা শরীরে হাত বুলোনো শেষ হয় না মার। আমি আমার লেখার ঘরে ধপাস করে বসে পড়েছি। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। মা কেঁদেই চলেছেন। কান্নার দমকে তিনি কোনও কথা বলতে পারছেন না। এতদিন পর ঘর ভরা আত্মীয় স্বজনের মধ্যিখানে আমি। যে পরিবেশে কোনওদিন ফিরতে পারবো আমার বিশ্বাস হয় নি। মৃত্যুর গুহা থেকে এভাবে বেঁচে ফিরব ভাবিনি, কেবল আমি কেন আমার আশেপাশে যারা ছিল, কেউ ভাবেনি, বড় করুণায় আমার শুকনো মুখটি দেখেছে। যেন স্বপ্নের মত ঘটে গেল পুরো ব্যাপারটি। আমার এখনও বিশ্বাস হয় না আমি সত্যিই আমার বাড়িতে বসে আছি। যতই নিরাপদে আমি এখন থাকি না কেন, আমি কিন্তু হাঁপাচ্ছি। আদালতের করিডোরের ভয় এত তীব্র ছিল যে সেটি দূর হতে অনেক সময় নেয়। ঘন ঘন পানি খাই কাঠ হয়ে থাকা গলাটি ভেজাতে। ক আমার পাশে এসে নিঃশব্দে বসেন। বলেন, আপনার পাসপোর্টটা দিন।
পাসপোর্ট খুঁজে বের করে দিই। ক বলেন, কোনও সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দেবেন না। যে সাংবাদিকই আসবে, যেন বাড়ি থেকে বলে দেওয়া হয় আপনি এ বাড়িতে নেই।
মাথা নেড়ে আচ্ছা বলি। ক চলে গেলেন।

নিচে বাড়ির নিরাপত্তা প্রহরী, তার ওপর বাড়ি ঘিরে পুলিশ পাহারা, ঘরের দরজায় লম্বা লম্বা বন্দুক হাতে নিয়ে পুলিশ বসে গেছে। একইসঙ্গে ফোন বাজছে, ইন্টারকম বাজছে। নিচে সাংবাদিকরা ভিড় করে আছে। পাইকারি ভাবে সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে আদালত থেকে তসলিমা এ বাড়িতে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য এসেছিল বটে, কিন্তু চলে গেছে আবার, কোথায় গেছে তা এ বাড়ির কেউ জানে না। এটাই বিশ্বাসযোগ্য কথা। তারপরও সাংবাদিকরা নিচে অপেক্ষা করছেন, কোনও রকম ফাঁক ফোকর দিয়ে ঢোকা যায় কি না দেখছেন অথবা কোনও রকম সংবাদ যোগাড় করা যায় কি না বাড়ির মানুষের কাছ থেকে অথবা পুলিশের কাছ থেকে। পাইকারির মধ্যে ফরিদ হোসেনও পড়েছেন। ফরিদ হোসেন অবশ্য বুদ্ধি করে বাড়ির দরজা অবদি আসতে পেরেছেন। তিনি আমার বাড়ির নাম করে ভেতরে ঢোকেননি, ঢুকেছেন ইস্টার্নপয়েন্টের দু নম্বর বাড়ির পাঁচতলায় তাঁর বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছেন বলে, তারপর দুনম্বর বাড়িতে তিনি গেছেন বটে, তবে নিজেকে আড়াল করে এক নম্বর বাড়ির নতলায় এসে চার নম্বর দরজায় টোকা দিয়েছেন। ফরিদকে দরজা থেকে বলে দেওয়া হল আমি বাড়ি নেই। দরজা খোলার জন্য তিনি হেন কথার আবদার নেই যে করেননি। না, দরজা খোলা হয়নি। শেষমেষ দরজার তল

দিয়ে দিয়ে গেলেন একটি প্রশ্নপত্র। মাত্র কটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুরোধ করেছে টাইম ম্যাগাজিন। টাইমের বিদেশী সাংবাদিক নিজে এসেছেন, আমার কাছে তাঁর আকুল প্রার্থনা যেন জবাব গুলো দিই। ফরিদকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই আমার, সাংবাদিকদের মধ্যে ফরিদই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। অনেকটা তিনি ঘরের লোকের মত। ফরিদ হোসেন এ বাড়িতে অনেক এসেছেন, তিনি জানেন এ বাড়ির পরিবেশ, নিশ্চয় তিনি অনুমান করেছেন যে যদি কোথাও থাকি আমি, এ বাড়িতেই আছি। আরেক দফা সুযোগ নিয়ে তিনি বিকেলে আবার যখন এলেন পাভেলকে নিয়ে, ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র তাঁকে দেওয়া হয়। ছাড়পত্র দেওয়া হয় ফরিদ সাংবাদিক বলে নয়। ফরিদ ফরিদ বলে, বন্ধু বলে। পাভেল কিছু ছবি তুলে নিলেন দ্রুত, আমি লক্ষ্য করার আগেই। প্রতিশ্রুতি দিলেন দুজনই, কোনও প্রাণীকে তাঁরা জানাবেন না আমি যে এ বাড়িতে আছি। ফরিদকে বললাম যে আমি কোনও সাক্ষাৎকার দেব না। কোথাও কোনও সাক্ষাৎকার দিচ্ছি না, কেবল বিবিসি সিএনএনকেই নয়, বিদেশি দেশি যত সাংবাদিক আছেন, সবাইকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাইম ম্যাগাজিন হোক আর যে ম্যাগাজিনই হোক, আমি মুখ খুলব না বলে দিই কিন্তু ফরিদের মুহূর্মহূ অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয় আমাকে, ঢেঁকি গেলা মানে রাজি হওয়া যে তাঁর প্রশ্নের উত্তর গুলো অন্তত লিখে হলেও আমি দেব। আজ তো নয়ই। কাল? দেখা যাক। ঢেকি গেলার পুরস্কার দেয় ফরিদ ফেরার পথে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলে যে আর যেখানেই থাকি আমি অন্তত এ বাড়িতে নেই। পরদিন সব পত্রিকায় আদালতের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শেষে লেখা হয়, আমি আদালত থেকে বাড়ি ফিরে মার সঙ্গে দেখা করেই আবার চলে গেছি কোনও গোপন ঠিকানায় আত্মগোপন করতে।

মা আমাকে খাবার টেবিলে বসিয়ে মাথার ওপর পাখা ছেড়ে দিয়ে মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দেন। এক হাতে ভাত খাওয়ান, আরেক হাতে আঁচল টেনে চোখের পানি মোছেন। বেশি খাবার আমার পেটে ঢোকে না। মুখ সরিয়ে নিই। বাড়ির সবার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু পারি না। শরীর দুর্বল। শরীর নেতিয়ে পড়ে। হাঁটতে পারি না এ ঘর থেকে ও ঘর। শুয়ে পড়ি বিছানায়। শরীর ভরা ক্লান্তি, ক্লান্তি মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, আমাকে পাড়ায় না।

রাত এগারোটার দিকে বাড়িতে জ,ঝ,ঠ আর ঙ আসেন। কোনও এক রেস্তোরাঁয় আজকের জামিন পাওয়ার আনন্দের দিনটি উৎযাপন করে অনেকটা যুদ্ধজয়ের উৎসবে যোগ দিয়ে আমাকে দেখতে এসেছেন। রেস্তোরাঁয় ক ছিলেন। কিন্তু ক এই রাতে আর আসতে পারেননি আমার কাছে, বলেছেন আগামীকাল বা পরশু একবার আসবেন। এঁরা আমার পাশে ছিলেন আমার অন্ধকার সময়গুলোয়। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছে একটি মানুষকে হত্যা করতে, যখন বন্ধুরাও মুখ ফিরিয়ে রেখেছে ভয়ে, তখন এঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, গভীর গোপন নিরাপত্তা দিয়েছেন। এঁরা আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। কী হন এঁরা আমার! আমার ভাইও নন, বোনও নন। অথচ এঁরাই আমার পরম আত্মীয়, এঁরাই আমার

সত্যিকার বন্ধু। মৌলবাদীর দাবি আর সরকারের অনমনীয় মতের বিরুদ্ধে আজকের এই বিজয় এঁরা নিজেদের বিজয় হিসেবে মনে করছেন। আমার পক্ষে বাইরের রেস্তোরাঁয় কোনও উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব হলে আমিও যোগ দিতে পারতাম। আমিও আনন্দ করতে পারতাম! কিন্তু আনন্দ কোথায় আমার মনে! জামিন পেয়েছি, কিন্তু সামনে আমার অনিশ্চিত একটি ভবিষ্যত। এঁরা সবাই জানেন আমার সামনের অনিশ্চয়তার কথা, কিন্তু আপাতত সব ভুলে আমাকে হাসতে বলছেন। অদ্ভুত একটি হাসি ঝুলে থাকে আমার ঠোঁটে। এঁদের মুখোমুখি সোফায় বসেছিলাম, সোফা ছেড়ে দিয়ে এঁদের খুব কাছে, পায়ের কাছে, ফরাসের ওপর বসি এসে। খুব ঘন হয়ে বসার অভ্যেস গত দুমাসে হয়েছে বলেই হয়ত। আমার কণ্ঠস্বর লঘুতে, নিচুতে, মৃদুতে। গত দুমাসে এভাবে কথা বলার অভ্যেস হয়েছে বলেই বোধহয়। আমি ক্লান্ত, যত না শরীরে, তারও চেয়ে বেশি মনে। এই মনের ওপর খুব বড় তুফান বয়ে গেছে, মনের দালানকোঠা ভেঙে গেছে। এই মনের ঘরকে শক্ত করে গড়তে আমি বড় শ্বাস নিই। এঁদের পাশে থাকা আমার শ্বাসে শুদ্ধ হাওয়া বইয়ে দেয়।

বাড়িটি অন্ধকার করে রাখা হচ্ছে। জানালাগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছে ভারী পর্দায়, দরজাগুলো বন্ধ। বাইরে থেকে যেন বোঝা না যায় এ বাড়িতে কোনও মানুষ বাস করছে। বাড়ির মানুষেরা বাড়ি থেকে বাইরে যাচ্ছে না। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তারপরও দেখে মনে হয় উৎসব লেগেছে বাড়িতে। এতজনকে একসঙ্গে আমি বহুদিন পাইনি। বাবা, মা, দাদা, ছোটদা, ইয়াসমিন, সুহৃদ, ভালবাসা, মিলন, গীতা, হাসিনা, পরমা, শুভ, সৌখিন সব এ বাড়িতে। পুরো পরিবার। পুরো পরিবার কখনও কি এক বাড়িতে এভাবে মিলেছে আর! ঈদের সময় অবকাশে মিলেছে, তবু সব ঈদে নয়। আমার মনে হতে থাকে আমি বুঝি সেই শৈশব বা কৈশোরের আমি। আমি বড় হয়ে উঠছি আত্মীয়দের আদরে ভালবাসায়। এভাবেই, এ বাড়িতে বুঝি আমরা সবাই আমাদের বাকি জীবন যাপন করব। কেউ কোনওদিন কারও থেকে দূরে সরব না। সবাই সবাইকে ভালবাসবো, আমরা সহায় হব একে অপরের। পরস্পরের প্রতি গভীর মমতা আমাদের আরও কাছে টানবে, আরও ঘনিষ্ঠ করবে। আমরা পরস্পরের আত্মীয় হব, বন্ধু হব আরও, আমরা সবাই সবার হৃদয় জুড়ে থাকব। আমরা হাসব, খেলব, আনন্দ করব। আমরা নিঃস্বার্থ, নিরুপদ্রব, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাবো। সুখ স্বস্তি আর শান্তি স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ার আমাদের ভাসাবে ডোবাবে নিশিদিন। একটি প্রাণীও আর অনিশ্চয়তায়, দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় নির্ঘুম রাত কাটাবে না। প্রতিটি ভোরকে আমরা চুম্বন করব, প্রতিটি দুপুরকে নূপুর পরিয়ে নাচাবো, প্রতিটি বিকেলের সঙ্গে প্রেম করব, প্রতিটি সন্ধেকে পান করব, প্রতিটি রাতকে আলিঙ্গন করব। আশ্বাসে আশায় ভাষায় ভালবাসায় কলরোল করবে প্রতিটি প্রাণী। আমার মনে হতে থাকে আমার এই বাড়িটি আমার সেই কৈশোরের অবকাশ। বাবা মা ভাই বোন মিলে এক বাড়িতে বাস করছি। আমি ভুলে যাই যে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি অনেক বছর ধরে, ভুলে যাই দাদা তাঁর বিয়েটি করার পর বড় স্বার্থপর হয়ে গেছেন, ভুলে যাই যে হাসিনা আমাদের দুবোনকে উঠোনে ফেলে মেরেছিল, ভুলে যাই ছোটদা সুহৃদকে আমাদের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন, ভুলে যাই যে ছোটদাই আমাদের দোষ দিয়ে বলেছেন

সুহৃদকে নষ্ট করেছি আমরা, ভুলে যাই যে তিনি আমার গাড়ি কেনার পঞ্চাশ হাজার টাকা এখনও ফেরত দিচ্ছেন না, ভুলে যাই বছরের পর বছর ধরে গীতার দুর্ব্যবহার, ভুলে যাই ইয়াসমিন অবকাশ ছেড়ে চলে গেছে অনেককাল, বিয়ের পর তার কাছে এখন তার স্বামী আর বাচ্চাই বেশি আপন। ভুলে যাই সব, যেন মাঝখানে কিছুই ঘটেনি, আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি, সময় পাল্টায়নি, বয়স বাড়েনি।

মা রান্না করছেন। কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে বাবা রান্না দেখছেন। দাদা ছোটদা আর মিলন গল্প করছে বিশ্বকাপ নিয়ে। ইয়াসমিন নতুন একটি হিন্দি ছবি চালিয়ে দিয়েছে। গীতা আর হাসিনা কথা বলছে আর হাসছে। সুহৃদ, শুভ আর পরমা ক্যারম খেলছে। সৌখিন আর ভালবাসা ছবি আঁকছে। দৃশ্যগুলো আমি ঘুরে ঘুরে দেখি। দেখতে দেখতে আমার বিশ্বাস হতে চায় না যে এমন ছিল না দৃশ্য এর আগে এ বাড়িতে। যেন সকলেই আমরা এভাবেই এক বাড়িতে হৈহুল্লোড় করে ছিলামই, যেন কেউ কখনও কারও থেকে আলাদা হইনি। একটি জিনিস লক্ষ্য করে আমার এত ভাল লাগে যে কারও সঙ্গে কারও কোনও বিরোধ নেই এখন, কেউ কোনও অভিযোগ করছে না কারও বিরুদ্ধে, সকলে সকলকে ভালবাসছে। আমার বিপদই সম্ভবত সবাইকে এমন একত্র করেছে, এক বিন্দুতে দাঁড় করিয়েছে। আমার এত ভাল লাগে যে চোখ ভিজে ওঠে। ঘুরে ঘুরে সবার কাছে দাঁড়াই, বসি। মার রান্নায়, দাদাদের গল্পে, ইয়াসমিনের ছবিতে, গীতাদের হাসিতে, সুহৃদদের খেলায়, ভালবাসার আঁকায়। এ সত্যিই এক অন্যরকম সুখ। সবাইকে কাছে পাওয়ার সুখ, চোখের নাগালে, হাত বাড়ালেই পাওয়ার সুখ।

বৈঠকঘরের কার্পেটে বিছানার চাদর বিছিয়ে ঘুমোয় সবাই। বালিশ বেশি নেই বলে সোফার গদিগুলোকেই মাথার বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে। এতে কারও কোনও অতৃপ্তি নেই। মনে সুখ থাকলে লোকে বলে গাছের তলাতেও আরামে ঘুমোনো যায়। আমার জন্য আমার শোবার ঘরটির পুরু গদির বিছানা, কিন্তু রাতে আমি আমার বিছানা ছেড়ে ভাই বোনদের মধ্যিখানে এসে শুই, এই আনন্দ ওই আরামের বিছানায় একা শোয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি। লেখালেখিতে মগ্ন থেকে আমি কোনওদিন ফিরে তাকাইনি কারও দিকে। আজ ফিরে তাকাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি সবাই আমাকে ভীষণ ভালবাসে। কোনওদিন বুঝিনি কেউ যে ভালবাসে। না, এই ভালবাসাকে কোনওদিন জানতে চাইনি, অবজ্ঞা করেছি, আমার জীবন আমার বলে সরে থেকেছি।

বাড়ির সকালটা কাটে পত্রিকার ওপর ঝুঁকে থাকায়। দাদা, ছোটদা, বাবা, ইয়াসমিন আর মিলন, গীতা, হাসিনা বৃত্ত হয়ে বসে যায়। একজন পড়ে, সকলে শোনে। হাইকোর্টে জামিন পেলেন তসলিমা নাসরিন, হাইকোর্টে যেভাবে এলেন, যেভাবে গেলেন-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, আদালত প্রাঙ্গনে যে অভূতপূর্ব নিরাপত্তার আয়োজন ছিল সকাল থেকে তার আদ্যোপান্ত, এখন যে আমার শান্তিনগরের বাড়িতে কেউ নেই, দরজায় তালা ঝুলছে, আদালত থেকে বাড়ি ফিরে বিকেলের মধ্যে আবার আত্মগোপন করতে চলে গেছি এসব খবর; এই খবরটিই সাংবাদিকদের কাছে

বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে কারণ তাঁরা মনে করছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজের বাড়িতে এ সময় কোনও বোকাও থাকবে না। বাড়ির ঠিকানাটি তো বড় বড় করে সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, মোল্লাদের যে কোনও একজনই যথেষ্ট বাড়িতে এসে নির্বিবাদে আমার গলাটি কেটে নেওয়া। সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় কিছুই নজর থেকে বাদ পড়ছে না কারওরই। আমি সামনে দাঁড়াতেই পত্রিকা থেকে মুখ তুলে দাদা বলেন, *কালকে জামিন হওয়ার পর বিবিসি থেকে সাক্ষাৎকার নিছে অনেকের, ডঃ কামাল হোসেন বলছেন, আজকের ঘটনায় আমরা ভরসা পাচ্ছি যে দেশে আইনের শাসন আছে। সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে জামিন দিয়েছে, তাতে একজন ব্যক্তি যে আইনের নিরাপত্তা পেতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। উগ্রপন্থীরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে মানুষ কোর্টে এসে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। তুই হাইকোর্টে গিয়া জামিন পাইছস, হাইকোর্ট থেইকা অনুমতি দিছে সিএমএম কোর্টে তর অনুপস্থিতিতে তর উকিলরা হাজিরা দিতে পারবে। সুপ্রিম কোর্টের যে স্বাধীনতা আছে তা প্রমানিত হইছে। তারপর ভয়েস অব আমেরিকাতেও সারা হোসেন সাক্ষাৎকার দিছে, বলছে তর বিরুদ্ধে মামলা করার পর পরিস্থিতি এমন ছিল বলছে যে তর পক্ষে কথা কওয়াও যেন অন্যায় ছিল, তর পক্ষে ওকালতি করাটাও যেন অপরাধ ছিল। কিন্তু হাইকোর্টের রায়টারে বলছে যে এত সহজে বিচার ব্যবস্থাকে মৌলবাদীরা প্রভাবিত করতে পারে নাই।*

বাবা বললেন, *শামসুর রাহমান তোমার প্রশংসা কইরা বলছে তুমি মেয়েদের কথা লিইখা সমাজকে আলোড়িত করছ। বলছেন, আমি মনে করি তসলিমা সফল, কেউ চাক বা না চাক তিনি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। ডঃ আনিসুজ্জামানও ভাল বলছেন।*

ছোটদা বললেন, *জামাত কি কইছে ওইডা কন। জামাত হেভি চেতা সরকারের উপর। কইতাছে সরকার সব জানত তুই কই ছিলি, সব নাকি সরকারের নাটক। এহন তর জামিন হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতাছে তারা। মিছিল হইব প্রত্যেকদিন।*

মিলন বলে, *ভোরের কাগজ লিখছে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম নাকি পাগল হইয়া গেছে। দিন রাত নাকি ফোন কইরা জানতে চাইছে এখন আপনি কই আছেন, নিরাপত্তার কি হইতাছে, বিনা বাধায় বিদেশ যাইতে পারবেন কি না।*

আজকের খবরের উত্তেজনা স্তিমিত হলে গত দুমাস কি কি ঘটেছে, কে কেমন ছিল এ বাড়িতে তার দুঃসহ বর্ণনা শুনি সবার কাছে। আমি চলে যাওয়ার পরই পুলিশ এসে বাড়ি তছনছ করেছে। বেচারা মোতালেবকে ধরে নিয়ে গেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা জেরা। কোথায় তসলিমা, বলতেই হবে। মোতালেবকে পিটিয়েছে পুলিশ। মিলনকে খোঁজা হচ্ছিল, কারণ পুলিশ খবর পেয়েছে মিলন আমার সঙ্গে ছিল যখন আমি বেরিয়ে গেছি। মিলন নিখোঁজ হয়ে ছিল অনেকদিন। প্রথম দিকে, উকিলরা যখন বলেছিলেন যে এসময় আমার কিছু জনসমর্থন থাকলে ভাল হয়, পত্রিকায় কিছু বিবৃতি যাওয়া দরকার তখন ছোটদা আর দাদা আমার কবি লেখক বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিবৃতি ভিক্ষে চেয়েছেন। পাননি। কেউই আমার পক্ষে কিছু বলার

কোনও উৎসাহ প্রকাশ করেননি, সবার মুখে ছিল আতঙ্ক। দাদাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার কোনও আত্মীয়র ছায়াও কোনও বাড়ির কাছাকাছি পড়লে ক্ষতি। যে কেউ বাড়ির বাইরে গেছে, এসবির লোকেরা পিছু নিয়েছে। ছোটদা নুন কিনতে গেলেও টিকটিকি পেছনে যায়। মিলন ভালমানুষের মত আদমজিতে চাকরি করতে গেলেও পেছনে টিকটিকি। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ঘটনাটি ঘটেছে ইয়াসমিনের ওপর, তার চাকরি চলে গেছে। সে আমার বোন, এই অপরাধে তার চাকরিটি গেছে। আমার বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করার কিছুদিন পরই ইয়াসমিনকে তার আপিসের মালিক এসে বলে দিয়েছে, তার আর কাল থেকে আপিসে আসতে হবে না।

এক এক করে বন্ধুদের নাম বলি, কেউ এসেছিল কি না এখানে খোঁজ নিতে আমার আত্মীয়রা কেমন আছে অথবা খোঁজ নিতে কেউ জানে কি না আমি কেমন আছি, কোথায় আছি, ভাল আছি কি না, বেঁচে আছি কি না। প্রতিটি নাম উচ্চারণের পর উত্তর শুনি, না। কোনও কবি সাহিত্যিকই আসেনি? যারা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল? না, কেউই আসেনি। নাকি এসেছে, তোমরা দরজা খোলোনি! না কেউই আসেনি। নিশ্চয়ই ফোন করেছে। ফোনে নিশ্চয়ই খবর জানতে চেয়েছে! না, কেউ ফোনও করেনি। গার্মেন্টেসএর সাজু জাহেদারা ছাড়া আর কেউ আসেনি। কেউ ফোন করেনি। কায়সারও আসেনি? না। ফোনও করেনি? না। বরং কায়সারকেই ফোন করা হয়েছে, একবার অন্তত বাড়িতে আসার অনুরোধ করা হয়েছে। কথা দিয়েছে আসবে, কিন্তু আসেনি। একবার জানতেও চায়নি আমার কথা।

স্তূপ হয়ে থাকা চিঠিগুলো পড়তে ইচ্ছে করে না। চিঠিগুলো হয়ত জরুরি চিঠি। কিন্তু জরুরি চিঠি পড়ার চেয়েও বাড়ির সবার সঙ্গে আড্ডা দিতে গল্প করতে হোক না *আজাইরা* গল্প, ভাল লাগে বেশি। ইচ্ছে না হলেও কিছু চিঠি খুলি গল্পের অবসরে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানবাধিকার সংগঠন আমাকে একটি গ্রান্ট পাঠিয়েছে, হেলমেন হেমেট গ্রান্ট। সরাসরি আমার ব্যাংক একাউন্টেই পাঠিয়ে দিয়েছে ছ হাজার ডলার। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি চিঠিতে এই খবরটিই পেলাম। প্রতিবছর এই সংগঠনটি মানবাধিকারের জন্য যারা লড়াই করছে, তাদের জন্য এরকম একটি গ্র্যান্টের ব্যবস্থা করে। এর মধ্যে ব্যাংকে পৌঁছে গেছে ফরাসি প্রকাশক ক্রিশ্চান বেস এর পাঠানো দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডটি এবার তাহলে জোড়া লাগল।

পুরোনো বন্ধুরা আমার কাছ থেকে দূরে সরলেও আমার নতুন বন্ধুরা আমাকে দূরে সরিয়ে দেন না। ঝ চলে আসেন পিস্তল নিয়ে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। পুলিশে তাঁর বিশ্বাস নেই। ঝকে বলি যে আমি খুব নিরাপদ বোধ করছি, এত নিরাপদ আমি আর আগে কখনও বোধ করিনি। আমাকে ঘিরে আমার পরিবারের সদস্যরা আছে, তাদের কারও কাছে পিস্তল নেই, বন্দুক নেই, কিছু নেই। তাদের ভালবাসাই আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। ভালবাসা যে কোনও মারণাস্ত্রের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা দিতে পারে, তা আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করি। যদি মৃত্যু হয় এ বাড়িতে এখন আমার, আমার মার কোলে, মার চোখের জল আমার কপালে টুপ টুপ

করে পড়বে, ইয়াসমিন আমার বুকের ওপর মাথা রেখে চিৎকার করে কাঁদবে, বাবা আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখবেন, আমার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকবেন আমার দাদা আর ছোটদা, সুহৃদ আমার কোলের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে দোলফুপু দোলফুপু বলে, এমন সময় যদি জানি আমার মৃত্যু হচ্ছে, আমার কি দুঃখ হবে? দুঃখ হবে না। ভালবাসা ঘিরে থাকলে মৃত্যুতে কোনও দুঃখ হয় না। আমার এই ঘরের মানুষদের ভালবাসা লক্ষ লক্ষ মোল্লাদের ঘৃণার চেয়ে তীব্র। আমি অনেক কিছু না পেয়েও কেবল সত্যিকার কিছু ভালবাসা পেয়ে তৃপ্ত।

দিন যায়। প্রতিদিন সকাল বিকাল মিছিল যায় সামনের রাস্তা দিয়ে। বিশাল বিশাল ব্যানার হাতে মিছিল, *তসলিমার ফাঁসি চাই।* স্লোগানে কাঁপছে এলাকা, তসলিমার ফাঁসি চাই, দিতে হবে। পঞ্চাশ হাজার, সত্তর হাজার লোকের মিছিল প্রতিদিন। মিছিলের শব্দ শুনলেই বাড়ির মানুষগুলো, জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দেয় রাস্তায়। মা বলেন, *এরা তো সত্যিকার ধার্মিক না। ধার্মিকরা কাউরে মাইরা ফেলতে চায় না। টুপি পিনলে আর দাড়ি রাখলেই ধার্মিক হওয়া যায় না।*
আমি হাসতে হাসতে বলি, *এরা তাইলে কি?*
এরা খারাপ লোক। খারাপ লোকেরা রাস্তায় নামছে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়া। সব ঠিক হইয়া যাইব, তুমি শুধু বইলা দিবা যে ধর্ম নিয়া আর কিছু লিখবা না।

ঘড়ির কাঁটা এগোয়। খুব দ্রুত। সমস্ত শক্তি দিয়ে কাঁটাটিকে আমার থামাতে ইচ্ছে করে। দিন লাফিয়ে লাফিয়ে রাতের দিকে যেতে থাকে। রাতগুলো বিকট দৈত্যের মত অন্ধকারকে ছিঁড়ে টুকরো করে সূর্যের আগুনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। আমি থামাতে পারি না কিছুই। ক আসেন হঠাৎ এক রাতে। সোজা আমার লেখার ঘরটিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি বসেন। হাতে গুঁজে দেন আমার পাসপোর্টটি আর একটি টিকিট। পাসপোর্টে নরওয়ের আর সুইডেনের ভিসা। টিকিট সুইডেন যাওয়ার। সুইডিশ সরকারের পাঠানো। গভীর রাতের বিমান, ব্যাংকক হয়ে, আমস্টারডাম হয়ে স্টকহোম। ক বললেন এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এটিই একমাত্র বাঁচার পথ। এটিই সরকারি সিদ্ধান্ত। জামিনের অলিখিত শর্ত। বিদেশের পরামর্শ। সে রাতে, যে রাতে আমাকে যেতে হবে, আমার বাড়িতে গভীর রাতে পুলিশের একটি বিশেষ বাহিনী এসে থামবে, কড়া নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে বন্দরে। বন্দরে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত থাকবেন, দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। বিমান বন্দরে আমি ওঁকে দেখতে পাবো, ওও যাচ্ছেন আমার সঙ্গে পুরো পথ। ব্যাংকক বন্দরে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবেন সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের লোক। আমি পৌঁছোতেই সুইডিশ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান আমাকে তাঁর দায়িত্বে নিয়ে নেবেন। হাতে পাসপোর্ট আর টিকিট নিয়ে বিমূঢ় বসে থাকি। ক বললেন, দেশে এক মুহূর্তের নিরাপত্তা নেই। যত শীঘ্র সম্ভব দেশ ত্যাগ করতে হবে, দিনের বেলায় ত্যাগ করা সম্ভব নয়, বিমান বন্দর ঘেরাও করে রেখেছে মৌলবাদীরা। এক আগামিকালই পাওয়া গেছে গভীর রাতের যাত্রা। সে সুযোগটিই নিতে হবে।
কবে ফিরব? ককে জিজ্ঞেস করি।

ক আমার প্রশ্ন শুনে চুপ হয়ে যান। করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, *আপাতত তো যান। তারপর গিয়ে ভাবুন কবে ফিরবেন। সবই নির্ভর করছে দেশের অবস্থার ওপর। এখন যে অবস্থা এই সময় আপনার অন্য কিছু না চিন্তা করে সোজা* দেশ ছাড়া উচিত। আপনার ভাগ্য ভাল যে আপনার এই সুযোগ হয়েছে।

যেতেই হবে? ভাঙা কণ্ঠ আমার।

হ্যাঁ, যেতেই হবে।

না গেলে কী হবে?

সরকার এই শর্তেই জামিন দিয়েছে।

সে জানি, কিন্তু শর্ত যদি না মানি!

শর্ত না মানলে কি হবে একটু আন্দাজ করতে পারছেন না কি? আশ্চর্য। মৌলাবাদীদের হাতে খুন হবেন। সরকার নিরাপত্তা দেবে না। জেলে পাঠাবে। জেলে কোনও নিরাপত্তা নেই আপনার। বাঁচতে চাইলে দেশ ছাড়ুন।

ভাঙা গলা আবার, *এই যে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, এতে কি কোনও লাভ হবে না! এই আন্দোলনে হয়ত মৌলবাদী দল হেরে যাবে। হয়ত তারা আর..*

ক চাপা গলায় ধমক দেন, *আপনার এইসব রোমান্টিকতা ছাড়ুন তো। মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন কিছুই করতে পারছে না। সব দল মিলে রাস্তায় নামলেও মৌলবাদীদের ঠেকানো এখন সম্ভব নয়।*

তাহলে কি কোনও আশা নেই?

জানি না আদৌ কোনও আশা আছে কি না।

দেশের কী হবে?

দেশের কি হবে, আপাতত সে কথা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ভাবুন।

ক চলে যান আমাকে বিদায়ের আলিঙ্গন করে। পাথরের গালে দুটো শুষ্ক চুম্বন পড়ে।

বাবা এগিয়ে এলেন পাথরের কাছে। টোকা দিলেন। টোকায় পাথরে কোনও শব্দ হয় না। অনেকক্ষণ পর পাথুরে কণ্ঠ থেকে বেরোয়, *কালকেই চইলা যাইতে হইব।* *কালকেই!* বাবা থ হয়ে গেলেন। বাড়ির সবাই খবরটি শুনে চুপ হয়ে গেলেন। কোলাহলে মুখর বাড়িটি মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। যেন কেউ মারা গেছে আজ। খুব আপন কেউ হঠাৎ মারা গেছে।

ফরিদ হোসেন দুদিন ধরে চেষ্টা করছেন বাড়িতে ঢুকতে। পারেননি। আজ ঢুকে আমার লিখে রাখা উত্তরপত্রটি নিয়ে যান। তাঁর অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, এখন কি দেশ ছাড়ার কথা ভাবছেন নাকি দেশেই থাকবেন? আমার উত্তর ছিল, দেশে থাকব। যা কিছুই ঘটুক, কখনও দেশ ছাড়ব না। এ দেশ আমার। আমার দেশটিকে আমি খুব ভালবাসি। ফরিদ হোসেন উত্তরপত্রটি হাতে নিয়ে খুব খুশি হয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, জানেন না ভেতরের ঘরে তখন একটি সবুজ সুটকেসে আমার কাপড় চোপড় ভরা হচ্ছে। সুটকেসটি বাড়ির প্রায় সবাই গুছিয়ে দিচ্ছে। আমার কোনও আগ্রহ নেই সুটকেসে, মারও নেই। সুটকেসের দিকে তাকিয়ে মা থেকে থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে নয়, হাউমাউ করে কাঁদেন। কোথায় যাচ্ছে তাঁর মেয়ে, কবে ফিরবে মেয়ে, মা তার কিছুই জানেন না। আশঙ্কায় কাঁদেন তিনি।

পাথর হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দ্রুত কিছু কাজ সারতে হবে। আমার অনুপস্থিতিতে মামলা চলতে হলে কিছু কাগজে আমার সইএর দরকার আছে। সারা হোসেন নিজে এসে পাওয়ার অব এটর্নির অনেকগুলো কাগজে আমার সই নিয়ে গেছেন। নিয়মিত সারার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দাদাদের বলি। টাকা পয়সা যা দরকার হয়, সব যেন দেওয়া হয়। ছোটদা আমার ব্যাংক থেকে তুলতে পারবেন আমার টাকা পয়সা।

ছোটদা হেসে বলেন, কামাল হোসেন তো তর কেইসের জন্য কোনও টাকা নেয় নাই। দলিলপত্র টাইপ করা আর ফটোকপি করার জন্য যা লাগছে খালি। এমনিতে কামাল হোসেনের সাথে শুধু কথা কওয়ার ফিই হইল এক লাখ টাকা।

ছোটদা বউ বাচ্চা নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দেবার স্বপ্ন দেখছেন। তাঁকে অনুরোধ করি যেন তিনি না যান, যেন দেশে থাকেন। আমি ফিরে আসব। সবাই আমরা একসঙ্গে থাকব। যেন আমাদের সংসারটিকে তিনি চলে গিয়ে ভেঙে না দেন। ইয়াসমিনের কোনও চাকরি নেই। বলি ব্যাংকে যে টাকা রেখে গিয়েছি, তা দিয়ে যেন চালাতে থাকে। আমি ফিরে এসে তার জন্য ভাল একটি চাকরি যোগাড় করে দেব। মিলনের আদমজির কাজটি পোষাচ্ছে না, তাকেও বলি অপেক্ষা করতে আমার জন্য। কিছু একটা নিশ্চয়ই করব আমি। রাতে ভাই বোনের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে থাকি। ইচ্ছে করে হাজার বছর এভাবেই কেটে যাক, এভাবেই পরস্পরের প্রতি পরম মমতায়, এভাবেই গভীর ভালবাসায় পাশাপাশি,এভাবেই আনন্দে, এভাবেই মায়া মমতায়। কতদিন আমরা এরকম এক বাড়িতে সবাই এক হইনি। ঈদের দিনের মত লাগে। ইচ্ছে করে ঈদ লেগে থাকুক জীবনে প্রতিদিনই। হা ঈদ। সারারাত মা কাঁদেন। সারারাত জেগে জেগে মার কান্না শুনি।

আগামীকাল এসে যায়। দিন পার হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। মা আমাকে পাঁচবেলা মুখে তুলে খাওয়াচ্ছেন। যা যা খেতে ভালবাসি, নিজে হাতে রান্না করেছেন। আমি খানিকটা অবসর পেতে চাই, দাদা আর বাবার রাজনীতির আলাপ থেকে সরে এসে একা হতে চাই। লেখার ঘরটিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই ভেতর থেকে। হাতে টিকিটটি নিয়ে বসি, এখন আমার হাতে সব ক্ষমতা। ইচ্ছে করলে এটি আমি এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারি। এখন আমি ইচ্ছে করলেই বলতে পারি আমি কোথাও যাবো না। টিকিটটিকে নাড়াতে থাকি হাতে, দ্রুত, খুব দ্রুত। যেন হাতপাখা এটি। ছিঁড়বো কি ছিঁড়বো না অবস্থায় বার বার বলি নিজেকে, টিকিট হাতে আছে বলেই বুঝি যেতে হবে, ছিঁড়ে ফেললেই তো হয়, ছিঁড়ে ফেল, তুমি যেও না কোথাও, যেও না। কিন্তু অদৃশ্য কে যেন আমার দেশ ছাড়তে না চাওয়ার বাসনার কথা জেনে হেসে ওঠে, হাসতে হাসতে বলে, ---*তুমি কেন থাকবে এ দেশে? তোমার এই বিপদের সময় কি তোমার বোঝা হয়নি কটি লোক তোমাকে সমর্থন করে! এখনও কি বোধ হয়নি! কী ভরসায় থাকবে এ দেশে!*

---কেন আমাকে ভরসা করতেই হবে?

---করতেই হবে কারণ তোমাকে হত্যার জন্য লক্ষ লোকের জমায়েত হয় এই দেশে। ভরসা তো করেছিলে, লুকিয়ে যখন থেকেছিলে! তুমি কি ভেবেছো, জামিন পেয়েছো বলে তোমার সব সমস্যা এখন শেষ হয়ে গেছে! প্রতিদিন নানারকম বিপদের সামনে পড়তেই হবে তোমাকে, তখন কার ওপর ভরসা করবে?

---কেন, আমাকে যারা আশ্রয় দিল! তারা তো আমার পাশে দাঁড়িয়েছে! শামসুর রাহমান, কবীর চৌধুরী.. আমাকে সমর্থন করেন।

---কজন? হাতে গোনো। হাতে গোনো, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, করে গোনা। হাতের কড়াগুলো তবুও তোমার বাকি থেকে যাবে, এ দেশে লোক আছে বারো কোটি। বারো কোটির মধ্যে কজন তোমার পক্ষে! কেন এ দেশে থাকবে তুমি! তোমার অভিমান হয় না! এ দেশে তুমি থাকতে চাও কেন?

---আমার আত্মীয়রা আছে। এরা আমাকে ভালবাসে।

---ভালবাসে ঠিক কথা। কিন্তু তাদের ভালবাসাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট! তুমি এখন সাধারণ একজন মানুষ নও যে, আত্মীয়দের ভালবাসা আর সমর্থন দিয়েই একশ একটা বিপদ থেকে তুমি রক্ষা পাবে। মৃত্যুর ফাঁদ থেকে বাঁচবে। তোমার আত্মীয়রা খুব নিরীহ মানুষ। তাদের কোনও শক্তি নেই। তারা তোমার চেয়েও নিরীহ। বেঁচে থাকতে চাইলে চলে যাও, বেঁচে থাকলে তুমি লিখতে পারবে, জীবনে যা ইচ্ছে তা করার সুযোগ পাবে।

---নাহয় হাইডিংএ থাকার সময় ডেসপারেটলি ভেবেওছিলাম বিদেশে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন এই যাওয়াটা, বিদেশে গিয়ে পড়ে থাকাটা কি রকম যেন অদ্ভুত লাগছে। কোনও মানে হয় না। কেউ আমাকে ঠিক করে বলছেও না কবে ফিরবো।

---ফেরার কথা ভাবার সময় নেই। পরের কথা পরে ভেবো। আগে বাঁচো তো। মনে রেখো আজ যদি বিদেশিরা তোমাকে সাহায্য না করত, তুমি এ দেশে বেঁচে থাকতে পারতে না। তোমার এত সমর্থক এ দেশে হয়নি যে এ দেশে থাকার সাহস তুমি কর। ওই হাতে গোনা কজন দিয়ে কিছু হবে না। তোমার বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি। এক লক্ষ শত্রু যদি থাকে, একজন তবে বন্ধু। এভাবে হিসেব করো। এ দেশে তুমি বাঁচার আশা কি করে করো! তোমার আত্মীয় স্বজনের কোনও ক্ষমতা নেই তোমাকে বাঁচাবার। ওরা তোমার আত্মীয় বলে ওদেরও বিপদ অনেক। তুমি চলে গিয়ে ওদেরও বাঁচাও।

---কিন্তু..

---কিন্তু কি!

---সময় তো জানি সব আবার ঠিক করে দেয়। হয়ত কদিন পর পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। প্রাণনাশের হুমকি কি আমার জীবনে এই প্রথম? সেই কবে থেকেই তো!

---না যাও। সরকার তোমাকে ঠেলে বের করবে। আজ না যাও, কাল যেতে হবে। কাল না যাও পরশু যেতেই হবে। এটা তোমার সিদ্ধান্ত নয়। এটা সরকারি সিদ্ধান্ত।

---এই সরকার তো আমার শত্রু। এই সরকার কি আমাকে বাঁচাতে চাইছে!

---*তোমাকে বাঁচাতে চাইছে না। নিজে বাঁচতে চাইছে। দেশের সরকার বিরোধী মৌলবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়ুক চাইছে, বিদেশের দুর্নাম বন্ধ করতে চাইছে।*

---*আমার কি অন্য কোনও উপায় নেই?*

---*না।*

---*কোনও উপায়ই নেই?*

---*না।*

অনেকক্ষণ বসে থাকি একা একা। মাথা ঘোরে, ঘোরে আমার এই প্রিয় ঘরটির সবকিছু। লেখার টেবিল। চারপাশের বইভর্তি বইয়ের তাক। ঘোরে না শেষ করা বিস্তর লেখা, ঘোরে স্তূপ স্তূপ লেখার কাগজ, ঘোরে দেয়ালে টাঙানো আমার প্রিয় তেলচিত্রগুলো, ছবিগুলো, ঘোরে পুরস্কারের পদক, ঘোরে জানালার ভারী সবুজ পর্দা। এই ঘরে দিনের পর দিন কেটেছে আমার লেখায়, পড়ায়। এই ঘরটি ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে! আমার সব তো এখানে। আমার জীবনটিই এখানে, আমার সব স্বপ্নই এখানে। সমস্ত স্বপ্নই। ঘুরতে থাকে আমার এই জগত। লাটিমের মত ঘোরে। চাই না, তবু রাত নেমে আসে। হু হু করে রাত বেড়ে চলে। রাত তখনও তত গভীর নয়, যতটা গভীর হলে আমার বিমান-বন্দরে যাওয়ার কথা। তখনই বিশেষ পুলিশ বাহিনীর উচ্চ পদস্থ দুজন কমকর্তা আমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলার জন্য বাড়িতে ঢোকেন। বাড়িতে ঢোকেন পরিচয় পত্র দেখিয়ে, কারণ বিশেষ পুলিশ বাহিনীর পরনে কোনও নীল বা খাকি পোশাক থাকে না। একজন লাল শার্ট, মোটামত, আরেকজন টাই পরা, মোচঅলা। যখন কথা বলবেন, বললেন আর কারও সামনে থাকা চলবে না। বৈঠকঘরে আলো আঁধারিতে বসে তাঁরা আমার সঙ্গে দুএকটি অজরুরি কথা বলেন প্রথম। তারপর বলেন আজ রাত দেড়টা থেকেই তাঁরা নিচে পুলিশের গাড়িতে থাকবেন। তারপর যা গরম পড়েছে আজ এমন একটি সহজ কথা বলার মত বললেন একজন, *কোথায় ছিলেন দুমাস?*

ছিলাম।

ছিলেন তো জানিই, কোথায় ছিলেন?

আমি খানিকটা দম নিয়ে বলি, *লুকিয়ে ছিলাম সে তো জানেন।*

আরেকজন বললেন, হেসে, *পুলিশ বাহিনীকে তো হয়রান করে ছেড়েছেন। সারা দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপনাকে পাওয়া যায় নাই। লুকিয়ে যে ছিলেন সে তো সবাই জানে, কিন্তু কোথায়?*

আমি ম্লান হাসি।

মোচঅলা লোকটি বলেন, *ভয় পান নাই লুকিয়ে থাকার সময়?*

পাবো না কেন? বেঁচে ফিরব, এমনই তো ভাবিনি কোনওদিন।

মোচহীন লাল শার্ট লোকটি হঠাৎ কাচের দরজা ঠেলে বারান্দায় যান। বারান্দা থেকেই বললেন, *ওদিকে কিছু লোক মনে হয় জটলা করছে।*

হাতের রেডিওতে রাস্তার পাহারা পুলিশদের জানালেন জটলা কেন খবর নিতে।

বারান্দা থেকে ফিরে এসে সোফায় বসে উদ্বিগ্ন মুখ চোখ, বললেন, *আপনি ভয় পাবেন না, আমরা সব ব্যবস্থা করছি।*

টাইপরা মোচঅলা বললেন, *আমাদের লোক বিমানবন্দরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহজনক লোকদের কোথাও জড়ো হতে দিচ্ছে না। যে করেই হোক যে কোনও রকম ঘেরাও ঠেকাবো আমরা।*
মোটামত লাল শার্ট বললেন, *ঠিক আড়াইটায় আপনার গাড়ি যেন বের হয়। আপনার গাড়ির ঠিক পেছনেই আমাদের গাড়ি থাকবে।*
এসব আমার জানা। আমি বসে থাকি জরুরি কথাটি শোনার জন্য।
ফর্সা মত টাইপরা বললেন, *দুমাস কি ঢাকায় ছিলেন নাকি ঢাকার বাইরে?*
ঢাকাতেই ছিলাম।
ঢাকাতেই? আশ্চর্য।
আশ্চর্য কেন?
আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কি করে এতদিন ঢাকায় ছিলেন, তাই ভাবছি।
আমি আবারও ম্লান হাসি। ভাবি, এই এরাঁই আমাকে সারা দেশ পাতি পাতি করে খুঁজেছেন গ্রেফতার করার জন্য, আর এঁরাই এখন আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন। এঁরা কি পাল্টে গেছেন? না। এঁরা এঁরাই আছেন, কেবল সরকারি হুকুম পাল্টেছে। এঁরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন এখন, হুকুম এলে এই এঁরাই বুটের লাথি লাগাতে পারেন পিঠে। হুকুম এলে এঁরাই আমাকে গ্রেফতার করে কালো গাড়িতে তুলে জেলে ভরতে পারেন।
গম্ভীর মুখে মোচঅলা জিজ্ঞেস করলেন--- *এক জায়গায় ছিলেন নাকি বিভিন্ন জায়গায়?*
---*বিভিন্ন।*
---*কোনও বাড়িতে ছিলেন নাকি অন্য কোথাও?*
---*অন্য কোথাও মানে?*
---*অন্য কোথাও তো অনেক কিছু হতে পারে। দোকানে, আপিসে, গুদামঘরে।*
---*না ওসব কোনও জায়গায় ছিলাম না।*
---*দূতাবাসে ছিলেন?*
---*না।*
---*দূতাবাসের কারও বাড়িতে?*
---*না।*
---*বিদেশিদের বাড়িতে তো ছিলেন!*
---*না।*
---*তবে কি বাঙালিদের বাড়িতে?*
---*হ্যাঁ।*
---*কাদের?*
---*কাদের মানে?*
---*কাদের মানে কাদের বাড়িতে ছিলেন?*
প্রশ্নটি শুনে বড় একটি শ্বাস নিই আমি। মোচহীন বলেন, *আসলে আমরা তো জানিই আপনি কাদের বাড়িতে ছিলেন। পুলিশ কী না জানে বলেন!*

এই প্রশ্নে নিরুত্তর থাকা আমি মোচহীনের মন্তব্যের বিপরীতে প্রশ্ন করি, *জানেনই যখন তখন আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?*

মোচঅলা বললেন, *আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।*

কেন শুনতে চান? কী দরকার?

দরকার আছে।

দুজোড়া চোখ আমার মুখে পলকহীন তাকিয়ে আছে। দুটো নাক ঘ্রাণ নিচ্ছে আমার অপ্রস্তুত অবস্থার, দুজোড়া কান খরগোসের কানের মত সজাগ দাঁড়িয়ে আছে। আমি টের পাই জিভ শুকোচ্ছে আমার, জিভের পেছনও শুকোতে শুকোতে নিচে নামছে, গলা, বুক শুকোচ্ছে।

টাইপরা ফর্সা মত মোচঅলা বললেন, *আপনি জামিন পাওয়ার পর থেকে যে বিমান বন্দর ঘেরাও করে আছে মৌলবাদীরা, তা তো জানেন।*

জানি।

আপনাকে যদি আজকে প্রোটেকশান না দেই, তাহলে কি করে যাবেন বিমানবন্দরে বলেন। একা যাবেন? পুলিশ ছাড়া?

চোখের সামনে আবছা আলোটুকু হঠাৎ মুছে যায়। যেন ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে একা বসে আছি। কোনও নামের একটি অক্ষরও তুই উচ্চারণ করিস না, ভেতরের আমিটি বাইরের আমিকে বলছে।

লাল শার্ট এবার শক্ত কণ্ঠে বলেন, *নামগুলা বলেন, যাদের বাড়িতে ছিলেন।*

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, *না বললে তো আপনার ক্ষতি। আপনি কি চান আপনার ক্ষতি হোক?*

অন্ধকারর ভেতর থেকে একটি শান্ত কণ্ঠ ভেসে আসে, নিজেই চমকে উঠি কণ্ঠটি শুনে। *না।*

না?

আমার এই স্পর্ধা দেখে চারটে ছানাবড়া চোখ পরস্পরকে দেখে।

অন্ধকার সরিয়ে আমি তখন একটু আলোর জন্য মরিয়া হয়ে জানালা দরজা খুঁজছি। আমার চোখ অন্ধ হয়ে আসছে, খোলা চোখ, যেন বুজে আছি এমন একটি বোধ। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে কেবল মাথা নয়, জগত। মোচহীন, মোচঅলা পর পর বলে চলছেন, তাহলে আপনি আপনার ক্ষতিই চাইছেন। তাহলে আপনি চাইছেন না বিমান বন্দরে আপনার কোনও নিরাপত্তা? তাহলে আপনি ভেবেই নিয়েছেন যে আপনি নিরস্ত্র হয়ে সশস্ত্র লোকগুলোর হাত থেকে বাঁচবেন? আমরা সময় দিচ্ছি আপনাকে, আপনি ভেবে দেখেন কি হবে আপনার, যখন আপনি বিমান বন্দরে পৌছবেন, আর আপনাকে ঘিরে ধরবে মোল্লারা!

লাল শার্টের চোখে পাথুরে দুটো চোখ রেখে বললাম, আপনাকে যদি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিছু মানুষ আশ্রয় দিত আপনার খুব বিপদের দিনে, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে যারা, তাদের কি বিপদে ফেলবেন আপনি? ঠিক আমার অবস্থা যদি হত আপনার, আপনি কি ওদের কারও নাম বলতে পারতেন?

লালশার্টের ঠোঁটে বাঁকা একটি হাসি। টাইপরা লোকটি নড়ে চড়ে বসে বললেন, গম্ভীর গলায়, আপনার জীবন কি এখন বিপদমুক্ত আপনি ভাবছেন?

লাল শার্ট বাঁকা হাসিটি মিলিয়ে ফেলে বললেন, *এখনও কিন্তু আপনি দেশের ভেতর।*

সে আমি জানি। কিন্তু আমি কারও নাম বলব না।

নাম না বললে আপনাকে বিমানবন্দরে একা যেতে হবে। পুলিশ যাচ্ছে না আপনার সঙ্গে।

এ কথার পর তিনটি প্রাণী অতল এক নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বসে থাকি। একসময় সেই নৈঃশব্দ্য থেকে উঠে এক গেলাস জল খেতে হয় আমাকে। লক্ষ্য করি গেলাসে ধরা হাতটি আমার কাঁপছে। ভেতরের ঘরে বাবা বসে আছেন, চোখদুটোয় ঔৎসুক্য লাফাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে আমার কি কথা হচ্ছে জানতে। আমি ইঙ্গিতে তাঁর চোখদুটোকে শান্ত হতে বললাম, তাঁকেও।

জল লালশার্টও চাইলেন। বাবা আর ঘরে বসে থাকতে পারেননি, উঠে এসে পুলিশদের ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন *চা খাবেন?* বলে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না জানতে চা এঁরা খাবেন কি না, মিনুকে পাঠালেন রান্নাঘরে চা করার জন্য। মিনু চা নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত তিনটি প্রাণী আবারও নৈশব্দ্যের ভেতরে সাঁতার কাটছিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে টাই পরা প্রথম বললেন, তাহলে কি আপনি কি নাম বলবেন না? কিছু নামের জন্য নিজের এত বড় ক্ষতি করবেন আপনি?

কেবল নাম হলে তো কথাই ছিল। নামের আড়ালে তো মানুষ আছে।

তাতে আপনার কি? আপনি তো নিজের দিকটা দেখবেন। যে শর্তে আপনার সুবিধা হয় তা নিয়ে ভাববেন।

নামগুলো জানা আপনাদের দরকার কেন?

এমনি। জাস্ট কিউরিওসিটি। আমরা তো তাদের আর কোনও ক্ষতি করতে যাবো না। প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে আর জানতে চাওয়া কেন?

বললাম তো কৌতূহল।

আপনারা তো বলেছেন তাদের নাম আপনারা জানেন।

জানি কিছু। বাকিটা আপনি বললে ভাল হয়।

না। আমি বলব না।

তাদের কোনওরকম ক্ষতি হবে না, কথা দিচ্ছি। কেবল আমরা দুজন জানব, আর কেউ না।

আমার পক্ষে সম্ভব না কারও নাম বলা।

আপনার ক্ষতি হলেও না?

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে স্পষ্ট স্বরে বললাম, *না।*

ভেবে বলছেন?

ভেবেই বলেছি।

ভাবার জন্য আরও সময় নেবেন?

না।

বলে আমি লক্ষ্য করি আমার হাত আর কাঁপছে না যখন চায়ের কাপটি আমার হাতে। লোকদুটো চা শেষ করেননি। দুটো কি তিনটি চুমুকের পর উঠে পড়লেন। আমি বসে থাকি, পুলিশ কি আমাকে বিমান বন্দরে তাহলে নিয়ে যাবেন না! এরকম কি হতে পারে না যে আমি যাবো না! পুলিশ আসেনি, তাই আমার যাওয়া হয়নি। এই ফাঁকিটি কি আমি এখন দিতে পারি না! নিশ্চয়ই পারি। জামিন আমাকে যদি এই শর্তেই দেওয়া হয়ে থাকে যে আমাকে দেশ ছাড়তে হবে, না হয় হয়েছে দেওয়া। কিন্তু আমি যদি বেঁকে বসি, যদি বলি যে যাবো না দেশ ছেড়ে, তবে কি আমার জামিন ফেরত নেওয়া হবে! ক বলেছিলেন, আমাকে সরকার যা খুশি করতে পারে, জেলে ভরতে পারে। আমি দেশে থাকলে মৌলবাদীদের আন্দোলন এমন তীব্র হবে যে আমাকে বাঁচাতে তখন আর কেউ পারবে না। না এ দেশ, না অন্য কোনও দেশ। অন্তত আন্দোলনের তীব্রতা কমাতে এ দেশের স্বার্থে আমাকে পাড়ি দিতে হবে আপাতত অন্য দেশে। তারপর ঘরের মেয়ে তো ঘরে ফিরে আসবই। একদিন না হয় একদিন।

মাথাটি ছিঁড়ে যেতে থাকে। কোনও ভাবনা আর ধরে না। শরীরে শক্তি নেই যে উঠে দাঁড়াবো। আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া যদি সরকারি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, এটি তো জানি সরকারি সিদ্ধান্তই, তবে তো পুলিশ আমাকে নিরাপত্তা দেবেই আজ রাতে। নিয়ে আমাকে যাবেই বিমান বন্দরে। আর তা যদি না হয়, তবে পুলিশ ছাড়াই যাবো বন্দরে, যা হয় হবে।

ভেতর ঘর থেকে মার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। কান্নার শব্দ অনুসরণ করে আলুথালু মাকে দেখি দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদছেন। চাপা স্বরে বলি, কাইন্দা কোনও লাভ হইব? বাইচা থাকতে চাইলে আমার তো যাইতেই হইব।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে বলতে থাকেন, তুমারে আমি লুকাইয়া রাখবাম, কেউ জানব না। তুমি যাইও না মা। উপরে আল্লাহ আছেন। কেউ কিছু করতে পারব না। সব ঠিক হইয়া যাইব। তুমি শুধু বইলা দিবা ধর্মের বিরুদ্ধে আর কিছু লিখবা না। মেয়েদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে, মেয়েদের স্বাধীনতার জন্য যা লিখতাছিলা,তেমন লিখবা, শুধু ধর্মের বিরুদ্ধে না লিখলেই তো হইল।

বাবা দীর্ঘ একটি শ্বাস ছেড়ে বললেন, বললেও ওরা মানবে না কিছু। ও তো বলছেই কোরানের কথা বলে নাই, তারপরও কি ওরা থামছে?

গ্রীবা শক্ত করে মা বললেন, ও তাইলে ক্ষমা চাক। যা লেখছে তার জন্য ক্ষমা চাইয়া ফেললে আর কোনও মিছিল হবে না।

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, *আমি মইরা যাবো, তবু ক্ষমা চাইব না।*

কেন চাইবা না? মানুষ ভুল করলে ক্ষমা চায় না? মার হাতদুটো চেপে ধরেছে আমার হাত।

আমি কোনও ভুল করি নাই।

এত অহংকার ভাল না নাসরিন। তুমি ক্ষমা চাইয়া ফালাও, তাইলে দেখবা আর কেউ কোনও অসুবিধা করব না। মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন।

মার সামনে থেকে সরে আসি। আমার পেছনে উঠে আসতে আসতে তিনি বলতে থাকেন, *আমি সাংবাদিকদের ডাকব, ডাইকা আমি আমার মেয়ের হইয়া ক্ষমা চাইব।*

না মা। এইগুলা কইর না। আমার যাইতে হইবই। আর কোনও উপায় নাই। আমি কঠিন কণ্ঠে বলি।

ইয়াসমিন সুটকেসে জামা কাপড় ঠেলে ভরছিল। মা ওর হাত থেকে আমার জামা পাজামা কেড়ে নিয়ে বললেন, *এত জামা কাপড় দিতাছস কেন? ও কয়দিনের লাইগা যাইতাছে?*

বাবা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, *মাস দুইমাস তো বাইরে থাকতেই হইব।*

ছোটদা লম্বা হয়ে শুয়েছিলেন। বললেন, *ওর আর জীবনেও আসা হয় কি না দেখেন।*

এক মুহূর্তে পরিবেশটাকে কেমন ভূতুড়ে করে ফেলেন ছোটদা।

এইসব কি কয় কামাল? বলে মা জোরে কেঁদে ওঠেন। মাকে সরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলি, *ধুত বোকার মত কান্দো কেন!*

নাসরিন এই বাড়ি কিনছে, গাড়ি কিনছে। বাড়িডা মাত্র সাজাইছে বাড়ি ছাইড়া চইলা যাওয়ার লাইগা?

মা, তুমি বুঝতাছো না কেন? আমি কি সারাজীবনের লাইগ্যা যাইতাছি গা নাকি? কয়দিন পরই তো আইয়া পড়াম।

কামাল কইল তোমারে নাকি আর আইতে দিব না। এইসব কী কয় কামাল?

ছোটদা কী জানে? ছোটদা কি আমার চেয়ে বেশি জানে? কয়, আন্দাজি কয়। নরওয়ে আর সুইডেনে আমার অনুষ্ঠান আছে। তাই আমারে বিদেশের সরকাররা সাহায্য করছে বিদেশে যাওয়ার লাইগ্যা। দেশের অবস্থা খারাপ বইলা করছে। দেখতাছো না কি ঘটতাছে! এখন তো হাতের কাছে পাইলে আমারে টুকরা টুকরা কইরা ফেলব। বিদেশের অনুষ্ঠান শেষ হইলে তো চইলা আমার আসতেই হইব।

মা ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে বলেন, *তহন কি আইতে দিব খালেদা জিয়া?*

দিব না কেন? এইটা আমার দেশ না?

তাইলে যে কামাল কয় আইতে নাকি দিব না।

এমনি কয়।

এমনি কয় কেন? কামাল এমনি কইব কেন এইসব কথা। কয় কেন যে জীবনেও আসা হইব না!

আশ্চর্য। এইসব যে কি বোকার মত কর। তোমার মত বোকা আমি আর দেখি নাই।খালেদা জিয়া ত আমারে দেশের বাইরে যাইতে দিতে চায় নাই। দেখ না পাসপোর্ট নিয়া নিছিল? দেখ নাই দেশের সব রাস্তা বন্ধ কইরা দিছিল যেন বাইরে যাইতে না পারি। সরকার তো কখনও চায় নাই আমি বাইরে যাই। এখন বাইরের দেশগুলা বলছে বইলা রাজি হইছে।

কবে আইবা তাইলে?

অনুষ্ঠান শেষ হইলেই আইসা পড়বাম। এরমধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হইয়া যাইব। মোল্লারা আর কতদিন চিল্লাইব! সরকার বুইঝা গেছে মোল্লাদেরে উস্কাইলে নিজেদেরই বিপদ হয়। এহন আর উস্কাইব না।

মা শান্ত হন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। ছোটদা যখন আবার বলতে শুরু করেন, *তরে আর আইতে দিব না। কারণ তুই আইলেই মোল্লারা তর ফাঁসি চাইব, সরকার পতনের আন্দোলন করব।* শুনে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন মা।

দাদা মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসা, বললেন, *খালেদা জিয়ার ত আর কোনও উপায় ছিল না নাসরিনরে দেশের বাইরে পাডাইয়া দেওয়া ছাড়া। মোল্লাদেরে একটু কন্ট্রোল কইরা সরকারই অরে নিয়া আইব।*

ছোটদা সোজা হয়ে বসে বললেন, *তোমারে কইছে নিয়া আইব! আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচে খালেদা। নেক্সট ইলেকশানে আওয়ামী লীগ জিতলে আসার একটা সম্ভাবনা আছে।*

আমার মেয়েরে তরা কই পাঠাইতাছস। মেয়ে কই থাকব? কার কাছে থাকব? কি খাইব! কেমনে বাঁচব! বলতে বলতে কাঁদেন মা। মার দিকে কেউ ফিরে তাকায় না।

এরা ষড়যন্ত্র কইরা তোমারে দূরে সরাইয়া দিতাছে। তুমি যাইও না। আমার মেয়েরে আমি কোথাও যাইতে দিব না। সুটকেস থেইকা কাপড় বাইর কর।

ছোটদা জোরে ধমকে ওঠেন, *কি পাগলামি করতাছেন মা। এইবার থামেন তো!*

বাবা আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেন, *পুলিশ কী কইতে আইছিল?*

জিগাইতে আইছিল কার কার বাড়িতে ছিলাম।

কইয়া দিছ?

না।

ভাল করছ।

ছোটদাকে বলি তিনি যেন পুলিশের কোনও চাপেই বলে না দেন যে ঝর বাড়িতে ছিলাম আমি। বাড়ির লোকেরা এক ঝর বাড়ির কথাই জানেন কেবল যে ওখানে ছিলাম। বাড়ির কাউকেই বলিনি আর কোনও নাম, আর কোনও বাড়ির কথা।

সুটকেসের দিকে চোখ পড়তে সুটকেসের কাপড় কিছু আলমারিতে তুলে রাখতে রাখতে বলি, এত কাপড় দিছে যেন মনে হয় ছয় মাসের লাইগা যাইতাছি! এইসব এইখানে যেইভাবে সাজানো আছে, তেমনই থাকুক।

ছোটদার ঠোঁটে অদ্ভুত একটি হাসি। দাদার ফ্যাকাসে মুখে কোনও হাসি নেই, তিনি চেয়ারে বসে পা নাড়ছেন। পা গুলো খুব দ্রুত নড়ছে। সামনে তাঁর যত্ন করে কাটা গত দুমাসে দেশের পত্রিকাগুলো থেকে আমি জড়িত খবরের কয়েক দিস্তা কাগজ। বিদেশ থেকে আসা চিঠিপত্র, ফ্যাক্স।

এইগুলা নিয়া যা নাসরিন।

না।

কাজে লাগতে পারে।

না।

বিছানায় শুয়ে থাকি। আমার পাশে বাবা শুয়ে আছেন। বিছানার কিনারগুলোয় বসে আছেন ছোটদা, দাদা। ইয়াসমিন আর মিলনও আছে। মা কাঁদছেন আমার পায়ের কাছে বসে।

যা যা পছন্দ করি খেতে, মা সারাদিনই চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সেসব মুখে তুলে দিয়েছেন, খেতে না চাইলেও মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। রাত ঘন হচ্ছে আমি ঘন ঘন চা পান করছি। মা আবারও মুখের সামনে খাবার নিয়ে এলেন। ধুত্তুরি বলে ঠেলে সরিয়ে দিলাম মার হাত। এ সময় কার খেতে ইচ্ছে করে! ঘড়ির দিকে বার বার চোখ চলে যাচ্ছে। যত কাঁটা এগোচ্ছে, তত আমার শরীর শিথিল হচ্ছে।

রাত দেড়টার দিকে দেখি দুটো গাড়ি শান্তিনগরের মোড়ের কাছে। ছোটদা দেখে বলেন, ওইগুলা পুলিশের গাড়ি।

আমাকে এখন এমন কাপড়ে ঢাকতে হবে শরীর এবং মুখ, যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে। ওড়নায় আবার মুখ মাথা ঢাকার পালা, বেরিয়ে থাকবে কেবল চোখ, চোখে আবার একটি কালো চশমা, আর চোখের ভুরু ইয়াসমিন এমন করে এঁকে দেয় যেন আমার ভুরু বলে কেউ ধারণা করতে না পারে। আয়নার সামনে এভাবে আমাকে সাজতে হয়, এবং খুঁটিয়ে দেখতে হয় আমি বলে কিছু আমার চেহারায় আছে কি না। নেই বুঝে সরতে হয়, সরে আমাকে দরজার দিকে হাঁটতে হয়। কারণ ছোটদা, দাদা, মিলন তৈরি, সময় হয়ে গেছে। মা এই দৃশ্য দেখতে চান না, তিনি মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন। মার শাড়ি সরে গেছে মার শরীর থেকে। কপাল ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। বাবা ধমকে থামাতে চাইছেন মাকে, আশে পাশের বাড়ি থেকে লোক জেগে যাবে বলে।

মাকে থামানোর সাধ্য কারও নেই।

মা কেঁদে কেঁদে বলছেন, *আমার মেয়েরে তরা ষড়যন্ত্র কইরা দেশ থেইকা বার কইরা দিতাছস। আমার মেয়েরে আমার কাছে ফিরাইয়া দে তরা। আমার মেয়েরে আমি যাইতে দিব না। কোথাও যাইতে দিব না।*

বাবা, দাদা আর ছোটদার বিরুদ্ধে অভিযোগ শেষ করে মা আল্লাহ নিয়ে পড়েন, *আল্লাহগো, এ কি করলা গো আল্লাহ। তোমার পায়ে পইরা কত কানছি। কত কইছি আমার মেয়েরে কোনও বিপদ দিও না। আমার মেয়েরে কই পাডাইতাছো আল্লাহ গো। আমি কি কইরা বাচবাম! আল্লাহ তুমি কি করলা। আমার মেয়েরে এত কষ্ট কেন দিতাছ। ও তো এত কষ্ট সইতে পারবো না। কষ্ট আমারে দেও আল্লাহ। ওরে আর কষ্ট দিও না। আমার মেয়েরে আমার কাছে থাকতে দাও আল্লাহ। ওরে নিও না। ওরে আমার কাছ থেইকা দূরে সরাইও না।*

মাকে মেঝে থেকে উঠিয়ে আমি আমার টিকিটটি দেখাই, *এই দেখ মা, টিকিটে লেখা আছে ফেরার তারিখ। ঠিক এক মাস পরে আমার ফেরার তারিখ, দেখ দেখ আটই সেপ্টেম্বর। দেখছ? টিকিট আমার হাতে দেশে ফেরার। তুমি কাইন্দ না।*

মা চোখ তবু মোছেন না। তবু মা কাঁদেন। আমি জানি, মাও জানেন যে আমাকে যেতে হচ্ছে, দেশে থাকার উপায় নেই বলে কোথাও যেতে হচ্ছে আমার। আমি জানি যে দেশের অবস্থা খানিকটা ভাল হলে, মৌলবাদীদের আস্ফালন সামান্য কমে এলে আমি দেশে ফিরবো, কিন্তু আমি জানি না যে মৌলবাদীদের আন্দোলন কমে এলেও, দেশের অবস্থা খানিকটা নয়, অনেকটা ভাল হলেও আমার আর ফিরে আসা হবে না। কারণ আমাকে ফিরতে দেওয়া হবে না। আমি জানি না যে আসলে এই

আমার শেষ যাওয়া। আমাকে কোনওদিন আর আমার নিজের দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। সরকারের বদল হবে, কোনও সরকারই আমাকে দেশে ঢুকতে দেবে না আর। আমাকে আমার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে, সকলে জানবে সব কিন্তু কেউ কোনওদিন এত বড় একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও টুঁ শব্দ করবে না। একজন লেখককে তাঁর লেখার অপরাধে, তাঁর মত প্রকাশের অপরাধে চরম নির্বাসনদণ্ড পেতে হবে, পুরো একটি দেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে কেবল, কোনও আপত্তি করবে না। আমি যাচ্ছি স্বপ্ন নিয়ে যে দেশের বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কিছুতেই মেনে নেবেন না যে একজন লেখককে তাঁর লেখার কারণে নির্বাসনে যেতে হবে, তাঁরা আন্দোলন করবেন, আমাকে দেশে ফেরত নিয়ে আসার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাবেন, আমি একদিন ফিরে আসবো নিজের দেশে সসম্মানে, যেভাবে নিজের মুখখানি ঢেকে মাথা নিচু করে চরম অসম্মাননা নিয়ে নাম পরিচয় লুকিয়ে আমাকে দেশ থেকে বেরোতে হল, সেভাবে নয়, শির উঁচু করে ফিরব,নিজের নামটি নিয়ে ফিরব, লেখক হিসেবে ফিরব, লেখকের অধিকার নিয়ে ফিরবো, বাক স্বাধীনতার জয় জয়কার ধ্বনিত হবে চারপাশে, আমি ফিরব। কিন্তু আমি জানি না যে আমার স্বপ্ন পায়ে মাড়িয়ে যাবে লোকে, কেউ কখনও আমার দেশে ফিরে আসার কথা ভুলেও তুলবে না। আমি জানি না যে আমাকে দেশের লোকেরা ভুলে যাবে খুব দ্রুত, আমার কথা আর কোথাও তেমন উচ্চারিত হবে না। না, আমি কিছুতেই জানি না যে দেশ থেকে আমাকে বিতাড়িত করার এই ঘটনাটি সকলে বিস্মৃত হবে অচিরেই। অচিরেই আমাকে একটি ভুলে যাওয়া নামে, লেখকে পরিণত করবে সকলে। কেউ আর আমার কোনওরকম প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করবে না। কেবল একজনই অনুভব করবেন, তিনি আমার মা। তিনিই শুধু ভাববেন ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসুক। তিনিই কেবল আমার জন্য অপেক্ষা করবেন, প্রতিদিন তাকিয়ে থাকবেন আকাশের দিকে, উড়োজাহাজে করে আমি ফিরে আসছি দেশে, এই আশায়। তিনিই শুধু ভাববেন আমাকে, তিনিই শুধু আমার না থাকাকে সইতে পারবেন না। একা একা কাঁদবেন তিনি। কেউ তাঁর ওই কান্নার দিকে ফিরে তাকাবে না।

বাবাকে বলা হয়েছে বিমান বন্দরে যাওয়ার তাঁর দরকার নেই, কিন্তু তিনি প্যান্ট শার্ট পরে তৈরি হয়ে রয়েছেন সবার আগে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবাকে অসহায় বালকের মত দেখতে লাগে। তিনি করুণ চোখে তাকাচ্ছেন সবার দিকে, যেন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। ছোটদা বাবার হাত টেনে শোবার ঘরে নিয়ে এসে বললেন, *কোনও দরকার নাই আপনের যাওয়ার।* কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা, যাবেনই। আমি বললাম, *বাবা যাবে।*

না, দরকার নাই। কি দরকার! ছোটদা বললেন।

কারও তো যাওয়ার তাইলে দরকার নাই। আমি রাগ দেখালাম।

গাড়িতে জায়গা হবে না।

হবে।

দরজার কাছে যেতেই মা আমাকে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রাখেন। দু বাহুতে শক্ত করে আমাকে বুকে আঁকড়ে রাখেন। আমাকে মার শক্ত আলিঙ্গন থেকে জোর করে টেনে বের করেন দাদা আর ছোটদা। আমি বাবার হাত ধরে দরজার বাইরে বেরোই। দরজার কাছে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ছজন পুলিশ ঠিক বুঝে পেল না এত রাতে কোথায় যাচ্ছে বাড়ির এতগুলো লোক।
মিলন পুলিশদের বলল, আমার খালা আজকে চিটাগাং যাইতাছে, তারে পৌঁছাইয়া দিতে যাইতাছি ।

পাহারা পুলিশও যেন না জানে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, কারণ এদের মধ্যেও মৌলবাদী থাকতে পারে, এদের মধ্যে কেউ খবর দিতে পারে যে আমি এখন বিমানবন্দরে যাচ্ছি। সরকারের ওপরতলা জানে আমি যে যাচ্ছি, নিচতলা জানে না কূটনীতির সবকিছু। এমন সতর্কতার মধ্যে ইতিউতি তাকিয়ে সবাই নীচে গ্যারেজে নেমে এল। চালকের আসনে ছোটদা, ছোটদার পাশে মিলন, পেছনে আমি দাদা আর বাবার মাঝখানে। সাদা গাড়িটি বেরিয়ে এল ইস্টার্ন পয়েন্ট থেকে। সুনসান রাস্তা, শান্তিনগরের মোড় অবদি পৌঁছতেই আমাদের গাড়ির সামনে একটি, পেছনে একটি গাড়ি চলতে শুরু করে। পুলিশের গাড়ি। পেছনে বাড়িটির দিকে তাকানো হয় না আমার। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মা, টের পাই। মার কান্নার শব্দ আমার সঙ্গে বিমান বন্দর অবদি যায়।

বিমান বন্দরে গাড়ি থেকে নামতেই দেখি মোচঅলা আর মোচহীন পুলিশ অফিসার দুজন আমার দু পাশে। সাদা পোশাকের এক দল পুলিশ ঢুকে যাচ্ছে বন্দরের ভেতরে। মাঝখানে আমি, আড়াল করে রাখা হচ্ছে আমাকে। যেতে যেতে কখন একসময় লক্ষ্য করি পেছনে আটকে পড়েছে বাবা, দাদা, ছোটদা আর মিলন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। পেছনে তাকিয়ে দেখি ওরা আমার নাগাল না পাওয়া দূরত্বে। কিন্তু আমাকে দাঁড়ালে চলবে কেন! পুলিশের তাড়ায় আমাকে হাঁটতে হয় সামনে। দূরত্ব বাড়তে থাকে। হু হু করে ওঠে বুক। সোজা আমাকে বিমানের ভেতরে নিয়ে গেলেন পুলিশ অফিসার দুজন। ভেতরে কিছু লোক বসে আছে। হঠাৎ দেখি ঙ বসে আছেন আমার আসন থেকে দু সারি কিছু পেছনে। মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হয়।

জানালায় তাকিয়ে থাকি। বাইরে একটু একটু করে আলো ফুটছে।

রানওয়ে পার হয়ে যখন বিমানটি আকাশে, জানালায় চোখ রেখে দেখছি আমার ক্ষুদ্র দরিদ্র দেশটি, অভাবে অসুখে থাকা দেশটি, বারো কোটি মানুষের জনাকীর্ণ দেশ, দুর্ভিক্ষে খরায় বন্যায় ভোগা দেশটি, আমার জন্মের দেশ, আমার শৈশব কৈশোর যৌবনের দেশটি। যত ওপরে উঠি দেশটি ধূসর হতে থাকে, দেশটি একটু একটু করে অদৃশ্য হতে থাকে, অদৃশ্য হতে থাকে বিমান বন্দরে নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকা বাবা, শান্তিনগরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা মা, অদৃশ্য হতে থাকে আমার সকল স্বজন, সকল বন্ধু। অদৃশ্য হতে থাকে আমার জন্ম জন্ম চেনা প্রকৃতি, বাড়িঘর, উঠোন, পুকুর, অদৃশ্য হতে থাকে নদী, গাছ গাছালি, মেঠো পথ, বন, ফসলের ক্ষেত। এক ঝাঁক মেঘ এসে হঠাৎ আড়াল করে দেয় সব। মেঘ খানিকটা দূরে সরবে এই আশায় মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকি পলকহীন চোখে।

মেঘ তুমি সরে যাও, আমাকে আরেকটু দেখতে দাও। মেঘ তবু সরতে চায় না। নিষ্ঠুর বিমানটি আরও মেঘ ফুঁড়ে মেঘের ওপরে উঠে যায়। আচমকা অদৃশ্য হয়ে যায় আমার দেশটি, বড় প্রিয় দেশটি।

নিজের একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে উঠি।

শ্বাসটি কি নিশ্চিন্তের! স্বস্তির! জীবন ফিরে পাওয়ার!

নাকি বেদনার! অনিশ্চয়তার! জীবন হারানোর!